বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
তালিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক।

কৃষি ও শিল্পবিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন ১৩৩০ সালের বর্ষসূচী।

২৪শ খণ্ড

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে কৃষি শিল্পাদি	১৭ ও ৪৯
অর্থ সমস্যা	২৯৮
অশ্বগন্ধার চাষ	৩১১
আলু চাষ	১৫৫
আনারস	৫৯, ১১৮ ও ২৭৯
আখরোট	২৫২
আতা পাতা	৩০
আহার্য্য ছত্রক	২২
আহার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রয়োজন।	৩৭৬
ইক্ষু	৯১ ও ২১৪
উদ্যান ও ক্ষেত্রজ ফসল	৪৪
উদ্ভিদের উপর চন্দ্রের প্রভাব	২৮৬
একাল ও সেকাল	১৮৬
এরোরুট ও শঠীর পালো প্রস্তুতের যন্ত্র	২৭৭
এরোরুট	২৮ ও ২১০
এলুমিনিয়ম	৩৫০
কাজু অথবা হীজলী বাদাম	১
কার্পাস চাষের ভবিষ্যৎ	৬, ১১৩ ও ৩১৮
কৃষিপ্রবাদ	৫৭

কৃষিজাত দ্রব্যাদিও আগামী প্রদর্শনী ৬৯
কৃষি (কবিতা) ৮৬
কচুরী পানা সমস্যা ৯৭ ও ৩৫০
কাক ১০৫
কৃষি ও অন্নকষ্ট ১৩৪
কপি চাষ ১৩৮
কৃষি সংবাদ আলোচনা ১৭৪
কৃষি বাণিজ্য ২০২
কলা ও এরারূট ২১০ ও ২৫৫
কষ উৎপাদক উদ্ভিদ ২১৮
কাশ্মীরের স্বভাবজ সম্পদ ২২১ ও ২৩৫
কৃষকের জাগরণ গীতি (কবিতা) ২৪৩
কাঁঠাল প্রসঙ্গ ২৪৪
কৃষকের নিবেদন ২৫৭
কাঁচা তরকারী ও ফল ২৮২
কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনীতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ ৩০৩
কার্পাস ২৮৯
কুইনাইনের কথা ৩৪৯
কচু (সার) ২১৫
কার্পাস গবেষণা বৃত্তি ২০৮
করাতের গুঁড়া ২০৬
ক্যানেডায় কৃষিজাত পণ্য ৯৪
কৃষিকার্য্য অবহেলার বা ঘৃণার কার্য্য নহে ৩৫৩
খাদ্য ও জীবনী শক্তি ২৮০
খাদ্যাভাব ৩৭৫
গোলাপ ও গোলাপজাত দ্রব্যাদি ৬৫
গাঁদা ও জিনিয়া ১০৭
গোরক্ষা ও গোহত্যা ৩১০
গোপালন ও দুগ্ধব্যবসায় ৩২১ ও ৩৬২
গুড় ও চিনি ৩৩৬
গড়গড়ীর চাষ ১৫২

গোলাপের পোকা ৫৯
ঘরের ও বাহিরের কারবারের কথা ২৬১
চাষীর উপনিবেশ ৩৫১
চিনা বাদামের চাষ ২৮৫
চরকা প্রচারের উপকারিতা ২৮৩ ৩০৩
জল হাওয়া ও ফসল ২৫,৫৩, ৯৬, ১২০, ২১৪, ২৩৮ ও ৩১৯
জল বায়ু ও ফসল ১২১
জিনিয়া ও গাঁদা ১০৭
জাতীয় শিক্ষার কথা ৬১
জল শোধণ ৩৫০
জীবনুর আবশ্যকতা ২০৬
ঝুম চাষ ২৫১
টিউবওয়েলের উপকারিতা ৩১৭
তুলার চাষ ১৪৭ ও ২৮৯
তামাকের চাষ (বিলাতী) ১৫৩
দেশের ও দশের কথা ২২, ৫৪, ৮৯, ১০৯, ১৪৭, ২০৮, ২৫৩, ২৮৩, ৩১৬, ও ৩৪৯
দুধে তৈয়ারী জিনিস ২১৫
ধুন্দুল শিল্প ১৯৬
নারিকেল ১১০, ১৭৮, ২৫১ ও ২৮৪
নকল তুলা ২৮৬
নীল ৬০
পত্রাদি ৩১, ৮০ ও ২৫৫
প্রাপ্ত পত্র ৩৪৭
পটল চাষ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা ১৮৯
পটলের মোরব্বা ১২৪
পাট ফসল ১৪৪ ও ২৫৫
পানিফল ১০১
পাট ও শণ চাষ এবং অন্নকষ্ট ৭৩
প্রদর্শনী ৬৯ ও ৯৫
পাখীর কাজ ৯৩ ও ৩১৭
পেয়ারা বাগীচা ২৮৫
বিদেশে ভারতীয় কলার রপ্তানীর ব্যবসায় ৩৪০

পঞ্চনদের বন বিভাগ ২৮৩
পল্লীসংস্কার ৩৭৩
পল্লি যুধিষ্ঠির (কবিতা) ১৫৪
পান চাষ ৩৬৭
ফলের ব্যবসা ২৫৫, ২৭৯ ও ৩১৬
বাংলা কৃষি পরীক্ষা ও গবেষণা ৮
বর্ষারম্ভ ১৩
বাবলার উপকারিতা ৪৭
বঙ্গে কৃষিশিল্প ৭৭
বনভূমির উপকারিতা ১৬১
ব্যবসায়ীক মুর্গীচাষ ১৯৩
বন্য কাক ২০০
বেকার সমস্যা ও তাহার প্রতীকারোপায় ২৭৩ ও ৩৫৯
ব্যবসায়ের প্রচার বিভাগ ৩২৪
বঙ্গীয় কৃষক, কৃষি ও পল্লীর উন্নতি ৩৪৩
বঙ্গের কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী ৩৪৬
বাজার দর ৩৪৮
বাগানের মাসিক কার্য্য ৩২,৬৩, ৮৭, ১২৭, ১৫৯,১৯১, ২২৩,২৫৬, ২৮৭, ৩২০, ৩৫২ ও ৩৭৭
বিলাতে ভারতীয় দ্রব্য প্রদর্শনী ৩৫০
বঙ্গে যৌথ কারবার ৩১৯
বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা ৩১৫
বঙ্গে ধাতু শিল্প ২৮৩
বাগান বাগিচা ২১৬
বাঁশের বীজ ২১৬
বারমেসে পটল ১৯০
বিলাতে তামাকের চাষ ১৫৩
বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন ৫৪
বৈদেশিক পণ্যের আমদানী ৩৫৬
বর্ষ শেষে ১৭১
ভারতের তৈলবীজ ৩৩
ভারতে রেল পথের বিস্তার ২৩১

ভূমিই অর্থ বা ধন ২৬৭
ভূমি (কবিতা) ২৭২
ভারত ব্রহ্ম রেলপথ ৩৪৯
মাটীর কথা ২৯৬ ৩২৮ ও ৩৬৫
মৎস্যোৎপাদন ৩০৭
মলমূত্র সার ৩১৬
মাংসভূক উদ্ভিদ ২৫১
ম্যালেরিয়া বীজ আবিষ্কারের ইতিহাস ২০৮
মাছ ১২৫
মৎস্য দ্বারা ম্যালেরিয়া দমন ১১৭
রবর উৎপাদন ১৪৩
রক্ষিত ফলের ব্যবসায় ২৭৯
রেড়ীর চাষ ১৫৩
রেশম শিল্প ৮৯
লাল পিঁপড়া ৫৫
লাক্ষা ১১০ ও ২২৯
লেবু ২২৫
লেবুর বাগান ৩১৮
শণ চাষ ৭৩
শালিক পাখী ৪১
শিক্ষার বিস্তৃতি ৩১৫
শুল্ক বোর্ড ও কৃষি ২৪০
সমগ্র জগতে একটী আন্তর্জাতীক ভাষা ৩১৩
সরকারী চাকুরী ৩১৪
সমসাময়িক জগত ২৬, ৫৫, ৯৩, ১১৭, ১৫২, ২০৬, ২৫১ ও ২৮৬
সার সংগ্রহ ২৮, ৫৯, ৮১, ১২২, ১৫৪, ২১৫ ও ২৭৯
সুন্দরবনের স্বাভাবিক সম্পদ ১২৯

সার হিসাবে বরবটীর চাষ	২৮৩
সার (কচু)	২১৫
সব্জী বীজ	২০৭
সূর্য্যমুখী গাছ	১৪৮
সুরাসার (তরল জ্বালানী)	৯৩
হাড়ের গুঁড়া সার	১১৪
হোকলা	১৪৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

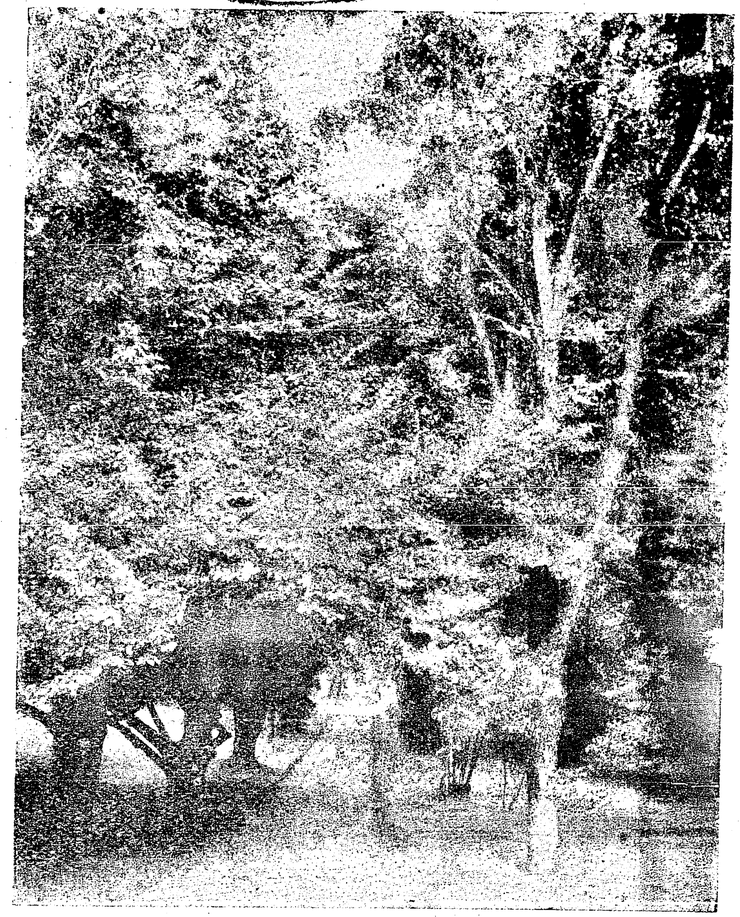

জায়ফল-কুঞ্জ।

মালাক্কা, জাভা, মালয়, সিংহলদ্বীপে এই বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে, ঐ সকল স্থানে ইহার আবাদ করাও হইয়া থাকে। নদীতীরে পলিমাটিতে ইহার আবাদ সহজে হয়। ৮।১০ বৎসরে এই বৃক্ষ ফলবান হয়। বৃক্ষগুলি সর্ব্বদাই সবুজ-পত্রে সুশোভিত থাকে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

২৪শ খণ্ড | কৃষক—বৈশাখ, ১৩৩০ সাল। | ১ম সংখ্যা।

কাজু অথবা হিজলী বাদাম।

বর্ত্তমান জগতে খাদ্য সমস্যার ন্যায় কোন সমস্যাই এত জটিল কিম্বা গুরুতর নয়। বিশেষতঃ বিগত মহাসমরের পর শ্রমিক ও মূল ধনের অভাবে ইউরোপ খণ্ডের নানা স্থানে অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে। পৃথিবীর এক মহাদেশের আহার্য্য বস্তুর অভাব হইলেই অন্য দেশের ফসলের উপর টান পড়ে। সেই হিসাবে ভারতের শস্যাদির উপর ক্রমশঃ টান পড়িতেছে ও পড়িবে। কিন্তু অন্য দেশে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করিয়া, নূতন ফসল প্রবর্ত্তন করিয়া ও যৌগিক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া যেমন খাদ্যাভাব মোচনের চেষ্টা হইতেছে এদেশে সেরূপ কিছুই হইতেছে না। অথচ কৃষিজাত ফসল বাদ দিলেও আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে এত রকম পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ্য আহার্য্য আছে যে তাহা ভাবিলে আমাদের নিশ্চেষ্টতা বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। এস্থলে আমরা এইরূপ একটি বৃক্ষের আলোচনা করিব—ইহা সাধারণতঃ কাজু অথবা হিজলী বাদাম নামে পরিচিত।

উদ্ভিদ্‌বিদেরা হিজলী বাদামের নাম দিয়াছেন—Anacardium Oceidentale. ইহা Anacardiaceae অর্থাৎ আম্র বর্গের অন্তর্গত। ইহার আদিম নিবাস মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, কিন্তু আজকাল ইহা পৃথিবীর অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যথা ইণ্ডো-চিণ, ভারত, মলয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইনস, পূর্ব্ব ও [illegible] আফ্রিকা,

ম্যাদাগাস্কর ও অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় স্থান। অপরাপর কতিপয় ব্যবহারিক উদ্ভিদের ন্যায় হিজলী বাদামও এতদ্দেশে পর্ত্তুগীজেরাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং ভারতে ইহার আগমন ৩০০ বৎসরে অধিক নয়। কিন্তু বিদেশী হইলেও কাজু বাদাম ভারতের অনেক স্থলে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। গোয়া, মালাবার, কোচিন, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বাংলায় মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলার সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে, ব্রহ্ম দেশের উপকূলে কাজু বাদাম যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বড় বড় নদীর ব-দ্বীপগুলি বাদ দিলে ভারতের উপকূল-অরণ্যে কাজু বাদাম একটি বিশিষ্ট গাছ এবং এই সমুদয় স্থানের লোকেরা ইহার নানাবিধ ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ও অবিদিত নহে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমায়ই বন্য হিজলী বাদাম দেখা যায়।

স্বভাবজাত হিজলী বাদামের গাছে বিন্দুমাত্র লালিত্য নাই। না থাকিবারই কথা। যাহার সমস্ত জীবন সমুদ্র তীরের বালুময় অনুর্ব্বর জমি, প্রবল বাত্যা, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাত ও গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপের সহিত অনুক্ষণ দ্বন্দে অতিহাবিত হইয়াছে সে যে বক্র, কুব্জ ও সৌষ্ঠবহীন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সাধারণতঃ হিজলি বাদাম বেশ ঝাড়াল ও প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ হয়। কিন্তু উত্তম মৃত্তিকায় ও সযত্ন পালনে ইহা ৫০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে পারে। সমুদ্রতীরে এত অসুবিধা ভোগ করিলেও সমুদ্রের সহিত ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সমুদ্র হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে ইহা ভাল জন্মায় না। এ বিষয়ে ইহার স্বভাব অনেকটা নারিকেল বৃক্ষের মত। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রবর্ত্তী স্থানে বালি আড়ি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। বালি আড়ির অব্যবহিত পশ্চাতে কতকগুলি অপুষ্ট, প্রায়-কণ্টকময় উদ্ভিদের শ্রেণী প্রসারিত। তাহার কিছু পরেই হিজলি বাদাম জন্মিয়া থাকে। ইহার ত্বক, কোমল অংশ ও আঠা তীব্র স্বাদযুক্ত বলিয়া পশ্বাদি ইহা খায় না। হিজলী বাদামের বংশ রক্ষার ইহা একটি স্বাভাবিক সহায়। শীতের শেষে ইহার ফুল হইতে আরম্ভ হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভেই ফল পাকিয়া যায়। ইষৎ রক্তাভ ও শ্বেত—এই দুই প্রকারের ফুলযুক্ত গাছ দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের ফলের কিম্বা ফলনের কোন তারতম্য আছে কিনা তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই। একপ্রকার কীট ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে, কাঁথি মহকুমায়ই ইহা প্রধানতঃ দেখা যায়। হিজলী বাদাম গাছের কোন যত্নই করা হয় না এবং যাঁহাদের জমিতে উক্ত গাছ আছে তাঁহারা একবার মাত্র ফল সংগ্রহ করেন। গাছের তলায় যে সকল ফল পড়িয়া থাকে তাহা সাধারণতঃ স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা সংগৃহীত হয়। তাহারা উক্ত ফল হয় বাজারে বিক্রয় করে, কিম্বা অধিক পরিমানে সংগৃহীত হইলে তৈল বাহির করিয়া বেপারীগণকে দেয়। বেপারীরা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল ক্রয় করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ক্ষুদ্র বেপারীরা ফল সংগ্রহ

করিয়া আবার বড় মহাজনের নিকট দেয় এবং তাহারা সুবিধা মত নানা স্থানে উহা চালান দেয়।

দেখিতে সুদৃশ্য না হইলেও হিজলীবাদাম মূল্যবান আয়কর বৃক্ষ। অন্ততঃ ছয় প্রকারে ইহা মানবের ব্যবহারে আসিতে পারে। ইহার কাষ্ঠ সমুদ্রতীরবর্ত্তী নিরন্ন অধিবাসীদিগকে জ্বালানি কাঠ ও কুটীর নির্ম্মাণের খুঁটি প্রভৃতি সরবরাহ করে। ইহার গঁদ কীট নিবারক এবং হিং ও মুসব্বরের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহার উপকারিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মার্কিণে ইহার বেশ আদর আছে। ছালের কষে চামড়া রং করা যায়। ভেলার ন্যায় ইহার ছালের রসও দাগ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এই দাগ অথবা রং ধুইলেও উঠিয়া যায় না। অবশ্য হিজলী বাদামের অদ্ভুদাকার ফলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান অংশ। ফলের বৃন্তাংশ সমধিক পরিমাণে স্ফীত হইয়া গম্বুজাকার ধারণ করে। ৫ এর আকার যুক্ত ফল তাহার উপরে সংলগ্ন থাকে। বোঁটা পরিপক্ক হইলে সুন্দর রক্তাভ বর্ণ বিশিষ্ট হয় এবং উহা ঈষৎ কষায় রসযুক্ত মিষ্ট বলিয়া লোকে কাঁচা অবস্থায় অথবা পাক করিয়া উহা খাইয়া থাকে। ইহা হইতে যে কিয়ৎ পরিমানে শর্করা পাওয়া যাইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। শর্করা প্রস্তুতের জন্য ইহা ব্যবহৃত না হইলেও পর্ত্তুগীজ গোয়া অঞ্চলে উক্ত বোঁটা হইতে প্রচুর পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। সুরা শর্করার রাসায়ণিক রূপান্তর মাত্র।

প্রকৃত ফলের অর্থাৎ হিজলি বাদামের উপরে একটি কঠিন আবরণ আছে। সমস্ত ফলের ওজনের অনুপাতে এই আবরণ প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ, মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ। ইহাতে একপ্রকার কালচে রঙ্গের তৈল পাওয়া যায়; উহাতে শতকরা ১০ ভাগ Cardole ও ৯০ ভাগ Anacardic acid আছে। কার্ডোল অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য পদার্থ। গায়ে লাগিলে ফোস্কা হইয়া যায়, কিন্তু ইহার কীটনাশের ক্ষমতা যথেষ্ট। সেইজন্য মার্কিণে পুস্তক বাঁধাই ও কাষ্ঠ সংরক্ষণ কার্য্যে খোসার তৈল প্রভূত পরিমানে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়া পোড়াইয়া উক্ত তৈলের সহিত মিশাইয়া দিলে নৌকা এবং মাছ ধরার জাল প্রভৃতি রং করার উপযুক্ত উত্তম বার্ণিস হয়। উপরের কঠিন খোসা ও ভিতরের শাঁসের মধ্যে একটি পাতলা রক্তবর্ণের পর্দ্দা আছে। শাঁস ব্যবহারের পূর্ব্বে উহাকে ইষৎ ভাজিয়া লওয়া হয়। সেই সময় এই পর্দ্দা তুলিয়া ফেলা হইয়া থাকে। শাঁস প্রকৃত বাদামের ন্যায়ই সুস্বাদু। কাঁচা অবস্থায়, তরকারিতে ও মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

প্রকৃত বাদামের গাছ উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের বৃক্ষ। বাদাম ও বাদাম তৈল অত্যন্ত মহার্ঘ দ্রব্য তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত নহে যে হিজলী বাদাম কি তৈলের মাত্রায় ও কি পুষ্টিকর উপাদানের হিসাবে প্রকৃত বাদামের

Bleed Through

সমতুল্য। ২৬০। বাদামের শাঁস হইতে শতকরা ৪০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। হিজলী বাদাম ও প্রকৃত বাদামের গুণাগুন নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে :—

	হিজলী বাদাম	প্রকৃত বাদাম
জল	১৬·০১	৬·০
প্রটীন	১৮·০০	২৪·০
তৈল অথবা চর্ব্বি	৫৭·৩৮	৫৪·৪
শ্বেতসার প্রভৃতি	৫·২৮	১০·০
তন্তু	০·৯১	৩·০
ছাই	২·৪২	৩·০
পুষ্টিকর খাদ্যাংশ (food unit	১৯৪	২০৫
পোষণমাত্রা (Nutrient ratio)	১'৭৬৩	১·৫৫৯

আপাততঃ ভারতে যে সমুদয় লোকের হাতে হিজলী বাদাম সংগ্রহ ও ব্যবসায়ের ভার ন্যস্ত আছে তাহারা সযত্নে ফল তুলিবার অথবা উপযুক্ত প্রথায় বাদাম ভাঙ্গিবার ও গুদামজাত করিবার গুনাগুন কিছুই বোঝেনা। পক্ক, অর্দ্ধপক ও অপরিপক্ক ফল সমূহ এক সঙ্গেই তুলিয়া ফেলা হয়, শাঁসের অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেতঁসেঁতে ও বায়ু চলাচল রুদ্ধ স্থানে রাখায় অল্পদিনের মধ্যেই শাঁস 'টকিয়া' যায়। সাধারণতঃ ফল সংগ্রহের পর খোলা বায়গায় শুকাইতে দেওয়া হয়। খুব রোদ হইলে ৩৪ দিনে ফল শুকাইয়া যায়। শুষ্ক ফল তিন প্রকার অবস্থায় বাজারে আসিতে দেখা যায়। (১) শুষ্ক ফল, যাহার খোসার তৈল বাহির করা হয় নাই; (২) উক্ত তৈল বাহির করা অর্থাৎ 'ভাজা' ফল; (৩) শাঁস। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে ফল সংগ্রহ করে তাহাই পূর্ব্বোক্ত প্রথম অবস্থায় স্থানীয় হাট বাজারে আসিতে দেখা যায়; দ্বিতীয় প্রকারের ফল সমৃদ্ধ গৃহস্থগণের বাড়ী হইতে পাইকাররা ক্রয় করে। দুইটি হাঁড়ির দ্বারা মান্ধাতার আমলের এক প্রকার চোলাই যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফল হইতে তৈল বাহির করা হয়। খোসার তৈলের বাষ্প মুখ ও চোখে লাগিলে অপকার হয় ও উহার গন্ধও তীব্র ও অপ্রীতিকর বলিয়া লোকে যত শীঘ্র সম্ভব এই কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতে চায়। তাহাতে ফল এই হয় যে জ্বালের মাত্রা সমান থাকে না এবং অধিক জ্বাল দিলেই উত্তাপ ফলের খোলা অতিক্রম করিয়া শাঁসে লাগে। অধিকাংশ স্থলে শাঁস অল্পাধিক পুড়িয়া যায় ও পুষ্টিকর নাইট্রোজেনযুক্ত অংশ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হয়।

পূর্ব্বে ৫।৬ টাকা মন দরেই হিজলী বাদাম পাওয়া যাইত। এক্ষণে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহার দাম ও দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধির অন্য কারণের মধ্যে হিজলী বাদামের চাষ বিস্তৃতির অভাব, ফলন্ত গাছ কর্ত্তণ, ফলনের হ্রাস প্রভৃতিও গণ্য হইতে

পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আজকাল কাঁথি মহাকুমার চালানের জন্য ৫০০০ মণ বাদাম পাওয়া ও অসম্ভব। কিন্তু আগে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ ফলও পাওয়া যাইত। শাঁসের দাম মোটামুটি গোটা ফলের দ্বিগুণ। বলা বাহুল্য যে ফসলের হ্রাস বৃদ্ধির উপর দাম নির্ভর করে।

হিজলী বাদাম যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। অবশ্য বোম্বাই রপ্তানির প্রধান বন্দর, কারণ পশ্চিম উপকুলেই হিজলী বাদাম বৃক্ষের সংখ্যাধিক্য। বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ শাঁশই পছন্দ করেন। পর্দ্দা সমেত ও পর্দ্দা বিহীন দুই প্রকারের শাঁশ চালান যায়। বিলাতী বাজারে গড়ে এই দুই প্রকার যথাক্রমে ৬০ ও ৭০ শিলিং (১৪-১৬ শিলিং =১৲) হন্দর দরে বিক্রয় হয়। প্রত্যেক পেটী অথবা বাক্সে ২ হন্দর মাল থাকে। দেশে এত খাদ্যাভাব যে হিজলী বাদামের মত পুষ্টিকর দ্রব্য রপ্তানি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

কাজুবাদাম চাষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে যে উপকুল বাসী লোক ভিন্ন অতি অল্প লোকেই ইহার সহিত পরিচিত আছেন। অন্যান্য আয়কর উদ্ভিদের জমির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়াও কাজুবাদামের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে পারা যায়। কারণ যে স্থলে কাজুবাদাম স্বভাবতঃ জন্মায় সেখানে অতি অল্প কৃষিজাত ফসলই জন্মিতে পারে। ভারতের লক্ষ লক্ষ বিঘা উপকুলাংশে রীতিমত চাষ করিলে হিজলীবাদাম ফসল বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। চাষের পর, বিক্রয়ের জন্য বাদাম প্রস্তুত প্রণালীরও অনেক উন্নতি সাধন আবশ্যক। বর্ত্তমান জগতে খাদ্যোপযুক্ত তৈলের এত অভাব যে বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত হিজলীবদাম তৈলের প্রচুর কাটতি অবশ্যম্ভাবী।

হিজলীবাদাম অবশ্য দেশ মধ্যে সর্ব্বস্থলে জন্মিতে পারে না। সমুদ্র তীর হইতে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত দেশে ইহা উত্তমরূপেই জন্মিতে পারে। তাহার পর আরও ১০০ মাইল পর্য্যন্ত ইহা উপযুক্ত যত্নে চাষ করা যাইতে পারে। বীজ হইতেই চারা উৎপাদন করা প্রশস্ত। বেলে মাটিতে দীর্ঘে ও প্রস্থে ১৫ হাত অন্তর গর্ত্ত করিয়া প্রত্যেক গর্ত্তে ৩।৪ টি বীজ দিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুপুষ্ট চারা গর্ত্তে রাখিয়া অন্য চারাগুলি ৬ ইঞ্চি পরিমিত হইলে স্থানান্তরে তুলিয়া বসান দরকার। বর্ষার প্রারম্ভে বসাইলে আর জল দেওয়ার আবশ্যক নাই। গাছ ২।৩ হাত বড় হইলে আর পশ্বাদি দ্বারা অনিষ্টের ভয় ততটা নাই। আমরা আশাকরি যে এরূপ একটি আয়কর বৃক্ষের চাষ ক্রমশঃ সমধিক প্রসার লাভ করিবে।

কাপাস চাষের ভবিষ্যত।

বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে তুলা চাষ বিস্তার করিয়া বিলাতের তুলা শিল্পের অভাব দূর করার জন্য British Cotton Growing Association যে বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাহা অনেকেই জানেন। সম্প্রতি এই সভার ডাইরেক্টার, মিঃ হিমবেরী, তুলা চাষ বিস্তার কল্পে সভার দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবার জন্য এতদ্দেশে ও সুদানে আসিয়াছিলেন। তিন মাসকাল এই দুই দেশে অবস্থিতি করিয়া ও স্বচক্ষে সমস্ত বিষয় দেখিয়া তিনি বিলাতে গিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতও সুদান-উৎপাদিত তুলা ভবিষ্যতে জগতের অভাব অনেক পরিমাণে মোচন করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্য জল সেচনের বিরাট বন্দোবস্ত হওয়া প্রথমেই আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে জগতে ১—২ লক্ষ গাঁট তুলার অভাব। মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী নানাবিধ গোলযোগে অনেক স্থানের তুলাকলে, বিশেষতঃ ল্যাঙ্কে সায়রের, এখন কিন্তু পুরা কাজ করিতেছেনা। বিলাতের তুলা কলে পুরা কাজ হইলে তুলার অভাব প্রায় ১০—২০ লক্ষ গাঁট হইবে। এ পর্য্যন্ত কার্পাস চাষের প্রধান কেন্দ্র ছিল মার্কিন। কিন্তু মার্কিনে জমি নিরেস হইয়া পড়ায় ও পোকামাকড়ের দৌরাত্ম্যে উৎপাদন কম হইতেছে। এবার ৩½ কোটি একারে বোধ হয় ১ কোটি গাঁটের অধিক তুলা হইবেনা।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশে পঞ্চনদে তুলার ভবিষ্যত ভাল বলিয়াই বোধ হয়। এখানে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপাদিত হইতেছে—যাহা দেশী ও বিলাতী উভয় স্থানের কলেই চলিতে পারে। ভারত যদি স্বকীয় কলসমূহে উৎকৃষ্ট তুলা সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলেও লাভ আছে। কারণ তাহা হইলে অন্য দেশীয় তুলার উপর ভারতের টান পড়িবেনা ও তাহা বিলাতে যাইতে পারিবে। পঞ্চনদে তুলা ও গোধুম এক জমিতেই চাষ হয়। যাহাতে শীতকালে গম হয় তাহাতেই আবার গ্রীষ্মকালে কার্পাস উৎপাদন করিতে পারা যায়। আপাততঃ প্রায় ১ কোটি একারে এই দুইটি ফসল জলসেচন দ্বারা জন্মান হয়। শীঘ্র আরও ১০ লক্ষ একরে চাষ বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পঞ্চনদের ন্যায় সিন্ধু দেশও তুলা চাষের বিশেষ উপযুক্ত। কিন্তু এখানেও জলের অভাব। সক্করে সিন্ধুনদের জল আটকাইয়া কয়েকটি খাল কাটার প্রস্তাব এবার মঞ্জুর হইয়াছে। তাহাতে সকলপ্রকার চাষেরই জমি যে প্রভূত পরিমানে বাড়িয়া যাইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এতদঞ্চলেরও অনন্ত ৫ লক্ষ একরে তুলা চাষ করিতে পারা

যায়। এক্ষণে ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁট তুলা উৎপাদিত হয়, তাহার মধ্যে ৫ লক্ষ গাঁট উৎকৃষ্ট মার্কিণ জাতীয় তুলা। উপযুক্তরূপে চেষ্টা করিলে মোট তুলার উৎপাদন ৬০ লক্ষ গাঁট ও তন্মধ্যে দীর্ঘ তন্তু তুলা ২০ লক্ষ গাঁট হইতে পারে।

সুদান সম্বন্ধে মিঃ হিমবেরী বলেন যে জগতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেখানেই উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু এখানেও সেই একই প্রতিবন্ধক—জলাভাব। জল পাইলে সুদানে ১৯ লক্ষ গাঁট তুলা হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। সেস্থলে মোটে এখন ৪০—৫০ হাজার গাঁট হয়। মাকৃবাড়ে যে জলসেচনের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার ফলে ১৯২৫ সাল নাগাত ৩ লক্ষ একর জমি চাষ হইতে পারিবে। সুদানীয়েরা খুব শ্রমশীল এবং চাষ আবাদের কার্য্যে পটু। তাহারা তুলা চাষে অনায়াসেই লাভবান হইতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন স্বভাবতঃ সুদানের জমিও যথেষ্ট উর্ব্বরা। একর প্রতি প্রায় এক গাঁট তুলা হয়। ভারতে বর্ত্তমান সময় দুই একারে ১ গাঁট তুলা হয়। মার্কিনেও পূর্ব্বে তাহাই হইত, কিন্তু এখন ১ গাঁট তুলার জন্য ৩-৪ একর জমি আবশ্যক হয়।

ফলতঃ সুদান, ভারত, উগাণ্ডা ও নাইগিরিয়া হইতে বিলাতী কলসমূহের আবশ্যকীয় তুলা কালক্রমে পাওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ ভারতের তুলা হ্রস্বতন্তু। প্রায় ¾ ইঞ্চি লম্বা। ল্যাঙ্কেসায়রে যে তুলা আবশ্যক হয় তাহা অন্ততঃ ১—১⅛ ইঞ্চি লম্বা হওয়া দরকার। এইরূপ দীর্ঘতন্তু তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য British Cotton Growing Association পঞ্চনদে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। চাষীকে উত্তম বীজ দেওয়া, চাষের পদ্ধতি শিখান, উৎপাদিত তুলা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা এই সমুদয়ই উন্নত জাতীয় তুলা চাষ প্রবর্ত্তণের প্রধান উপায়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে তুলা চাষের সময় কম বলিয়া দীর্ঘতন্তু তুলা উৎপাদনের অসুবিধা হয়। এরূপ আবহাওয়া যুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত যে যেখানে উন্নতজাতীয় তুলা পরিপক্ক হওয়ার সময় পায়। উপরোক্ত সভা সে বিষয়েও অনুসন্ধান করিবার ত্রুটি করিতেছেন না।

বাঙ্গালায় কৃষি-পরীক্ষা ও গবেষণা।

এতদ্দেশে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষা ও গবেষণার কথা বলিতে সরকারী অনুষ্ঠান সমূহের কথাই বলিতে হয়। শিক্ষা, উদ্যম ও আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে বাংলায় এখনও এমন দিন আসে নাই যে কোন সভা, সমিতি কিংম্বা ব্যক্তি বিশেষ কৃষির উন্নতিকল্পে কোন ধারাবাহিক কার্য্য আরম্ভ এবং পরিচালনা করেন। নানারূপ দোষ সত্ত্বেও সরকারী কৃষি পরীক্ষা ও কৃষিপদ্ধতি প্রদর্শন ক্ষেত্র সমূহ ও কৃষিগবেষণাগার গুলিকেই বৈজ্ঞানিক কৃষি কর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র বলিতে পারা যায়। এই সমুদয় ক্ষেত্রে কি কার্য্য হইতেছে ও তাহাতে দেশের কৃষির উন্নতির কতটা সম্ভাবনা আছে, তাহা কৃষি অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই জানা দরকার।

বঙ্গের কৃষি সচিব প্রত্যেক জেলাতেই এক একটি কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও অর্থাভাবে তাহা এখনও হইয়া উঠে নাই। আপাততঃ ১৫টি সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে কার্য্য চলিতেছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর ও দিনাজপুর জেলার নূতন ক্ষেত্রগুলি এখনও অসম্পূর্ণ। ১৯২১-২২ সালে উক্ত ১৫টি ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

১। ঢাকা (মনিপুর) ক্ষেত্র :—বঙ্গদেশের ইহাই সর্ব্ব প্রধান ও কেন্দ্র ক্ষেত্র বলিলেই চলে। সাধারণ পরীক্ষা ব্যতীত মৌলিক গবেষণাও এখানে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং বাংলার সরকারী বিশেষজ্ঞগণের ইহাই প্রধান আড্ডা। এই ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ পরীক্ষারই ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। ধানের আপেক্ষিক ফলনের হিসাবে দেখা যায় যে এক হিসাবে ইন্দ্রসাল ও তিলকছড়ির ফলন একর প্রতি যথাক্রমে ২২½ ও ২৬ মন ও আর এক হিসাবে ২৮½ ও ২৬½ মন; বিচালীর পরিমান যথাক্রমে ৪২৮১ ও ৪৭৩৯ পাঃ। সুতরাং ইন্দ্রসালের পক্ষে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ঢাকা ক্ষেত্র উন্নতজাতীয় বীজ উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র। গত বৎসর ৮৩৮ মন পাট, ১২½ মন কটকতারা আউসধান ও ৪১, ১৫০ (ওজন কি সংখ্যা ?) ইক্ষুবীজ ক্ষেত্রের বীজ ভাণ্ডার হইতে সরবরাহ করা হয়। পাট বীজ ক্রয়ের হিসাবে অল্প বিস্তর রহস্য আছে। প্রথমতঃ বার্কমায়ার কোম্পানির বীজের দাম মনকরা ১৮৲ এবং অন্যলোকের ১২৲ টাকা দাম হইল কেন তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয়ত দেখা যায় যে যে পরিমান বীজের দাম ধরা হইয়াছে তদপেক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে কম পরিমান বীজ গুদামে আসিয়া পৌছিয়াছে।

২। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা ক্ষেত্রের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গে চুঁচড়া ক্ষেত্রই প্রধান। নাগরা ধানে বিভিন্ন প্রকারের সার প্রয়োগের পরীক্ষায় দেখা যায় যে একর প্রতি ১০০ মন গোবর সার ও ধঞ্চের সবুজ সারে তিন বৎসরের গড়পড়তায় যথাক্রমে ২৩ মন, ২৪ সের ধান +২৮ মন ৮ সের বিচালীও ২৬মন ৬সের ধান+২৯মন ৩৯ সের বিচালী পাওয়া গিয়াছে। অপর কোন উল্লেখ যোগ্য ফল গতবৎসর পাওয়া যায় নাই। চুচুঁড়া ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু, ইন্দ্রসাল, কটকতারা, নাগরা ও হাতিসাল ধান, অরহর এবং পাট বীজ সরবরাহ হইয়াছিল।

৩। বর্দ্ধমান ক্ষেত্র :—ইন্দ্রসাল, নাগরা, দুধকমলা, পমা জটা কলমা, কার্ত্তিক সাল ও ঝিং সাল ধানের তুলনা মূলক চাষে নাগরা ও জটাকলমা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদের ফলন যথাক্রমে ৩২ মন ১০ সের ধান+৪৩মঃ ৫ সের বিচালী ও ৩১মন ১৬ সের ধান+৪৮ মন ২৪ সের বিচালী।

৪। গোসবা ক্ষেত্র :—সুন্দরবনে ধান ভিন্ন অন্য কি ফসল জন্মান যাইতে পারে তাহা দেখাই এই ক্ষেত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাট, শন, ধঞ্চে, আখ, গম, যই প্রভৃতি সামান্য সামান্য পরিমানে চাষ হইয়াছিল। কোনটিরই ফল আশাপ্রদ নয়।

৫। কুমিল্লা ক্ষেত্র :—আউস ধানের গড়পড়তা ফসল বিঘা প্রতি ২মঃ ৩৩সের ও আমন ধানের ৬মন ৩সের হইয়াছে। ইহা সাধারণ চাষের ফলন অপেক্ষা কম।

৬। মৈমনসিংহ ক্ষেত্র :—কৃষিবিভাগের নামজাদা ধান, ইন্দ্রসাল ও কটকতারা, এখানে বিঘা প্রতি যথাক্রমে ৩ ও ৫½ মন ফল প্রসব করিয়াছেন। কৈফিয়তে দেখা যায় যে উক্ত বিভাগ দো ফসলী জমির জন্য এই দুই জাতীয় ধান অনুমোদন করেন না। তবে কি প্রকারে সরকারী ক্ষেত্রে এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইল ?

৭। রংপুর ক্ষেত্র :—রংপুরে তিনটি ক্ষেত্র আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ১০০০ বিঘার ক্ষেত্রটি গবাদি প্রজনন ও পালনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। স্থানীয় ও হিসার জাতির সংমিশ্রনে উৎপাদিত গোবংশ ভালই হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ১০টি গাভীর দুগ্ধ উৎপাদনের তালিকায় দৃষ্ট হয় যে সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বাধিক দৈনিক দুগ্ধের পরিমান যথাক্রমে ৯ ও ১৯½ পাঃ। সুরাটী নামক একটি গাভী ৫১ দিন গড়পড়তায় দিন ১৩ পাঃ দুধ দিয়াছে। ইলসী, মেনকা ও প্রমিলা নামক গাভীর দৈনিক দুগ্ধের পরিমান যথাক্রমে ১৪, ১৫ ও ১৬ সের।) এই ক্ষেত্রের ষাঁড় প্রজনন উদ্দেশ্যে বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে পশুখাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে যে সমুদয় পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে প্রমানিত হইয়াছে যে স্থানীয় অপেক্ষা কালিমপং ভূট্টার ফসল অধিক। গম অপেক্ষা যই ও অধিক ফলে।

৮। রংপুর কৃষিপদ্ধতি প্রদর্শন ক্ষেত্র :—সারির মধ্যে ২১ ইঞ্চ ও ৩৬ ইং ব্যবধান রাখিয়া আলু রোপণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে কম ব্যবধানেই ফলন অধিক হয়, অর্থাৎ

দেশীয় প্রথায় ৩৬ ইং ব্যবধান রাখা অনাবশ্যক। সারি আরও ঘন করিলে ফলন কম হয় না বরং বেশী হয়।

৯। বুড়ির হাট তামাকু ক্ষেত্র ঃ—এতদ্দেশে চুরুট ও সিগারেট প্রস্তুতের উপযুক্ত তামাকু উৎপাদন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষেত্র সংলগ্ন চুরুট তৈয়ারীর কলও

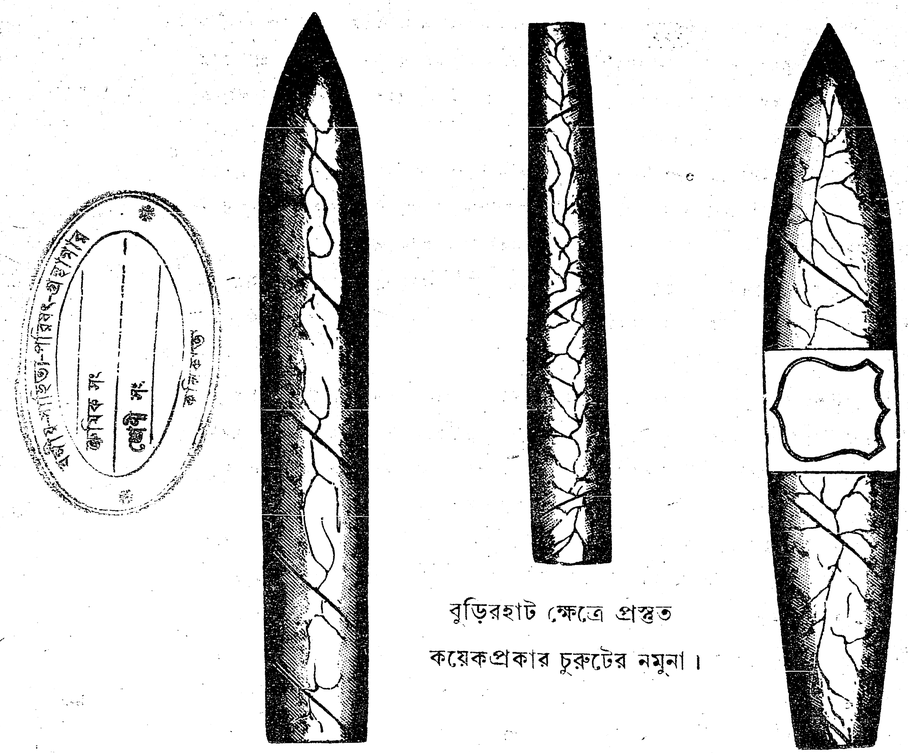

বুড়িরহাট ক্ষেত্রে প্রস্তুত
কয়েকপ্রকার চুরুটের নমুনা।

আছে। আপাততঃ যে কয়েক প্রকার তামাক উৎপাদিত হইতেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি অন্যতম; (১) দেশীয় ভেঙ্গী, ইহা হইতেই প্রসিদ্ধ বর্ম্মা চুরট প্রস্তুত হয়। (২) সুমাত্রা—হইতে চুরুটের উৎকৃষ্ট আবরণ প্রস্তুত হয়; (৩) চুরুটের ভিতরে দেওয়ার জন্য কয়েক প্রকার দেশীয় ও বিদেশীয় তামাকের মধ্যে 'ম্যানিলা' ও 'মরিচ'ই বোধ

হয় কার্য্যোপযোগী হইবে। গতবৎসর ক্ষেত্র হইতে ২২০০৲ টাকার চুরুট বিক্রয় হইয়াছে ও ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ক্ষেত্রজাত তামাকের চুরুট ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আদৃত হইতেছে।

১০। রাজসাহী ক্ষেত্র ঃ—কোন পরীক্ষার ফলই উল্লেখযোগ্য নয়; কেবল গোধূম সম্বন্ধীয় একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচনে ফলন প্রায় দ্বিগুণ হয়।

১১। বোগড়া ক্ষেত্র ;—একর প্রতি ৩ মণ সরিষার খৈল ও ৬০ মণ গোবর সার প্রয়োগে যথাক্রমে ১৬ মঃ ২৫ মঃ ১২ মঃ ১০ মঃ ফলন হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের লাল মাটিতে সরিষার খৈল সুতরাং ধানের উপযুক্ত সার বলিয়া বোধ হইতেছে।

১২। পাবনা ক্ষেত্র ;—স্থানীয় ডালির পরিবর্ত্তে টানা আপ্ ও স্থানীয় তোষার' পরিবর্ত্তে কৃষি বিভাগের 'চুঁচড়া সবুজ' পাট উৎপাদনে অধিক লাভ আছে দেখা যায়। অন্যান্য ফসলের পরীক্ষার ফলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

১৩। কলিমপং ক্ষেত্র ;—এখানে অনেকদিন হইতে ভূট্টা সম্বন্ধীয় পরীক্ষা চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে ছয়টি উপজাতির ফলন খুব অধিক দেখা গিয়াছে—একর প্রতি ২১০১ হইতে ২৫৯৯ পাঃ (৮২ পাঃ=১ মন)। হলদে গোল ও সাদা গোল উপজাতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিঘা প্রতি ৫ সের বীজ চৈত্রমাসে বোনা হয়। তৌলী জাতীয় ক্ষেত্রজ ও সবুজ সার উপর্য্যুপরি ১২ বৎসর প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে সবুজ সারেই ফলন অধিক হয়। সবুজ সারের জন্য রাম অথবা সয় কলাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। যদিও পাহাড়ে ইক্ষু ফসল পরিপক্ক হইতে ১৮ মাস, অর্থাৎ নিম্নদেশ হইতে ৮ মাস অধিক সময় লাগে তবুও ইহা বেশ লাভ কর ফসল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একর প্রতি ২৬৪ পাঃ গুড় পাওয়া গিয়াছে এবং বিঘা প্রতি প্রায় ২৫০ শত টাকা লাভ হয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। অ্যারোরুট ও আনারস পরীক্ষার দৃষ্ট হয় যে এই দুইটি ফসল পার্ব্বত্য প্রদেশে লাভ জনক হইতে পারে। পক্ষী চাষের জন্য এই ক্ষেত্রে ১½ বিঘা জমি রাখা হইয়াছে। ৪ জাতীয় বিদেশীয় ও সিকিম ও চট্টগ্রাম মুরগী লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে। এখনও পরীক্ষার ফলাফল অনিশ্চিত, তবে আশা করা যায় যে উক্ত কয়েকটি জাতির সংমিশ্রণে এতদ্দেশোপযুক্ত উত্তম মুরগী পাওয়া যাইবে।

১৪-১৫। বহরমপুর ক্ষেত্র নিতান্ত নূতন এবং বরিশাল ক্ষেত্র এখনও ঠিক উৎপাদনের অবস্থায় আসে নাই বলিয়া উহাদের কোন বিবরণ দেওয়া হইল না।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি সরকারী পরীক্ষা ক্ষেত্রের কার্য্যের আভাস পাওয়া যাইবে। এক্ষণে আমরা উহাদের আয় ব্যয়ের একটি তালিকা প্রদান করিতেছি।

সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্র সমূহের আয় ব্যয়।

নং	পরীক্ষাক্ষেত্রের নাম	চাষের জমির পরিমাণ বিঘা	আয়	ব্যয়
১	চুচুঁড়া	৪৭৭	১৪,১১৭৲	২০,৫৮৬৲
২	বর্দ্ধমান	৭৫	১৮৩৩৲	৪৬৩৩৲
৩	গোসবা	২০	৫০৯৲	৩৮৯৲
৪	বহরমপুর	১৮	৬৭৲	২৮৪১৲
৫	ঢাকা	৬৪৫	৮০৭১৲	৪৫৬৬১৲
৬	কুমিল্লা	৩৯	৫৭২৲	৪০৯৮৲
৭	মৈমনসিংহ	৩৭½	৫৩৯৲	৫৬৭২৲
৮	বরিশাল	৪৭	৯৭০৲	৫৫১৩৲
৯	রপুর	১০০০	৪৩৪২৲	৩৮৮৭৪৲
১০	ঐ	৪৮	৭৫০৲	৩৫৪৪৲
১১	ঐ	৮৪	৩৮১০৲	৭৯৮৯৲
১২	রাজসাহী	১৫৯	৩৭১৫৲	৮০৯৫৲
১৩	বগুড়া	৬৮	২৮৪৲	৫৯০৩৲
১৪	পাবনা	১৭	০	৩৭০২৲
১৫	কালিম পং	২২৫	৯৯৭১৲	১৮,২০১৲

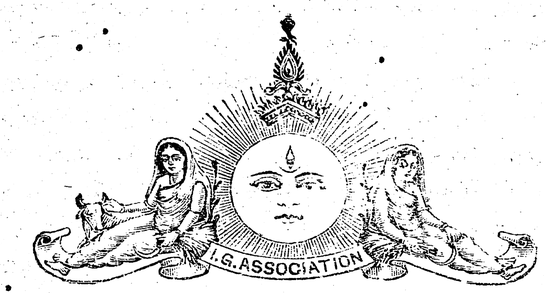

কৃষক—বৈশাখ, ১৩৩০ সাল।

বর্ষারম্ভ।

দেখিতে দেখিতে আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল। বর্ত্তমান সালে কৃষকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর। যাঁহারা বাংলার সংবাদপত্র ইতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহার সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে যদি বাস্তবিকই কোন পত্রিকার বিশেষজ্ঞ কিছু না থাকে তাহা হইলে তা'র পক্ষে প্রায় সিকি শতাব্দী জীবিত থাকা বড় কঠিন। সাধারণ সংবাদ পত্র জগতে শৈশবে অকালমৃত্যু অসাধারণ নহে—কৃষি, শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ত দূরের কথা। তবে কৃষক যে এতদিন জীবিত থাকিতে ও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে তাহা কেবল গ্রাহক অনুগ্রাহক বর্গের অনুকম্পার ফল। কৃষকের পরিচালকবর্গ সে জন্য চির কৃতজ্ঞ।

প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত মন্মথ নাথ মিত্রের অপার সারকুলার রোডস্থ বাটীতে কয়েকজন উৎসাহী যুবক মিলিত হইয়া একটি সভা করেন। তাহাতে স্থির হয় যে শিক্ষিত ব্যক্তিমণ্ডলী কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে দেশের অবস্থা ক্রমশই হীণ হইয়া পড়িবে সুতরাং সমবেত চেষ্টা দ্বারা উন্নত কৃষিজ্ঞান প্রচার করা বিশেষ দরকার। এই প্রচেষ্টার ফলে Indian Gardening Association অথবা ভারতীয় কৃষি সমিতির স্থাপনা হয়। আজ এই দেশব্যাপী কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞানও বানিজ্য বিষয়ক সভা সমিতির বাহুল্যের দিনে ২৭ বৎসর পূর্ব্বের উক্ত ক্ষুদ্র চেষ্টার যথার্থ আন্তরিকতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে সে সময়ে ভারতীয় কৃষি সমিতির ন্যায় আর একটি সমিতি দেশে ছিল না। এবং কৃষিও বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ম্মীর সংখ্যা এত কম ছিল যে সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ সময়ে সময়ে দুরূহ হইয়া

ড়িত। কিন্তু নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন পরলোক গত মন্মথ বাবু ও বর্ত্তমান 'কৃষক, সম্পাদককে কখনও ভগ্নোদ্যম করে নাই। সমিতির অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও সমিতি স্থাপনের কিছুদিন পরে আমরা একটী ইংরাজি সাপ্তাহিক কৃষি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি। কার্য্যতঃ তাহা মাসিক পত্রিকাতেই দাঁড়াইয়া যায়। এই পত্রিকা দেড় বৎসরের উপর কাল চলিয়াছিল এবং ইহাতে সমিতির মাসিক অধিবেসনে পঠিত প্রবন্ধাদি ব্যতীত অন্যান্য কৃষি ও শিল্প বিষয়ক আবশ্যকীয় সংবাদাদি প্রকাশিত হইত। কিন্তু শীঘ্রই ইহা প্রতীয়মান হয় যে দেশের জনসাধারণকে কৃষিবিষয়ে জাগাইয়া তুলিতে হইলে ইংরাজি পত্রিকায় কোন কাজই হইবেনা ও সমিতিরও মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা। সেই জন্য ১৮৯৯ সালের শেষভাগে বর্ত্তমান 'কৃষক' প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কৃষকের জীবনে ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃসময় গিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও ২।৪ মাসের জন্য 'কৃষক' প্রকাশ অনিয়মিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 'কৃষকের' পুরাতন পৃষ্টপোষকেরাই, আমরা আশা করি, বুঝিবেন যে ইহা ক্ষণিক ও অদৃষ্ট পূর্ব্ব ঘটনার ফল। সমিতির ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু কানাইলাল ঘোষের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে সমিতির কার্য্যের অনেক বিভাগে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ তিনি অকাতর পরিশ্রমে সমিতির সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে কিছু গোলযোগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুখের বিষয় যে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বিপুল পরিশ্রমে সমস্ত কার্য্যই আবার আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছেন; কৃষকের পূর্ব্ব সম্পাদক বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং অ্যাসোসিয়েসন কোম্পানির অনুরোধে আবার কৃষকের কর্ণধার হইয়াছেন; এবং সমস্ত বিভাগে নূতন বন্দোবস্তের ফলে সমিতি কৃষিঅনুরাগী ব্যক্তিবর্গের সকল প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছেন।

আমাদের কৃষির ভবিষ্যত সম্বন্ধে কতিপয় লোককে এরূপভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখা যায় যে এতদ্দেশে কৃষিপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক ও তাহা সাধিত করিয়া ৫।১০ বৎসরের মধ্যে দেশকে সুজলাং সুফলাং করিয়া তুলিতে পারা যায়। ইহা অনেকটা অগভীর চিন্তার ফল। ভারতের কৃষিপদ্ধতি সুসভ্য পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় কোন কোন বিষয়ে হীন হইতে পারে কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে কোন দেশের কৃষিপদ্ধতি উক্ত দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় প্রতিবিম্ব মাত্র। বৈজ্ঞানিক কৃষির কতকগুলি মূল সূত্র আছে। সেগুলি সব দেশেই সমান। কিন্তু সেই গুলিকে কার্য্যে প্রয়োগ করিবার প্রণালী দেশ স্থান ও পাত্র হিসাবে বিভিন্ন হইবারই কথা The East is East and the West is west and the train shall never meet প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতিচ্য প্রতিচ্যই থাকিবে; এত-দুভয়ের সম্মিলন সুদূর পরাহত—ইহা কোন ব্যাপারে না হইলেও চাষ আবাদের ব্যাপারে

চিরকালই সত্য থাকিবে। সুতরাং কোন কৃষিপদ্ধতি ভারতীয় হইলেই যে তাহা অবৈজ্ঞানিক অথবা অঙ্গহীন এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। দেখিতে হইবে যে সেরূপ পদ্ধতির উদ্ভাবনা হইবার মূল কারণ কি ছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে তাহার কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। সেইরূপ পরিবর্ত্তিত প্রথা প্রচালনের চেষ্টাই শ্রেয়। একবারে খাস বিলাতী প্রথা এতদ্দেশে আনিয়া বসাইয়া দিলে চলিবে না। কিন্তু আপাততঃ অনেক পরিমানে হ্রাস পাইলেও আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় বিশেষজ্ঞ আমদানি করেন তাঁহারা প্রায়ই বিদেশীয় প্রথার পক্ষপাতি।

ভারতের কৃষি যে কি বিরাট ব্যাপার তাহা এই বলিলে অনেকটা বোঝা যাইবে সমস্ত ব্রিটিস সাম্রাজ্যে এক চতুর্থাংশ লোক বাস করে এবং লোক সংখ্যা হিসাবে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৬ অংশেরই অধিক। ভারতের ৩২ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৭২ জনের উপজীবিকা কৃষি। অন্য হিসাবে দেখা যায় যে এতদ্দেশে শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে। ইহারা সকলেই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কৃষির উপর নির্ভর না করিলেও ইহাদের কৃষির সহিত সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট। যে দেশে ৮০ কোটি বিঘা চাষের জমি সে দেশে কৃষির উন্নতিসাধন যে কি বিপুল শ্রম আয়াসসাধ্য তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। লর্ডকর্জ্জনের সময় হইতে ভারতের নিস্পন্দ কৃষিজগতে একট সাড়া আসিয়াছে সত্য; কিন্তু পূর্ণ চেতনা আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা অনেক দিকে ধাবিত হইতেছে। সেগুলির সামঞ্জস্য বিধান (Co-ordination) প্রথমেই আবশ্যক। নতুবা চেষ্টায় অনুরূপ ফল হওয়া দুরূহ।

আর্থিক অবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষক যদিও কোনরূপ মূল্যবান সার অথবা কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করিতে অক্ষম, তবুও দরিদ্র-রুধির পুষ্ট ভারতীয় কৃষি সম্পদে অনেক সওদাগরই প্রভূত ধন রাশি সঞ্চয় করিতেছেন। একবার ভারতের রপ্তানির ফর্দ্দ দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের দুই চারিটি প্রধান ফসলের গড়পড়তায় বাৎসরিক উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরূপ;—

ধান	৩৪৭½ লক্ষ	টণ
গোধূম	১০২½ "	"
চা	৩৪ "	"
গুড়	২৭½ "	"
কার্পাস	৪৫ "	গাঁট
পাট	৮৩ "	"
তিসি	৫ "	টন
সরিসা রাই	১২ "	"
চিনের বাদাম	১২ "	"

কৃষি প্রসারের প্রধান উপায় দুইটি;—intensive cnltivatiou অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ফলনের মাত্রা বৃদ্ধি করা অথবা যথা সম্ভব অধিক ফসল জন্মান; extensive cultivation অর্থাৎ চাষের জমি বৃদ্ধি করিয়া ফসল উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা। প্রথম উপায় এদেশে কমই অবলম্বিত হইয়াছে কারণ ইহার জন্য মূলধন ও বিশেষ জ্ঞান অধিক পরিমাণে আবশ্যক এবং উভয়ের অভাব এখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। কেবল মাত্র ২।১ জাতীয় ধান, গোধূম ও তুলা অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিমান জমিতে অধিক ফসল প্রদান করিতেছে। ইহার জন্য সরকারী বিশেষজ্ঞগণ ধন্যবাদার্হ।

ভারতের কৃষির উন্নতি যাহা সচরাচর দেখা যায় তাঁহা কেবল অধিক পরিমাণ জমি আবাদের জন্য। তাহার জন্যও আবার বৃষ্টি বারির উপর একান্ত নির্ভর। ভারতে মোটে ৬৭০০০ মাইল খাল আছে। খাল, কূপ ও পুষ্করণী হইতে যে জমির জল সেচন চলিতে পারে তাহা ২৫ কোটি একর কর্ষিত জমির মধ্যে মোটে ২½ কোটি একর। এরূপ অবস্থায় কৃষির উন্নতি অনেকটা দৈবের উপর নির্ভর করে। সম্প্রতি প্রাপ্ত সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে ১৯২১-২২ সালে ২৫৭০ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে চাষ হইয়াছিল। খাদ্য ও অন্যান্য ফসল হিসাবে ইহাকে বিভাগ করিলে দেখা যায় যে ২১৬০ লক্ষ একরে খাদ্য ফসল ও ৪১০ লক্ষ একরে অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহাতে বৃদ্ধির মধ্যে ছোলা ৬০, বজরা ৪০, গোধুমও যোয়ার প্রত্যেকের ২০, ধান ১৫ ও যব ১০ লক্ষ একর জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ফসলের জমি ১০ লক্ষ একর কমিয়া গিয়াছে। চাষের জমির হ্রাসের মধ্যে তুলার ২৫ লক্ষ ও পাটের ১০ লক্ষ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

চাষের জমির হ্রাস বৃদ্ধি যাহাই হউক বর্ত্তমান সময়ের মুখ্য কথা হইতেছে যে দেশের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে সকলের সমবেত চেষ্টা বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভূত পরিমাণে দায়ীত্ব গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল যে কয়েক জন ভদ্র ব্যক্তি স্বাস্থ্যকর স্থানে জমি লইয়া চাষ আবাদ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। কাপ্তেন পিটাভেলের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পৃষ্টপোষিত কৃষি উপনিবেষের কল্পনাও যথেষ্ট পরিমাণে আশা প্রদ কিন্তু আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে কোন স্বাস্থকর স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে জমি যোগাড় করিতে পারিলেই যে কৃষিকার্য্যের প্রস্তাব সার্থক হইয়া গেল তাহা যেন কেহ না মনে করেন। কৃষিকার্য্যে মোটের মাথায় লোকসাণের সম্ভাবনা অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় কম; কিন্তু ইহাও ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে মূলধন, শ্রমিক, জল, বিক্রয়ের বাজার হাট, স্বকীয় পরিদর্শন এসমস্ত গুলির অথবা একটির অভাবেও আপাততঃ মনো মুগ্ধকর প্রস্তাবও ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সুশিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত

কোন কৃষি কারবার অকৃতকার্য্য হইলে শুধু যে তৎ সংক্রান্ত ধনীগণের লোকসান তাহা নহে উক্ত রূপ দৃষ্টান্তে ভবিষ্যত কৃষি উন্নতির পথে বিস্তর বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

নূতন বর্ষে আমরা আশা করি যে দেশের লোকের কৃষি অনুরাগ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কৃষি আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রধান অবলম্বন। আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হউক যে যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া লোকের আহার ও পরিধেয় নিত্য নৈমিত্তিক জিনিষের অভাব মোচন হয়। শুধু কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতির জন্য জীবন পুনর্গঠন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

"শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
মরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ গৃহে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাঙ্কিত কালি
লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাল
বালাই সংশয়
সহেনা সহেনা আর জীবনেরে ক্ষণ ক্ষণ করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে কৃষি-শিল্পাদি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কার্পাস,—জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে কার্পাস চাষ, চরকার ব্যবহার, বস্ত্র বরন জন্য দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধির এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও আপামর সাধারণ প্রায় সকলেই বিলাতী বস্ত্র অবাধে ব্যবহার করিতেছে। পল্লীগ্রামে চরকার প্রচলন হয় নাই, বলিলেও চলে। পল্লীগ্রামে ২।১ জন স্বদেশানুরাগী ভদ্রলোক বিলাতী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বদেশী মিলের মোটা বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন মাত্র দেশে কার্পাস চাষ বা চরকার প্রচলন জন্য কাহারও যত্ন উৎসাহ দেখিতে পাওয়া

যায় না। বিলাতী বস্ত্রে যে দেশ হইতে কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে; দেশের কোটী কোটী লোক অন্নাভাবে অনশনে কাল যাপন করিতেছে; বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ করিতে পারিতেছে না, সে দিকে লোকের দৃষ্টি নাই। দেশে যে এত রোগ অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব, অন্নবস্ত্রের অভাবই তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া অমরা মনে করি। দেশে বিলাতী বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হইয়া খদ্দরের প্রচলন হইলে অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। এখন লোকের বিলাসিতা এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, কেহই মোটা বস্ত্র ব্যবহার করিতে চায় না। পল্লীগ্রামে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী উন্নতমনা লোকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। নিঃস্বার্থভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য যত্ন পরিশ্রম করিতে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশে কৃষি শিল্প বণিকের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতিও সুদূরপরাহত। দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এ বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে দৃষ্টি থাকা অতীব কর্ত্তব্য। স্বার্থ ত্যাগ না করিলে দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারা যায় না।

আমি আপন জীবনে (লেখকের বয়স এখন প্রায় সপ্ততি বর্ষ) দেশের কতই পরিবর্ত্তন দেখিলাম। আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রামে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লোকের আদৌ বিলাশিতা ছিল না, তখন কি ইতর কি ভদ্র সকলেই মোটাভাত মোটাকাপড়েই সন্তুষ্ট হইত। তখন পল্লীগ্রামে প্রায় সকলেই খদ্দর ব্যবহার করিত। গ্রামে গ্রামে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত ঘরে ঘরে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একটী করিয়া চরকা ছিল। কি ইতর কি ভদ্র সকল গৃহস্থের স্ত্রীলোকেই নিয়মিত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া চরকা লইয়া বসিত। গ্রামে গ্রামে বহু সংখ্যক তাঁত চলিত। অর্দ্ধশতাব্দীর পর হইতে পল্লীগ্রামে বিলাতী বস্ত্র ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ প্রবিষ্ট হইয়া দেশী মোটা কাপড়ের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এই প্রবন্ধে পূর্ব্বে এ বিষয়ে অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য এস্থলে ঐ সকল বিষয়ে আর পুনরুল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিলাম না। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ যখন লিখিত হইয়াছিল, তখন দেশে কার্পাস চাষ চরকার প্রচলন বস্ত্রবয়ন খদ্দর ব্যবহার জন্য এত আন্দোলন ছিল না। অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে প্রণালীতে কার্পাস চাষ হইত, সে বিষয়ে (কার্পাস চাষ) আমার লিখিত প্রবন্ধ—বহু (বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসর) পূর্ব্বে কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন কার্পাস জন্য দেশে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আমাদের এ প্রদেশে যে প্রণালীতে পূর্ব্বে কার্পাস চাষ হইত. তাহা পুনশ্চ লিখিত হইলে দোষাবহ হইবে না, তজ্জন্য "কার্পাস চাষ" প্রবন্ধ পুনরায় লিখিত হইল।

এপ্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেই—গ্রামের নিকটবর্ত্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চ দোঁয়াষ জমিতেই পূর্ব্বে কার্পাস চাষ হইত। এজন্য এখনও ঐ সকল জমিকে "কাপাষে" জমি বলে। পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে কার্পাস ব্যতীত অন্যান্য ফসলও উৎপন্ন হইত। প্রতি বর্ষেই

ঐ সকল জমিতে ২।৩ প্রকার ফসল উৎপন্ন হইত। অন্যান্য প্রদেশে এখন যে কার্পাস চাষ হইয়া থাকে, তাহার বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা হয়, আমাদের এ প্রদেশে যে কার্পাস চাষ হইত, তাহার বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করা হইত। কার্পাসের জমির মৃত্তিকা উর্ব্বরা ও দোঁয়াস হওয়া চাই। কার্পাসের জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধিজন্য গোময় প্রভৃতির সার দেওয়া আবশ্যক। খুব উর্ব্বরা জমি না হইলে প্রতিবর্ষ ২।৩ প্রকার ফসল ভাল জন্মিবে না। ঐ সকল জমিতে প্রথমতঃ আশু ও ফেলেস ধানের চাষ করা হইয়া থাকে। আশু ধান ভাদ্রমাসে কেলেস ধান আশ্বিন মাসে পাকিয়া থাকে। আশু ও কেলেস ধান কাটা হইলে, সে সময়ে প্রায়ই জমি সরস থাকে; বাত হইলে (মো পাইলে) খুব গভীর করিয়া আশ্বিন মাসের শেষে দুইটা চাষ উপরি উপরি দিতে হইবে। চাষ দিবার ১০।১২ দিন পরে জমির মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক হইলে, গোবর প্রভৃতি সার জমিতে ছড়াইয়া দিয়া জল সেচন করিয়া দিতে হইবে। ৪।৫ দিন পরে বাত হইলে খুব গভীর ঘন ঘন এরূপ ভাবে চাষ দিতে হইবে, জমির কোন অংশই যেন অকর্ষিত না থাকে। তাহার পর বিঘা প্রতি ৬।৭ সের হিসাবে মসুর ও ১ সের শর্ষপ সমভাবে বপন করিয়া পুনরায় আর একটা চাষ দিতে হইবে। তাহার পর মই দিয়া জমির মৃত্তিকা চুর্ণ ও সমুচ্চতা সম্পাদন করিতে হয়। সরস মৃত্তিকাতেই যেন চাষ দেওয়া হয়। মসুর ও শর্ষপ উপ্ত হইলে পর ৩ ফুট অন্তর এক একটি খুপি (চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকা অপেক্ষা নিম্ন) কাটিতে হইবে। প্রতি খুপিতে ৪।৫টী করিয়া কাপাস বীজ বপন করিয়া, তাহার উপর সার মিশ্রিত মৃত্তিকা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। কাপাস বীজ বপন সময়ে যদি জমির মৃত্তিকা বেশ সরস না থাকে, তবে কার্পাস বীজ বপনের পর প্রতি খুপিতে একটু একটু জল দিলে ভাল হয়। কার্পাস বীজ বপনের পূর্ব্বে ১দিন (২৪ ঘণ্টা) জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। বীজ ও তুলা পৃথক করিলেও বীজের সহিত সামান্য সামান্য তুলা সংযুক্ত থাকে, তুলা সংযুক্ত বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় না, তজ্জন্য ভিজা বীজ জল হইতে তুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া চটে বীজগুলি ঘর্ষণ করিলে বীজ হইতে তুলা পৃথক হইয়া যায়, তৎপরে সেই সীজ বপন করা হইত। বপনের কয়েক দিন পরে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইত। তাহার পর আর কোনরূপ পাইট করার আবশ্যক হইত না। কাপাস চাষে গভীর কর্ষণ বিশেষ আবশ্যক।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল কার্পাস চাষ উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে প্রণালীতে কার্পাস চাষ হইত, এখনকার কৃষকেরা তাহা জানে না। গ্রামে আমার অপেক্ষা বয়োজেষ্ঠ দুইজন ব্যতীত আর নাই। আমরা পূর্ব্বে যেরূপে কাপাসের চাষ করিতাম, তাহাই লিখিত হইতেছে। আমাদের গ্রামেই পূর্ব্বে অন্যূন ২০০/০ বিঘা জমিতে কাপাসের চাষ হইত। বিলাতী কাপড়ের আমদানির সহিত কাপাস চাষ ও চরকা ক্রমশ উঠিয়া

গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ চাষের-কাপাসের তুলা লইয়া চরকায় সূতা প্রস্তুত করা হইত। সেই সূতা তাঁতিকে দিয়া কাপড় বুনাইয়া লওয়া হইত। সেই কাপড় এ প্রদেশের আপামর সাধারণ সকলেই ব্যবহার করিত।

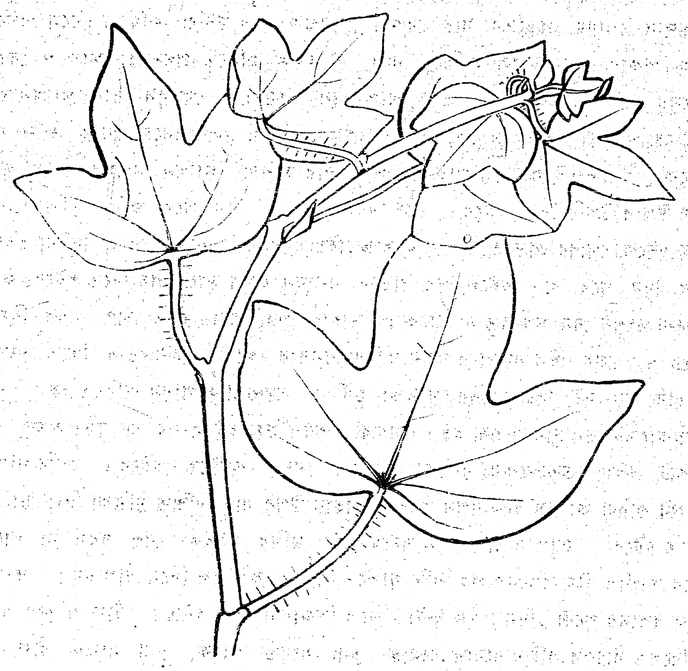

বাণী-কার্পাস।

শর্ষপ ও মসূর গাছ ৩ মাস মধ্যেই পাকিয়া থাকে। মাঘ মাসে শর্ষপ মসূর গাছ তুলিয়া লওয়া হইত। সে সময় কার্পাস গাছ শর্ষপ মসূরের মধ্যে নিস্তেজ অবস্থায় থাকিত। কাপাস চারায় ২।৪টি মাত্র পাতা হইত। সর্ষপ মসূর তুলিয়া লইবার পর মাঘ মাসে কাপাসের জমিতে জল সেচন করা হইত। জমির মৃত্তিকা কিছু শুষ্ক হইলে জমির সমস্ত মৃত্তিকা খননকরা হইত। প্রতি খুপিতে অধিক সংখ্যক চারা বাহির হইয়া হইয়া থাকিলে, ২।৩টী সতেজ চারা রাখিয়া অবশিষ্ট নিস্তেজ চারাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হইত। তৎপরে কাপাসের চারাগুলি বেশ সতেজ হইয়া গুল্মের ন্যায় হইত। ইহার পর ২০।২৫ দিন অন্তর জল সেচন ও আর একবার খনন ব্যতীত অন্য কোনরূপ পাইট করিবার আবশ্যক হইত না। চৈত্র মাসের শেষ হইতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়া

প্রস্ফুটিত পুষ্পে কার্পাস ক্ষেত্র সুশোভিত করিয়া তুলিত। বৈশাখ মাস হইতে ফুল হইতে ফল অর্থাৎ কার্পাস গুটি ধরিতে আরম্ভ হইত। বৈশাখের শেষ হইতে সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস ক্রমান্বয়ে গুটিগুলি পক্ক হইত। গুটিগুলি পক্ক হইলেই কাপাসের গুটির উপরের আবরণ ফাটিয়া চারি অংশে বিভক্ত হয়। সেই সময়ে গাছ হইতে গুটি তুলিয়া আনিয়া রৌদ্রে রাখা হইত। পাকিলে ২।১ দিন অন্তর গুটিগুলি তুলিয়া আনা হইত। এইরূপে আষাঢ় মাসের কিছুদিন পর্য্যন্ত কার্পাসের ফল সংগ্রহ করা হইত। কার্পাসের গুটি বেশ সুপক্ক হইলেই, উপরের কঠিন আববণ ফাটিয়া গিয়া তুলা বাহির হইয়া পড়ে। উপরের আবরণ ভেদ করিয়া তুলা বাহির হইবার পূর্ব্বে আবরণ ঈষৎ ফাটিলেই গাছ হইতে ফল তুলিয়া আনা দরকার। নচেৎ শিল্পি কাটিয়া তাহা হইতে তুলা বাহির হইয়া জমিতে পড়ে সে তুলা সংগ্রহ করিয়া আনা বিশেষ কষ্টকর। একারণ তৎপূর্ব্বেই কলগুলি তুলিয়া আনিতে হয়। বাড়ীতে ২।৩ দিন থাকিলেই আবরণ ফাটিয়া তুলা বাহির হইয়া পড়ে। আবরণ হইতে তুলা পৃথক করিয়া লওয়া হইত। ২।৩ দিন রৌদ্রে রাখিলে তুলা গুলি ফুটিয়া স্ফীত হইয়া উঠে।

খাউই নামক কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা ঐ তুলার বীজ পৃথক করা হইত। পূর্ব্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত আখমাড়া কল দ্বারা যেরূপ আখ হইতে রস বাহির করা হইত, খাউই ও প্রায় সেই প্রকার যন্ত্র। পূর্ব্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত আখমাড়া কল দুই জন বলিষ্ঠ লোক যেরূপ দুই হাত ও দুই পায়ের সাহায্যে চালনা করিত, খাউই চালাইতে সেরূপ দুইজন লোকের দরকার হইত না। চরকায় সূতা কাটার ন্যায় এক জনেই সম্পন্ন হইত। এক হাতে যন্ত্র চালনা করা হইত, আর এক হাতে যন্ত্রের মুখে তুলা যোগাইতে হইত। বোধ হয় অনেক পাঠক কাষ্ঠ নির্ম্মিত "আখমাড়া কল" ও "খাউই" দেখেন নাই। যাহারা দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে লিখিয়া বুঝান সুকঠিন। অর্দ্ধ শতাব্দীর পর হইতেই ঐ সকল যন্ত্রের বিলোপ সাধিত হইয়াছে। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে ও একটী খাউই ভগ্ন অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজনারায়ন বিশ্বাস।

দেশের ও দশের কথা।

আহার্য্য ছত্রকঃ—যাহাকে লোকে সাধারণতঃ বেঙ্গের ছাতা বলিয়া থাকে তাহা ছত্রকজাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ্। পুরাতন বিচালী গাদায়, গলিত কাষ্ঠে, আস্তাবলে ও আবর্জ্জনা স্তূপে নানাজাতীয় ছত্রক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন কতকগুলি বিষাক্ত তেমনি অপর কতকগুলি খুব পুষ্টিকর আহার্য্য। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ

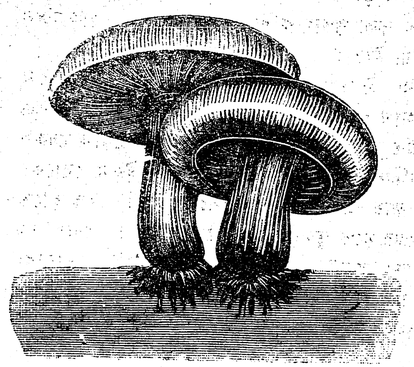

পাতাল কোঁড়
নিম্নমুখী ছত্র।

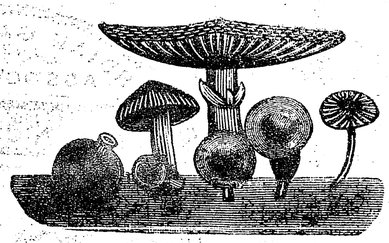

ঊর্দ্ধমুখী শিরোবেষ্ট
বা ছত্র।
ক্ষুদ্র বিন্দু হইতে বৃহৎ
ছত্রাকারে পরিণত হইয়াছে।

'গুছিয়ান' নামক ছত্রক শুষ্কীকৃত হইয়া উত্তর ভারতের বাজারে ৩৪ টাকা সের দরেও বিক্রয় হয়। বাংলায় বর্ষার প্রারম্ভে বেঙ্গের ছাতা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না এবং অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া অনেকেই ইহা খান না। বিলাতে ছত্রক চাষ ও সংরক্ষণ একটি বিশেষ ব্যবসায়। চেষ্টা করিলে এদেশেও উহা প্রবর্ত্তিত করিতে

পারা যায়। শুনা যাইতেছে যে এবারে দক্ষিণ শ্রীহট্টের চা বাগান সমূহে প্রচুর পরিমাণে স্বভাবজাত ছত্রক দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে ২।৪ দিন পরে ইহার অধিকাংশই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহা উপযুক্ত প্রথায় সংরক্ষিত হইলে উৎকৃষ্ট আহার্য্যে পরিণত হইতে পারিত, অজ্ঞতা ও চেষ্টার অভাব হেতু তাহা অনাদরে মৃত্তিকাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। ইহার মধ্যে সুখের বিষয় এই যে এতদ্দেশে ছত্রকের এখনও সদ্ব্যবহার না হইলেও উদ্ভিদ্ তত্ত্বের হিসাবে ভারতীয় ছত্রক শ্রেণী সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতে শ্রম শিল্পঃ—সম্প্রতি-প্রকাশিত ভারতীয় রেল কমিটির রিপোর্টের সমালোচনাচ্ছলে বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা, Manchester Guardian বলিয়াছেন যে ভারত এখনও শ্রম শিল্পের উন্নতির উপযুক্ত হয় নাই। ভারতীয় শিল্পোৎসাহী ব্যক্তিগণ যে ভারতকে শীঘ্র শীঘ্রই শিল্প বিষয়ে উন্নত করিতে চান, তাহার ব্যয় এত অধিক যে প্রকৃত পক্ষে সেরূপ চেষ্টা শিল্পের সহায়তা না করিয়া বরং প্রতিকুলতা করিবে। Manchester Guardian সাধারণতঃ ভারতবাসীর পক্ষে অনুকুল মতই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমান বিষয়ে উক্তরূপ মত প্রকাশ করিবার কারণ এই যে ইংরাজ কখনই স্বার্থ ভোলেনা। ভারত শ্রম শিল্পে যে এক সময় উচ্চ স্থান করিবে তাহা নিশ্চয়, তবে যতদিন ভারতের সে শুভদিন ও ইংরাজের অশুভ দিন না আসে তাহাই তাঁহাদের চেষ্টা।

সিংহলের স্বাভাবিক সম্পদঃ—সিংহলের সৌন্দর্য্যের বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন। আধুনিক সিংহল কৃষিজাত ও খণিজ দ্রব্যাদিতে উন্নতির পথে কম অগ্রসর হইতেছে না। কয়েকটি বিশেষ ফসল চাষের পক্ষে সিংহল দ্বীপের জলবায়ু অত্যন্ত উপযোগী। সেরূপ ফসলের চাষ আবাদ প্রায় শ্বেতাঙ্গগণের হাতে এবং তৎসমুদয়ের মধ্যে চা, নারিকেল ও রবারই প্রধান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ফসলের মধ্যে কতকগুলির বেশ নাম আছে, যথা কোকো, দারুচিনি, গন্ধতৃণ তৈল, তামাক ও ছোট এলাচ। শন, তুলা, নেবু, ইক্ষু, কর্পূর, আনারস প্রভৃতির সমধিক চাষের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। সম্ভবতঃ সিংহলে পাতিনেবুর চাষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ন্যায়ই বিস্তৃত ও সফল হইবে।

চিনির দরঃ—যশোহরে হঠাৎ চিনির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে চিনির মন ১৭৲ ১৮৲ টাকা বিক্রয় হইত এখন তাহা ২৬৲। ২৭৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। ফলে মধ্যবিত্ত লোকের কষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু কৃষকগণ বাঁচিয়া গিয়াছে। (উদ্ধৃত)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যঃ—"ষ্টুডেণ্টস ওয়েল ফেয়ার কমিটী" কলিকাতার ৭টি কলেজের প্রায় ৬০০ ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, যুবকগণ শতকরা ৭১ জন স্বাস্থ্যহীন। কমিটীর মতে অধিকাংশ যুবকের শরীর ২১ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করে, অর্থাৎ ২১ বৎসর পরেই জরাজীর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইউরোপে ৩০।৩৫ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ বিবাহই করে না আর আমাদের দেশে ২১বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই জরা আসিয়া দেখা দেয়, মেয়েদের ত কথাই নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

SEEDS
INDIAN GARDENING ASSON.
FLOWERS VEGETABLES
ASSOCIATIONS TESTED
SEEDS
WHICH ALWAYS SUCCEED
PLANTS MANURES
162, BOW BAZAR STREET
Tel. "KRISHAK" CALCUTTA.

জল হাওয়া ও ফসল।

নিখিল ভারতের অবস্থাঃ—বৈশাখের প্রথমে নিম্ন ব্রহ্ম ও উত্তর ব্রহ্মের স্থানে স্থানে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের উত্তর ও পশ্চিমাংশে ও বিহার উড়িষ্যায় সামান্যই বৃষ্টিপাত হইয়াছে। অন্য কোন প্রদেশেই জল হয় নাই। ব্রহ্মদেশে কৃষিকার্য্য মন্দ চলিতেছে না। বঙ্গের অনেক স্থলেই, বিশেষতঃ পশ্চিমাংশের জেলা সমূহে বৃষ্টির অভাবে ধান ও পাটের জমি প্রস্তুতের দেরী হইতেছে। ক্ষেত্রস্থ ফসল সমূহের অবস্থা মন্দ নয়। পূর্ণিয়াতে পাটও ভাদুই ফসল বপন চলিতেছে ও উড়িষ্যায় ধান্য ফসল পরিপূর্ণ।

ব্রহ্মে ও বাংলায় গড় পড়তায় চাউলের দর কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু আসামে পূর্ব্ববৎ আছে। যুক্তপ্রদেশে বাসন্তিক শস্য সমুদয়ে কাটাই ঝাড়াই ও আখ্ এবং অন্য ফসলে জল সেচন চলিতেছে। পঞ্চনদে গোধুম ও ক্ষেত্রস্থ অন্য ফসলের অবস্থা ভাল। গোধুম কাটা আরম্ভ হইয়াছে। ফলন স্বাভাবিক অথবা তদপেক্ষা সামান্য বেশী হইবে।

মধ্য ভারতে মেহিদপুরে আফিং ঢেঁড়ী তোলা আরম্ভ হইয়াছে। নারায়নগড়ে আফিং ওজন প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মালবে আফিং এর অবস্থা ভাল। গুজরাট, কচ্ছ, কাথিরাবাড় ও কর্ণাটকে তুলা ফসল তোলা আরম্ভ হইয়াছে। মান্দ্রাজে ধান চারা তুলিয়া বসান, ইক্ষু ও রবি শস্য বপন চলিতেছে। এবার উক্তে প্রদেশে ধান, আখ্ ও তিল মন্দ হয় নাই।

১৯২১-২২ সালে মোট চাষের জমির বিষয় স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। মোট ২০ কোটি একর খাদ্য ফসলের জমির ভিতর প্রায় ৮ কোটি একর ধানের জমি। ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য ফসল। ধান্য উৎপাদন বিষয়ে বাংলার স্থান সর্ব্বোচ্চ। তন্নিম্নেই যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও ব্রহ্ম দেশ। অন্য কোন প্রদেশেরই ধানের জমি কোটি একর নয়। জোয়ার, গোধুম ও বজরা অন্যতম খাদ্য শস্য। তৈল শস্যের মোট ১৪১ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৩৩ লক্ষ একর মান্দ্রাজ প্রদেশে। বিহার ও উড়িষ্যা ২০ লক্ষ এবং মধ্য প্রদেশ ১৭ লক্ষ। বঙ্গদেশে মোটে ১২ লক্ষ একর জমিতে তৈল শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। ভারতে তৈল শস্যের মধ্যে সরিসা ও রাই এবং তিল সর্ব্বপ্রধান। উভয়েরই চাষের জমি ৩৭ লক্ষ একরের কিছু উপর। তৎপরে তিসি ও চিনার বাদাম—উভয়ই কিঞ্চিদধিক ২০ লক্ষ একারে চাষ হয়। নারিকেলের জমি ৬৩৮, ৩২৭ একর বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহা সম্ভবতঃ কম। তন্তু উৎপাদক ফসল সমূহের মধ্যে অবশ্য তুলা ও পাট সর্ব্বপ্রধান ইহাদের চাষের জমি যথাক্রমে ১১৬ ও ১৫ লক্ষ একর। ফল ও সব্জীর জমি ৫৪ লক্ষ একর।

সম সাময়িক জগত।

ইংরাজের আহার—কিছু দিবস পূর্ব্বে আমরা আমাদের খাদ্যের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে দেখান হইয়াছিল যে বাঙ্গালীর আহার একজন সবলও সুপুষ্ট পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর গুণের হিসাবে অত্যন্ত হীন। সম্প্রতি 'টিট্ বিটস্' নামক সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী পত্রিকায় একজন পূর্ণ বয়স্ক ইংরাজ বৎসরে কোন আহার্য্য কি পরিমাণে ব্যবহার করে তাহার একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত তালিকায় তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

পাঁউরুটি	৩৯৭ পাউণ্ড
মাখম	১৭ পাঃ
পণির	২০ পাঃ
আলু	২৩০ পাঃ
অন্যান্য সব্জী	২০ পাঃ
মাংস	১১৭ পাঃ
মৎস	৫১ পাঃ
চিনি	৯০ পাঃ
চাউল	১২ পাঃ
শ্বেতসার	৩ পাঃ
ফল	২০ পাঃ
দুধ	১৬০ পাঃ
চা	৬ পাঃ
ডিম	৯২ টী

এইরূপ আহারে প্রতিপালিত হইয়া ইংরাজ যে আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক কর্ম্মক্ষম হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

মার্কিণে ধান্য ফসল—সর্ব্ব প্রথমে ভারত হইতে ধান্য মার্কিণে প্রবর্ত্তিত হইলেও এক্ষণে মার্কিণ জগতের একটি ধান চাষের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। চালের দীর্ঘতার হিসাবে লম্বা, মাঝারি ও ছোট—তিন প্রকারের চাল মার্কিণে উৎপাদিত হয়। লম্বা চাউলের মধ্যে 'হণ্ডুরাস' জাতিই অধিক পরিচিত। ছোট চাউল জাপানী ধানের ফসল; কিন্তু মাঝারি জাতিই অধিক পরিমাণে চাষ হয়। উৎপাদিত চাউলের শতকরা ৬০ ভাগ মাঝারি শ্রেণীর। ইহার মার্কিনী নাম

blue rose অর্থাৎ 'নীল গোলাপ'। দেশমধ্যে ব্যবহার বাদে মার্কিণ চাউল অনেক পরিমাণে রপ্তানি হয়। গত দুই চারি বৎসর হইতে মার্কিণের চাউল জাপানে রপ্তানি হইতেছে। জাপানে লোকসংখ্যার অনুপাত ধানের জমি কম। জাপান ভারত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল আমদানি করে। ১৯২২ সালে ১৯২ লক্ষ টাকার চাউল ভারত হইতে জাপানে যায়। এ ছাড়া ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইণ্ডো চায়নার বাজারেও জাপান নিতান্ত ছোট খরিদ্দার নয়। কিন্তু এবার উক্ত দেশ সমূহে ধান ভাল না হওয়ায় এবার জাপান মার্কিণ হইতে চাউল আমদানির বন্দোবস্ত করিতেছে।

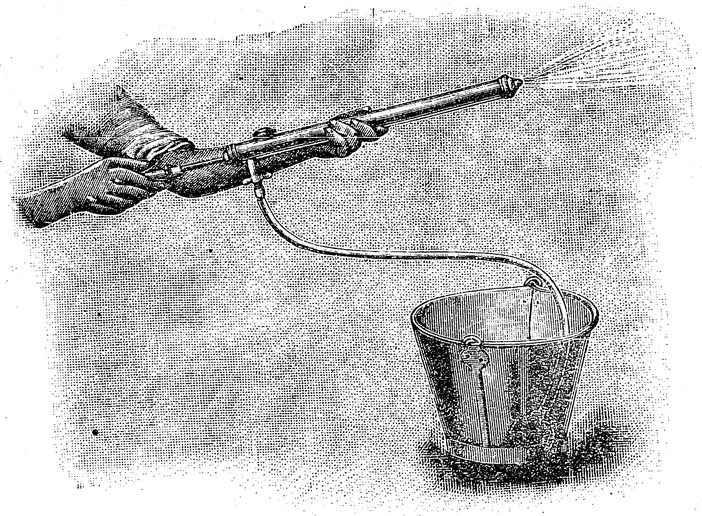

গাছে জল দিবার সিরিঞ্জ বা পিতলের পিচকারী

ভারতীয় কৃষি সমিতিতে পাইবেন।

সার সংগ্রহ।

গাছের বয়স—ঝড়ে একটি গাছ উপড়াইয়া পড়িয়া যায়। তাহার গোড়ার ব্যাস ১৪ ফিট। এই গাছটি যে কত পুরোণো তাহা বুঝাইবার জন্য গাছটিকে এড়োভাবে কাটা হয় এবং তাহার মধ্যে কয়েকটি বৃত্ত কাটিয়া দেওয়া হয়। গাছটি কি রকম ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা এই বৃত্তগুলিতে বুঝা যায়। এই বৃত্তিগুলি ইতিহাসের এক-একটি বিশেষ বছরের উপর দেওয়া হইয়াছে।

বরফ-পাত হইতে ফল-রক্ষার প্রণালী—আমেরিকার অনেক স্থানে শীতকালে বেশ বরফ পড়ে এবং তাহাতে গাছের ফল, শাক সবজী ইত্যাদি এক রাত্রির মধ্যেই সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়। অনেক রকম চেষ্টা করিয়া শেষে ফল রক্ষা করিবার এক উপায় বাহির করা হইয়াছে। যুক্তরাজ্যের কলরোডো প্রদেশে আপেলের চাষ খুব বেশী হয়। তুষারের হাত হইতে কল রক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার তেল বিশেষভাবে তৈরী এক-একটা পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। রাত্রে সরকার কর্ত্তৃক পাহারা থাকে। তাহারা বরফ পড়িবার সূচনা দেখিলেই সঙ্কেত করে। সঙ্কেত পাইবামাত্র চাষীরা সেই-সমস্ত তেলের পাত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহাতে হাওয়া গরম হইয়া উঠে এবং বরফ গাছে পড়িবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ফলের কিংবা গাছের কোন অনিষ্টই হয় না। সঙ্কেত না পাইলেও বৈদ্যুতিক থারমোমিটার দেখিয়াও চাসীরা তেল জ্বালিতে হইবে কি না বুঝিতে পারে।

এরারুটের চাষ।

এরারুটের চাষ একটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। বহুদিন যাবৎ আমি একাজে বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিয়া হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে এবিষয়টি আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়কে জানান অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। পাটের চাষকে এখন আমাদের দেশের কৃষকেরা একটা খুব লাভের ব্যবসা মনে করে, এবং কোন কোন চাষী এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অত্যধিক লাভের আশায় ধান্যের জন্য একতোলা জমিও না রাখিয়া সমস্ত জমিতে পাট দিয়া শেষে কতই না বিপদে পড়ে। আজকাল অনেকেই স্বাধীন জীবিকার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারাও যে ইহার চাষ দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন সে বিষয়ে

আমার সন্দেহ নাই। ইহার চাষের প্রণালী অনেকটা আদা-হলুদেরই মত। উচ্চ-ভূমি এবং দোআঁশ মাটিতেই ইহার চাষ ভাল হয়। চৈত্র, বৈশাখ মাসই ইহার চাসের উপযুক্ত সময়। মাঘ ফাল্গুন মাস হইতেই জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে। জমির মাটি খুব গভীর ভাবে ওলাট পালাট করিয়া দিতে হইবে। প্রথমতঃ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া পরে লাঙ্গল দ্বারা বার বার চাষ দিবে। গোবর পচাপাতা ছাই ইত্যাদি ইহার উত্তম সার। চৈত্র মাসে অল্প বৃষ্টি হইয়া গেলে পর প্রতি দেড় হাত অন্তর এক হাত উচ্চ করিয়া লম্বালম্বিভাবে বেদী প্রস্তুত করিবে, এবং প্রতি হাতে ছয়টি করিয়া বীজ পুঁতিয়া দিবে। বীজগুলি যেন বেদীর আট দশ অঙ্গুলীর বেশী নীচে না যায়। বেদী ভালরূপ প্রস্তুত হইলে ইহাতে আর মাটি দেওয়া বা নিড়াই খরচ কিছুই লাগিবে না। ছায়া-যুক্ত স্যাঁৎ-সেঁতে জমিতেও ইহার চাষ হইতে পারে। ফসল উঠাইবার সময় জমির মাটি খুব নীচ পর্য্যন্ত ওলটপালট হয় বলিয়াই বোধ হয় একই জমিতে উপর্য্যুপরি ৫।৭ বার আষাদ করিলেও জমির উর্ব্বরতা-শক্তি নষ্ট হয় না, বরং প্রথমবারের চেয়ে ফসল বেশী হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে প্রতি বিঘায় বৎসর কিরূপ আয় হইতে পারে নিম্নে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।

এক বিঘা জমির খাজনা	২৲
জমি প্রস্তুত ও বেড়া দেওয়ার খরচ	৮৲
বীজ দুই মন ১০৲ টাকা দরে	২০৲
ফসল তোলার খরচ	৫৲
পেষাই ও মাংস প্রস্তুত খরচ	১৫৲
মোট খরচ	৫০৲

প্রতি বিঘায় গড়ে ৬০৶ মন ফসল জন্মে এবং ইহা হইতে ন্যূন পক্ষে ২৫৶ এরারুট প্রস্তুত হইবে। এগুলি অন্ততঃ ১৮৲ টাকা মন দরে বিক্রয় করা স্বচ্ছন্দে চলে। এই হিসাবে—

২৫৶ মন এরারুটের মূল্য	৪৫০৲
বাদ খরচ	৫০৲
মোট	৪০০৲

কাগজ কিম্বা টিনের কৌটায় ভরিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে আরও অনেক বেশী লাভ হইতে পারে।

শ্রীপূর্ণেন্দু ভূষণ রায়।
(প্রবাসী)

আতা পাতা।

বিষাক্ত স্ফোটকের (carbuncle) বিশেষ ফলপ্রদ দেশীয় ঔষধ।

ডাক্তার এল্ এম্, সেমজ্ গিরি এল্ এম্, এস্, সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন যে তিনি একটি দেশীয় সহজ প্রাপ্য ঔষধ দ্বারা বহুদূষিত ঘা, ফোড়া, নালী ইত্যাদি চিকিৎসা করিয়াছেন এবং ঐ ঔষধটির আরোগ্যকারী শক্তি দেখিয়া এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ গ্রাণ্ট্ মেডকেল কলেজ সোসাইটিতে পাঠ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, পাছে এই সহজপ্রাপ্য ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধটি বিলুপ্ত হইয়া যায় সেইজন্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন।

এই ঔষধটির উপাদান—আতার পাতা।

পশ্চিম অঞ্চলে আতার নাম সীতাফল ইংরাজীতে custard apple এবং উদ্ভিদ্ তত্ত্বে (Botany) ইহার নাম "Anona Squamosa"

কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?

কতকগুলি পাতা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। তৎপরে থেঁতো করিয়া রস বাহির করতঃ উহা ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া তাহার উপরে ঐ পাতা বাটিয়া গরম করিয়া পুলটিস্ দিবে। এরূপ দিনে দুইবার করিয়া দেওয়া শ্রেয়। উপশমের চিহ্ন—ক্ষতের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার একটি সাদা দাগ লক্ষিত হয় এবং ক্ষতের পূঁজ, রক্ত বা রস্ কমিয়া গিয়া ক্ষতস্থান লাল দেখায়।

তিনি এই ঔষধটি ফোড়া, ঘা, নালী, ক্ষত কার্ব্বঙ্কল এমন কি ক্ষয় রোগ জনিত হাড়ের পচনেও (Tubercular caries) ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়াছেন। বহু স্থানে কার্ব্বলিক, আইডোফর্ম প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া কোন সুফল না পাওয়ায় এই সামান্য ঔষধি ব্যবহারে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন।

তিনি বলেন এই ঔষধ উল্লেখের কারণ—ইহা এত সহজ প্রাপ্য অথচ এরূপ ফলদায়ক। বিশেষতঃ যে সকল দরিদ্র লোক আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন না এবং এদেশে এইরূপ লোকই বোধ হয় বার আনা ভাগ, তাঁহাদের যদি কিছু উপকার হয়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইবেন না।

নালীঘায়ে এই পাতার রস পিচকারি করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হইবার ইহা একটি প্রশস্ত উপায়। (স্বাস্থ্য)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
তারিখ সং
শ্রেণী সং

পত্রাদি

মান্যবর

"কৃষক" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

২৯শে বৈশাখ ১৩৩০

মহাশয়—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরদানে বাধিত করিবেন। (১) আমি এবৎসর গত ফাল্গুণ মাসের বৃষ্টিতে প্রায় ৪০ বিঘা জমীতে ধান বুনন করিয়াছি। কিন্তু এতাবৎ ভালরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ঐ সকল গাছ আশানুরূপ অঙ্কুরিত হয় নাই। খুব ফাঁক ফাঁক কতকগুলি গাছ বাহির হইয়াছে। ঐ জমীগুলি অত্যন্ত নাবাল; এক্ষণে জৈষ্ঠ-মাসে যন্ত্রপী পুনরায় বুনন করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে সম্ভবতঃ ঐ বুননের গাছগুলি বড় হইতে না হইতেই জমীগুলি ডুবিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় ঐ ফাঁক ফাঁক গাছগুলি নষ্ট করিয়া পুনশ্চ বুনন করা যুক্তি সঙ্গত কিনা জানাইবেন এবং অন্য কি পন্থা অবলম্বন করিলে ঐ জমীতে আশানুরূপ আবাদ হইতে পারে তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন।

(২) কতকগুলি জমীর আজ কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি লাল আলুর আবাদ করাতে উর্ব্বরাশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধান ভাল জন্মায় না। মাটী বেলে আঁশ। কেহ কেহ ঐ জমীতে চুণ সার দিতে উপদেশ দেন। কিন্তু কি পরিমান জমীতে কত চুণ ব্যবহার করা যাইতে পারে জানাইবেন। ঐ জমীর মাটীতে চুণ আছে কিনা তাহা অবগত হইবার সহজ উপায় কি, জমীতে চুণ সারের উপকারিতা কি? প্রত্যহ যে পাথুরিয়া কয়লা জ্বালান হয় তাহার ছাই জমীতে ছড়াইলে কতকটা চুণের কাজ হয় কিনা? কি প্রকারের চুণ জমীতে দেওয়া যাইতে পারে? একবার চুণ দিলে কতদিন পরে আবার চুণ দিবার আবশ্যক হইবে? অত্যন্ত নাবাল জমী যাহার মাটী অত্যন্ত এঁটেল তাহাতে বুনন ধান্য চাষের পর আর অন্য কোন জিনিষের আবাদ করা যাইতে পারে?

বিনীত—

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ।

[(১) যে গাছগুলি আপাততঃ হইয়াছে সেগুলি ফাঁক ফাঁক হইলেও নষ্ট করিয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত নয়। যদি জমিতে খুব বেশী জল দাঁড়াইবার আশঙ্কা থাকে তবে দীর্ঘ কাণ্ড বিশিষ্ট ধান্য চাষ করিতে পারেন। ৩।৪ হাত জলেও ইহাদের বিশেষ ক্ষতি হয়

না। এরূপ ধানের বীজ পূর্ব্ব হইতে অর্ডার দিলে ভারতীয় কৃষি সমিতি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। (২) এতদ্দেশের মাটিতে সাধারণত চূণের মাত্রা প্রায় কম থাকে না। চূণ সার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে ভাল মন্দ দুই হইতে পারে। অনুর্ব্বর জমিতে চূণ প্রয়োগে প্রথম ২।১ বৎসর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। বেলে জমিতে চূণ দিয়া তৎপরে ক্ষেত্রজ সার দিলে জমি অনেকটা বাঁধে এবং উহার শোষন শক্তিও বৃদ্ধি পায়। চূণ অপর প্রকার অপেক্ষা gypsum (সোডাওয়াটার কলের আবর্জ্জনা) রূপেই প্রয়োগ করাই ভাল। জমির অবস্থা বুঝিয়া বিঘা প্রতি আধমন হইতে ২মন চূণ দেওয়া যাইতে পারে। উল্লিখিত জমিতে চূণ অপেক্ষা সবুজ সার (সন, ধঞ্চে ইত্যাদি) প্রয়োগে অধিক উপকার পাওয়া সম্ভব—কৃঃসঃ]

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়। পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুণ ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে মকাই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরাছস কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের থাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কৃষিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

২৪শ খণ্ড { কৃষক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল। } ২য় সংখ্যা

ভারতের তৈল বীজ।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ তৈল কেবল মাত্র রন্ধন কার্য্যে অথবা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এখন আর সে দিন নাই; সাবান, বাতি, স্নিগ্ধকরণ ও পশু খাদ্য প্রস্তুতে তৈলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সেই জন্য জগতের চারিদিক হইতে অধিকতর পরিমাণে তৈল বীজের জন্য চাহিদা আসিতেছে। ভারতে যে পরিমাণে ও যত বিবিধ প্রকারের তৈল বীজ উৎপাদিত হয় পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি তাহা হয় না। পশ্চিম আফ্রিকায় অনেক রকম তৈল বীজ আছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে ২।৩টি ভিন্ন অন্য গুলির জগতময় কাটতি নাই।

ভারতে তৈল বীজের বাৎসরিক উৎপাদন গড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টন, ইহার মূল্য মোটামুটি ৭৫ কোটি টাকা বলিয়া ধরিতে পারা যায়। বিগত যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারত তাহার তৈল শস্যের ½ ভাগ বিদেশে চালান দিয়াছিল। এবং উহার সহিত যদি তৈল ও খৈল যোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে ভারতের তৈল বীজ ও তজ্জাত দ্রব্যাদির বহির্ব্বানিজ্য প্রায় ২৭ কোটি টাকার দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্য ব্যতীত ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি এই শ্রেণীর ভারতীয় মালের প্রধান খরিদ্দার। এই তিনটি দেশ যথাক্রমে বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় তৈল বীজের ⅓, ⅛ ও ⅙ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু পরিমাণ হিসাবে অধিক বীজ ইংলণ্ডে গেলেও ইহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। কারণ

কম দরের বীজই ইংলণ্ডে যায়। পক্ষান্তরে মূল্যবান তৈল বীজের রপ্তানি জর্ম্মণি ও ফ্রান্সে সমধিক। ইউরোপের অন্যান্য দেশও সামান্য মাত্রায় ভারতীয় তৈল বীজ গ্রহণ করে।

বীজের তুলনায় তৈলের রপ্তানি নিতান্ত কম—গড়ে ৬০ লক্ষ টাকার অধিক নয়। অবশ্য বিপুল পরিমাণ তৈল দেশ মধ্যেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে ভারতের এখনও তৈলপ্রস্তুত ব্যবসায় শৈশবাবস্থায়। দেশের সর্ব্বত্রই ঘানি আছে এবং তৎ সমুদয় দ্বারা নানা প্রকার তৈল বীজের তৈল নিষ্কাষণ করা হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ণ মাত্রায় তৈল বাহির হয় না, তৈল পরিস্কার হয় না, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক খরচ পড়ে। ইংলণ্ডের হল্ অথবা জর্ম্মাণির হ্যামবর্গ নগরের এক একটি বড় তৈল কারখানায় যে পরিমাণ তৈল উৎপাদিত হয় আমাদের দেশে ১০০টি গ্রামেও বোধ হয় তাহা হয় না।

তৈল বীজ বর্ত্তমান জগতে একটি মূল্যবান ফসল। তৈল বীজ ব্যবসায়ে ভারতের যে বিশাল বহির্ব্বাণিজ্য দেখা যায় তাহার সমস্তটা বাঞ্ছনীয় নহে। তৈল দেশে প্রস্তুত হইলে লোক জনের মজুরি এবং অনেক পরিমাণে খৈল দেশেই থাকিয়া যায়। দেশে খরচের পর উদ্বৃত্ত তৈল রপ্তানি হওয়াই উচিত। তৈল বীজ এবং খৈল রপ্তানিতে সমধিক ক্ষতি আছে। অথচ উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয়। অবশ্য ইহার মূলে ভারতীয় কৃষক অথবা গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা। পশ্বাদির পক্ষে খৈল যে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য ও খৈল সংযোগে জমির উর্ব্বরতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা লোকে যে না জানে তাহা নয়; তবে দারিদ্রের তাড়নে তাহারা এই সমুদয় উচিত রূপে ব্যবহার করিতে পারে না। আপাততঃ খরচ সংক্ষুলানের জন্য অল্প মূল্যেই তাহা দিগকে এই সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়।

ভারতে বন্য ও কর্ষিত তৈল বীজের অভাব নাই। এস্থলে বন্য তৈল বীজের আলোচনার স্থানাভাব। কর্ষিত তৈল বীজের মধ্যেও ব্যবসায়ের হিসাবে সব গুলির গুরুত্ব সমান নয়। যে গুলি সচরাচর বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় ও যে গুলির অল্প বিস্তর অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য আছে এস্থলে সে গুলিরই উল্লেখ করা হইল। ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকায় গত বৎসর যে পরিমাণ ও যে প্রকারের তৈল বীজ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি বিদেশে গিয়াছিল তাহা দেখান হইল।

উক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে ভারতের তৈল বীজ গুলি বীজ রূপেই অধিক পরিমাণে চালান যায়। কেবল পাঁচটি ফসলের তৈলের বহির্ব্বানিজ্য আছে :—তৈল উৎপাদনের হিসাবে উপরোক্ত তৈল বীজ গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় :—১ম, যে গুলি হইতে শতকরা ১৩ হইতে ৩৬ ভাগ তৈল পাওয়া যায়—কার্পাস, সরিষা ও রাই এবং তিসি; ২য়, যে সমুদয় বীজে তৈলের মাত্রা ৪২ হইতে ৬৫ ভাগ—পোস্ত, চিনের

বাদাম, তিল, রেড়ী, মহুয়া ও নারিকেল। এই গুলির মধ্যে যে সমস্ত তৈল সহজে শুষ্ক হয়—তিসি ও পোস্ত—সে গুলির রং প্রস্তুতে চলন আছে। ভারতীয় প্রধান প্রধান তৈল শস্যের মোটামুটি বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান কৃষির অন্যতম সমস্যা এই সমুদয় তৈল ফসলের তৈল উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা।

নারিকেল:—আজকাল জগতে নারিকেল তৈলের আদর যথেষ্ট। নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুতে ইহা জর্ম্মণি ও আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া, কাথিয়াবাড় ও রত্নগিরি অঞ্চলে; মান্দ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া, গোদাবরীর ব-দ্বীপে ও মালাবারে, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যে; ব্রহ্ম-পুত্র গঙ্গা ও ইরাবতীর সমুদ্র প্রবেশের সন্নিহিত স্থানে নারিকেল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। ঠিক কত পরিমাণে কোপ্রা অর্থাৎ শুষ্কীকৃত নারিকেল শাঁস বৎসরে উৎপাদিত হয় বলা যায় না; তবে গড় পড়তায় যে পরিমাণ কোপ্রা লইয়া পৃথিবীর বহির্ব্বাণিজ্য হয় তাহার ½ অংশ ভারত-জাত। এতদ্ভিন্ন মালাবারের কোপ্রা প্রসিদ্ধ, বাজারে ইহা অন্য শ্রেণীর কোপ্রা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। নারিকেল তৈল ক্রমশঃ দেশে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। তাহা সুখের বিষয়। কিন্তু নারিকেল বৃক্ষের চাষ প্রসারে এবং অধিকতর মাত্রায় তৈল উৎপাদনে—এতদুভয় বিষয়েই, ভারত অনেক নারিকেল উৎপাদন কারী দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

পোস্ত:—আফিং এর জন্যই পোস্তের চাষ; কিন্তু তাহা হইলেও পোস্ত বীজের ব্যবসায় নিতান্ত সামান্য নহে। আফিং এর চাষ যুক্ত প্রদেশেই অধিক এবং বাৎসরিক উৎপাদনের মাত্রা প্রায় ৩৮০০০ টন বীজ হইবে। পোস্ত বীজ, তৈল ও খৈল যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। শৈত্য প্রয়োগে পোস্ত বীজের তৈল বাহির করিলে উহা খাদ্যে ও রঙ্গে লাগিতে পারে, কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগে প্রস্তুত তৈল প্রধানতঃ সাবান তৈয়ারীতেই ব্যবহৃত হয়। তুর্কী, রুশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে। বীজ উৎপাদিত হইলেও ভারত হইতেই পোস্ত বীজের রপ্তানির মাত্রা অধিক।

চিনের বাদাম:—ভারতে চিনের বাদামের চাষ বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও ব্রহ্ম দেশেই আবদ্ধ। মধ্যে রোগ প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে ইহার চাষ কমিয়া গেলেও ইদানীন্তন নূতন বীজ প্রবর্ত্তণে ফসলের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। গড়ে প্রায় ৭ লক্ষ টন চিনার বাদাম বৎসরে উৎপাদিত হয় ও তাহার সিকি বিদেশে চালান যায়। বৃটিশ বন্দর ব্যতীত দক্ষিণ ভারতের ফরাসী বন্দর, পণ্ডিচারী, দিয়া অনেক চিনের বাদাম চালান যায়। ফ্রান্স ইহার প্রধান খরিদ্দার। খোসা সমেত ও খোসা ছাড়ান উভয় প্রকারেই চিনার বাদাম রপ্তানি হয়। কিন্তু খোসা সমেত বীজ হইতেই উৎকৃষ্ট তৈল হয়। কারণ সেরূপ অবস্থায় বীজ সহজে খারাপ হইতে পারে না। অবশ্য কলে ছাড়ান হইলে

খোসা ছাড়ান বীজও ভাল অবস্থায় বিদেশে পৌঁছিতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত চিনের বাদামের তৈলের তেমন রপ্তানি নাই ; যাহা প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই দেশে কাটিয়া যায়। চিনের বাদামের খৈলের চালান তদপেক্ষা অধিক। ইদানীন্তন ইহা যবদ্বীপে অধিক মাত্রায় যাইতেছে। পূর্ব্বে কেবল সাবান তৈয়ারীর জন্যই চিনের বাদামের তৈল ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু এখন নূতন শোধণ প্রথার উদ্ভাবনে চিনের বাদামের তৈল উৎকৃষ্ট আহার্য্য তৈল ও মাখমে পরিণত হইতেছে। ইউরোপে চিনের বাদামের খৈল মূলাবান পশুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। চিনের বাদামের ন্যায় ফসলের চাষ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ বাংলায় চলিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

তিলঃ—ভারতের সকল প্রদেশেই অল্প বিস্তর তিলের চাষ হইলেও মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশেই ইহার চাষের জমি অধিক। বৎসরে প্রায় ৩½ লক্ষ টন তিল উৎপাদিত হয়। শ্বেত তিলেই অন্যান্য চারি জাতি অপেক্ষা তৈলের মাত্রা অধিক। জগতের তিল বীজের বাণিজ্যে ভারতের অংশ প্রায় সিকি ভাগ। প্রায় ১ লক্ষ টন তিল বীজ পূর্ব্বে বিদেশে চালান যাইত ; এখন অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। দেশী ঘাণিতে প্রস্তুত হইলেও ভাল তিলের তৈল পরিষ্কার ও বর্ণ হীন। রন্ধন কার্য্যে ও গায়ে মাখিবার জন্য অনেক পরিমাণ তিল তৈল দেশে ব্যবহৃত হয়। ইহাও কৃত্রিম মাখম প্রস্তুতে প্রয়োগ করা হয়।

রেড়ীঃ—মিশ্র ফসল হিসাবে রেড়ীর চাষ এদেশের অনেক স্থলে প্রচলন আছে ; কিন্তু অধিক উৎপাদন প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশ, হাইদ্রাবাদ রাজ্য ও বোম্বাই প্রদেশেই হইয়া থাকে। ছোট ও বড় বীজ হিসাবে দুই জাতীয় রেড়ী আছে। প্রথমটি ঔষধার্থ তৈল প্রস্তুতে ও দ্বিতীয়টির তৈল জ্বালানয়, কলকব্জা মসৃণ করায়, চামড়া নরম করায় ও রং তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। বৎসরে ২½ হইতে ৩ লক্ষ টন বীজ উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর অন্যত্র রেড়ী জন্মাইলেও রেড়ীর বীজের ব্যবসায় ভারতের এক প্রকার একচেটিয়া। দেশী তৈল প্রস্তুতের প্রথা এখনও সেকেলে গোছের আছে বলিয়া হল প্রভৃতি স্থানের ন্যায় উত্তম হয় না। তবুও পরিষ্কার তৈল কলিকাতার বাজারে অপ্রাপ্য নয়। বস্তুতঃ রেড়ীর তৈল প্রস্তুতের অধিকাংশ কলই কলিকাতায় অবস্থিত। চা বাগানে ও ইক্ষু এবং আলু চাষে রেড়ীর খৈলের আদর আছে।

মহুয়াঃ—ভারতে তিন জাতীয় মহুয়া গাছ আছে। বর্ষার প্রারম্ভেই মহুয়ার ফল হয় এবং সমস্ত বর্ষাকাল ইহার কাজ চলে। মহুয়া বীজ রপ্তানির পরিমাণে অনেক উঠ্‌তি পড়তি দেখা যায়। সাবান ও বাতি প্রস্তুতের জন্য বেলজিয়মেই ইহার চালান অধিক। সুলভ চোকোলেট্ প্রস্তুতে ও ইহার ব্যবহার কম নয়। মহুয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আরও কয়েকটি বিদেশীয় তৈল আছে।

ভারতের তৈল বীজ উৎপাদন ও বহির্বাণিজ্যের তালিকা, ১৯২২।

নং	তৈল শস্যের নাম	সাধারণ মোট উৎপাদনের পরিমাণ টন হিঃ	রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য, ১৯২২					
			তৈল বীজ		খৈল		তৈল	
			পরিমাণ, টন হিঃ	মূল্য	পরিমাণ, টন হিঃ	মূল্য	পরিমাণ, গ্যালন হিঃ	মূল্য
১	নারিকেল		১৫,০৯৪	৫৪,৮৮,৪২৪৲	২০২৬	২,৯২,৭২১৲	১২,০৯,৯২৩	২৯ ৯৬,১৬৮৲
২	রেড়ী	২৫০০০০	৮৫,৪৭৫	১,৮৫,৬৬,৪৬৬৲	১৪৩৬	১,২৩,৭৭৪৲	৪৯৫,৭১৩	১১,৭৯,৮১২৲
৩	তিসি	৫০০,০০০	৩১০,১০৯	৮,২২,৬৯ ৪৬৯৲	১০,৩১৬	১৬,২৭,৮২১৲	৩২ ২০০	১,২০,২০২৲
৪	সরিসা ও রাই	১২,৬০,০০০	২৬৭৯৪৪	৫,৮৭,০০,০২২৲	৫৬,২০২ (৪ ও ৫)	৬৬,৮৪,০৫৯৲ (৪ ও ৫)	৩৮৪,৪২৪	১০,৮৫,৫৫৫৲
৫	তিল	৩৭৫০০০	৫১,৬৫৪	১,৫৪,৬১,৪১৯৲			১০১০৮৬	২,৫৩,১২৯৲
৬	কার্পাস	২০,০০,০০০	১৪৯,১৬৩	১,৫৯,৬৭,০৯৭৲	২৩৫৯	৩০২,১৫২		
৭	চিনের বাদাম	৭০০০০০	২৬৩৬২৪	৩,৯৮,১৩,০৮০৲	৬০,৩০৬	৬২,৭৫,৯৯৫৲		
৮	পোস্তবীজ	৩৭৮০০	৪০১৭	১২,১৪,১২০৲				
৯	মহুয়া	২৭,০০০	১৯,১৮৬	২৮,১৩,১৮৯৲				
১০	অন্যান্য		১৯,৯৭৫	২৭,৪৬ ৪৫০৲	৬,৬০৯	৮,৬১,৯৪৫৲	৫৬,৯১৩	১,৭৫,৮১৮৲

কার্পাসঃ—তুলা উৎপাদনের হিসাবে জগতের মধ্যে ভারতের স্থান মার্কিন যুক্ত রাজ্যের নিচেই। সুতরাং ভারতে যে বহুল পরিমাণে তুলা বীজ উৎপাদিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পৃথিবীতে বৎসরে ১০০ লক্ষ টণ তুলা বীজ উৎপাদিত হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, তাহার মধ্যে ২০ লক্ষ টণ ভারতে জন্মায়। গড়পড়তায় যে পরিমাণ তুলা বীজ নানা দেশ হইতে রপ্তানি হয় তাহার প্রায় ⅓ অংশ ভারত-জাত। ভারতে তুলা বীজ উৎপাদনের পরিমাণ এত অধিক হইলেও, দুঃখের বিষয় এই যে ইহার সদ্ব্যবহার অতি কম মাত্রায়ই হইয়া থাকে। তুলা বীজের তৈল খাদ্যার্থে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং খৈলও উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য। এ পর্য্যন্ত এই তৈল প্রস্তুতের একটি মাত্র আধুনিক কল বোম্বাই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে প্রস্তুত তৈল, খৈল, সুজী প্রভৃতি খুব ভালই দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু একটি মাত্র কলে ২০ লক্ষ টণ বীজের কি হইবে। অবশ্য বীজের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টণ আবশ্যক হয় এবং গড়ে ৩ লক্ষ টণ বিদেশে চালান যায়। বাকি বীজের মধ্যে কিয়দংশ ভাঙ্গা বীজরূপে পশু খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে কার্পাস তৈল হইতে কৃত্রিম মাখম ও চর্ব্বি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সমস্ত ভারতের হিসাবে ব্রহ্মদেশে অতি সামান্য তুলা উৎপাদিত হইলেও এখানে অধিক পরিমাণে তৈল প্রস্তুত হয়। যাহাতে অধিক পরিমাণে কার্পাস তৈল ও কার্পাস খৈল দেশে ব্যবহৃত হয় তদ্বিষয়ে বড় বড় ধনীগণের যত্নবান হওয়া উচিত।

তিসিঃ—তিসি হইতে উৎকৃষ্ট তন্তু হইতে পারে, কিন্তু ভারতে প্রধানতঃ বীজের জন্যই তিসি উৎপাদিত হইয়া থাকে ও উৎপাদিত বীজ ও তৈলের অধিকাংশই বিদেশে চালান যায়। এক সময়ে ভারতজাত তিসিই জগতের অভাব মোচন করিত; কিন্তু এক্ষণে আর্জ্জেণ্টাইন, মার্কিন, কান্যাডা ও রুশিয়ায় তিসি উৎপাদিত হওয়ায় পৃথিবীর তিসি বীজের বাণিজ্যে ভারতের ভাগ প্রায় শতকরা ৩০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ বিহার ও বাঙ্গলায়ই তিসি চাষ হয় ও সময়ে সময়ে ইহা মিশ্র ফসল রূপে উৎপাদিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় আহার্য্য তৈল, মাখম ও গ্লিস্‌রিণ প্রস্তুতের জন্য অনেক পরিমাণ তিসি রপ্তানি হইত। এদেশে এখনও অনেক পরিমাণ তিসির তৈল দেশী ঘানিতে প্রস্তুত হয়; তাহাতে পূর্ণ মাত্রায় তৈল পাওয়া যায় না এবং অনেক অপচয় হয়। এই জন্যই দেখা যায় যে কোন কোন সময় বিলাতের কল ওয়ালা ভারতের ব্যবসায়ী অপেক্ষা কম দরে তৈল বিক্রয় করিতে পারেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর তিসির তৈল ও ফেলা যায় না। রং প্রভৃতির কাজে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

রাই ও সরিষাঃ—বাজারে যেরূপ ভাবে বিক্রয় হয় তাহাতে রাই ও সরিষার পৃথক রূপে হিসাব পাওয়া যায় না। রাই সরিসা, তোরিয়া প্রভৃতির চাষ উত্তর ভারতেই আবদ্ধ। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১২½ লক্ষ টণ রাই ও সরিষা প্রতিবৎসর

ভারতে উৎপাদিত হয় এবং উহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বিদেশে চালান যায়। সাধারণ রন্ধন কার্য্যে, ও গায়ে মাখার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া প্রভূত পরিমাণ সরিষার তৈল দেশে প্রস্তুত হয়। সরিষার তৈলে অনেক রূপ ভেজাল চলে, এমন কি অনিষ্টকারী কুসুম ফলের বীজের তৈল ও ইহাতে মিশ্রিত করা হয়। বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা শরিষার তৈলকেও সুস্বাদু মাখমে পরিণত করা যায়। এতদ্দেশে এখনও সে প্রথার প্রচলন হয় নাই। সরিষার তৈলের রপ্তানির মুল্য উহার বীজ অপেক্ষা অনেক কম, তাহা পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে। তবু ও ইহা উল্লেখযোগ্য যে ভারতের বাহিরে যেখানে অধিক অংখ্যক ভারতবাসী আছে যথা দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিচ দ্বীপ, ফিজি প্রভৃতি—সে সকল স্থানেই সমধিক পরিমাণে সরিষার তৈল রপ্তানি হয়। সরিষার খৈলের চালানও নিতান্ত কম নয়, কিন্তু বিদেশে পশু খাদ্য অপেক্ষা সার রূপেই ইহার ব্যবহার অধিক।

যেদিন হইতে তৈল শোধণের উন্নত প্রথা ও তৈলকে কঠিনীভূত করিবার প্রণালী (Hydrogenation of oils) আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইদিন হইতেই তৈল জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কতকগুলি তৈল, যেমন কুসুম ফলের তৈল (পাকড়া তৈল), শরীরের পক্ষে অনিষ্ট কর বলিয়া পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত না। জর্ম্মনেরা কিন্তু আজ কাল ঐ শ্রেণীর তৈল এরূপ ভাবে শোধণ করিয়া লয় যে তৈল পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হয়। তৈল শোধন ও তাহা হইতে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুতে মধ্য ইউরোপে ও মার্কিণে অনেক বড় বড় কারখানা নিযুক্ত আছে। যে অবস্থায় আমাদের ঘানির তৈল বাজারে আসে তাহাতে রন্ধণ কার্য্য চলিলেও মাখন প্রভৃতির ন্যায় খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের কৃত্তিম খাদ্য প্রস্তুতকারকগণের লক্ষ্য হইয়াছে যে কোন বিশেষ তৈল হইতে অথবা বিশেষ বিশেষ তৈলের সংমিশ্রণে মাখন, চর্ব্বিও অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুত করা।

যে তৈল এদেশ হইত চালান যায় তাহা শুধু অপরিষ্কৃত নহে তাহাতে নানাপ্রকার ভেজাল থাকে। বিলাতী কলওয়ালাগণ ঐ রূপ তৈল লইয়া শোধণ করেন। প্রথমতঃ তৈলের অম্লত্ব নির্দ্ধারিত হয়, তারপর উহা কিরূপভাবে শোধিত হইবে ঠিক করা হয়। শোধণের নানাপ্রকার প্রথা আছে; বিশেষ শ্রেণীর তৈল হিসাবে বিশেষ প্রথা প্রযুয্য। কিন্তু সকল প্রথাতেই তৈল রং ও গন্ধহীণ হইয়া বাহির হইয়া আসে। শোধণের পর তৈলের যে অবশিষ্টাংশ থাকিয়া যায় তাহাকে কলওয়ালাগণ 'ফুট' বলেন। এই ফুট তৈল শোধণ ব্যবসায় লাভের অন্যতম আকর। ইহাতে সাবানে অপরিবর্ত্তিত তৈল ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যও থাকে। রাসায়ণিক প্রণালী দ্বারা উহা হইতে আরও কতক তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং বাকি ভাগ কাল চর্ব্বি (Black grease) রূপে সাবান প্রস্তুত কারকদিগকে বিক্রয় করা হয়। তৈল কঠিণীভূত করার প্রথার প্রচলণে তৈলজ

খাদ্য প্রস্তুত অনেক সহজ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটি প্রধান শ্রেণীর খাদ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—Nut margarine) ইহাতে কোন প্রাণীজ চর্ব্বি থাকেনা এবং দেখিতে শ্বেতবর্ণ ; Oleo margurine) উদ্ভিজ্য তৈল বাদে ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাণীজ চর্ব্বি থাকে এবং ইহার স্বাদ বর্ণ ও গন্ধ স্বাভাবিক মাখনের ন্যায়। তৈল ও চর্ব্বি ব্যতিরেকে দুগ্ধ, মাখনও এই সমুদয় প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ আজকাল উদ্ভিজ্য তৈল বহুবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করা হইতেছে—সাবান, বাতি, রং, কলকব্জায় মসৃনতা সাধন, কীট নাশক দ্রাবণ, পমেটম, মালিস্, কৃত্তিম দুগ্ধ ও ননি, আইস্‌ক্রিম, অয়েলক্লথ, কৃত্তিম রবর্ ইত্যাদি তন্মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির দিনে ভারত যে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে তাহা অবশ্য কেহ ইচ্ছা করেন না। কিন্তু কৃষির সহিত কৃষি সংক্রান্ত শিল্পের যে ঘণিষ্ট সম্বন্ধ তাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করেন না। শুধু কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া বিশেষ লাভ নাই। যাহাতে উক্ত দ্রব্য দেশ মধ্যেই ব্যবহারোপযোগী রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সে বিষয়েও যথেষ্ট চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত তথ্যাদি হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত কিরূপ লাভজনক ব্যবসায়। যাঁহাদিগকে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে কাঁচা মাল লইয়া যাইতে হয় তাঁহারাও এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতেছেন। হাতের নিকট মাল থাকিয়াও ভারতবাসী তাহা করিতে পারিতেছে না। ইহাপেক্ষা উদ্যম, অধ্যবসায় ও ব্যবসা বুদ্ধির স্বল্পতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হইতে পারে ?

শালিক পাখি।

শালিকের ন্যায় কৃষকের উপকারী পক্ষী কমই আছে। যে হিসাবে কীট কুলের বংশ বৃদ্ধি হয়, তাহাতে শালিক যদি এক বৎসর কোন স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় তবে পর বৎসর ফসল হওয়া দুরূহ। সুখের বিষয় যে দেশের সর্ব্বত্রই শালিক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদেশ প্রভেদে শালিক দেশী ময়না, বম্‌ণি, বণি প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে শালিক অবাধে লোকে বিনষ্ট না করিতে পারে তজ্জন্য আইন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় শালিকের নাম Acridotheros tristis.

কাল, পাটকিলে ও সাদা রঙ্গের মিশ্রণে শালিক পাখিকে মন্দ দেখায় না, যদিও সৌন্দর্য্য হিসাবে ইহাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত অনেক পাখী গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এত সুপরিচিত যে ইহার পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্যক। স্ত্রী ও পুং পক্ষী দেখিতে একই রকম, কেবল পুং পক্ষীর মাথা একটু বড় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিক পরিপুষ্ট।

শালিক প্রধানতঃ জমিতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। ফড়িং ধরা ইহার একটি বিশিষ্ট অভ্যাস বলিয়াই ইহার Acridotheros নামকরণ হইয়াছে। অনাবাদী অথবা কর্ষিত জমি, সর্ব্বস্থানেই শালিকের যাতায়াত আছে। গরু বাছুর অথবা অন্যান্য পশ্বাদি চলিয়া গেলে পোকামাকড় সরিয়া যায় বলিয়াই তাহাদের পিছনে পিছনে শালিক ঘুরিয়া বেড়ায়। জমিতে লাঙ্গল অথবা ছেঁচ দিলেও কীটাদি বাহির হয়। সুতরাং সেরূপ স্থলেও ইহা উপস্থিত থাকে। যে সমস্ত পোকা ইহা খায় সেগুলি প্রায়ই কৃষির অনিষ্ঠকর—ফড়িং, কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ, কীড়া, মাকড়সা, কৃমি-কীট, উচ্চিঁড়ে, ঘুর-ঘুরে ইত্যাদি। শষ্য ও ফলও ইহার আহার্য্য ; তবে মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। ফলের মধ্যে অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞ এবং অন্য ডুমুর ও পাকুড় ফলই ইহারা অধিক ভাল বাসে। প্রায় অধিকাংশ শস্যই (ধান, গম, যোয়ার ইত্যাদি) শালিক পাখি খায়, কিন্তু নরম ভুট্টার দানার উপর ইহার একটু অধিক নজর।

শালিক নিতান্ত নিরীহ পাখি নয়। যে ক্ষেত্রে অথবা উদ্যানাংশে এক জোড়া শালিক বহুকাল হইতে চরিয়া তাহাদের স্বত্ব স্থাপন করিয়াছে, সেখানে অন্য পাখি গেলেই অনধিকার প্রবেশের উপযুক্ত ফল তাহাকে পাইতে হইবে। বড় পাখী অথবা সংখ্যায় অধিক হইলেও শালিক সহজে ছাড়িয়া দেওয়ার পাত্র নয়। শালিকের এই

বাঙ্‌লার কৃষকপল্লী।

কলহ প্রবণতা ও জবরদস্তি করার অভ্যাস কোন কোন সময়ে বিরক্তির কারণ হইতে পারে। শালিকের আধিক্য হইলে সে স্থলে অন্যান্য উপকারী অথচ নিরীহ প্রকৃতির পাখী টিকিতে পারে না। ভারত হইতে মরিচ দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া, নবজিলণ্ড ও হাওয়াই দ্বীপ পুঞ্জে শালিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শেষোক্ত দেশে ইহার অত্যাচারে স্থানীয় পায়রা দেশ ছাড়া হইবার যোগাড় হইয়াছে। আন্দামান দ্বীপেও তথাকার আদিম অধিবাসী, শ্বেত ময়না, শালিকের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে শালিকের অভ্যাস ও চাল চলন কৌতুহলজনক বিষয়। কাকের ন্যায় ইহা চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ নহে। ইহা যাহা করে তাহাতে লোকের নজর পড়িলেও কোন দ্বিধা বোধ করে না। মানুষের আবাস স্থল ইহারা নিজের বলিয়াই মনে করে এবং সময়ে সময়ে ঘরের ভিতরেই বাসা করিবার চেষ্টা করে। তখন অবশ্য ঘনিষ্ঠতার মাত্রা অত্যধিক হইয়া পড়ে এবং জোর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। শালিক বাসা তৈয়ারী করিতে এত প্রকার দ্রব্য সম্ভার আমদানি করে যে গৃহ আবর্জ্জনা স্তূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। শালিকের বাসা অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত দ্রব্যাদির সমষ্টি। কাঠি, খড়, পালক, নেকড়া, ছোট ছোট হাড়, কাগজের টুকরা—কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু সাপের খোলস্ গৃহ সজ্জা হিসাবে শালিকের নিকট বিশেষ প্রিয়। মোটের মাথায় ছোট বড়, সুন্দর ও কদর্য্য উপাদানের অভাব না থাকিলেও শালিক পাখির বাসা বড় একটা সুচিক্কণ শিল্পের দৃষ্টান্ত নয়। যেখানে বৃক্ষের কোটর অথবা গৃহ প্রাচীর অথবা ছাতের গর্ত্ত পাওয়া যায় সেখানে শালিক প্রথমেই বাসা করিবার চেষ্টা করে, তাহা না পাইলে অন্যত্র বাসা করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভ হইতে বর্ষার মধ্য পর্য্যন্ত বাসা প্রস্তুতের প্রশস্ত সময়। ইহারা প্রায় ৪।৫টি ডিম পাড়ে। ডিম্বের বর্ণ চক চকে নীল। শালিক পাখির বাসায় কোকিলের ডিম সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন সময় তাহাও দেখা যায়। তরুণ শাবকের জন্য প্রধাণতঃ পোকা মাকড়, কোমল ফলাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ সখ্ করিয়া শালিক পাখী পোষেণ। খুব বাচ্ছা অবস্থা হইতে প্রতিপালন করিলে শালিক এত পোষ মানে যে খোলা থাকিলেও পলাইয়া যায় না। শালিক স্বরের তত ভাল অনুকরণ করিতে পারে না; ইহা সাধারণতঃ অত্যন্ত শব্দ করে; শব্দ অনেকটা এইরূপ—কিকি, কিকি, কিকি—ছর্‌র্, ছর্‌র্, ছর্‌র্—কোক্ কোক্। শালিকের ঝাঁক কোন রকমে ভয় পাইলে এক প্রকার তীব্র শব্দ করে ও তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। নীড় বাঁধিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ঝোপে ও ছায়াযুক্ত গাছে শালিকের দল একত্র মিলিত হইয়া এত শব্দ করে যে তাহা সময়ে সময়ে অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাপেক্ষা অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, যখন সিমুল ফুল ফোটে ও তাহার মধু পান করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী সমস্ত শালিক কুল উপস্থিত হয়।

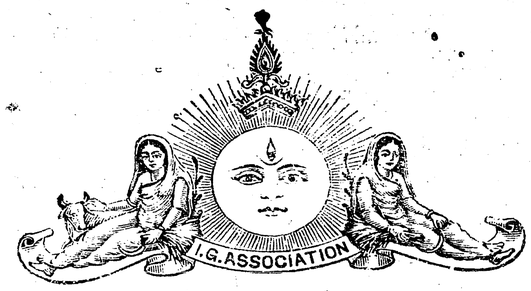

কৃষক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল্।

উদ্যান ও ক্ষেত্রজ ফসল

সভ্যতার আদিম যুগে অর্দ্ধবণ্য মানব চাষ আবাদের প্রথা পরিজ্ঞাত ছিল না। তখন বনের ফলমূলই তাহাদের প্রধান ভক্ষ্য ছিল। গহ্বর বাসী মনুষ্য ক্রমশঃ নানাস্থানে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে এবং এইরূপ যাযাবর মানবের পত্নী যুগান্তর-প্রবর্ত্তক সত্য আবিষ্কার করে যে ২।৪টি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের বীজ ছড়াইয়া দিলে অল্পদিনেব মধ্যেই জীবনধারণোপযোগী শষ্য পাওয়া যাইতে পারে। যাযাবর মনুষ্যের পক্ষে ইহাই বিশেষ সুবিধা জনক—কোন স্থানে গিয়া জঙ্গল পোড়াইয়া ২।৪ মুষ্টি শষ্য ছিটাইয়া দাও, ৩।৪ মাস পরে উৎপাদিত শষ্য সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাও, তাহাতে কোন বন্ধন নাই, অধিক দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা নাই। ফলের গাছ জন্মাইতে ও পরিণত অবস্থায় আসিতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং ফলচাষ অপেক্ষা শষ্য চাষ আপাত-লাভজনক। এই ধারণা বহুকাল হইতে মানবকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া কৃষির-উন্নতি দ্রুত গতিতে হইয়াছে। সেই হিসাবে উদ্যান ফসলের উন্নতি হয় নাই।

কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে উদ্যান ফসল উৎপাদনে অবহেলা প্রদর্শন করা কি মনুষ্যের পক্ষে শুভকর হইয়াছে? ইহা স্থির যে বৃক্ষ ফসল হইতে শ্বেতসার, শর্করা, তৈল, মানব ও পশুখাদ্য, জ্বালানি ও গৃহ নির্ম্মাণের কাষ্ঠ, রং, তন্তু, প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। এক নারিকেল গাছ কত প্রকারে ব্যবহারে আসে। পক্ষান্তরে একটি ক্ষেত্রজ ফসল হইলে এক শ্রেণীর দ্রব্যই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। অধিকন্তু প্রতিবৎসর বিশেষ প্রকারের জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগে ও সময়ে সময়ে জল সেচন দ্বারা ক্ষেত্রজ ফসল উৎপাদন করাও আয়াস সাপেক্ষ। বৃক্ষ ফসল মৃত্তিকা ও জল বায়ুর বিশেষ অবস্থার উপর ততটা নির্ভর করেনা। কোন দেশে উপযুক্ত মাত্রায় বৃক্ষ রাজি না থাকিলে তদ্দেশের মানবের সর্ব্বাঙ্গিণ

পরিণতির ব্যাঘাত হয়, বারিপাতের লাঘবতা হয় এবং জমি উর্ব্বরা হইতে পারে না। উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের, অনেক স্থান ও পঞ্চনদের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল বৃক্ষের অভাবে কিরূপ বাসের অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। অন্যদিকে মিশরেও আলজিরিয়ায় প্রভূত সংখ্যায় বৃক্ষ রোপণ করিয়া পূর্ব্বের অনাবাদী ও মানবপরিত্যক্ত জমি আজকাল লোকালয়পূর্ণ ও শষ্য বহুল হইয়া উঠিতেছে।

এস্থলে আমাদের একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে লোকে কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উদ্যান তরুর চাষ করুক। জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিকার্য্য ও কৃষিজাত ফসল অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এস্থলে আমরা ইহাই বুঝাইতে চাই যে কৃষিকার্য্য মানবের আহার ও আচ্ছাদন উৎপাদনের একমাত্র উপায় নয়। ক্ষেত্রজ ফসল বাদে এমন অনেক ফসল মনুষ্য তাহার গৃহের আঙ্গিনায়, উদ্যানে অথবা পতিত জমিতে চাষ করিতে পারে যাহাতে তাহার জীবনধারণের যথেষ্ট সহায়তা হয়। ক্ষেত্রজ ফসলের তুলনায় এরূপ বৃক্ষ অথবা গুল্ম ফসলের সংখ্যা অনেক অধিক। এমন কতকগুলি গাছ আছে যাহা মানুষের কোন চেষ্টা ব্যতীত তাহাদের বাস স্থানের নিকট জন্মাইয়া তাহাদিগকে আহার্য্য অথবা অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য যোগাইতেছে—হিমালয়ের বাদাম (chestnut) উর্ন্নী, আখরোট, চিল্‌গোজা এবং নিম্নপ্রদেশের মহুয়া, হিজলীবাদাম, কাঠ বাদাম, তেঁতুল প্রভৃতি এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশ প্রভেদে যে সমুদয় গাছের ফল মুল ত্বক, ও পত্রাদি কাজে লাগে, তাহাদিগের নাম করিতে গেলেও অনেক স্থান লাগে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে উহার উপযুক্ত মত যথেষ্ট বৃক্ষ ফসল আছে।

ক্ষেত্রজ ও উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন মাত্রা তুলনা করা ঠিক হইবে না। কিন্তু যদি কয়েক বৎসরের গড়পড়তা ধরা যায় তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন সেই পরিমাণ জমিজাত ক্ষেত্রজ ফসল অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যাপক রসেল স্মিথ একটি আপেল গাছের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যাহা হইতে বৎসরে ৫০০ মনেরও অধিক আপেল পাওয়া যায়। ইতালীর যে পার্ব্বত্য বাদাম (chestnut) জঙ্গল আছে খাদ্যোৎপাদনের হিসাবে তাহা অত্যুর্ব্বর গোধূম ক্ষেত্রের সমতুল্য। এ সমুদয় অবশ্য চরম লাভের উদাহরণ। সাধারণতঃ নানাপ্রকার বৃক্ষ সমেত ১ বিঘা জমিতে রোপনের ৫।৬ বৎসর পরে গড়ে ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা আশা করিতে করিতে পারা যায়। উৎপাদনের হার কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িতে চলিবে। সুতরাং খালি জমি ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা তাহাতে নির্ব্বাচন করিয়া গাছ রোপণ করাই ভাল।

পশ্চিম বঙ্গে জলাভাবে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জমি পতিত থাকিয়া যাইতেছে। অধিক দিন এইরূপ অবস্থায় অনাবাদী থাকিলে জমিকে আবার চাষের উপযুক্ত করিতে

অনেক ব্যয় পড়িবে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুরের গড়বেতা মহকুমায় এরূপ জমির অভাব নাই। ভূস্বামীগণ এই সমুদয় জমিতে যদি যথেষ্ট ব্যবধানে আয়কর বৃক্ষরোপণ করেন তাহা হইলে বৃষ্টির জলে ভাল মৃত্তিকা ধুইয়া গিয়া জমির সমধিক ক্ষতি সাধন করিতে পারেনা এবং কতক পরিমাণে ছায়াযুক্ত থাকার জন্য জমিও অনেকটা সরস থাকে।

ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে যে কোন দেশ প্রথমে জঙ্গল দ্বারাই আবৃত ছিল। জঙ্গল কাটিয়া তৎপরে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু জঙ্গলের অবাধ বৃদ্ধি যেমন কৃষিকার্য্যের পক্ষে ক্ষতিকর জঙ্গলের অভাবও ঠিক সেইরূপ। এস্থলে জঙ্গল অর্থে বৃক্ষ সমষ্টির কথা বলা হইতেছে। ছোট ঝোপঝাপের জঙ্গল সব সময়েই ক্ষতিকর। বৃক্ষরোপণ লাভজনক ও স্থান বিশেষে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও উপযুক্ত জাতীয় বৃক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া রোপণ করা উচিত। কতকগুলি গাছ এরূপ কষ্টসহ যে একবার লাগিয়া গেলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। বাংলায় জন্মাইবার উপযুক্ত এইশ্রেণীর গাছের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির বিশেষরূপে নাম করিতে পারা যায়—বাবলা, খয়ের, মহুয়া, সিমুল, তাল, শিশু, কোদ, জাম, কুড়চি, নিম, মুর্গা কুসুম ফল, কুঁচিলা, তেঁতুল, অর্জ্জুন প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি উদ্ভিদাবরণে আবৃত করিতে হইলে এই শ্রেণীর গাছই বিশেষ উপযোগী। পক্ষান্তরে সরস স্থানের জন্য সাধারণতঃ বেল, সোঁদাল, টুন, খেজুর, আমলকী, দেবদারু, করঞ্জা, আমড়া, কুল প্রভৃতি রোপণ বাঞ্ছনীয়। মোটের মাথায় দৃষ্টিরাখা আবশ্যক যে বৃক্ষ এরূপ ভাবে রোপণ করিতে হইবে যেন তাহার নিচে ফসল উৎপাদন করা চলে। যদি বৃক্ষের আচ্ছাদনে জমিতে রৌদ্র প্রবেশ করিতে না পারে তাহা হইলে কার্য্য হইবে না। বরং জমি অর্দ্ধ ছায়াযুক্ত করাই বৃক্ষ রোপণের মূল উদ্দেশ্য। তাহাতে জমি কৃষিকার্য্যের পক্ষেও উপযুক্ত থাকিবে এবং অন্যপ্রকারে আয় বৃদ্ধি হইয়া কৃষকের যথেষ্ট সহায় হইবে।

বাবলার উপকারিতা।

বাবলা গাছ বহুজাতীয় হয়,—তন্মধ্যে কাল বাবলা, সোণা বাবলা, বড় বাবলা, ও সাঁই বাবলা, এই কয়প্রকার সচরাচর দেখা যায়। কাল বাবলাই কৃষিকার্য্যের উপযোগী। অন্যান্য বাবলা কোন না কোন ঔষধাদি ও জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

বাবলার কাষ্ঠ অত্যন্ত শক্ত ও টেকসই, এজন্য আজকাল ইহা অনেক কার্য্যে লাগিতেছে। গাছের দরও তাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইকাষ্ঠে গাড়ীর চাকা, ঢেঁকি, লাঙ্গলের বাঁট, রেল পাতিবার শ্লিপার কাষ্ঠ, নৌকার কোন কোন অংশ কামান বহনের গাড়ী, আকমাড়া কল, ঘানীগাছ. প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। কোদালী, কুড়াল, দা বা কাটারী, নিড়ানী, ফোড় প্রভৃতি যন্ত্রগুলিতে বাবলা কাষ্ঠের হাতল বা বাঁট পরাইলে বিশেষ মজবুত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই কাষ্ঠের আঁশগুলি অত্যন্ত ঘন সংবদ্ধ বলিয়া উহা সহজে ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় না। কৃষি কার্য্যের জন্য যে সকল কাষ্ঠযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সারবান বাবলা কাষ্ঠেই নির্ম্মিত হওয়া উচিত। লাঙ্গল, বিদে প্রভৃতি ভূমি-কর্ষনী যন্ত্র সাধারণতঃ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, তজ্জন্য ইহাদের ঈশ হইতে ফলাধার পর্য্যন্ত সমস্ত অংশই বাবলা কাষ্ঠের হইলেই ভাল হয়। ঢেঁকি যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ বাবলা কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইলে যন্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং সহজে উই প্রভৃতিতে নষ্ট করিতে পারে না। সারবান গুঁড়িতে উদূখল করিলে বিশেষ মজবুত হয়, দীর্ঘদীনেও ফাটে না বা নষ্ট হয় না।

বাবলার পরিষ্কৃত আঠা আরবিক গঁদের পরিবর্ত্তে অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃক্ষের গাত্রে এক বা দেড় অঙ্গুলি গভীর গর্ত্ত করিয়া দিলে ঐ আঠা বহির্গত হইয়া সূর্য্যোত্তাপে জমাট বাঁধে। কফ, বাত, মেহ, বহুমূত্র রোগে বাবলার আঠা বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশে নবপ্রসূত সন্তান ও প্রসূতিকে সেঁক দিবার ব্যবস্থা আছে; উহার জন্য বাবলা কাটের আগুণই প্রশস্ত। কারণ উহার উত্তাপে সহজে সূতিকাগৃহ উত্তপ্ত হয় না, অথচ সেক দিবার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। তেঁতুলাদি অন্যান্য জ্বালানী কাষ্ঠের আগুনে সেক দিলেও চলে, কিন্তু বাবলা কাষ্ঠের আগুনই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বলিয়া সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতির পক্ষে বিশেষ উপকারী। উহার পাতার রস বেদনা নিবারক, এবং কচি পাতার অগ্রভাগ সিদ্ধ করিয়া খাইলে অর্থাৎ ঐ কাথ খাইলে রক্ত আমাশয় রোগ ভাল হয়। বাবলার কষ দুর্গন্ধ হারক, এজন্য উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলিতে দন্তধাবন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কালী ও নানাপ্রকার রং প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা বিস্তর আবশ্যক। ইহার ছাল হইতে যে কস প্রস্তুত হয় তাহা জাল প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য জলে ভিজিবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে দেওয়া হয়। বাবলা ছালকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া /২৷৷০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১৷৷০ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে অর্দ্ধতোলা ফটকিরি গুঁড়া মিশ্রিত করিতে হয়। ইহাতে কোন কাপড় ২।৩ বার ভিজাইয়া ২।৩ বার শুকাইয়া লইলে ঘোর পাটকিলে রং হয়। একটু হিরাকস মিশাইয়া একরূপ মাঝারি গোছের পাকা রং প্রস্তুত হয়। বাবলার ছালে চামড়ার উত্তম রং হয় বলিয়া সাহেবেরা এই ছাল বিলাতে চালান দিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আরও উত্তম রকমের রং করিবার চেষ্টায় আছেন। বাবলার আঠার চুর্ণ ক্ষতস্থানে দিবামাত্র রক্তবন্ধ হইয়া যায়। উহার কাঁচা বা অর্দ্ধ পক্ক ফলগুলি গরু প্রভৃতি পশুকে খাওয়াইলে, উহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে।

এরূপ উপকারী বৃক্ষের চাষে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়, ইহার চাষ অতি সহজ, বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই এই গাছ জন্মিতে পারে। জমি একবার কোদলাইয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই ৮।১০ দিনের মধ্যে চারা বাহির হয়। বর্ষাকালে বীজ ছড়াইতে হয়, চারা গুলি একটু বড় হইলে গায়ে কাঁটা বাহির হয়, তখন আর কোন পশুতে নষ্ট করিতে পারে না; এক বৎসরেই ৫।৬ হাত লম্বা গাছ হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি ছাগলের মুখ নিঃসৃত বীজ হয় তবে আরও শীঘ্র বড় হয়। ছাগলেরা উহার ফল খাইয়া বীজ গুলি বাহির করিয়া ফেলে। ইহার অপর কোন পাইট নাই, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ফেকড়ি গুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই বৃক্ষের জন্য দোয়াঁশ মাটীই প্রশস্ত। কিন্তু বালি ও আঠাল মাটীতেও যথেষ্ট বাবলা গাছ জন্মে।

৫।৭ বৎসরের মধ্যে উহার কাষ্ঠ কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এক একটী গাছ হইতে আয়ও বড় কম হয় না, ৭।৮৲ টাকা হইতে ১০।১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হইতে পারে। প্রয়োজনীয় আসবাবাদি প্রস্তুত করিয়া অবশিষ্ট অংশ জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার হয়। বাবলার পাতা জমীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, সুতরাং কোন পতিত জমীতে বাবলার আবাদ উঠাইয়া লইয়া ধান্যাদি রোপণ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ইহা জলের নিকটেও জন্মে ও সতেজে বর্দ্ধিত হয়, উহার শিকড় মাটী আবদ্ধ করিয়া রাখে, ধুইয়া যাইতে দেয় না। এজন্য লোকে পুলের উপর, পুষ্করিণী, খাল বিলের পাড়েও বাবলার আবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু ফল পাকিয়া জলে পড়িলে বিবর্ণ হইয়া জল নষ্ট ও পানের অনুপযোগী করিয়া ফেলে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে কৃষিশিল্পাদি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন লৌহ নির্ম্মিত আখমাড়ার কলের প্রচলন হওয়ায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত কলের বিলোপ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ প্রদেশে বহুল পরিমাণ আখচাষ হইত। এ প্রদেশের আখ চাষে বহু পরিশ্রম ও জল সেচনের আবশ্যক হয়। এখনকার কৃষকেরা রুগ্ন, দুর্ব্বল, কৃশ, অলস ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল পুষ্করিণী ও জলাশয় হইতে জল সেচন করা হইত, এখন সে সকল মজিয়া যাওয়ায় কার্ত্তিক মাসের পর আর জল থাকে না, একারণ এখন এ প্রদেশে আখ চাষ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তখন কাঁষ্ঠ নির্ম্মিত কলে আখ মাড়িলে "কাঁ্যা কোঁ" করিয়া খুব শব্দ হইত। মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রতি গ্রামেই ৫।৭টী করিয়া কল চলিয়া গ্রামকে মুখরিত করিয়া তুলিত।

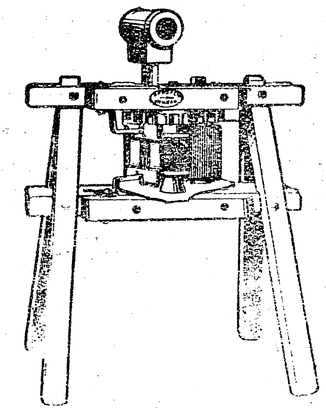

আধুনিক বলদ চালিত আখ মাড়ার কল।

পূর্ব্বের কাষ্ঠ নির্ম্মিত আখমাড়ার কল অপেক্ষা এখনকার লৌহনির্ম্মিত কলে অল্প পরিশ্রমে, অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্য হইয়া থাকে। এখনকার লৌহ নির্ম্মিত আখমাড়ার কল মনুষ্য দ্বারা চালিত না হইয়া বলদ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। বলদের গতির ন্যূনাধিক্য অনুসারে কার্য্যেরও কম বেশি হয়।

খাউই যন্ত্র দ্বারা বীজ পৃথক হইলে সেই তুলায় চরকা দ্বারা সূতা কাটা হইত। প্রথমতঃ সেই তুলাকে হস্ত দ্বারা পেঁজা হইত। সেই পেঁজা তুলাকে "আছড়া" দ্বারা

ধোনা হইত। এখন ধুনুনীরা যে যন্ত্র দ্বারা তুলা ধুনিয়া লেপ তৈয়ার করে, আছড়া সেরূপ ধুনুরীদের তুলা ধোনা যন্ত্রের ন্যায় নহে। আছড়া ধনুকের ন্যায়, ছিলা রজ্জুর পরিবর্ত্তে, তাঁতের দ্বারা দৃঢ় রূপে আবদ্ধ থাকিত। ঐ তাঁত চামার বা মুচিদের নিকট পাওয়া যাইত। গরুর অন্ত্র (নাড়ি) দ্বারা তন্তু বা তাঁত তৈয়ার হইত। ঐ তাঁত চরকাতেও ব্যবহৃত হইত। ধোনা তুলা লইয়া পাজ তৈয়ার করিয়া চরকার সাহায্যে লোকে সুতা কাটিত। একফুট পরিমিত সর কাটীর চারিদিকে ধোনা তুলা বেষ্টন করিয়া দুই হাতে অকটু চাপ দিয়া দলিলেই পাঁইজ তৈয়ার হইত।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রদেশের প্রত্যেক কৃষকেরই কাপাস চাষ ছিল। তাহারা আপনাদের আবশ্যক মত তুলা রাখিয়া অবশিষ্ট তুলা বিক্রয় করিত। সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই চরকা ছিল। সকল গৃহস্থের প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই একটী করিয়া চরকা থাকিত। স্ত্রীলোকেরা স্বীয় স্বীয় নিত্য গৃহস্থালী কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট সময় বৃথা না কাটাইয়া সুতা কাটিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকদের ন্যায় তখনকার স্ত্রীলোকদিগের কোন বিলাসিতা ছিল না। তাঁহারা মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকিতেন। গৃহস্থ সুতা তাঁতিকে দিয়া কাপড় বুনাইয়া লইতেন। পূর্ব্বে অষ্ট প্রহরে কাপড় প্রায় কাহাকেও কিনিতে হইত না। তাঁতিকে সামান্য বানি দিয়া কাপড় তৈয়ার করিয়া লইতেন।

চরকায় যে সুতা কাটা হইত, মোটা কাপড়ই তাহাতে প্রস্তুত হইত। কোন কোন স্ত্রীলোক বেশ সরু সুতাও কাটিতে পারিতেন। এখনকার ৪০নং সুতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা কেহই কাটিতে পারিতেন না। সচরাচর ১০নং হইতে ৩০ নং সুতা চরকায় কাটা হইত। ২।১ জন স্ত্রীলোক সূক্ষ্ম ৪০ নং সুতা পর্য্যন্ত কাটিতে পারিতেন।

বস্ত্র বয়নই তন্তুবায় জাতির জাতীয় উপজীবিকা। এ প্রদেশে তন্তুবায় জাতির সংখ্যা খুব কম। অনেক গ্রামেই তন্তুবায় জাতি নাই। আবশ্যকমত তন্তুবায় জাতি না থাকায় অন্যান্য জাতির দ্বারা বস্ত্রবয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইত। পূর্ব্বে এপ্রদেশে তন্তুবায় জাতি ব্যতীত মুসলমান, জোলা, বাগ্দী, চাঁড়াল, মুচি প্রভৃতি বহু জাতিতেই কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এমন কি ঐ সকল জাতির স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বস্ত্র বয়ন করিয়া আপন আপন অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিত। আমাদের ন্যায় নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ গ্রামে আমরা ২৫।৩০ খানি তাঁত চলিতে দেখিয়াছি। কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তন! এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে শুদ্ধ আমাদের গ্রামে কেন, এপ্রদেশের সকল গ্রামেই আর একখানি তাঁতও দেখিতে পাওয়া যায় না। চরকায় কাটা সুতায় না হউক কলের ১৫ নং কি ২০ নং সুতায় কাপড় বুনিতে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ২।১ খানি তাঁত চলিতে দেখা যাইত। এখন আর তাহা প্রায় দেখা যায় না। বিলাতী বস্ত্রের আমদানি হইতে আরম্ভ হইলে, এপ্রদশের হিন্দুগণ দেশী মোটা সুতার কাপড় ব্যবহার ক্রমে ক্রমে

পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। হিন্দুদিগের মধ্যে কি দরিদ্র কি মধ্যবিত্ত সকলেই বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেও মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে চরকায় সুতা কাটা ও মোটা দেশী বস্ত্র ব্যবহার অনেকদিন পর্য্যন্ত ত্যাগ করে নাই। এখন আর কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারই বাড়ীতে চরকা দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার দেখা যায় না। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিলেও খুব খাপি বস্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে, অথবা কলের ১৫ নং কি ২০ নং সুতায় দেশী তাঁতে বোনা কাপড় ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তজ্জন্য কোন কোন মুসলমান প্রধান গ্রামে এখনও ২।১ খানি তাঁতের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

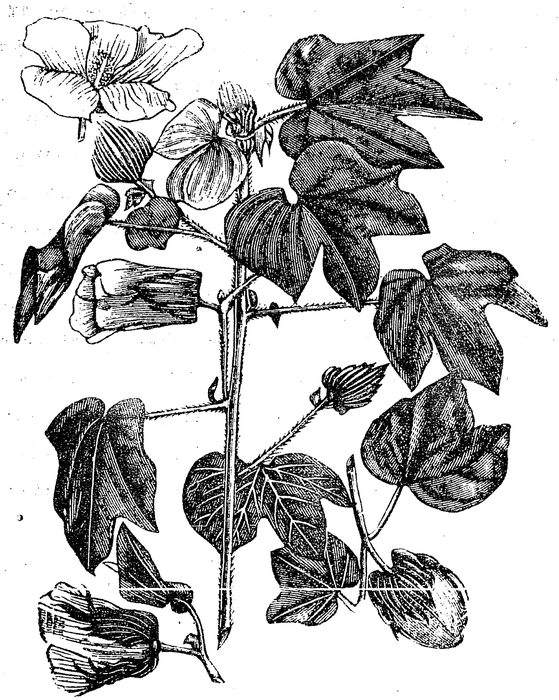

মার্কিণ নিম্নভূমির তুলার গাছ। ভারতীয় কৃষি সমিতির পরীক্ষা ক্ষেত্রে উৎপন্ন।

এখন দেশে কার্পাস চাষ, চরকার প্রচলন, দেশী তাঁতে বস্ত্রবয়ন, বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য এত যে আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু এ প্রদেশে ঐ সকল গুলির মধ্যে একটা

ও কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে না। বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার জন্য দেশের কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কার্পাস চাষের প্রচলন, চরকা ও তাঁতের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিলে দেশে বহু সংখ্যক নিরন্নের অন্ন সংস্থান হয়। দেশের টাকা দেশে থাকিয়া দেশ ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরুঢ় হয়। বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা এখন দেশী মিলের বস্ত্র অপেক্ষাকৃত শস্তা, দেশী মিলের বস্ত্র অপেক্ষা বিলাতী বস্ত্র চিক্কণ ও সূক্ষ্ম বলিয়া এপ্রদেশের অনেকেই অধিক মূল্য দিয়া ও বিলাতী বস্ত্র কিনিতেছে। সুখের বিষয় এই যে এখন অনেক ভদ্র লোকেই বিলাতী বস্ত্র না কিনিয়া দেশী মিলের মোটা কাপড় কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যখন কোন কোন ভদ্র লোক বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিয়া দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন ভবিষ্যতে সর্ব্ব সাধারণেই যে ভদ্রলোকের অনুকরণে দেশী মিলের বস্ত্র ব্যবহার করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। চরকার প্রচলন বা পূর্ব্বের ন্যায় কার্পাস চাষের আগ্রহ কাহার ও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

এখন যে রূপ চরকা কাটা সুতায় দেশী তাঁতে বোনা মোটা কাপড় (খদ্দর) প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে—১৫।১৬ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ঐরূপ মোটা কাপড় (খদ্দর) আমরা ব্যবহার করিয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রদেশের কি দরিদ্র কি মধ্যবিত্ত সকলেই ঐরূপ মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। এখন দীন দরিদ্র, এমন কি যাহার প্রতিদিন দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার জুটে না, সে ও দেশী মিলের মজবুত মোটা কাপড় না লইয়া অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম চিক্কন বিলাতী বস্ত্র লইয়া থাকে। আমরা দেশী মিলের মোটা কাপড় ব্যবহার করিলে ও দাস দাসীর জন্য বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতে হয়, তাহারা কিছুতেই দেশী মিলের মোটা কাপড় লইতে সম্মত হয় না। বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা দেশী মিলের বস্ত্র মজপুত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, অথচ সাধারণে দেশী মিলের মোটা বস্ত্রের পক্ষপাতী নহে। ইহা অপেক্ষা দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। জানিনা ভগবান কত দিনে দেশ বাসীর মনে সুবুদ্ধির সঞ্চার করিবেন।

(ক্রমশঃ)

জলহাওয়া ও ফসল।

বিহার ও উড়িষ্যায় রবিশস্য—এবারে বিহার ও উড়িষ্যায় রবিশস্যের ফলন মন্দ হয় নাই। এই শ্রেণীর ফসলের মধ্যে যব, ছোলা ও তামাকই প্রধান। আলু এবং অন্যান্য ফলমূলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। জল হাওয়া মোটের মাথায় অনুকূল ছিল বলিতে হইবে। বৃষ্টি পূর্ণ মাত্রায় না হইলেও অনেক স্থলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছিল। এজন্যই তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৭১,২১,২০০ একারের স্থলে গত বৎসর ৭৩,৬৯,৯০০ একারে রবি শস্য চাষ হইয়াছিল। মজঃফরপুর, সাঁওতাল পরগণা ও সম্বলপুরে স্বাভাবিক অপেক্ষাও অধিক ফসল হইয়াছে। কিন্তু গড়পড়তায় সমস্ত প্রদেশে স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৯৬ ভাগ ফসল জন্মিয়াছে। বোরো ধান হইতে ২৯৭৬০০ হন্দর চাল পাইবার আশা করা যায়। ছোলা তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক হইবে। অন্যান্য ফসলে বিশেষ বৃদ্ধি দেখা যায় না, বরং হ্রাসই দৃষ্টি গোচর হয়।

পঞ্জাবে তুলা ফসল—এবার পঞ্চনদে তুলার ফলণ খুব অধিক হইবে। বৃটিশ-শাসিত জেলা সমূহে ৯৫ লক্ষ একারের অধিক জমিতে চাষ হইয়াছে এবং ফলণও ৪০ লক্ষ টনের অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ফসলের অবস্থা এইরূপ ভাল বলিয়াই স্বভাবতঃ তুলার দরও অনেক পরিমাণে সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ না ফসল সংগ্রহ শেষ হয় ততক্ষণ নূতন ফসলের বাজারের উপর কিরূপ প্রভাব হয় বলা যায় না। কিন্তু বাজার দর যে রকমই হউক, পঞ্চনদে খুব ক্ষিপ্রগতিতে কার্পাস চাষ বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এ বৎসরের ফসল গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১০ গুণ অধিক হইবে। আর যদি বিগত ১০ বৎসরের গড়পড়তার সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে বৃদ্ধির মাত্রা শতকরা ৩৭ ভাগ হইবে। তুলা উৎপাদনের আধিক্য অবশ্য সুখের বিষয়, কিন্তু উৎপাদিত তুলা দেশ মধ্যে ব্যবহৃত হইলেই অধিকতর সুখের বিষয় হয়।

দেশের ও দশের কথা।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধক প্রস্তাবে ভাগচাষী, বর্গাদার, আধিয়াদার প্রভৃতি যদি নিজেরা চাষাবাদ করেন, তাহা হইলে জমির প্রজা বলিয়া গণ্য হইবেন, এই প্রকার যে একটী ধারা পাশ করিবার কথা হইয়াছিল, সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশে বেশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং উহার বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন ব্যবস্থাদি আবশ্যক বোধ করিলে, গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে করিবেন।

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন কমিটি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতামত গবর্ণমেণ্টের নিকট আসিতেছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট পরে যাহা হয় স্থির করিবেন। মোটের উপর আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে দেশের জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করা হইবে। এ বিষয়ে মতামত গ্রহণের শেষ দিন গবর্ণমেণ্ট ১লা জুলাই পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন।

উক্ত ভাগচাষী সম্বন্ধীয় ধারার উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে বলিয়াছেন,—It is therefore desirable to publish for general information the fact that the Government have decided not to accept this particular amendment of the Committee. অর্থাৎ সাধারণের অবগতির জন্য ইহা জানান বাঞ্ছনীয় যে গবর্ণমেণ্ট কমিটির এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে জমীদারগণের সত্বের উপর হস্তক্ষেপের প্রথম টাল কাটিয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যত যে একবারে নিরাপদ তাহাও বলা যায় না।

ভীতি-জনক ভবিষ্যদ্বাণী—ট্যাইমস্ অব ইণ্ডিয়া পত্রে প্রকাশ, তিব্বত অভিযানের মেজর ক্রস নাকি গোয়াতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন তিনি হিমালয় প্রদেশে ২৪০ বৎসর বয়স্ক এক ধর্ম্মযাজককে দেখিয়াছেন। ইনি নাকি থিওসোফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্ ব্লাভ্যাট্স্কীর গুরু ছিলেন। ইনি ইচ্ছামত অন্তর্হিত ও পুনরাবির্ভূত হইতে পারেন। ইনি বলেন ১৯২৭ সালে একটী ভীষণ যুদ্ধ ও সেই সঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ হইবে।

সম-সাময়িক জগত।

লাল পিপীলিকার দল:—আমাদের দেশে আম, ও করঞ্জা প্রভৃতি গাছে যে লাল পিঁপড়ে বাসা করে তাহা অনেকে দেখিয়াছেন। সেরূপ গাছে যাঁহারা কোন প্রকারে হস্ত ক্ষেপ করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে পিঁপড়ের দল কিরূপ ভাবে আক্রমণ করিতে আসে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও ভীষনতর পিপীলিকা-জাতি আছে। প্রধানতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই তাহাদের বাস। সম্প্রতি আফ্রিকায় টাঙ্গানিকা অঞ্চলে এইরূপ এক জাতীয় পিঁপড়ের সদল-বলে আক্রমণের বিবরণ লণ্ডনের কীটতত্ত্ব সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।' আমরা এ স্থলে তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

এই জাতীয় পিপীলীকা যাযাবর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লুটমারই তাহাদের ব্যবসায়। উহারা নিজে বাসা বাঁধে না, অপরের বাসা কাড়িয়া নেয়। রাণীর শরীর প্রায় ২ ইঞ্চি পরিনাণ দীর্ঘ; পুরুষ ১ ইঞ্চ এবং মজুর তদপেক্ষাও ছোট। মজুরেরা অন্ধ, ঘ্রাণ যন্ত্রের সাহায্যে শীকার করে। ইহাদের সমাজ আশ্চর্য্যরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত পত্রিকায় যে আক্রমণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা জনৈক শ্বেতাঙ্গের গৃহে ঘটিয়াছিল ও ৫।৬ দিন যাবত চলিয়াছিল। প্রথমে রীতিমতভাবে অগ্রণীয় দল আসিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশের রাস্তা ঘাটে প্রহরী বসিয়া গেল, তৎপরে ৫।৬টী পিঁপড়ে বিস্তৃত বহু সংখ্যক সৈন্য-বাহিনী গৃহের প্রস্তর ভিত্তি বাহিয়া দ্বারে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। গৃহের মধ্যে পালিত ও স্বভাবজ কতিপয় শ্রেণীর কীট ও সরিসৃপ ছিল। ইহারা কেহই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। কঠিন পক্ষ পতঙ্গ সমূহ পক্ষ অথবা পদ হারাইয়া ত্রাসে পলাইয়া গেল। ফড়িং, উচ্চিংড়ে, মাকড়সা প্রভৃতিরও সেই অবস্থা হইল। কেবল এক জাতীয় ১ ইঞ্চ দীর্ঘ লাল পিঁপড়ে ছিল, তাহারাই সামান্য পরিমানে বাধা দেওয়ায় আক্রমণকারীর দল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

আক্রমণের শেষাবস্থায় সাহেব বিষ, গরম ছাই প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া সৈন্যদলের গতি রোধ করার চেষ্টা করেন। তাহাতে কিছু হয় নাই। অবশেষে যখন তাঁহার শয়ন গৃহে বিছানা মশারি প্রভৃতি আক্রান্ত হইল এবং তাঁহার জীবন: সংঙ্কটাপন্ন হইল, তখন সাহেব পলায়নই শ্রেয় মনে করিলেন। গৃহে কতকগুলি কচ্ছপ, কুমীর ও গিরগিটী ছিল। তাহার মধ্যে যেগুলি পলাইতে পারিয়াছিল বাঁচিয়া গিয়াছিল, অবশিষ্টগুলির কঙ্কাল মাত্রই অবশিষ্ট ছিল। এইরূপ ভীষণ পিপীলিকায় আক্রমণ অবশ্য

অরণ্য মধ্যে অথবা অরণ্য সন্নিহিত স্থানেই হয়। অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। মানবকে অনেক স্থলে ইহাদের জন্য, অন্ততঃ কতিপয় দিনের জন্যও বাস-স্থান ছাড়িতে হয়। গরম ছাই আক্রমণ প্রতিরোধের সহজ ও উৎকৃষ্ট উপায় কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে উপর দিয়া যাইতে না পারিলে নিচে অপর জীবের সুড়ঙ্গ দিয়া ও এই জাতীয় পিপীলিকা গৃহে আসিয়া প্রবেশ করে।

বর্ষার জলে

আমরা অজীর্ণ রক্তামেশা ও মেলেরিয়ার বহু অর্থব্যয় করেও রক্ষা পাই না। একবার ১০০০৲।১৫০৲ টাকা খরচ করলে যদি সকলে রক্ষা পাই ত আলস্য করা কি উচিৎ?

শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল্, উকিল, বারুইপুর মুনসেফ কোর্ট বলেন "টিউব ওয়েলের জল পান ও স্নান করে আমি বারুইপুরের মত মেলেরিয়া দুষ্ট স্থানে এখনও বেশ আছি। যদি এ বৎসর ডাক্তার খরচ বাচাতে চান ত সপ্তাহেই বাটীতে একটী বসান"

উক্ত পম্পের বিশদ বিবরণ 'কৃষকের' শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন।

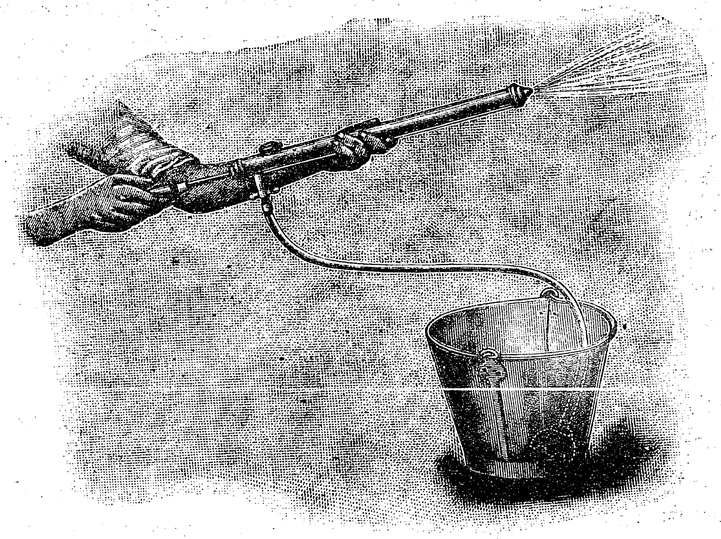

গাছে জল দিবার সিরিঞ্জ ভারতীয় কৃষি সমিতিতে পাইবেন।

কৃষি-প্রবাদ।

(প্রাপ্ত)

আমাদের দেশের কৃষিই সম্বল—লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ধারণের উপায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে সকলের সমবেত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও উৎসাহ যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য। এখনও আমাদের দেশে যে সকল অনাবাদী অর্থাৎ পতীত জমি আছে তাহা আবাদীতে পরিণত করিতে পারিলে আমাদের দেশীয় যুবক-বৃন্দের একটা অবলম্বন হইবে এবং তৎসঙ্গে দেশের উন্নতি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশে কৃষকগণ সহজে কৃষির কোন নূতন প্রথা অবলম্বন করিতে চাহে না। অধিকাংশ লোক দেবতার দোহাই দিয়া বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে। আজকাল নূতন ধরণের যে সকল কৃষি-যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে, কৃষি কার্য্যের উন্নতি-কল্পে সে সকল ব্যবহৃত হইলে এবং অন্যান্য সুপ্রণালী অবলম্বন করিলে উৎপন্ন ফসলের প্রাচুর্য্য অবশ্যই হইবে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বরণ কোম্পানী, ম্যাকবেথ্ ব্রাদার্স প্রভৃতির আফিসে অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল কৃষি-যন্ত্রাদি পাওয়া যাইতে পারে।

পুরাকালে ভারতবর্ষে অনেক স্থানে শাস্ত্রানুসারে কৃষি-কার্য্য পরিচালিত হইত। এরূপ সংস্কার ছিল যে তাহার ব্যতিক্রম করিলে ফসলের বিশেষ অনিষ্ট হয়, এমন কি গৃহস্থের অমঙ্গলের সম্ভাবনা। ফসলের প্রাচুর্য্য ও অল্পতা এবং মঙ্গলামঙ্গল অনেক সময় লক্ষণালক্ষণের উপর নির্ভর করে। হলারম্ভ কালে যদি একটি গো নাদে অর্থাৎ গোবর ত্যাগ করে এবং নাসা লেহন করে তাহা হইলে শস্য চতুর্গুণ হয়। হলারম্ভ মাত্রে একটী গো শব্দ করিলে এবং অন্যকে লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য হয়। হলারম্ভ মাত্র গোবর ও মূত্রত্যাগে বন্যা হয়। লাঙ্গল দিবার সময় যদি জমির আইল ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে গৃহিনীর মৃত্যু বা অগ্নিভয় হয়। ফাল উৎপাটিত হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশ ত্যাগ হয়। লাঙ্গলভঙ্গে: প্রভুবিনাশ, ঈশভঙ্গে কৃষকের জীবন সংশয়, যোয়াল ভঙ্গে বৃষনাশ, যোত ছিঁড়িলে রোগভয়, শস্যহানি, কর্ত্তা বিনষ্ট এবং রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হয়। হলপ্রবাহ কালে একটী গো পতিত হইলে কর্ত্তার অরাতিসার রোগে মৃত্যু হয়। বৃষ দৌড়িয়া পলায়ন করিলে কৃষি নষ্ট এবং শারীরিক পীড়া হয়।

শীতকালে হলারম্ভে সুবর্ণ লাভ হয় অর্থাৎ মাঘ মাসে হল আরম্ভ করিলে জমি (কর্ষিত মৃত্তিকা) সুবর্ণ সম হয়। বসন্তে রৌপ্য ও তাম্র লাভ হয় অর্থাৎ ফাল্গুনে রজত সন্নিভ ও চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাত হয়। গ্রীষ্মকালে ধান্য অর্থাৎ বৈশাখে ধান্যতুল্য ও

জ্যৈষ্ঠে মৃত্তিকাসম এবং বর্ষাকালে দরিদ্রতা লাভ হয় অর্থাৎ আষাঢ়ে কর্দ্দমসম এবং শ্রাবণে নিষ্ফলা হয়। এখনও পাঁজি দেখিয়া শুভদিন নির্ণয় করিয়া হলপ্রবাহ, বীজ বপন, ধান্যচ্ছেদন ও ধান্যস্থাপন করা হয়। আমাদের প্রত্যেক সাংসারীক ও বৈষয়ীক কার্য্য ধর্ম্ম অর্থাৎ পূণ্য সংশ্লিষ্ট। আমাদের দেশের লোক স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু এবং সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক কার্য্যের মূলে ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ডাকাতেরা ডাকাতি করিবার পূর্ব্বে কালী পূজা করিয়া যাত্রা করে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকে ইংরাজী শিক্ষার ফলে এ সকল মানিতে চাহেন না। আমরা তাঁহাদিগকে অন্য কিছু বলিতে চাহিনা কেবল তাঁহারা যেন এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং শুভাশুভ পরীক্ষা করেন এইমাত্র প্রার্থনা।

জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন :—গত কার্ত্তিক মাসে আমি আলুর আবাদ করিয়াছিলাম। কয়েকটী গাছে পচা রেড়ির খোল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে সে গাছগুলি বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং মরিতেছে এবং সেই খোল হইতে নানা প্রকার পোকা হইতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

[খৈল সম্পূর্ণরূপে পচিয়া গেলে তদ্বারা গাছের অপকার হয় না। তবে যদি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে খৈল ভালরূপ না পচিয়া থাকে তাহা হইলে পরে গাছের গোড়ায় পচিতে থাকে; তাহাতে গাছের অনিষ্ঠ হয়। খৈলের সহিত সামান্য পরিমাণে তুতে (সের প্রতি ৫ গ্রেণ) মিশ্রিত করিলে উহা পচিবার সময় পোকা উৎপাদন করিবার সহায়তা করিতে পারে না। যে খৈল পচিয়া প্রায় মৃত্তিকার ন্যায় হইয়া গিয়াছে তাহা প্রয়োগে অনিষ্ঠ হয় না। তামাকের জল, ঝুল, তুঁতের জল, লণ্ডন পার্পল এবং আমাদের পোকা নাশক ঔষধ দ্বারা ক্ষেত্রে পোকা নাশ হইতে পারে। কৃঃ সঃ]

সার সংগ্রহ।

কাপড়ে নীলের কলপ :—কাপড়ে নীলের কলপ দিলে বেশ পরিষ্কার হয় ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ সাহেবদের কাপড়ে ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক অতিবুদ্ধিমান রজক আছে যাহাদের নীল দিবার গুণে কাপড় শুভ্র না দেখাইয়া নীলবর্ণ দেখায়। দুই আউন্স গুঁড়া নীল হামানদিস্তায় রাখিয়া অল্পে অল্পে গঁদের জলের সহিত ঘুঁটিয়া মিলাইতে হয়। ক্রমে নীল ও গঁদের জল নীলবর্ণ তরল পদার্থে পরিণত হইলে উহা বোতল কিম্বা অন্য কোন কাচ পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। ব্যবহার করিবার সময় পাত্রটী নাড়িয়া লইতে হইবে। কি মাত্রায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। যাহার মাত্রা বোধ আছে সেই ভাল ধোপা।

ঘেঁটু ফুল :—ইহার আর একটী নাম ভাঁট ফুল (Clerodendron infortunatium)। বাঙ্গালা দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ভাঁট গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিন উষাকালে ঘণ্টাকর্ণ পূজা অর্থাৎ ঘেঁটু পূজা উপলক্ষে এই ফুল প্রায় প্রতি ঘরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে ভাঁট দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বভাবজাত বা বুনো ভাঁট। ইহার পাতা মোটা এবং ফুল একানে হয়। ফুলে তাদৃশ ভাল গন্ধ নাই। আর এক প্রকার ভাট গাছ হয় তাহার নাম পদ্ম ভাট। ইহার ফুল অধিক পরিমাণে জন্মে এবং ফুলে বেশ সুগন্ধ এই ফুল সখের জিনিষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাতাগুলি পাতলা ও দেখিতে সুন্দর। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে Buddleia Asiatica বলে। ইহার পাতার রস বিরেচক ও ক্রিমি নাশক।

গোলাপের ডালে পোকা—নষ্ট করিতে হইলে এক ভাগ ঝুল ও তিন ভাগ চুণ মিশাইয়া ৫ তোলা একটী মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে ৫সের জল মিশাইয়া লইতে হইবে। কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবার পর জল থিতাইয়া গেলে সেই জল পিচ্‌কারি দ্বারা গাছের গায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে। বাগানটী ভালরূপ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা উচিত। গাছের তলার আবর্জ্জনা সমুদয় একস্থানে জমা করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

আনারস—প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। গাছের নিম্নে ছায়াযুক্ত স্থানেও আনারস জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ স্থান হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা প্রায়ই মিষ্টতাবিহীন হইয়া পড়ে। সমতল ভূমিতেও ফসলের অবস্থা ঐরূপ হয়। সুতরাং টিলা জমি

আনারসের আবাদের জন্য নির্ব্বাচিত করা কর্ত্তব্য। বালি মাটি কিম্বা দোয়াস মাটিই ইহার চাষের পক্ষে প্রশস্ত।

আনারস অত্যন্ত অনুভবশীল উদ্ভিদ। অম্লের আধিক্য বিশিষ্ট ভূমিখণ্ডে ইহার ফলন সুবিধাজনক হয়না। সুতরাং ঐরূপ জমিতে চুণ মিশাইয়া অম্ল দোষ নষ্ট করিয়া লইলে সুফল লাভ করা যাইতে পারে।

চুণ আনারসের জমির শ্রেষ্ঠ সার। প্রত্যেক একর জমিতে ১০ দশ মন করিয়া চুণ ব্যবহার করিলে খুব ফল পাওয়া যায়, আনারসের চারা রোপণের চতুর্থ বৎসর হইতে গোবরের সার দিলেও ফসলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দোয়াস কিম্বা বালি মাটিতে আনারসের উত্তম ফলন হয়। আনারসের মাথার চারা হইতে গোড়ার চারাই ভাল হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ চারা জমিতে চারি হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৪ হাত অন্তর অন্তর এক একটী চারা পুতিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রকারে ইহার আবাদ করিলে রোপণের চতুর্থ বৎসর হইতে ৮ম ৯ম বৎসর পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে ফল লাভ করা যায়। শ্রীহট্ট জেলার নানাস্থানে তিন হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে এক হাত কিম্বা দেড় হাত অন্তর চারা লাগাইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রকার আবাদ করিলে গাছ অত্যন্ত ঘন হইয়া পড়ায়, মাত্র ২।৩ বৎসর ভাল ফসল পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম মতই ইহার চারা লাগান কর্ত্তব্য। আনারসের জমি অন্ততঃ পক্ষে বৎসরে দুইবার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। [পল্লিশ্রী]

নীল :—নীলের গাছ জলে পচাইলে নীল পিতাভ পদার্থে পরিণত হয়। নীল জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, কিন্তু পিতাভ পদার্থ জলে দ্রব হয়। এই জলটাকে আলোড়ন করিলে পীতাভ পদার্থের সহিত অক্সিজেম যুক্ত হয় এবং তাহাকে পুনরায় নীলে পরিণত করে।

তুলা, রেশম ও পশম নীল বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইলে নীল শুধু জলে দিয়া লাগাইলে স্থায়ী বর্ণ হয় না, ধুইলে উঠিয়া যায় এবং বস্ত্র ব্যবহার সময়ে গায়ে ও অন্য কাপড়ে লাগিয়া যায়। স্থায়ী রং করিতে নীলকে পুনরায় জলে দ্রব করিয়া লইতে হইবে। নীলের আদিম প্রস্তুত প্রণালী হইতে একটি উপায় স্বতঃ আসিবার কথা এবং তাহাই হইয়াছে। নীলকে পুণরায় পচাও ("ফার্ম্মেণ্ট" কর)। ভূষি ও গুড় ইত্যাদি পচাইয়া তাহার সঙ্গে নীল দেও, নীল পচিবে ও রূপান্তরিত হইবে। পচাই জলের সঙ্গে চুণ মিশিলে এই চুণের জল ঐ রূপান্তরিত পদার্থকে দ্রব করিবে। তখন চুণের জলে ঈষদ্ পীতাভ বর্ণ দেখা যাইবে। এই জল কাপড় ডুবাইলে বায়ু হইতে অক্সিজেন নিয়া পীতাভ পদার্থ উজ্জ্বল নীলে পরিণত হইবে। এই প্রণালী ইউরোপে ও ভারতে প্রচলিত আছে।

ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে নীলে সদ্যোজাত হাইড্রোজেন লাগিলে তাহা বর্ণহীন পদার্থে পরিণত হয় এবং বায়ুর অক্সিজেন যোগে পুনরায় নীলে পরিণত হয়। এই বর্ণহীন পদার্থ চুণ, অথবা অন্য এলকেলির জলে দ্রব হয়। এই সদ্যোজাত হাইড্রোজেন পাইবার কয়েকটি উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

চুণ, হীরাকষ (আয়রণ সল্‌ফেট) নীল একসঙ্গে জলে দিলে চুণ সংযোগে হীরাকষ জল হইতে অক্সিজেন নেয় এবং জলের হাইড্রোজেন মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সদ্যোজাত অবস্থায় হাইড্রোজেন নীলকে আক্রমণ করে এবং নীল রূপান্তরিত হইয়া চুণের জলে দ্রব হয়।

চুণ, হাইপোসালফাইড্ অব সোডা [ইহা ফটোগ্রাফেতে ব্যবহৃত হয়] ও নীল জলে দিয়া আলোড়ন করিলেও সদ্যোজাত হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। কেহ কেহ হীরাকষ, হাইপোসালফাইড্ অব সোডার পরিবর্ত্তে দস্তাচূর্ণ ও লৌহ ব্যবহার করেন; কেহ মনঃসিলা (সালফাইড্ অব আর্সেনিক) ব্যবহার করেন।

নীল হইতে আস্মানি ও আস্মানি হইতে পীতবর্ণ সংযোগে সবুজবর্ণ পাওয়া যায়। রঞ্জন ক্রিয়ায় নীলের প্রাধান্য বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। অনিলাইন রঙ্গগুলিও জন্মদাতা নীলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। [পল্লিশ্রী]

জাতীয় শিক্ষার কথা।

[শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু]

যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহাকেই আমরা জাতীয় শিক্ষা বলি। জাতীয় শিক্ষার প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—

প্রথমতঃ—জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আদর্শ, জাতীয় ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—আমাদের দেশে যেরূপ দারিদ্র্য—সেই দারিদ্র্য যাহাতে দূর করা যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—আমাদের দেশের ছাত্রদের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, সেই শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষার প্রণালী আমাদের উদ্ভাবন করিতে হইবে। * * *

যাহাতে ছাত্রগণ অতি অল্প মূলধন লইয়া আপন আপন গৃহে বা গ্রামে আপনার কর্ত্তৃত্বে গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে আমাদের শিক্ষালয়ে সেইরূপ practical trainingএর প্রবর্ত্তন হওয়া উচিৎ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—পথ কোথায়? উপায় কি?—পথ আমাদিগকেই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, পাথেয় আমাদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমার বলিবার কথা এই যে—এই গৃহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে স্থানীয় অবস্থার উপর। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিল্পের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা নির্ভর

করিবে প্রত্যেক স্থানের আবহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের উপর। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক কৃষি বিভাগ—যে স্থানে আখের চাষ প্রভূত পরিমাণে হয়—সেখানে চিনি প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী শিখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের একটা অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে; মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যেখানে রেশমের চাষ হয় সেখানে ২।৪ টা করিয়া রেশমের কারখানা করা, নানা রকমের কাপড় প্রস্তুত এবং রং করা ইত্যাদি ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ভিজাগাপটম্ অঞ্চলে Nux-vomica গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সব গাছ সস্ত সস্ত বিদেশে রপ্তানী হয়, সেখানে তাহার নির্য্যাস হইয়া ঔষধাকারে আমাদের দেশে আসে—আমরা দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে তাহা ক্রয় করি। যদি এই সব স্থানে ছোট ছোট Laboratory বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার খোলা যায় এবং Nuxvomicaর নির্য্যাস প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি শিখানো যায় তাহা হইলে সহজেই ছাত্রদের অন্ন সংস্থানের একটা উপায় হইতে পারে। আপনারা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় মৃত গো মহিষ ফেলিবার একটা বাচড়া (পতিত জমি) বা ভাগাড় আছে। সেখানে রাশিকৃত হাড় শিং পড়িয়া থাকে—বিদেশী বণিকের অর্থে পুষ্ট ব্যাপারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিদেশে চালান দেয়। কিন্তু এই শিং হইতেই চিরুণী, বোতাম এবং পরিত্যক্ত অংশে সিরিস প্রস্তুত হইতে পারে। এসব স্থানীয় ব্যাপার—স্থানীয় লোকেরা এই সব শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের কুসংস্কার ইহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী—সমাজপতি হয়ত রোষকষায়িত লোচনে দরিদ্র গরুর হাড় বা শিং সংগ্রহকারীকে কঠোর শাস্তি দিবেন; এই সব অন্ধ কর্ব্বরতাকে আমল দিলে চলিবে না।

তার পর যেসব স্থানে নারিকেল অধিক পরিমাণে জন্মায় যেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহশিল্প শিক্ষা দেওয়া যায়। Central Jailএ দেখিয়াছি জনৈক আন্দামানী রাজনীতিক বন্দী নারিকেলের ছোবড়া হইতে সুন্দর চেন, মালা প্রভৃতি কারুকার্য্য করিতে পারিতেন। নারিকেলের মালা হইতে বোতাম তৈয়ারী, সাঁশ হইতে তৈল উৎপাদন করিবার প্রণালী অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারা যায়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পাগার থাকিলে, ছাত্রেরা সাহিত্য, চারুকলা, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা ও গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে। এইরূপ পিন্, নিভ্, ক্লিপ, কলম, পেন্সিল, কালি প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট সামগ্রী প্রস্তুত করিবার প্রণালী যদি আমরা ছাত্রদের শিখাইতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে ছাত্রদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা আমরা সহজেই করিতে পারিব। ছোট ছোট শিল্পাগার ও কারখানায় স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া অবশিষ্ট সময়ে মনোবৃত্তির উৎকর্ষের জন্য ধর্ম্ম, সাহিত্য, চারুকলা, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা ও গবেষণায় মানুষ আপনাকে নিয়োজিত করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে।

* * *

কোন্ প্রণালী আমাদের দেশের উপযোগী হইবে ইহা নির্ণয় করিবার জন্য বোলপুর ও গুরুকুল বিদ্যালয়ের মত বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্ব-স্ব-প্রধান ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করুন, এক দিন বাঙ্গালায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তিত যে কোনও প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া গৃহীত হইবে।

[উপাসনা]

বাগানের মাসিক কার্য্য

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগান—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, ঝিঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া পুঁই, বরবটি, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—জল্‌দি বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা নাবি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখন সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা,) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অথাৎ ডাল কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গাম্‌লা বদ্‌লাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা, প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বসাইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথার কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুড়ি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং

জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধামের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণের উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা! ফলের গাছে হাঁড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, পিশু, সেগুণ, মেহগ্নি, খদির, য়াধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় আবশ্যক।

বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন আবশ্যক।

সব্জী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়ইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যেখানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতে হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোবাঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—যাহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোন্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

২৪শ খণ্ড { কৃষক—আষাঢ়, ১৩৩০ সাল। } ৩য় সংখ্যা

গোলাপ ও গোলাপজাত দ্রব্যাদি।

গোলাপের স্নিগ্ধ সুরভি, সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা যুগে যুগে কত লোকের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে এবং কত কবিই ইহার গুণগান করিয়াছেন। কিন্তু আজ কালকার জীবন সমস্যার, ঘোর বাস্তব দিনে কেহই শুধু সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে ইচ্ছুক নন্। সেই জন্য লোকের নিকট গোলাপের উপকারিতা কি তাহাই অনুসন্ধিৎসার বিষয়। আয়কর উদ্ভিদের হিসাবে গোলাপ নগণ্য নয়। অবশ্য কোন খাদ্য শস্যের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু কাটা ফুল, কুঁড়িও পাপড়ি, আতর ও গোলাপ জল বিক্রয় করিয়া অনেকে বেশ দুপয়সা লাভ করেন এবং ইহার চাষেও অনেক লোক নিযুক্ত আছে।

মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই এতদ্দেশে গোলাপের প্রাদুর্ভাব। কথিত আছে যে সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানই প্রথম গোলাপের আতর আবিষ্কার করেন। সে যাহা হউক, আপাততঃ ভারতের নানাস্থানে বহু প্রকারের বন্য ও কর্ষিত গোলাপ দেখিতে পাওয়া

যায়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাগান সমূহে অথবা মধুপুর, মিহিজাম প্রভৃতি স্থানে যে গোলাপ উৎপাদিত হয় তাহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে প্রবর্ত্তিত। এই সব গোলাপ লইয়াই শীতকালে ফুলের ব্যবসায় চলে। এস্থলে আমাদের এরূপ গোলাপের আলোচনা করার উদ্দেশ্য নাই। যে সমুদয় জাতীয় গোলাপ প্রভূত পরিমানে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় অথবা ক্ষেত্রজ ফসল হিসাবে যাহার চাষ হয়, আমরা সে গুলিরই এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিব।

গোলাপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান, উহার বায়ী (Essential) তৈল। সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'আতর' বলে। এতদ্দেশে কেবল এক জাতীয় গোলাপই এই কাজে নিযুক্ত হয়—Rosa Damascena অথবা বসোরা গোলাপ। ভারতের বাহিরে তুর্কি, বুলগেরিয়া, মিসর ও পারস্যেও ইহার যথেষ্ট চাষ আছে। এতদ্দেশে গাজীপুরই গোলাপ চাষের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু এতদ্ভিন্ন, আলিগড় ও পঞ্চনদের অমৃতসহর ও লাহোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং হোসিয়ারপুর জেলায় অল্প বিস্তর গোলাপ উৎপাদিত হয়। গাজীপুর ক্ষেত্র কাশী হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত। ক্ষেত্র গুলি গাজীপুর সহরকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। শীতকালে এই সমুদয় ক্ষেত্রের শ্রেণীবদ্ধ গোলাপ গুল্ম গুলি যখন রক্তাভ পুষ্প ভারে অবনত হইয়া পড়ে, তখন দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম হয়। প্রত্যুষ হইতে সামান্য বেলা পর্য্যন্ত পুষ্প চয়নের কার্য্য চলে। ফুলের ওজনের দ্বিগুণ পরিমিত জল দিয়া চোলাই করা হয়। বার বার চোলাইতে জল খারাপ হইয়া যায়। ১ তোলা অথবা একটাকা ওজনের আতরের জন্য প্রায় কুড়ি হাজার ফুল আবশ্যক হয়। উৎকৃষ্ট আতরের তোলা ১৫০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। গাজীপুরে যথেষ্ট পরিমাণে গোলাপ উৎপাদিত হইলেও উক্ত স্থানে আতর চোলাইর কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। চোলাই কারকগণ শীতের শেষে আপন আপন যন্ত্রাদি লইয়া নানা স্থান হইতে আসে এবং প্রতিলক্ষ পুষ্প ৪০৲—৭০৲ দরে ক্রয় করিয়া আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত করে। ১ লক্ষ ফুলের ওজন গড় পড়তায় ১০০ পাউণ্ড এবং উহা হইতে ৪ আঃ আতর ও ১০০ বোতল গোলাপ জল পাওয়া যায়।

দুঃখের বিষয় ভারতে গোলাপ বংশের উন্নতি সাধণের অতি সামান্য চেষ্টা হইয়াছে। বায়ী তৈলের মাত্রার হিসাবে গাজীপুরের গোলাপ অপেক্ষা আলিগড়ের গোলাপ কিছু ভাল হইলেও, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় গোলাপ বুলগেরিয়ার গোলাপ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বুলগেরিয়ায় প্রায় ২০০০০ একারে বৎসরে গোলাপ চাষ হয় এবং তাহা হইতে ৮০০০০ লক্ষ গোলাপ পাওয়া যায় অর্থাৎ একর প্রতি প্রায় ২৫০০ পাঃ পাঁপড়ি উৎপাদিত হয়। এক বুলগেরিয়ায় বাৎসরিক আতর উৎপাদনের পরিমাণ ১৭০,০০০—২২৫০০০ আউন্স। ইহাতেই উক্ত দেশে গোলাপ চাষের পরিসর সম্যক্ রূপে উপলব্ধি হইবে।

খাঁটি আতর দানাদার অর্দ্ধদ্রব পীতাভ পদার্থ। তুর্কী শাশনের আমলে বুলগেরিয়ার গোলাপ ফুল চোলাইর সময় উহাতে কয়েক ফোঁটা জিরানিয়ম তৈল ছড়াইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে আতর কিছু বেশী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খাঁটি হয় না। গাজীপুরেও চন্দন তৈল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; তাহাতে ঐরূপ ফল হয়। বুলগেরিয়া ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এই অনিষ্টকর অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশে ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত। আতরে ভেজাল দেওয়ার অন্যান্য জিনিষ—কতিপয় স্থায়ী তৈল (Fixed oil), কাঠ গোলাপ ও গোয়েকম কাষ্ঠের তৈল এবং রোজাঘাসের বায়ী তৈল। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে এতদ্দেশে প্রস্তুত আতর দেশ মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায়; তদ্ভিন্ন পারস্য হইতে ৩০০০০ গ্যালনের অধিক গোলাপ জল আমদানি করা হয়। বুলগেরিয়ার আতরের প্রধান কাটতির স্থল ফরাশী দেশের সুপ্রসিদ্ধ গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কেন্দ্র, গ্রাসে। অবশিষ্ট আতর প্রায়ই নিউইয়র্কের বাজারে চলিয়া যায়। এতদ্দেশেও যে বুলগেরিয়ার আতর না আসে তাহা নয়। বস্তুতঃ জন সাধারণের মধ্যে গন্ধ দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আতর এদেশে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়িয়া যাইতেছে। যে গোলাপ জল পূর্ব্বে গড়ে ৶১০ পাঃ দরে বিক্রয় হইত তাহা এখন ।/১০ দরে পাইকারেরা ক্রয় করিতেছে। আতরের আউন্সও ৫০৲ টাকায় নিচে নাই। গোলাপ পাপড়ি ও কুঁড়িরও কিছু পরিমাণে বিক্রয় আছে। প্রথমটি Rosa centifolia এবং দ্বিতীয়টি R.gallica হইতে প্রাপ্ত। গোলাপ পাঁপড়ি 'গুলকন্দ' নামক মিষ্টান্নের প্রধান উপাদান। কোষ্ঠ পরিস্কারের জন্য পশ্চিমে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

ভারতের অনেক স্থানেই গোলাপ চাষের উপযুক্ত জমি ও জলহাওয়া আছে। তবুও ইহার চাষের যে কেন এখনও সমধিক প্রসার হইতেছে না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। গন্ধ দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আতর উৎপাদনের জন্য গোলাপ চাষ করিয়া অনেকেই লাভবান হইতে পারেন।

ভারতের বণ্য গোলাপ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করা যায় না। হিমালয় অঞ্চলে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোলাপফুল ফুটিয়া বনে জঙ্গলে নষ্ট হইয়া যায়। কুমায়ূণ হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত কয়েকটি বিশেষ জাতীয় গোলাপ স্থানে স্থানে পর্ব্বত গাত্র একবারে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে দেরাদূণের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের R. Multiflora; বাঘাট, পাতিয়ালা, সিরমুর রাজ্যের ও সিমলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের R. Macrophylla এবং R. Sericea; উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের লতানে গোলাপ, R. Moschata এবং কাশ্মীরের R. webbiana বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। অধিত্যকার ও উপত্যকার এই বিপুল গোলাপ রাশি কার্য্যতঃ সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

পাহাড়ীরা সামান্য পরিমাণে গোলাপ শুষ্ক করিয়া, 'ফুল কুজো' নামে বিক্রয় করে এবং অমৃত সহর প্রভৃতি ব্যবসায়ের স্থান হইতে কখন কখন লোক আসিয়া বন্য ফুল সংগ্রহ করে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায় এইরূপে সংগৃহীত ফুলের মাত্রা অতি সামান্য।

ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে বসন্তের সময় গিরিপার্শ্ব ও কানন নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া উঠিলে এক এক দল লোক সঙ্গে সহজে স্থানান্তর-করণ-যোগ্য চোলাই যন্ত্রাদি লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং যেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুল পায় সেই খানেই আবশ্যক মত সময় অবস্থিতি করিয়া গন্ধ তৈল চোলাই করিয়া লয়। সময়ে সময়ে বড় বড় তৈল ব্যবসায়ীরাও এইরূপ Collecting Party পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে দেশের বন্য পুষ্প গুলিও অনেক পরিমাণে সদ্ব্যবহার হয়। এতদ্দেশেও উক্তরূপ প্রথায় বন্য গোলাপকে কার্য্যে লাগানর ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কালকা-সিমলার রাস্তার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যদি ফুল সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে কোন কোন কেন্দ্রে প্রত্যহ ১ লক্ষ গোলাপ পাওয়া কঠিন নয়। কাশ্মীর অধিত্যকায় তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ফুল পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবসায়ের স্থান হইতে কাঁচা মালের উৎপত্তির স্থান দুরবর্ত্তী হইলে অনেক মাল ব্যবহারে আসিতে পারে না। কিন্তু ফুল সম্বন্ধে ঠিক তাহা বলা যায় না। কারণ ফুলের স্বাভাবিক জন্ম স্থানে উহার গন্ধসার প্রস্তুত করিয়া লওয়া অসম্ভব নয়, এবং সেই প্রকারেই জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশে ফুলের সদ্ব্যবহার হইতেছে।

চন্দন গাছ প্রধানতঃ ভারতে জন্মিলেও ইহার তৈল এতদ্দেশে পূর্ব্বে অধিক মাত্রায় প্রস্তুত হইত না। বিলাতী ব্যবসায়ীগণ কাঠ কিনিয়া লইয়া গিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া ভারতে পাঠাইতেন। তাহাতে লাভাংশের অধিকাংশই তাঁহাদের হাতে যাইত। বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় মহীশূর গবর্ণমেণ্ট চন্দন তৈল প্রস্তুতের আধুনিক কল কারখানা স্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট চন্দন তৈল প্রস্তুত করিতেছেন। এখন প্রধাণতঃ সেই তৈলই জগতের অভাব মোচন করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটি নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেইরূপ উদ্যোগ, উদ্যম, ও ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক চেষ্টা নিয়োগ করিলে গোলাপজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এইরূপ আধুনিক গোলাপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলে দুইটি প্রধান সমস্যা আছে—১মঃ নির্ব্বাচন ও উন্নত জাতি প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ষিত গোলাপের বারী তৈলের মাত্রা বৃদ্ধি করণ; ও ২য় বন্য গোলাপ সমূহ সদ্ব্যবহার করার উপযুক্ত প্রণালী ও যন্ত্রাদি নির্দ্ধারণ করন। দুইটি সমস্যার সমাধাণেই যথেষ্ট সময় লাগিবে। কিন্তু তাহা ভাবিয়া ভগ্নোদ্যম হওয়ায় কোন কারণ নাই। সকল বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা এক দিনেই হয় না। বস্তুতঃ ভারত যে গোলাপ শিল্পে চেষ্টা করিলে অগ্রগন্য হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

I.G. ASSOCIATION

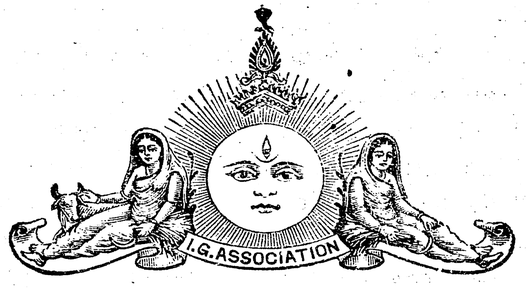

কৃষক—আষাঢ়, ১৩৩০ সাল।

কৃষিজাত দ্রব্য ও আগামী প্রদর্শনী।

আগামী শীতকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার ইডেন্ গার্ডেণে যে একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে তাহা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। ১৯২৪ সালে লণ্ডন্ সহরে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহা-প্রদর্শনী খোলা হইবে, বর্ত্তমান প্রদর্শনী তাহারই মুখ পাত স্বরূপ। উইমব্লে পার্কের সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে আপাততঃ অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সাধারণতঃ আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী সমূহ যেরূপ বিশাল সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয় এখানে তাহার কোন ত্রুটি হইবে না। সাম্রাজ্যের ধন সম্পদ পূর্ণ মাত্রায় প্রদর্শন করিতে ইংরাজ কোন ব্যয়কেই বাহুল্য মনে করিবেন না।

বঙ্গের আগামী প্রদর্শনী সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে যথা সম্ভব দ্রব্য সম্ভার দানে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন প্রদর্শনীর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও নিজ নিজ প্রদেশের দ্রব্যাদি নির্ব্বাচন ও প্রদর্শন কল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। গুরুতর প্রতিবাদ সত্বেও বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সে দিন ৩ লক্ষ টাকা এই উদ্দেশ্যে মঞ্জুর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শোনা যাইতেছে ইডেন্ গার্ডেন প্রদর্শনীর গ্যারাণ্টি ফণ্ডেও প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। সুতরাং দেশে অন্ন থাকুক্ আর নাই থাকুক্, লণ্ডন

প্রদর্শনীকে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে উন্নীত করিতে ভারত অর্থব্যয়ে আদৌ পশ্চাৎ পদ হইতেছে না।

প্রদর্শনীর জন্য অযথা অর্থব্যয়ে প্রতিবাদ করা অরণ্যে রোদণ মাত্র। তবুও দেখা দরকার যে, কোন প্রদর্শনীর প্রয়োজনীতা ও সার্থকতা কি, এবং বর্ত্তমান বাংলা দেশের অবস্থায় কৃষিও শিল্প জাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া কি পরিমাণ সফলতা লাভ করিতে পারা যায়। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে আগে আমাদের দেশেও মেলা হইত। সে গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদর্শনী ভিন্ন আর কিছুই নয়। তখন গ্রাম সমূহের অভাব গ্রাম মধ্যেই উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা মোচন হইত। আহার্য্য, পরিধেয়, গৃহ-সজ্জা, সামান্য বিলাসিতার উপকরণ, এ সকল কিছুর জন্যই বাহিরে যাইতে হইত না। মোটামুটি সমস্ত জিনিষ গ্রামেই পাওয়া যাইত। বৃটিশ শাষণের আমলে এরূপ স্বাবলম্বন-শীল (Self-contained) গ্রাম আজ কাল আর দেখা যায় না। সুতরাং ক্ষুদ্র প্রদর্শনী অথবা মেলার দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার উচ্চতর স্তরের জেলা-প্রদর্শনী এখনও অনেক জেলায় হয়। বিগত কলিকাতা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর সময় হইতে আজ বোধ হয় ৪০।৪৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে বঙ্গের নানা স্থলে অনেক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছে কি?

প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য—কৃষি, শিল্পে ও বাণিজ্যে অনুরক্ত জন সাধারণের শিক্ষা ও বিশেষ বিশেষ কাঁচা মাল এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় প্রসার। যেখানে দেশ স্বাধীন এবং স্বকীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষমতা-সম্পন্ন, সেখানে প্রদর্শনী এরূপ ভাবে পরিচালিত হয় যে প্রদর্শনী হইতে দেশের উপকারই হইয়া থাকে। সেই জন্য ইউরোপ অথবা আমেরিকায় প্রদর্শনীতে বিপুল অর্থ ব্যয় সার্থক হয়। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এক একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী আমোদ, প্রমোদ ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অন্তরালে ব্যবসায় সমর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন্ দেশে কোন্ মাল সহজে ও সস্তায় পাওয়া যায়; কোন্ দেশে কিরূপ জিনিষের প্রচলন ও তাহা নকল করিয়া সেই দেশের বাজারে বিক্রয় করা যায় কিনা; কোন্ দেশের দ্রব্যের উৎকর্ষতা কি কারণ-জনিত এবং কি প্রকারে তাহা নিজস্ব করিয়া লওয়া যাইতে পারে—এই সমুদয় বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রত্যেক বিশিষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত থাকেন। লণ্ডনের মহা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখানে সরকার পক্ষ যতই নিরব থাকুন না কেন, বিলাতে অনেক প্রসিদ্ধ পত্রিকা ইহার আন্তরিকতা প্রকাশ করিতে বিমুখ হন নাই। বিগত মহা যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় জাতি সমূহের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে তাহারা ব্যবসায়ের হিসাবে আদান প্রদান করিতে অসমর্থ। আমেরিকা স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় চালাইতে চায়। এদিকে বিলাতে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রভূত মূলধন আনিয়োযিত হইয়া পড়িয়া আছে, সাধারণের দুরবস্থা ও অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এ

সমুদয় প্রতিকারের উপায় কি? একমাত্র উপায়-বৃটিস সাম্রাজ্য ভুক্ত দেশ সমূহকে এরূপ ভাবে ব্যবসায় হিসাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তোলা যাহাতে তাহাদের বাণিজ্য স্রোত ইংলণ্ড অভিমুখে ধাবিত হয়; তাহাদেয় কাঁচা মাল সমূহ বিলাতে আসে ও বিলাতের শিল্পজাত দ্রব্য তাহাদের বাজারে বিক্রয় হয়।

যে কোন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ দুই শ্রেনী ভুক্ত:—কাঁচা মাল ও প্রস্তুতিকৃত দ্রব্য। কাঁচা মালের মধ্যে স্বভাবজ ও ক্ষেত্রজ দুই প্রকারের দ্রব্য থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লণ্ডন মহা প্রদর্শনীর কাঁচা মালের শ্রেনীবিভাগ উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহাতে আছে—খনিজ দ্রব্য; কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য; কৃষিজাত দ্রব্য যথা তন্তু উৎপাদক ফসল, তামাক, পশম, চামড়া রেশম ইত্যাদি; সমুদ্রজাত দ্রব্য যথা স্পঞ্জ, চর্ব্বি, মাছের তৈল প্রভৃতি। বলা বাহুল্য যে কাঁচা মালের জন্যই বিলাতওয়ালা-গণের ভারতের উপর বিশেষ টান। ভারতে অনেক দ্রব্য স্বভাবতঃ জন্মায় বটে, কিন্তু আমরা উহাদের ব্যবহার জানিনা। সেই জন্যই যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে আমরা এ সমস্ত দ্রব্য বিদেশী ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করি। বিদেশের বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যখন ঐ সমস্ত মাল প্রস্তুতীকৃত হইয়া আবার এদেশে আসে, তখন শত এমন কি সহস্র গুণ মূল্য দিয়াও ঐ সমস্ত মাল আমরা ক্রয় করি। সুতরাং অজ্ঞ ভারতবাসীর নিকট হইতে কাঁচা মাল যত সস্তায় কেনা সম্ভব অন্য কোন উন্নতিশীল দেশে তাহা সম্ভব নয়। এই সমস্ত বুঝিয়া বিলাতী সওদাগরগণ ভারতীয় কাঁচা মালের জন্য বিশেষ আগ্রহ-যুক্ত। বঙ্গের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে বিলাতী হিসাবে অবশ্য পাটই প্রধান। ব্রেজিল প্রভৃতি স্থানে অনেক চেষ্টা হইলেও পাট চাষে সফল হইতে কোন দেশ এখনও পারে নাই। কিন্তু পাট উৎপাদন করিতে না পারিলেও পাটের ব্যবহারিক প্রয়োগ করিয়া লাভবান হইতে বিদেশে কম চেষ্টা হয় নাই। ডণ্ডির পাট-শিল্প তাহার উদাহরণ স্থল। ভারতের পাটের শতকরা ৯০ ভাগ বাংলায় উৎপাদিত হয়। পাট ব্যতীত বাংলার অন্য-তম কাঁচামাল—চাল, কয়লা, চা ও রেশম। এ গুলির রপ্তানিও যদি বৃটিশ জাহাজে হয়, বৃটেনের হাত দিয়া অন্য দেশে বিতরিত হয় তাহা হইলেও লাভ কম নয়। কাজেই এ গুলির ব্যবসা যাহাতে হাতছাড়া হইয়া সাক্ষাৎভাবে অন্য দেশে গিয়া না পড়ে তজ্জন্যও ইংরাজ কম চেষ্টা করিবেন না।

ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীর কর্ত্তাপক্ষেরা বলেন যে বাংলার কুটির শিল্পের উন্নতিই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কথাটার মধ্যে বেশ একটু রসিকতা আছে বটে। বঙ্গের প্রধান কুটীর শিল্প, কার্পাস ও রেশম বস্ত্র, যাঁহাদের বহুবৎসর ব্যাপিয়া ধারাবাহিক চেষ্টায় লুপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই আবার বাংলার কুটীর শিল্পের পুনং প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়া-য়াছেন। বঙ্গের অন্যান্য যে কুটির শিল্প এখনও কোন প্রকারে টিকিয়া আছে তাহার মধ্যে হাড়, শিং ও শাঁখের কাজ, পিতল ও কাঁশার বাসন, মাদুর, মছলন্দ, ও বেত এবং

বাঁশের গৃহসজ্জা অন্যতম। ব্যবসায়ের হিসাবে এ সব দ্রব্যের বিদেশে অতি সামান্য কাটতি আছে। সখ করিয়া কেহ এই শ্রেণীর ২।৪টি দ্রব্য বাড়ীতে রাখিতে পারেন, কিন্তু এসকল দ্রব্য শ্বেতাঙ্গের প্রকৃত কাজে লাগেনা। সেইজন্য যখন অর্থ স্বচ্ছলতা থাকে তখনই তাঁহারা এসব কেনেন, অন্য সময় নয়। বস্তুতঃ বিগত তিন বৎসরে এই শ্রেণীর ভারতীয় দ্রব্যের যে বিদেশে অতি সামান্য পরিমাণে কাটতি হইয়াছে লণ্ডনের Indian Trade Commissioner এর রিপোর্ট তাহার সাক্ষ্য স্থল। পক্ষান্তরে যে সমুদয় অভিনব শিল্পের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যেমন ইংঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, চাল, তৈল ও কাগজের কল, রেশম সূত্র প্রস্তুতের কারখানা, চামড়ার কারখানা প্রভৃতি —সে সকল আপাততঃ নিজের দেশের অভাব মোচন করিতে অসমর্থ; রপ্তানি ত দূরের কথা।

এরূপ অবস্থায় আমরা প্রদর্শনীর বিশেষ কোন সার্থকতা দেখিতে পাইনা। বাংলার কৃষি এখনও যে কত অনুন্নত তাহা এক ধানের ফলন হইতেই বোঝা যাইবে। জাপান মিশর প্রভৃতি দেশের তুলনায় বাংলায় একর প্রতি অর্দ্ধেক উৎপাদনও হয়না। উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানি হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এত অধিক পরিমাণে রপ্তানি হওয়া উচিত নহে যাহাতে দেশেই খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের টান পড়িয়া যায়।

SEEDS
INDIAN GARDENING ASSON.
FLOWERS VEGETABLES
ASSOCIATIONS TESTED
SEEDS
WHICH ALWAYS SUCCEED.
PLANTS MANURES
162, BOW BAZAR STREET
Tel. "KRISHAK" CALCUTTA.

পাট ও শণ চাষ এবং অন্নকষ্ট।

ইদানীং পাট বঙ্গ দেশের একটী প্রধান বাণিজ্যের সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দেশ যতই সভ্য হইতেছে ততই পাটের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। দড়ি, দড়া, গুণ, চট, নৌকার পাল ইত্যাদি ত আছেই, আবার যত বিলাতী কাপড় এ দেশে আসিতেছে, তন্মধ্যে কয়েক শ্রেণীতে পাট মিশ্রিত থাকে। এইরূপে দিন দিন পাটের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব যত পাট উৎপন্ন করা যাইতে পারে তত বিক্রয় হইয়া যাইবে, পড়িয়া থাকিবার জিনিষ নহে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। যাহা কিছু শিল্প ও বাণিজ্য ছিল, তাহার অধিকাংশই বহুদিন হইতে বিদেশী বণিকের চেষ্টায় এবং কৌশলজালে বিনষ্ট হইয়াছে; ধান্যই বঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য। বিশেষতঃ বাঙ্গালী প্রায় সম্পূর্ণ সব্জী-ভুক। এরূপ স্থলে অজ্ঞ কৃষক জাতি যদি বিলাতী বণিকের মোহ জালে জড়িত হইয়া এবং প্রলোভনে পড়িয়া নগদ টাকার লোভে, পাটের চাষ আরও দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া তুলে তবে এত লোকের জীবন রক্ষা হইবে কিসে? যখন এমন গরিব দেশের লোকে ৫৲ টাকা মণ চাউল হইলেই প্রমাদ গনিয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়া দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে, তখন সোণার বাঙ্গালায় অগ্রে "ধন" অর্থাৎ ধান্যের সংস্থান না করিয়া অন্য কোন ফসলের সংস্থান করা উচিত নহে। যদি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে গোলা বোঝাই ধান থাকে, তবে নগদ টাকা না থাকিলেও বিশেষ অসুবিধা বা কষ্টের কারণ হইতে পারে না। পূর্ব্বে এদেশে সাধারণ লোকের হস্তে এত নগদ টাকা না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের এতাদৃশী অসহনীয় কষ্ট হইত না। বিনিময় বিধি দ্বারা পরস্পরে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বঙ্গ দেশের কৃষকগণ পাটের চাষে বৎসরে প্রায় কুড়ি কোটী টাকা উপার্জ্জন করে, কিন্তু কয় কোটী তাহাদের হাতে থাকে।

কথাটী সত্য বটে, পাটের চাষে লাভও বিস্তর। কয়েক মণ পাট বিক্রী করিলেই একমুঠা টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত চাষীর লাভ কি? পাটের চাষ করিতে হইলে ধান্যাপেক্ষা খরচও বেশী পড়িয়া থাকে। জমীর খাজনা, আবাদী খরচ, বীজ, নিড়ানী, কাটা, কাচা ইত্যাদিতে প্রায় দেড় গুণ দ্বিগুণ খরচ পড়ে, কিন্তু সচরাচর বিঘা প্রতি ২।৩ মণের বেশী পাট জন্মিতে দেখা যায় না। বিল কাঁদুড়ে জমিতে, উচ্চ ডাঙ্গা জমী অপেক্ষা কিছু বেশী ফসল হয় বটে, কিন্তু উহা শতকরা কয় বিঘা? পাটের আবাদাধিক্য জন্য ভাল ধানী জমি পাট চাষে পরিণত হইয়া খাদ্যাভাব ঘটিতেছে। ধর্ম্মশীল জমিদার মহোদয় গণ এই সুযোগে জমীর খাজানার হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়া

আপন আপন কোষ পূর্ণ করিতেছেন। নিরক্ষর অপরিনামদর্শী কৃষক হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া গোভাগাড় এমন কি উঠান, রাস্তা, ঘাট পর্য্যন্ত বন্দবস্ত করিয়া লইয়া পাট বপন করিয়াও সুখী হইতেছেন। বরং দিন দিন তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য অভাবাদি, ঋণ দায় বৃদ্ধি ব্যতীত কম হয় না। অধিকন্তু তাহাতে গোচারণের স্থান অভাবে গবাদি পশুগণ প্রচুর খাদ্যাভাবে দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া অবশেষে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। দুগ্ধ, ঘৃতাদির অপ্রাচুর্য্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তৎপরে এদেশের কৃষকেরা জমীতে সার দিতেই জানে না, অথবা জানিলেও অর্থাভাবে তাহাতে সক্ষম হয় না। গরিব কৃষক ক্ষুধার জ্বালায় বীজ ধান্য পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে, আর সার দিবে কোথা হইতে? আরও পাটের চাষ করিবার জন্য অধিকাংশ এমন কি বার আনা রকম কৃষকই মহাজনের নিকট হইতে উচ্চ সুদে বা আগী ধরতায় ফাল্গুন চৈত্র মাসেই টাকা কর্জ্জ লয়, উহার সুদ বা ধরতা সহ ভাদ্র মাসে আসল টাকার দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়া উঠে। কৃষক সমস্ত পরিশোধ করিতে না পারিলে বাকী টাকার পুনরায় মহাজনের নিকট "লিখিতং" করিয়া দিল। এই "লিখিতং" স্থল বিশেষে তাহাদের ২।৩ পুরুষেও শোধ হইল না। আবার বৎসর গতিকে পাটের বাজারও এত নিম্নে নামিয়া আইসে যে তাহাতে কৃষকের আবাদী খরচ সংকুলান কঠিন হইয় উঠেনা। সুতরাং যদি কোন বৎসরে কৃষকের ভাগ্য ক্রমে দু দশ টাকা খরচ বাদ বাঁচে, তাহা মহাজনের ঘরেই যায়, এবং কৃষকের যে হাহাকার সেই হাহাকার। এমন অনেক গৃহস্থকে দেখা গিয়াছে যে ২।৩ শত টাকার পাট বিক্রী করিয়া খরচাদি ও মহাজনের দেনা দিয়া শেষে সম্বৎসর দেড়া দুনা ইত্যাদি করিয়া ধান্য মহাজনের নিকট লইয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হইয়াছে।

ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা পাট ও শনের চাগ করিতে একেবারেই নিষেধ করিতেছি। তবে এক্ষণে যে পরিমাণে জমীতে প্রত্যেক কৃষক ধান্য গোধুমাদি দিয়া অবশিষ্ট জমীতে পাট ও শণ দিতেছে, তৎপরিবর্ত্তে যদি অধিকাংশ জমীতে ধান্য গোধুমাদি খাদ্য শস্য দিয়া প্রয়োজন মত জমীতে অর্থাৎ স্বীয় খরচ ও দেশের কলকারখানাদির জন্য যে পরিমাণ পাট ও শণ আবশ্যক তাহাই বপন করে, তাহা হইলে অচিরেই লক্ষ্মী দেবী সুপ্রসন্না হইয়া গৃহে গৃহে বিরাজ করিবেন। আর ঘরে ঘরে অন্নের জন্য হাহাকার বা ঘন ঘন অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়া দেশের কঙ্কালাবশিষ্ট রোগ শোকে জর্জ্জরিত মানবগণের কাল স্বরূপ হইবে না। নচেৎ দেশ হইতে এই চির দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত হইবার আর গত্যন্তর নাই। বর্ত্তমান আন্দোলনে পাঠ ও শণ চাষের আংশিক হ্রাস হইতেছে দেখা যায়। ইহা শুভ লক্ষণ ও সুখের বিষয়। তবে ইহাপেক্ষাও কম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু ২ করিয়া কার্পাস চাষ করা কর্ত্তব্য। যাহারা

মনে করে যে স্বীয় প্রয়োজনমত ধান্য হইলেই হইল, সেটি তাহাদের বিষম ভ্রম, কারণ তাহাতে দেশের লোকের ত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেই পারেনা, তদুপরি আবার স্বীয় উদর পূরণ বিষয়ে ও অক্ষম হইয়া পড়ে। কারণ সকল বৎসর কিছু সমান ফসল হয়না। যদি কোন বার অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইল, তাহা হইলে অন্যের করা দূরে থাকুক, নিজেরই হাহাকার উপস্থিত হয়।

ভারতবর্ষ দেবমাতৃক দেশ, বৃষ্টিবারির উপরই ইহার কৃষি কার্য্য নির্ভর করে, সুতরাং একবৎসর বৃষ্টি না হইলেই আশানুরূপ ধান্য উৎপন্ন হয়না। সেই অভাব যব, গমাদি রবি শস্য দ্বারা অনেকাংশেই পূরন হইতে পারে, পূর্ব্বে যে সকল জমীতে আশু ধান্য বপন করা হইত, সেই জমীতেই কার্ত্তিকমাসে আবার রবি শস্যের বপন হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহাতে রবিশস্যের পরিবর্ত্তে শণের আবাদ হইতেছে। আশু ধান্যও কমই হয়। পূর্ব্বে প্রায় অধিকাংশ গৃহস্থের ঘরেই কিছু ২ ধান্য সঞ্চিত থাকিত, যদি কোন বৎসর দৈব দুর্ব্বিপাকে ফসল ভাল না হইত তবে সেই সঞ্চিত শস্য দ্বারাই অনায়াসে ২।১ বৎসর চলিয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে ১০।২০ খানি গ্রাম অনুসন্ধান করিলেও হয়ত ২।১ জনের বাটীতে যৎসামান্য ধান্য সঞ্চিত দেখা যায়। আর পাট ও শণ ও যে প্রতিবৎসর সমান জন্মিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, হয়ত কোন ২ বৎসর বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ হওয়াও দুঃসাধ্য।

পূর্ব্বে যে এত পাট ও শণ উৎপন্ন হইতনা, তাহাতে লোকের কিরূপে চলিত, বরং তখন লোকে সুখে স্বচ্ছন্দেই কাল কাটাইয়াছে। এই ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথাই ধরুন না কেন, তখন টাকায় ১—১৷৷০ মণ চাউল, /৮ সের তৈল, /৪ সের ঘৃত ইত্যাদি বিক্রয় হইতেছিল। মুদ্রার ব্যবহার ও খুব কম ছিল. বিনিময় প্রথা ও কড়ি দ্বারা ক্রয় বিক্রয়াদি নির্ব্বাহ হইত, পূর্ব্বে আমাদের বাল্যাবস্থায় দেখিয়াছি, প্রায় প্রতি গৃহস্থই নিজের প্রয়োজন মত অর্থাৎ গৃহ কার্য্যাদি ও দড়ি দড়াজন্য ২।১ বিঘা জমীতে পাট বপন করিত। বাকী জমীতে আশু ও হৈমন্তিক ধান্য, রবি শস্য যথা সরিষা, গম, যব, নানাজাতীয় কলাই ইত্যাদি বপন করিত। তখন কৃষাণ মজুরাদিও সুলভ ছিল। একজন কৃষি অভিজ্ঞ চাকরের বেতন বার্ষিক ১৫।১৬৲ টাকা ও রাখাল ৫।৬ টাকাতেই পাওয়া যাইত, তদ্ব্যতীত তাহাদের খোরাক ও পোষাক দিতে হইত। ফলতঃ যে সময় হইতে পাটের আবাদ বৃদ্ধি ও উচ্চ দরে বিক্রী হইতেছে, তৎকাল হইতে চাকরের বেতন ৩৫।৩৬ টাকা হইতে ৪০।৪৫ টাকা পর্য্যন্ত ও রাখাল ১২।১৪ টাকার কমে পাওয়া যাইতেছেনা। তদুপরি খোরাক পোষাক ত আছেই। দৈনিক মজুর পাট কাটা ও কাচার সময় টাকায় ২।৩টীর বেশী পাওয়া যায় না। শণ পূর্ব্বে কেবল জালিকেরাই জাল প্রস্তুত করণ জন্য সামান্য মাত্র বপন করিত, গৃহস্থ লোকে কেহই বুনিত না, আবার তৎকালে লোকের একটী কুসংস্কার ছিল যে গৃহস্থকে শণের আবাদ করিতে নাই, তাহাতে বংশ লোপের সম্ভাবনা,

ফলতঃ কালক্রমে বিক্রয়ের উচ্চ দর দেখিয়া এখন সেই কুসংস্কার একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে ও অধিকাংশ কৃষকই শণের আবাদে লিপ্ত আছে। এক্ষণে পাট ও শণ বিক্রী করিয়া লোকে বিস্তর টাকা পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে খাদ্য শস্যের অপ্রতুল ঘটিয়া দেশে ঘন ২ ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতেছে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

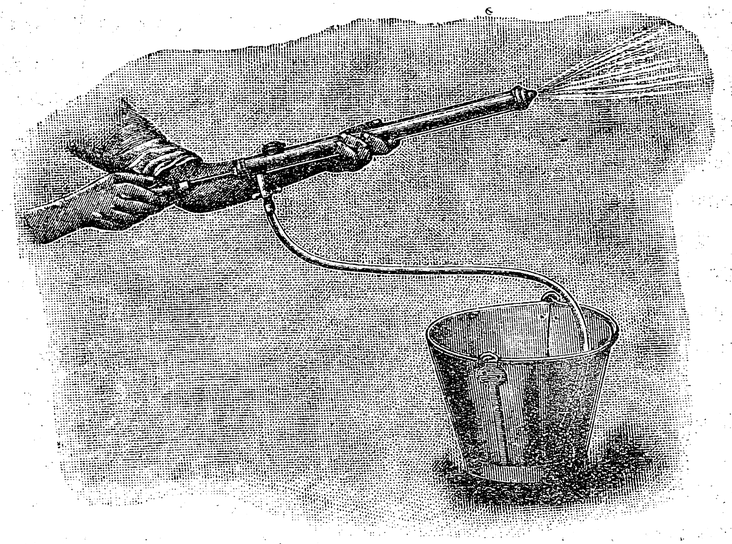

গাছে জল দিবার পিচকারী।

বঙ্গে কৃষি-শিক্ষা।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কালিফর্ণিয়া এবং উইস্‌কনসিন্ বিশ্ববিদ্যালয় কৃষির নানাশাখা এবং পাখীর চাষ শিক্ষাদিয়া থাকেন, প্রজণন তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য National Animal Breeding School of Pleasant Hill, Ohio, পাখীচাষ শিক্ষার জন্য ক্যানসাসসিটীর American School of Poultry Husbandry এবং মিনাপোলিসের American Farmers' School প্রতিষ্ঠিত আছে। কালিফর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিশাখার এক্‌স্‌টেনসান্ বিভাগে মকা, পিয়াজ, যব, ষই, গম, গো, শূকর, ছাগল, পাখী, মাছ, মেষ, দুগ্ধ, কুল, সপেদা, ছোলা, তিল, আখ, বাদাম, আখরোট, আঙ্গুর, লেবু, আঞ্জির, খেজুর তরিতরকারী, খরগোস, প্রভৃতির চাষ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই সব শিক্ষা প্রচলন করা চাই; আর আমাদের চাই—সেই স্থানীয় প্রাচীন পল্লীজীবন জাগ্রত করা।

বর্ত্তমানে পল্লীজীবন জাগাইতে হইলে পল্লীসংস্কার করিতে হইবে। তাহার জন্য আমাদের দেশের বালকবৃদ্ধ ও যুবাদের নিজে নিজে খাটীতে হইবে; ঝোড়, জঙ্গল পানা পুকুর পরিষ্কার, জলনিকাশ, ও পয়ঃপ্রণালী নিজেরাই কাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে; দেশের ম্রিয়মান কুটির শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে; চরকায় চাকায় শক্তি প্রদান করিতে হইবে; তুলার চাষ দেশে জাগাইতে হইবে।

উন্নতি করিতে হইলে শ্রমজীবি কৃষিজীবি, রেলজীবি, জাহাজজীবি, চাকুরীজীবি, সকলেই দল ও সমিতি সম্বদ্ধ হইয়া বঙ্গীয় ট্রেড্ ইউনিয়ান কন্‌ফারেন্সে যোগদান কর। বঙ্গীয় তথা ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবি দল ক্রমশঃ ক্রমশঃ শক্তি সম্পন্ন হউক এই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে দেশে কাজ হয়। আমরা কথা চাইনা কাজ চাই। আমাদের দেশের শিক্ষার ভার প্রাপ্ত মহোদয়গণ ও স্বদেশবাসী ধনী ও দরিদ্রগণের এদিকে আশু দৃষ্টি কি পড়িবেনা? ইহা না করিলে দেশের কল্যাণ নাই।

আমি পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি এবং পুনশ্চ বলিতে চাই যে ডাকযোগে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা ডেণমার্ক ও আমেরিকাদি দেশে কৃষকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে; কিন্তু আমাদের দেশে এ সমস্ত কিছুই নাই। দেশের সুদিন বলিতে হইবে যদি এই সকল বিষয়ে আমাদের নেতাবৃন্দের আশু দৃষ্টি পড়ে। আমাদের দেশের নিঃস্ব চাষাদের মধ্যে সুলভ কৃষিশিক্ষা ও নব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিস্তার করিতে হইলে ডেনমার্ক,

বিলাত ও আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি, বিশেষতঃ ডাকযোগে কৃষিশিক্ষা ও স্থানীয় ভাষায় ভ্রমণশীল লেকচার প্রদান বিধি দেশোপযোগী করিয়া কৃষিকেন্দ্রে কেন্দ্রে দান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য ঐ সকল দেশে ২।১ জন কৃষক প্রতিনিধি শিক্ষা পদ্ধতি সকল পরিদর্শন করিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

আমেরিকায় কৃষকস্কুলে সার মিশ্রণ ও প্রস্তুত করণ, মাটী প্রস্তুত, তামাকচাষ শিক্ষাকরণ, তরিতরকারী চাষ, ব জার নির্ব্বাচন, কৃষিজাত মাল বিক্রয় করণ, ফারম ম্যানেজমেণ্ট প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস ২ বৎসর ও ১ বৎসরব্যাপী কালের মত আছে। শিক্ষা নবীশকে সমস্ত ফী, কমিশান ও একশেঞ্জ অগ্রিম দিতে হয়। সায়েন্স কোর্সের ছেলেরা বেশ সহজে কৃষিশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া ভেটারনারী কলেজের ছাত্রগণ বা অপর কোন বুদ্ধিমান ছেলে যদি পশু জনন নীতি শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের Berry School of Animal Brceding ; Pleasant Hill, Ohio U, S, A তে ডাকযোগে শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইতে অনুরোধ করি। আমেরিকা বা বিলাতের সকল কৃষি বিদ্যালয়, যাহাদের নাম উপরে উল্লেখ করিয়াছি, পাঠ্য বই বা lessons বিনামূল্যে দিয়া থাকেন। উত্তর পরীক্ষা করেণ এবং ছাত্রদের যে কোন সংশয় জন্মে বা জিজ্ঞাস্য থাকে তাহা ডাকযোগে সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং পারদর্শিতা অনুসারে সার্টিফিকেট দেন। পাশ্চাত্য সভ্যদেশের জমীদারপুত্রগণ প্রায় অধিকাংশই ভাল চাষী ; তাঁহারা চাষী বা কৃষক বলিতে কোনরূপ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রাচীন আর্য্যযুগেও রাজাগণ বৃষ্টি, কৃষি, গবাদি পশুর পালন রক্ষণ এবং জননের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। আমরা সেই চাষা নামকে অবজ্ঞা করি, কি অধঃপতন আমাদের হইয়াছে বলিতে পারি না। আমি সেই জন্য একান্ত ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের জমীদারগণ এই পথ অনুসরণ করিয়া চাষাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া দেশকে আশু উন্নতির দিকে নীত করিতে পশ্চাতপদ না হন।

এই তীব্র জীবন সংগ্রামের কশাঘাতের দিনে আমারা কৃষক, শ্রমজীবি ও কেরাণী ভায়েদের বলি যে গোলামী করিলে আর চলিবেনা ; পল্লীজীবন পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে ; তাহা জাগাইবার প্রকৃষ্ট পথ—লাঙ্গল ধর, অবসর সময়ে চরকা চালাও ; বৈজ্ঞানিক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, তথা গোপালন, গোজনন, পাখি চাষ আদি কলা বিদ্যা সব যাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, ডাকযোগে বেশ করিয়া আমেরিকা ও বিলাত হইতে শিখিয়া আসল কার্য্যক্ষেত্রে নাম ; খাইতে পাইবে, সংসারে সুখ হইবে, হাহা, কৈ কৈ, বোল মিটিবে, ছেলেপিলেরা দীর্ঘজীবি হইবে ; পরণের কাপড় ঘরেই জন্মিবে। মরাই ভরা ধান, পুকুরে পোণামাছ, এবং কেঁড়ে ভরা দুধের দিন দেশে ফিরিয়া আসিবে। গ্রাম্যমোড়লত্ব বা প্রধানত্ব বা দলপতিত্ব যাহা এখন বংশগত হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, এবং গ্রাম্য সুখ শান্তির পরিবর্ত্তে যত অশান্তি, দলাদলি গ্রাম্যবিবাদ, ঈর্ষা, ঝগড়া, বিশম্বাদ ইত্যাদির কেন্দ্রস্থল হইয়া গ্রাম্যউন্নতির ও একতার প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে, তাহা ভগ্ন করিয়া "মুড়লী" বা "প্রধাণত্ব গুণগত" ও ব্যক্তিগত করিতে হইবে—ইহা যেন স্মরণ থাকে। নিজে স্ত্রীটি ও ছেলে কয়টিকে সংসারক্ষেত্র করিলে চলিবে না ; মা, ভাই, ভাজ, বিধবা ভগ্নী, মাসী, পিসী আদিকে লইয়া সেই প্রাচীন কালের মত সংসার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে ; দেশের, গ্রামের এবং সেই প্রাচীন পল্লীর এই সকল খুঁটীনটিগুলির প্রতি খুব তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; পথগুলি সংস্কার করিতে হইবে, আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া গ্রাম্য সমাজ-প্রবাহকে নির্ম্মল করিতে হইবে। ইহার প্রধান উপায় শিক্ষা। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, তথা বর্ত্তমান শিক্ষার দুর্ভাগ্য এই যে, মৌন, মূক, নিরক্ষর, অসহায়, কৃষক ও শ্রমজীবী মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দেহের রক্ত জল করিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্ভোগের উপাদান যোগাইতেছে, আমরা হীন, স্বার্থান্ধ বর্ব্বরের মত তাহাদিগকে এপর্য্যন্ত নির্য্যাতিত ও পদ দলিত করিয়া আসিয়াছি। ইহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া আবার সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সমাজ "স্বরাজ" বুঝেনা, নব প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কারের সঙ্গে তাহাদের সংস্রব ও সহানুভূতি খুবই কম ; তাহারা চায় বাঁচিতে, বেশী খাদ্য সম্ভার উৎপাদন করিয়া বেশী সংখ্যক লোককে খাওয়াইতে, মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিতে চায় ; তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা কি ভগবান পূর্ণ করিবেন না ?

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার M.R.A.S. L.L.B. Vakil High Court.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং.
কলিকাতা।

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায়গ্রাম, যশোহর ঃ—বাঁধাকপির মধ্যে 'ড্রমহেড'ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। 'সুগারলোফ্' আকারে কিছু ছোট হইলেও খাইতে সুস্বাদু। বিঘাপ্রতি তিন মণ সোরা সার বাঁধা কপির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। পায়রা অথবা অন্যান্য পক্ষীমল ১ ঝুড়ি, গুঁড়ান ঘুটে ৩ ঝুড়ি, ১ ঝুড়ি ছাই ও আধঝুড়ি চূণ একত্র উত্তমরূপে মিশাইয়া, গাছ একটু বড় হইলে প্রত্যেক চারার গোড়ায় ১ মুটা করিয়া দিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। ভাদ্র—আশ্বিন মাস জলদি বাঁধা কপির চারা তৈয়ারীর সময়। আলুর পক্ষে বিঘাপ্রতি ১০ মণ রেড়ীর খৈল ভাল সার। সার অথবা বীজ প্রভৃতির মূল্যের জন্য স্বতন্ত্র পত্র ভারতীয় কৃষি সমিতির কার্য্যালয়ে লিখুন।—কৃঃ সঃ

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ঃ—বেদানা ও মজঃফরপুর উভয়ই উৎকৃষ্ট জাতীয় লিচু। স্বাদের পার্থক্য অবশ্য আছে, কিন্তু নিজ নিজ হিসাবে উভয়েরই আস্বাদ উৎকৃষ্ট। লিচুর সাঁশের আধিক্য অথবা স্বল্পতা এবং কাঠিন্য ও কোমলতা অনেকটা জমি ও তাৎকালিক জল হাওয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ বিহার প্রদেশের ন্যায় বাংলায় লিচু তত ফলে না, কিন্তু ভাল তদ্বিরের ফলে বারুইপুর প্রভৃতি স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল হইতে দেখা যায়। নানাজাতীয় আমের ঠিক তুলনা করা চলেনা। ইহা ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। অধিক ওজনের আম প্রায় কমই ফলে। কিষনভোগও তাই। বিভিন্ন প্রকার আমের বর্ণনা—Woodrow's Mango নামক পুস্তকে পাইবেন—কৃঃ সঃ

সার সংগ্রহ

জল কষ্টঃ—প্রতি বৎসরই বাংলাদেশে ভীষণ জলকষ্ট হয়। আগেকার কৃত্রিম জলাশয়গুলির কতক রাজাদের খনিত, কতক দেশের ধনী লোকদের খনিত। এখন যে জলকষ্টে লোকেরা ক্লেশ পায়, এবং নানাপ্রকার রোগ ভোগ করে, তাহার সমস্ত দোষটা দেশের লোকদের নহে, গবর্ণমেণ্টেরও নহে। আগেকার রাজারা যে বড় বড় হ্রদ, পুষ্করিণী, "বাঁধ" খনন ও নির্ম্মাণ করাইতেন, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের সব প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও হায়দরাবাদে নিজাম, মৈসুরের মহারাজা প্রভৃতি নৃপতিরা রাজব্যয়ে সুবিশাল জলাশয় নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাংলা দেশের কোথাও কোথাও আগেকার স্বাধীন নৃপতিদের খনিত জলাশয় দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে যে "বাঁধ" নামক জলাশয়গুলি আছে, তাহা রাজাদের কীর্ত্তি। কালক্রমে পুরিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহার অনেকগুলির দ্বারা এখনও বিষ্ণুপুরবাসীদের জলাভাব দূর হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় নৃপতিদের দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ও জলকষ্ট দূর করিতে বাধ্য। এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব যতটা, তাহা তাঁহারা কাজের দ্বারা স্বীকার করেন না। ডিষ্ট্রক্ বোর্ড্, লোক্যাল বোর্ড্ এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ এ বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে পালনের চেষ্টা করেন না।

জাপানের সাধারণ মন্ত্রীরা বৎসরে বার হাজার টাকা বেতন পান; বঙ্গের মন্ত্রীরা পান চৌষট্টি হাজার। তাঁহারা বার হাজারে কাজ করিলে বাকী ৫২০০০ এ বৎসরে ১৩টি ছোট পুকুর হইত। তাহা হইলে তাঁহারা তিন জনে তিন বৎসরে ১১৭টি পুকুর দিয়া দেশের হিত করিতে পারিতেন।

আগে দেশের সম্পন্ন লোকেরা পুকুর দেওয়া একটি পুণ্যকর্ম্ম মনে করিতেন। ইহা কুসংস্কার নহে। পুকুর দেওয়া লোকহিতকর বলিয়া সত্যসত্যই পুণ্যের কাজ। বাংলা দেশের জমীদারেরা এখন আর পুকুর দেন না (২।৪ জন হয় ত দেন), পূর্ব্বপুরুষদের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করান না, এমন কি প্রজারা পুকুর দিতে চাহিলে তাহাতেও আপত্তি! তাঁহারা অনেকে এখন কলিকাতার আরামই বেশী পছন্দ করেন। ভূমি সম্বন্ধে নূতন যে সংশোধিত আইন হইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে প্রজার অধিকার স্বীকার করিবার চেষ্টা হওয়ায় জমীদারদের পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছে। সত্য বটে, যে, জমীদাররা অনেক ঋণগ্রস্ত; কিন্তু তাহার জন্য দোষী প্রধানতঃ তাঁহারাই।

বোম্বাই অঞ্চলে যেমন খুব ধনী বণিক্ অনেক আছেন, বঙ্গে তাহা না থাকিলেও

সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী, ব্যারিষ্টার, উকীল, চিকিৎসক প্রভৃতি আছেন। তাঁহারা নিজ নিজ পিতৃগ্রামে জলাশয় খনন ও রক্ষা করিলে লোকের জলকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয়।

গ্রামবাসীরা নিজেও দলবদ্ধ হইয়া পুকুর খনন ও পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন। কৃষি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌথ চেষ্টা করিবার উপায় একটি সরকারী আইন অনুসারে করা যায়। এরূপ চেষ্টা বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে হইতেছে। প্রবাসী

কচুরি পানা কমিটি:—পূর্ব্ববঙ্গে কচুরি পানার উপদ্রবে খুব ক্ষতি হইতেছে। উহা বিনষ্ট না হইলে আরও ক্ষতি হইবে। গবর্ণমেণ্ট উহা বিনাশের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি করিয়া ও সাতজন সভ্য মনোনীত করিয়া এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এবিষয়ে বসু মহাশয় অনেক গবেষণা করান। গ্রিফিথ্স্ নামক দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যক্তি বলে, যে, তাহার ঔষধ আছে, তাহার প্রয়োগে কচুরি পানা ধ্বংস হইয়া যায়। সে কয়েক লক্ষ টাকা পাইলে উহার উপাদান বলিয়া দিবে। পরীক্ষায় এই ঔষধের স্থায়ী কার্য্যকারিতা কোথাও প্রমাণিত হয় নাই। কমিটির পাঁচজন সভ্য ও সভাপতি বসু মহাশয় গ্রিফিথ্সের ঔষধের বিরুদ্ধে মত দেন। তথাপি কি কারণে জানি না, এত বড় বৈজ্ঞানিকের ও পাঁচ জন সভ্যের মত অগ্রাহ্য করিয়া কৃষিমন্ত্রী নবাব নবাবআলী চৌধুরী গ্রিফিথ্সের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা বাধা না দিলে ইহার ফলে প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের বহুলক্ষ টাকা বাজে খরচ হইবে। এই বিষয়টির বিশেষ বৃত্তান্তের জন্য জুন মাসের মডার্ন্ রিভিউ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী

বাঙালীর বাণিজ্যবিমুখতা নিজেদের অকৃতকার্য্যতা, অধিকার-শূন্যতা, বা কোন অসুবিধার দোষটা অন্যের ঘাড়ে বা কোন প্রতিকূল অবস্থার ঘাড়ে চাপাইতে পারিলে আমরা খুশি হই। সেই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, বাঙালীর আধুনিক বাণিজ্য বিমুখতার সম্ভবতঃ একটা যে ঐতিহাসিক কারণ আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাণিজ্যবিমুখতা দোষ খণ্ডিয়া যায়, তাহা আমরা বলিতেছি না।

ঈষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাহারা মুসলমান নৃপতিদের নিকট হইতে এই সুবিধা পাইয়াছিল, যে যে-সব জিনিষ কোম্পানী বঙ্গে কিনিয়া ইউরোপে চালান করিবে, বা ইউরোপ হইতে আমদানী করিয়া এদেশে বিক্রী করিবে, তাহার উপর কোন শুল্ক দিতে হইবে না। তখন পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা ও ইতস্ততঃ চালানে শুল্ক লাগিত। কোম্পানীর এই সুবিধা কোম্পানীর জন্যই অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু উহার ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এই সুযোগে নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে বিনাশুল্ক ব্যবসা করিতে থাকে। তাহাতে বঙ্গের সুবাদারের রাজস্বের ক্ষতি হইতে থাকে। কোম্পানীর ভৃত্যেরা কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হয় নাই। কোম্পানী বা তাহার ভৃত্যেরা এই দেশের

অন্তর্বাণিজ্য বিনাশুল্কে করিবে, অর্থাৎ এই দেশেরই জিনিষ এই দেশে বিনাশুল্কে কিনিয়া বিনাশুল্কে দেশের নানা স্থানে চালান করিয়া বিনাশুল্কে বেচিবে, মুসলমান নৃপতিদের ফর্ম্মানে তাহাদিগকে কোন কালে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাতে দেশী বণিকদের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল, তাহাদের ব্যবসা মাটি হইল; কারণ তাহাদিগকে কেনাবেচা ও চালান করিবার নিমিত্ত কর দিতে হইত। নবাবের রাজস্বেরও প্রভূত ক্ষতি হইল। কোম্পানীর ভৃত্যেরা ইহা অপেক্ষাও দুষ্কর্ম্ম এই করিল, যে, তাহারা তাহাদের প্রিয়পাত্র ও আজ্ঞাধীন দেশী লোকদিগকে কোম্পানীর ক্ষমতার আড়ালে বিনা করে অন্তর্বাণিজ্য চালাইবার অধিকার দিল। ইহা দিবার ক্ষমতা কোম্পানী বা তাহাদের ছিল না। ইহাতে, আগে হইতে যে-সব দেশী বণিক্ শুল্ক দিয়া ব্যবসা করিত, তাহাদের ব্যবসা উঠিয়া গেল। এই সব কারণে নবাব মীর কাসিম ইংরেজ ও ভারতীয় সকল জাতির ব্যবসার উপর শুল্ক উঠাইয়া দেন। কারণ, পয়সা যখন পাইবেনই না, তখন বাণিজ্য-শুল্ক বসানর বদ্নামটা থাকে কেন?

কোম্পানীর ভৃত্যেদের দুর্ব্যবহারের চরম সীমার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। তাহারা জোর করিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট দরে দেশের লোককে জিনিষ কিনিতে ও বেচিতে বাধ্য করিত। কেহ তাহাতে রাজী না হইলে, সিপাহী বরকন্দাজ পাঠাইয়া তাহাকে পাকড়াও করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত ও অন্যপ্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হইত। শুল্কসম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবহার ও এইপ্রকার অত্যাচার, মীর কাসিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ।

কোম্পানীর ভৃত্যদের উল্লিখিত প্রকার ব্যবহার যে তাহাদের অধিকারবহির্ভূত ছিল, তাহা বিলাত হইতে বোর্ড্ অব্ ডিরেক্টর লিখিয়া পাঠান, এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মীর কাসিমের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করেন। কিন্তু ঐ চিঠি যখন আসিয়া পৌঁছে, তাহার অনেক আগেই মীর কাসিমকে পদচ্যুত করিয়া কোম্পানীর ভৃত্যেরা মুর্শিদাবাদের মস্নদে মীরজাফরকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছে।

ইহা হইতে পারে, যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বাণিজ্য ও বণিক্কুল যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহা সাম্লাইতে পারে নাই। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, যে, এক একটা জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া আবার শির উঁচু করিয়াছে। নষ্ট বাণিজ্যে পুনরুদ্ধার তাহা অপেক্ষা সহজ কাজ। সুতরাং আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নহে। আমাদের মনোবাঞ্ছা এই, যে, অন্ততঃ পক্ষে আমাদের এই নিবন্ধিকাটি বাণিজ্যের বাঙালীর অলসতা ও নিরুদ্যমতাকে যেন প্রশ্রয় না দেয়। বরং আমরা মনে করি, যে, আমরা যে আগে বড় বণিক্ ছিলাম, ইহা এই বিশ্বাসেরই সমর্থন করিবে, যে, আমরা আবার বড় বণিক্ হইতে পারিব। প্রবাসী

ভারতের খনিজ সম্পদঃ—স্বর্ণ ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে কোলার নামক স্থানে সোনার খনি আছে। দেশের অন্যান্য প্রদেশেও কোন কোন স্থানে সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নীলাম্বর নদীর খাতে সোনার কণা পাওয়া গিয়াছে।

লোহা—টাটার লোহার কারখানার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে বহু লোহার খনি আছে। কিন্তু এই সব লৌহ হইতে এই দেশে কলকারখানা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয় নাই। খনিজতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ লোহা মাটীর তলে রহিয়াছে তাহার দশভাগের এক ভাগও তোলা হয় নাই। এই সব লোহা উত্তোলন করিলে ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজন অর্দ্ধেক মাল সরবরাহ করিতে সমক্ষ হইবে।

হীরক— কথিত আছে যে মোগল আমলে একটী খনি হইতেই বার শত মণ হীরক পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকারও ভারতের হীরকখনি কোথায় অবস্থিত আছে তাহার সন্ধান পায় নাই। ব্রহ্ম দেশের নানা স্থানে অন্যান্য মূল্যবান পাথরের সহিত হীরকও পাওয়া যাইতেছে।

অভ্র—ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়। বহু বৎসর অভ্রের ব্যবসায় করিয়া অনেক লোক ধনী হইয়াছে। এখনও এ দেশে অভ্রের প্রাচুর্য্য আছে। অভ্রের কারবার দেশীয় লোকেও করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য কারবারের ন্যায় অধিকাংশ কারবার বিদেশীর হাতে।

কয়লা—এদেশে কয়লাও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বাঙ্গালা দেশেও বহু কয়লার খনি আছে। কিন্তু কয়লার খনির মালিক ইংরাজই বেশী, দেশীয় কারবার আছে বটে কিন্তু তাহাও বঙ্গবাসীর খুব কম, মাড়োয়ারিই বেশী।

ইহা ছাড়া রূপা, গ্রাফাইট, উলফ্রাম, তামা প্রভৃতি খনিজ সম্পদও অল্পাধিক পরিমাণে আছে। ভারতবর্ষ খনিজ সম্পদে সম্পদশালী বটে কিন্তু খনিজ বিদ্যা শিখিবার জন্য এই দেশে যথেষ্ট বিদ্যালয় নাই। দেশের এই অভাব দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছোলতান।

অদ্ভুত তেতুল গাছ—পাবনা জেলার আজোগোড়া গ্রামে একটি তেঁতুল গাছ আছে। গাছটি অনুমান ৫০।৬০ হাত উচ্চ। কিন্তু গাছের ৩০।৪০ হাত উচ্চ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত ফুকার। ১০।১২ অঙ্গুলী কাঠেয় সহিত ত্বক্ বেষ্টনী। ফলে গাছটি শূন্যগর্ভ। গাছের পূর্ব্বের দিক দিয়া তাহার গর্ভে প্রবেশ করিবার রাস্তা। গোড়া হইতে ৪০ হাত উর্দ্ধের ফুকার পর্য্যন্ত সিড়ি পথ। এখনও যে কেহ গাছের ভিতরের সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে পারে এবং উপর হইতে নীচে নামিতে পারে।

স্থানীয় লোকেরা বলে যে, আমরা বাল্যকালে গাছটির গোড়ার বেড় ৩০ হাত দেখিয়াছি। গাছটি ক্রমে মাটির নীচে বসিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে গাছটির গোড়ার

বেড় ২২ হাত। ৬ হাত উঁচুতে পূর্ব্ব উত্তর দিকে যে ৫ হাত বেড়ের ডালখানি বাহির হইয়াছে তথায় গুঁড়ীর মাপ ১৭ হাত। পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া গাছের গর্ভে প্রবেশ করিলে, পূর্ব্ব পশ্চিমে গর্ভের ফুকার ৭ হাত এবং উত্তর দক্ষিণে গর্ভের ফুকার ৫ হাত অর্থাৎ একজন লোক অনায়াসে একখানি তক্তাপোষ পাতিয়া গাছের মধ্যে নিরাপদে বাস করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ শূন্যগর্ভ তেঁতুল গাছটি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা সহিত ৩।৪ কাঠা জমি দখল করিয়া বসিয়া আছে। শাখা প্রশাখাগুলি সতেজ, সবুজবর্ণ, তেঁতুলও বিস্তর ফলে।

প্রবাদ এই মুসলমান রাজত্বকালে রঘুরাম ওরফে রাঘব রায় দিনের বেলায় এই গাছের মধ্যে বাস করিতেন। রাত্রিতে বাহির হইয়া "দয়া এবং নিদয়া" নামক নদীদ্বয়ে ডাকাতি করিতেন। তখন গাছের পূর্ব্বদিক দিয়া দরজা ছিল না। তিনি উপরের রাস্তা দিয়া গাছের মধ্যে যাতায়াত করিতেন। পূর্ব্বদিকে দরজা না থাকায়, গাছের মধ্যে কোন কিছু আছে কি না, বাহির হইতে তাহা দেখা যাইত না।

দয়া নদী বেতিলের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত। নিদয়া নদী আজোগাড়ার ঠিক পশ্চিমে, এখন বিল রূপে পরিণত হইয়াছে। যে সকল লোক দয়া নদী দিয়া যাইত রাঘব তাহাদিগের প্রতি কিছু দয়া প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু নিদয়া যাত্রিগণের তাঁহার হাতে রক্ষা ছিল না। তাহার এই ব্যবহার বৈষম্যে নদীদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছে।

নাবাব সৈন্যগণ বহু দিন যাবৎ রঘুরামকে ধরিবার জন্য নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে নিদয়া নদীতটে ছাউনি করেন। এই সময়ে কতকগুলি পীপিলিকা নিকটবর্ত্তী তেঁতুল গাছের ভিতর হইতে চিনি মুখে করিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা গাছের পূর্ব্বদিকে দরজা কাটিয়া রঘুরামকে ধরেন এবং নবাব সরকারে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত রঘুরামের মাথা কাটিয়া লইয়া যান। নবাব, রাঘবের মাথা দেখিয়া বীরপুরুষের মাথা বলিয়া চিনিতে পারেন। তৎপরে তিনি রাঘবের স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য গ্রামখানি সামান্য জমায় রাঘবের পিতা রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে প্রদান করেন। অদ্যাবধি পাবনা কালেক্টরীর ৫১১ নং তৌজিভুক্ত হইয়া উক্তগ্রাম "রামকৃষ্ণ রায় খল্যাপুতুলী" নামে পরিচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

কৃষক।

নিদাঘে প্রখর রৌদ্রে, বসিয়া যে জন,
তোমার প্রাণদ অন্ন, করিছে অর্জ্জন!
অবহেলে কভু তারে, মূর্খ চাষা ব'লনা,
দেশের গৌরব সে যে, তা কি তুমি জাননা!

২

অট্টালিকাবাসী তুমি, সে থাকে কুটীরে,
তারে বিনা ভাসে দেশ, নয়নের নীরে।
অন্নের ভাণ্ডার শোভে, গৃহেতে তাহার,
সে না দিলে, তব গৃহে উঠে হাহাকার!

৩

লাঙ্গলের মুখে জন্মে যে অমূল্য ধন,
কভু তার তুল্য নয়, প্রবাল কাঞ্চন।
ধান্য-ধন, গম-তিল, সরিষা-কলাই,
এস ভাই নত শিরে, ঘরে নিয়া যাই।
হেরিয়া তাদের সদ্মা, হাসি হাসি মুখ,
আনন্দে ভাসিব মোরা, ঘুচিবেক দুখ।

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,
ছোলতান।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী খেতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৩।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালী গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেত্রে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেত্রে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের, যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে, তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখন চলিতেছে।

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান—বালসম (Balsam) জিনিয়া (Zinnia) কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুলগাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

দেশের ও দশের কথা।

সরকারী উদ্যান সমূহের বিবরণী:—কলিকাতার কয়েকটি সরকারী উদ্যান ও শিবপুরের প্রসিদ্ধ বোটানিক্ গার্ডেন এবং দার্জ্জিলিঙ্গের লয়েড্ বোটানিক্ উদ্যান,—এগুলি সমস্তই শিবপুর বাগানের অধ্যক্ষের অধীন। ১৯২১-২২ সালের বিবরণীতে প্রকাশ যে শিবপুর বাগানের কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গঙ্গাতীরের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রায় ১০০০ ফুট ইঁট দিয়া বাঁধান হইয়াছে এবং গাছঘরের গাছগুলিরও আমূল নব বিন্যাস হইয়াকে। অন্যদিকে ২।১বার আগুন লাগিয়া ও অনাবৃষ্টিতে কতকগুলি গাছ মরিয়া গিয়াছে। উক্ত বৎসরে প্রায় ৪০,০০০ প্যাকেট বীজ বিতরিত হয়। Hebarium এ নমুনার সংখ্যা সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮০০০ পরিমানে বাড়িয়াছে। শিবপুর বাগানের জন্য সরকার ১,৩৭,৯২১৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। তন্মধ্যে ১২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বাগানের আয় ৪৮১১৲ টাকা হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হলের বাগান যথা সম্ভব শীঘ্র সজ্জিত হইতেছে। লালদিঘীর বাগানেও কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গের বাগানে অন্যূন ৫০০০০ দর্শক গিয়াছিলেন। এই বাগান হইতেও বহু পরিমানে বীজ, চারা, গাছ প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছে।

রেশম শিল্প: এক সময়ে ভারতের রেশম শিল্প যে জগত-প্রসিদ্ধ ছিল তাহা সকলেই জানেন। নানা কারণে রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র উৎপাদনে ভারত কিছু দিন পূর্ব্বে অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল। সুখের বিষয় এই যে আবার রেশম শিল্পের পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মহীশূর রাজ্যেই এজন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। সাধারণ চাষ আবাদের কাজ করিয়া রেশম কীট পালনের যথেষ্ট সময় চাষাদের থাকে। শুধু তুঁত গাছ উৎপাদন করিয়াও কোন কোন চাষী বেশ দুপয়সা করে। মেদিনীপুর জেলার সবঙ্গ নামক গ্রাম তাহার উদাহরণ স্থল। কিন্তু তুঁত গাছের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল আবশ্যক এবং প্রথম অবস্থায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাতা খাইতে না পাইলে রেশম আদৌ ভাল হয়না। সেইজন্য যে সকল স্থানে জল সেচনের সুযোগ আছে সেইরূপ স্থানে রেশম কীট পালনের ব্যবস্থা করা ভাল। মহীশূরে তাহাই হইতেছে। রোগ-দুষ্ট পোকার আধিক্যও রেশমীশিল্প বিস্তারের একটি প্রধান অন্তরায়। ডিম পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। এবিষয়েও ক্রমশঃ অধিক মনোনিবেশ করা হইতেছে। বাংলায় বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর,

মুর্শিদাবাদ. মালদহ প্রভৃতি জেলার রেশম উৎপাদনে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আশা করা যায় আবার এই সমুদয় স্থানে নূতন উদ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত রেশম শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে।

পিঁপীলিকার প্রতিকার ঃ—জনৈক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে পিঁপড়ের উপদ্রবে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি অবশেষে ন্যাপথলিন চূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। ঘরের দরজার সামনে যদি উক্ত চূর্ণের গণ্ডি দেওয়া যায় তাহা হইলে পিঁপড়ে প্রবেশ করেনা। চূর্ণের উপর সামান্য পরিমাণে আল্‌কাতরা দিলে আরও ভাল হয়। কোন পাত্রের চারিদিকে এরূপ গণ্ডী দিলেও পিঁপড়ের আক্রমণ নিবারিত হয়।

উচ্চ কৃষি-শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা ঃ—পুষায় যে উচ্চ কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি বিদ্যালয় ও গবেষনাগার আছে তাহা অনেকেই জানেন। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানের সময় হইতে এখানে ১৩১ জন ছাত্রকে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য ২৬ জন এখানে গবেষণার সুযোগ পাইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে Public Services Commission বসিয়াছিল তাহার বিবরণীতে পুষার কৃষিবিদ্যা ও গবেষণাগার সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য দৃষ্ট হয় ঃ—পুষা ইনষ্টিটিউট্ প্রধানতঃ গবেষণার জন্য রাখা হইবে; ইউরোপ ও আমেরিকায় যেরূপ উচ্চাঙ্গ কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় পুষাতেও ভারতীয় কৃষি কলেজ সমূহের উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্র সমূহকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে; এবং তাহা যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তজ্জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক ও যন্ত্র ও পরীক্ষাগারাদির ব্যবস্থা করা হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অনেক বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে আপাততঃ ১লা নবেম্বর হইতে Indian Agricultural Service এর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃষি কলেজ অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ১২ জন ছাত্র নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহার মধ্যে ৩ জন ছাত্র কৃষি রসায়ণে, ২ জন ছত্রকতত্ত্বে (Mycology), ২ জন কীটতত্ত্বে, ৩ জন কৃষি জীবাণুতত্ত্বে ও ২ জন উদ্ভিদতত্ত্ব শাখায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। এতদিন পর্য্যন্ত Indian Agricultural Service শ্বেতাঙ্গ পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহারা যে সকলেই বিশেষজ্ঞ তাহা বলা যায় না। বিশেষজ্ঞ হইলেও তাঁহাদের ভারতীয় অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম। যে সময় তাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভ করেন তখন তাঁহাদের কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিবার সময় হয়। ভারতের অর্থে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইল তাহা কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার সময় যদি অপ্রাপ্য হয় তাহা হইলে দেশের যে কত লোকসান সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সেই জন্য ভারতের কৃষি-অভাবের হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমরা এই বার জন শিক্ষার্থী গ্রহণের প্রস্তাবে ভবিষ্যতের আশা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আসামে শিল্প শিক্ষার বিস্তার ঃ—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সম্প্রতি শ্রীহট্টে একটি শিল্প শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ৫০ জন ছাত্র থাকিতে পারিবে। আপাততঃ দুইটি কারখানা (workshop) খোলা হইয়াছে। একজন অভিজ্ঞ দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারকে প্রিন্সিপাল এবং কয়েকজন সুদক্ষ কারিগরকে শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। শিক্ষাগারে প্রধানতঃ কাঠের ও ধাতুর কাজেরই শিক্ষা দেওয়া হইবে। নাগপুরের প্রসিদ্ধ শিল্প শিক্ষালয়ের আদর্শে এই স্কুল গঠিত হইয়াছে। আসামে এইরূপ একটি শিক্ষালয়ের বিশেষ অভাব ছিল। বহুপূর্ব্বে কয়েক জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রচেষ্টায় পাহাড়িয়া গণের জন্য কয়েকটি স্কুল খোলা হইয়াছিল—শিলঙ্গে খাসিয়াদের জন্য, কোহিমাতে নাগাদের জন্য ও তুবাতে গারোগণের জন্য। এগুলি এখনও বর্ত্তমান; কিন্তু এগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যবহারিক হিসাবে তাহা নগণ্য। শ্রীহট্টের স্কুল বাস্তবিকই আসামীগণকে শিল্প-শিক্ষার অনেক সহায়তা করিবে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আসামের শিল্প বিভাগের কর্ত্তা মিঃ বড়ুয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

ভারতের তুলার কল ঃ—এতদ্দেশে বোম্বাই প্রদেশই তুলাজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতে সর্ব্বপ্রধান। আপাততঃ শোনা যাইতেছে যে তুলাজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে লাভের হার কমিয়া যাওয়ায় অনেক কলওয়ালা কাজ কমাইয়া দিতেছেন। তুলাজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের তালিকায় দেখা যায় যে সম্প্রতি বোম্বাই ও আমেদাবাদের কল সমূহে সূত্র ও বস্ত্র উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ৫ ও ৮ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। তবে এবারে বোম্বাই অঞ্চলে ফসলের আশা মন্দ নয়, তজ্জন্য তুলাজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও ব্যবহার শীঘ্রই বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে আশা করা যায়।

ইক্ষু রোপণের নব প্রণালী ঃ—বোম্বাই কৃষি বিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারী, মিঃ কুলকর্ণী কিছুদিন আগে মত প্রকাশ করেন যে আখের চারায় তিনটি মাত্র গ্রন্থি থাকাই বাঞ্ছনীয়। পুঁতিবার সময় প্রান্তিক দুইটি চোখ্ তুলিয়া ফেলিয়া কেবল মাঝের চোখটি ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া চারা বসাইলে সতেজ গাছ জন্মায় এবং ফলনও অধিক হয়। পৃথিবীর ইক্ষু চাষের অন্যতম কেন্দ্র, কিউবায়, এই প্রথা পরিক্ষীত হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে সাধারণ ভাবে রোপিত চারা অপেক্ষা এই তিন-গ্রন্থি ও এক-চক্ষু চারায় ফলনের মাত্রা অনেক বেশী হয়। কিউবার অভিজ্ঞেরা বলেন যে প্রথমে চোখ্ না তুলিয়া ফেলিয়া উহাদিগকে একটু গজাইতে দেওয়া ভাল। তৎপরে সর্ব্বাপেক্ষা সুপুষ্ট অঙ্কুর রাখিয়া অন্য দুইটি ভাঙ্গিয়া দিলে গাছের সতেজ বৃদ্ধি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকেনা।

সরকারী মৎস বিভাগ ঃ—মৎস-বিভাগের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তাহার অনুপাতে সামান্যই কার্য্য হয় বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যয় সংক্ষোচ কমিটি এই

বিভাগ তুলিয়া দিতে অনুমোদন করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির হয় নাই। এই বিভাগের অন্যতম কার্য্য পোনা বিক্রয়। ইহা এখন আরম্ভ হইয়াছে ও আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলিবে। রুই, কাতলা, মিরগেল ও কাল বোঁশের মিশ্রিত পোনা বাজারের উঠ্‌তি পড়্‌তি হিসাবে হাঁড়ি সমেত হাজার প্রতি ৩৲—৪৲ দরে বিক্রয় হয়। ২০০০ এর কম পোনা বিক্রয় হয় না। প্রত্যেক হাজারের জন্য অগ্রিম ১৲ টাকা দেওয়া আবশ্যক। লাল দিঘির পাড়ে মৎস বিভাগের আফিস হইতে পোনা দেওয়া হয়। এত বাঁধাবাঁধির ভিতর দিয়া কত লোক যে মৎস বিভাগ হইতে পোনা ক্রয় করিতে আসে তাহা আমরা বলিতে পারিনা, তবে ইহা ঠিক যে বাজারে বাছা পোনার দর সরকারী দর অপেক্ষা অধিক নয়। এস্থলে আরও দ্রষ্টব্য যে মৎস বিভাগ কোন বিশেষ জাতীয় মাছের পোনা স্বতন্ত্র করিয়া দিতে পারিবেন না এবং পোনামাছের সহিত যে অন্য মাছ নাই তাহারও গ্যারান্টি দিবেন না। কোন উন্নতিশীল দেশের মৎস-বিভাগের আদর্শে বাংলার মৎসবিভাগ গঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলে অনেকের কৌতুহল চরিতার্থ হয়।

বীজ পরীক্ষা :—স্যায়াণ্টকিক্ এগ্রিকালচারিষ্ট পত্রিকায় মিঃ এস, এন, মল্লিক বীজ পরীক্ষার একটি প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ :—একটি ছোট ঢাকনি সমেত বাক্স কিম্বা দুইটি খণ্ড তক্তা লও। পরে উক্ত আকারের দুই খানি ব্লুটিং কাগজ লইয়া তাহা আবশ্যক মত জল দ্বারা শিক্ত কর। এক্ষণে বাক্সের ভিতর কিম্বা এক খানি তক্তার উপর ভিজা ব্লুটিং রাখিয়া উহার উপর পরীক্ষাধীন বীজ গুনিয়া এক শত ছড়াইয়া দেও। তৎপরে অন্য ব্লুটিং কাগজটী চাপা দেও এবং বাক্স বন্ধ কর, অথবা অন্য তক্তাটি আল্গা ভাবে রাখিয়া দেও। দেখা দরকার যে বায়ুপ্রবাহে ব্লুটিং কাগজ যেন শুকাইয়া না যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইবে। যদি শতকরা ৯৪—৯৯ টি বীজ অঙ্কুরিত হয় তবে বীজ ভাল। [সব বীজই যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরিত হইবে তাহা বলা যায় না এবং কোন প্রকার খোলা plate এর মধ্যে ব্লুটিং কাগজ আংশিক ভাবে শুষ্ক হওয়া নিবারণ করা শক্ত কৃঃ সঃ]

সম সাময়িক জগত।

পক্ষীতত্ত্ব :—পৃথিবীর পাখিগুলি মরিয়া গেলে মানুষ ১০ বৎসরের অধিক বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, কারণ কীটাদি সমস্ত কৃষিজাত শস্যাদি ও ফল ফুল নষ্ট করিয়া দিবে। পক্ষীর অভ্যাস, নীড় নির্ম্মাণ প্রথা, খাদ্য প্রভৃতি লইয়া বিদেশে বিশেষজ্ঞগণ বহুবৎসর ব্যাপী গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। পাখির উড়িবার প্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া প্রথম ওড়াজাহাজ গঠিত হয়। এক প্রকার ছোট নীলকণ্ঠ পাখী আছে যাহারা প্রতি ঘণ্টায় ১৮০ মাইল হিসাবে উড়িতে পারে এবং এক সঙ্গে ১৬০০ মাইল উড়িয়াও ক্লান্তিবোধ করে না। সোয়ালো অনায়াসে ঘণ্টায় ১০০ মাইল উড়িতে পারে। এই সব পাখী নির্ম্মল বায়ুস্তরের মধ্যদিয়া পাঁচ মাইল উচ্চ হইতেও গন্তব্য পথের একটি ম্যাপ সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। ইহারা আফ্রিকার উত্তর উপকূল পার হইবার পূর্ব্বেই ভূমধ্যসাগরের পরপারে ফ্রান্স দেখিতে পায়। ইহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অভিনিবেশের সঙ্গে পাখীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটীত হইতে পারে।

চীনে তুলা চাষের বিস্তার :—নান্‌কিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় চিনে অনেক উৎকৃষ্ট মার্কিণ তুলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং অনেক ছাত্রকে বিশেষভাবে তুলা চাষ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট তুলার জমি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ৫।৬ বৎসরের মধ্যে চীণ উৎপাদিত দীর্ঘ সূত্র কার্পাসের প্রভাব তুলার বাজারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

তরল জ্বালানি :—কাষ্ঠই সভ্যতার আদিম অবস্থা হইতে প্রধান জ্বালানি (fuel) রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অপরাপর কার্য্যে ইহার অধিক ব্যবহারের জন্য পাথুরে কয়লা অনেক স্থলে ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার পাথুরে কয়লা অধিক ভারি বলিয়া স্থল বিশেষে 'গ্যাসোলিণ' প্রভৃতি তরল জ্বালানি ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে। তরল জ্বালানি মোটর গাড়িতে, বড় বড় জাহাজে ও কারখানায় এত অধিক মাত্রায় ব্যয় হইতেছে যে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে ইহারও টান পড়িবে। এ পর্য্যন্ত খনিজ কেরোসিন হইতে পেট্রোল প্রভৃতি তরল জ্বালানি প্রস্তুত হইত। কিন্তু উহার উৎপাদনের মাত্রা সীমাবদ্ধ। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সুরাসার প্রস্তুত ভিন্ন আর উপায় নাই। এবং সেই হিসাবে উদ্ভিদ্ জন্মাইতে হইলে গ্রীষ্ম মণ্ডলই তাহার স্থান। সেইজন্য বিদেশায়

ব্যবসায়ীগণ গ্রীষ্মমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ হইতে সুরাসার প্রস্তুত করণে ক্রমশঃ অধিকতর মনযোগ দিতেছেন। ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা জন্মে। ইহা হইতে জ্বালানি সুরাসার ইতি মধ্যেই প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশে অনেক স্থানে মহুয়ার গাছ যথেষ্ট, বিশেষতঃ মধ্যভারতে। হাইদ্রাবাদে মহুয়ার সুরাসার প্রচুর মাত্রায় প্রস্তুতের জন্য একটি বড় কারখানা খোলা হইতেছে। অন্যান্য বন্য গাছের মধ্যে বাঁস হইতেও প্রচুর পরিমাণে সুরাসার পাওয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্রজ ফসলের মধ্যে ভুট্টা, চাউল, তুলা, আখ, রাঙ্গা আলু, সিমুল আলু প্রভৃতি এই কার্য্যের উপযোগী। কিন্তু খাদ্য শষ্যকে সুরাসারে পরিবর্ত্তিত করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত তাহা কোন দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াই বলিতে পারা যায়।

বৃহত্তম কমলঃ—পদ্ম জাতীয় জলজ উদ্ভিদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার Victoria Regia নামক উদ্ভিদ্ বৃহত্তম। বস্তুতঃ পত্রের ও ফুলের আকারে ও আয়তনে ইহার সমকক্ষ উদ্ভিদ্ কমই আছে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত ভিক্টোরিয়া কমলের পত্র বৃন্ত সুদৃঢ় ও প্রায় ছয় হাত লম্বা। পত্রের ব্যাস ৫ হাতের কম হইবে না; ইহার উপরিভাগ মসৃণ এবং নিম্ন ভাগ তীক্ষ্ণ, বক্র কণ্টকে পরিপূর্ণ। ফুল বিকসিত হইলে প্রায় প্রস্থে এক হাত পরিমিত হয়। ২।৩ দিন অন্তরে এক একটি ফুল ফোটে ঃ—সকালে শুভ্র থাকে কিন্তু অপরাহ্ণে অল্প বিস্তর রক্তাভ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যায় প্রায় রক্তবর্ণ হইয়া যায়। আমেজন নদের পার্শ্বে অনেক আদিম অধিবাসীর গৃহ আছে। তাহারা যখন জলের সন্নিকটে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তখন তাহাদিগের শিশু সন্তান দিগকে ভিক্টোরিয়া কমলের পত্রে শোয়াইয়া রাখিতে দেখা যায়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে পাতার প্রান্ত ঈষৎ বক্র হইয়া প্রায় ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চ দিকে ওঠে। তাহাতে শিশুর জলে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আমাদের দেশে শালুক ও পদ্মের ন্যায় ভিক্টোরিয়া কমলের গেঁড়, ডাঁটা, পরাগ ও বীজ সমস্তই খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন পত্র গুলি কুটির আচ্ছাদনের জন্য প্রযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতায় শিবপুর স্থিত বোটানিকাল গার্ডেনে সময়ে সময়ে ভিক্টোরিয়া রিজিয়া উৎপাদিত হইতে দেখা যায়।

ক্যানাডার কৃষিজাত পণ্যঃ—ক্রমে ক্রমে গোধূম উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্যানাডা আজকাল পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান গোধূম ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর জগতের সমস্ত দেশে ৯২৩,০০০,০০০ বুসেল গম দরকার হয়; তন্মধ্যে এক ক্যানাডাই ৩১২,০০০,০০০ বুসেল সরবরাহ করে। মার্কিণের স্থান এখন ক্যানাডার নিচে এবং যে পরিমাণ গম ক্যানাডা হইতে রপ্তানি হয় ভারত অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেন্টিনা একত্র হইলেও সে পরিমাণ গম দিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন অধিক ভার ও শেতাভ বলিয়া ক্যানাড়ার গমের মূল্যও অন্য দেশের গম অপেক্ষা অধিক। এস্থলে ভারতের

সহিত ক্যানাডার বাণিজ্যের মোটামুটি একটা আভাস দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯২২ সালের প্রথম ছয় মাসে ক্যানাডা ভারত হইতে ১১০ লক্ষ টাকার পণ্য গ্রহণ করে; তৎপূর্ব্ব বৎসরে মোটে ৪৫ লক্ষ টাকার পণ্য উক্ত দেশে গিয়াছিল। অন্যদিকে উক্ত ছয় মাসে ক্যানাডা হইতে ভারতে ৩২ লক্ষ টাকার অর্থাৎ তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে ৯ লক্ষ টাকার মাল অধিক আসে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের সহিত ক্যানাডার বাণিজ্য অতি সামান্য ছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে যে সমস্ত মাল ক্যানাডা হইতে ভারতে আমদানী হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক মোটরকার ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি—বাকি অর্দ্ধেকের মধ্যে চিড় গাছের রেলওয়ে স্লিপার, ক্যালসিয়াম কার্ব্বাইড, লোহা লক্কড় গ্রামোফোন ও বাদ্য যন্ত্রাদি, রবারের দ্রব্য প্রভৃতি আছে।

ব্রিটিস-সাম্রাজ্য প্রদর্শনীঃ—১৯২৪ সালে যে বৃটিস সাম্রাজ্য প্রদর্শনী লণ্ডন সহরে খোলা হইবে তাহাতে সাম্রাজাজাত খাদ্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রদর্শনের সুবিধার্থ প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি পাঁচটি বিভাগে সজ্জিত হইবে—শ্বেতসার জাত পদার্থ, রুটি, পিষ্টক ইত্যাদি; সংরক্ষিত মৎস, মাংস, ফল ইঃ; শর্করা ও শর্করা যুক্ত দ্রব্য; চা ও কফি; মসলা, চাটনি ইঃ; পানীয়; গব্য দ্রব্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে এবং সাম্রাজ্যের যেখানে যাহা পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতের উক্ত কয়েকটি শ্রেণী-ভুক্ত আহার্য্য দ্রব্যাদির উপর যে বিশেষ টান পড়িবে তাহা বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

জল-হাওয়া ও ফসল।

ব্রহ্মে ভীষণ ঝড় ঃ—ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেক ইমারত ও জিনিষপত্রাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আকিয়াব হইতে ষাট মাইল লাইট রেলওয়ে লাইন বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়া ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মের সংবাদ আদান-প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অনেক চেষ্টার পর দুইটি তার ঠিক করা হইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নাকি এরূপ ঝড় হয় নাই।—'সোনার বাংলা'

চট্টগ্রামে প্রবল ব্যাত্যা ঃ—গত ৬ই মে কক্সবাজার মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চল দিয়া যে ভীষণ ঝড় বহিয়া যায়, তাহাতে টেকনাফ, উখিয়া, হিলা ও গর্জনিয়া থানার প্রায় সকল গ্রাম ও রামু থানার কিছু অংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ৪০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের বহুসংখ্যক গ্রামের উপর ঝড়টা বহিয়া যায়; ফলে তথাকার ৩০ হাজার অধিবাসী বিপন্ন হইয়া পড়ে। ঝড়ের বেগে লোকের ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালা উড়িয়া যায়; সমুদ্রের জল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাষ-আবাদের যথেষ্ট ক্ষতি করে; ধান-চাল বোঝাই ছোট বড় কতকগুলা নৌকা জলমগ্ন হয় এবং অনেক বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফাসিয়া যায়। ফলে লোক জন সব নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। এখন মজুরীর দর খুব বাড়িয়া গিয়াছে, ঘর-বাড়ী তৈরার করিবার জিনিষপত্রের ও খাদ্য-শস্যের মূল্যও চড়িয়া গিয়াছে। কাজেই স্থানীয় অধিবাসীদের—বিশেষতঃ দরিদ্রের অবস্থা শোচনীয়।—'যোলতান'

গোধূম ফসল ঃ—সমস্ত ভারতের গোধূমের জমির অনুপাতে বাংলায় শতকরা ১ ভাগ গোধূম উৎপন্ন হয় না। এবার ১২৪০০০ একরে গমের চাষ হইয়াছে। তাহা হইতে ২৮৬০০ টন (অর্থাৎ একর প্রতি ৮ মন ১৩½ সের) গম হইবে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে অনুমান করা হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ফলানের ⅝ ভাগ। পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্ত্তী বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এবার বোধহয় শতকরা ৯৫ ভাগ ফসল হইবে। এই প্রদেশে এ বৎসর গমের জমির পরিমাণ ১২,৬৫০০০ একর; আনুমানিক উৎপাদন ৫১৭৯০০ টন। সমস্ত ভারতের তুলনায় উক্তপ্রদেশে শতকরা কিছু কম ৪ ভাগ গমের জমি আছে। বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গমের জমি মালদহ জেলায়। তৎপরে যথাক্রমে মুর্সিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী ও পাবনা। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে কেবল বীরভূম ও বাঁকুড়াতেই ৩১০০ একরের উপর জমিতে গম চাষ হয়। অন্য কয়টি জেলায় গমের জমি সামান্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

কৃষক

২৪ খণ্ড } কৃষক—শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা

কচুরী পানা সমস্যা।

পৃথিবীর একদেশের গাছ অন্যদেশে নীত হইয়া কিরূপ অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে কচুরী পানা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Eichornia Crassipes, Solms ও ইহার আদিম নিবাস ব্রেজিলে। আগে ইহার বিস্তার দক্ষিণ আমেরিকাতেই সিমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সুদৃশ্য ফুলের রূপে মুগ্ধ হইয়া মানব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তন-জনিতই হউক, অথবা অনবধানতাপ্রযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া আগমণ হেতু হউক—যে কোন কারণে ইহা আজকাল পৃথিবীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ ফ্লোরিডা, যবদ্বীপ, কোচিন-চিন, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন সময়ে যে ইহা এতদ্দেশে আসে ঠিক বলা যায় না, তবে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার দু চারটি গাছ বাংলায় দেখা যাইত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই কিন্তু কচুরী পানার প্রভাব অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এবং সেইজন্যই বোধ হয় পূর্ব্ব বঙ্গে স্থানে স্থানে ইহা জর্ম্মণ পানা নামে পরিচিত। ১৯১৪ সাল হইতেই ইহা খুব বাড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু ১৯১৭ সালে যে পূর্ব্ববঙ্গময় প্রবল বন্যা হয় তাহাতে অনেক কচুরী পানা সমুদ্রজলে বিতাড়িত হইয়া বিনষ্ট হয়। ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে সেইজন্য ইহার ততটা বাড়াবাড়ি ছিলনা। কিন্তু তারপর হইতেই আবার ইহা এত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে যে খাল, বিল, নদী প্রভৃতিতে নৌকাদির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে, ও এমন কি স্থানে স্থানে ধান উৎপাদন করাও অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

১৯২১ সালের জুন মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কচুরী পানার বিষয় আলোচনার ফলে ইহা নিরসণ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়! কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ও সরকারী এবং বেসরকারী কয়েকজন ব্যক্তি সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, কচুরী পানা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইলেও নিরাকরণের কোন বিশেষ উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন যে কয়েকটি বিশেষ কর্ম্মচারী দ্বারা কচুরী পানার জীবন-বৃত্তান্ত ও উহাকে বিনষ্ট করিবার উপায় বিষয়ে আপাততঃ তিন বৎসর কাল অনুসন্ধান চলুক এবং নূতন আইন সংস্কলন করিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য একযোগে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা করা হউক। গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প সচিব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ধরা ছোঁয়ার কিছুই নাই। কেবব এইমাত্র আছে যে গ্রিফিথস্ নামক জনৈক সাহেবের কচুরী পানা মারিবার পেটেণ্ট ঔষধে কিরূপ কাজ হয় তাহা বহুবিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কমিটির অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলার ২৭টি জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও চট্টগ্রাম-পার্ব্বত্য-অঞ্চল ব্যতীত অন্য সকল জেলাতেই কচুরী পানা অল্পবিস্তর ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কচুরি পানা জলজ উদ্ভিদ্; জলে ও কাদায় সমভাবেই ইহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হয়। বৃদ্ধির প্রধান উপায় প্রসারণী কাণ্ড (Runner) এবং প্রসারের উপায় প্রত্যঙ্গ,পাতা,যাহা পালের ন্যায় কাজ করে এবং জলে বহুদূর পর্য্যন্ত এই উদ্ভিদকে বহিয়া লইয়া যায়। যেখানে জলা জমির আধিক্য সেখানেই কচুরীপানার প্রাদুর্ভাব। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ইহা যে কম হইবে তাহা স্বাভাবিক। সেইজন্য বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় এখনও কচুরী পানা বিশেষ ভয়ের কারণ হয় নাই। পক্ষান্তরে ২৪-পরগণা, ত্রিপুরা, রাজসাহী, ঢাকা, মৈমনসিংহ, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় পানায় খাল বিল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভৈরব ও গড়াই নদীর কথা বলিতে পারা যায়। এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। একটি কচুরী পানা গাছ হইতে ৩।৪ মাসের মধ্যে এত গাছ জন্মিতে পারে যে ৬০০ বর্গ গজ স্থান আবৃত হইয়া যায়। কোন পুকুর হইতে কচুরী পানা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও, ২।৪ টি গাছ থাকিলে আবার ২ মাসের মধ্যে পুকুর ভর্ত্তি লইয়া যায়। সুখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই যে বাংলায় বীজ দ্বারা কচুরী পানা বংস বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু পত্রবৃন্তে স্ফীত বায়ুকোষ (Bladder) ও পা'ল সদৃশ পাতার সাহায্যে কচুরী পানার সাধারণতঃ ২ হাত উচ্চ গাছ ঘণ্টায় তিন মাইল হিসাবে নদীর জলে ভাসিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহার প্রসার বন্ধ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

নানাদেশে কচুরী পানা জলপথ বন্ধ করিবার আশঙ্কায় ইহার প্রতিকারের কয়েক রকম উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সেগুলি সময় ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। আমাদের দেশে আপাততঃ গাছ তুলিয়া শুষ্ক করিয়া পুড়াইয়া ফেলানই ইহার প্রসার নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া স্থীরিকৃত হইয়াছে। অবশ্য ইহা কেবল মাত্র সাময়িক উপায়! দেশকে কচুরী পানার আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে হইলে দীর্ঘ সময় ব্যাপী চেষ্টা ও যথেষ্ট অর্থব্যয় আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন রাজা ও প্রজার সমবেত কার্য্য ব্যতীত কিছু হওয়ার উপায় নাই। এরূপ স্থলে প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে অন্য দেশে কচুরী পানা নিবারণের কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা কি ফল পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমেই ইহা বলা আবশ্যক যে লবনাক্ত জলে কচুরী পানা আদৌ বাঁচেনা। যদি কোন প্রকারে ইহাকে লবণাক্ত জলে অর্থাৎ সমুদ্রের মোহানায় বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে তবে ইহার ধ্বংস নিশ্চয়। এই স্থিরীকৃত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে সমস্ত নদীতে জোয়ার ভাটা চলে সেরূপ নদীতে পানাকে ক্রমশঃ ঠেলিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় হইতেছে। তাহাতে সুফলও ফলিয়াছে। এরূপ স্থলে ৬×৬×২০ ফুট পরিমিত বিম যুড়িয়া নদীর প্রস্থের বিস্তার হিসাবে রাখা হয়; ভাটার সময় ঐ সমস্ত বিমের সাহায্যে যতদূর সম্ভব নদীর মুখের দিকে পানাকে ঠেলিয়া দিয়া সেখানেই আবদ্ধ করা হয়। জোয়ারের সময় উহা আর উপর দিকে আসিতে পারে না বরং পরবর্ত্তী ভাটার সময় আরও মোহানার দিকে চলিয়া গিয়া অবশেষে লবণ জলে গিয়া পড়ে। সেইখানে কয়েক দিন থাকিলে কচুরীপানা একবারেই মরিয়া যায়। বড় বড় নদীতে এইরূপ নিবারণের উপায় সম্ভব হইলেও ক্ষুদ্র নদী ও জল যেখানে স্রোত অতি কম অথবা একবারেই নাই—সেরূপ স্থানে সম্ভব হয় না। সেরূপ জলাশয়ের জন্য উক্তদেশসমূহে একপ্রকার পানা তুলিবার জাহাজের ব্যবস্থা আছে। ইহা অনেকটা মাটিকাটা জাহাজের মত। ক্ষুদ্রবোট সাহায্যে জল হইতে ঘেরাও করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কচুরীপানা তুলিয়া লইয়া, জাহাজস্থিত যন্ত্রের সাহায্যে একবারে পিষিয়া দেওয়া হয় এবং সেই জাহাজ উক্ত নিস্পিষ্ট পানা একবারে জলাশয়ের তীরে কিছু দূরে ফেলিয়া দেয়। এরূপভাবে নিস্পেসন করিয়া দেওয়া হয় যে পানা আর জন্মিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং এই উপায়ই ক্ষুদ্র নদনদী অথবা জলাশয়ের পক্ষে প্রকৃষ্ট।

এই দুই প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রণালী হইতেছে,—রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে পানা বিনষ্ট করা। ইহাতেও যে কার্য্য হয় না তাহা নহে, তবে কচুরী পানা এত ঘন হইয়া স্থানে স্থানে জন্মায় যে রাসায়নিক দ্রাবণ উত্তমরূপে ছিটাইয়া দিলেও গাছের সর্ব্বাংশে পৌঁছায় না। আবার ২।৪টি গাছ যদি বাঁচিয়া যায় তবে দ্রাবণ প্রয়োগ নিস্ফল। রাসয়নিক দ্রাবণের প্রধান উপাদান আর্শেনিক অর্থাৎ সেঁকো বিষ। ইহা প্রয়োগে

আরও একটি ভয় আছে; গাছ যে মরিয়া গেলেও, জমির উপর ফেলিয়া = দেওয়া গাছ গরু বাছুর খাইতে ছাড়েনা। তাহাতে গরু বাছুরের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। রাসায়নিক দ্রাবণ প্রয়োগ দ্বারা যে সম্পূর্ণ নিরাকরণ অসম্ভব তাহা লুইসিয়ানা ও ফ্লোরিড়ার পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে। আমাদের দেশে সরকার যে গ্রিফিথস্ সাহেবের পেটেণ্ট দ্রাবণ ক্রয় করিবার এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং কোন কোন ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা সেই কার্য্যের ব্যগ্র সমর্থন করিতেছেন তাহা এইরূপ কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকন্তু বড় বড় জলাভূমিতে সেই দ্রাবণ প্রয়োগে যে কি ফল হয় তাহাও অনিশ্চিত। অথচ উক্ত ইংরাজি কাগজ সমূহ এরূপ ভাব দেখাইতেছেন যে অতি শীঘ্র গ্রিফিথস্ সাহেবকে ২।৪ লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার পেটেণ্ট ঔষধ কিনিয়া না ফেলিলে বিপদ অনিবার্য্য,—গ্রিফিথস্ সাহেব ঔষধ অন্যকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন এবং বাংলার জল পথ প্রভৃতি রুদ্ধ হইয়া গিয়া ও ধান ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। ইহার মধ্যে কৌতুকের বিষয় এই টুকু যে গত ৭।৮ বৎসর ধরিয়া কচুরী পানার আক্রমণের বিষয় জন সাধারণের নিকট প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু যত দিন না এক জন সাহেব পেটেণ্ট ঔষধ লইয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়াছিলেন ততদিন উক্ত সাহেবী কাগজ সমূহের কচুরী পানা সমস্যায় বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যাইত না।

কচুরী পানা বিনষ্ট করিবার উপায় ব্যতীত ইহা কিরূপে অন্য কাজে লাগান যাইতে পারে তাহারও অনেক অনুসন্ধান চলিতেছে। পচা কচুরী পানার সার গোবর সার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট। কচুরী পানার ভস্মে যথেষ্ট পরিমাণ পটাশ লবণ পাওয়া যায়; কিন্তু খাঁটি ছাই পাওয়া বড় কঠিন বলিয়া Shaw Wallace কোম্পানির ন্যায় বড় বড় সওদাগরেরাও এই কাজে হাত দিতে চান না। এই পানা হইতে কাগজও প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু গাছ হইতে সিকি ভাগের ও কম তন্তু পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সবডিভিজনাল অফিসার বলেন যে কচুরী পানার ফুল হইতে কালী প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু কালীর রং স্থায়ী করার ব্যবস্থা দরকার। পশু খাদ্য ও জ্বালানী হিসাবেও কচুরী পানা আপাততঃ বাংলার স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। ফলতঃ কচুরী পানার কোন বিশেষ কাজে লাগিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম এবং যে সকল কাজে এখন ইহা প্রযুক্ত হইতেছে তৎসমুদের জন্য যে পরিমাণ পানা আবশ্যক হয় মোট উৎপন্ন পানার হিসাবে তাহা নগণ্য। সর্ব্ব বিষয় বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কচুরীপানা সমস্যা অত্যন্ত জটিল। সমাধান হওয়া সময় সাপেক্ষ এবং তজ্জন্য গাছের জীবন বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে জানা আবশ্যক। পেটেণ্ট ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া ও দরিদ্র প্রজাদের ২।৪ লক্ষ টাকা অনর্থক খরচ করাইয়া কোন লাভ হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বোল্লিখিত আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় দৃষ্ট সুফল-প্রসবী প্রথা অবলম্বনে বরং অধিক উপকার হওয়ার সম্ভবনা আছে।

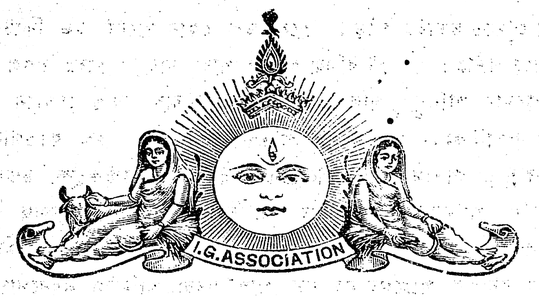

পানিফল।

কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে পানিফলের কাঁটাযুক্ত ফল অপরিচিত না হইলেও, নগরবাসীর পক্ষে ইহার ব্যবহারিক মূল্য নিতান্তই কম। ফিরিওলারা পানিফল বিক্রয় করে এবং খরিদ্দার প্রধানতঃ ছেলেরাই। খাদ্য হিসাবে সহরবাসীগণ পানিফল ব্যবহার করেন না। কিন্তু ভারতের কোন কোন অংশে চিনা, কাউন, বজরা প্রভৃতির ন্যায় পানিফল ও একটি প্রধান আহার্য্য ফসল। এই সৌন্দর্য্য-বিহীন, সাদা সিধে জলজ উদ্ভিদ্ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের সময় অনেক লোকের জীবন ধারণের সহায়তা করে। মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানেই পানিফল পাওয়া যায়। ভারতীয় পানিফলের বৈজ্ঞানিক নাম Trapa bispinosa; ইহার ইরাংজি নাম watkrnut ও বাঙ্গলা নাম পানিফল একার্থ বোধক। নানাদেশে পানিফল দৃষ্ট হইলেও, চীণ ও ভারতের ন্যায় অন্য কুত্রাপি ইহা এত প্রচুর পরিমানে আহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয় না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই খাল, বিল, পুকর জলা—যেখানেই বরাবর জল থাকে, সেখানেই পানিফল জন্মে। কিন্তু ভারতেও নানা প্রদেশে জন্মিলেও কেবল কাশ্মীরেই পানিফল রীতিমত ফসল রূপে বিবেচিত হয়। এই পার্ব্বত্য দেশের বহুসংখ্যক হ্রদ ও জলায় বহুকাল হইতে পানিফল জন্মিয়া আসিতেছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক নীচেও অর্দ্ধ প্রস্তরীভূত পানিফল পাওয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের সর্ব্বত্র পানিফল সুলভ হইলেও উলার হ্রদই ইহার প্রধান আবাস স্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে যিনিই গিয়াছেন তিনি অবশ্য উলার হ্রদ দেখিয়াছেন। স্বাদু জল বিশিষ্ট হ্রদ সমূহের মধ্যে ভারতে ইহাই বৃহত্তম। হ্রদের তটভূমি এক এক একস্থানে জলার

সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে ; খুব গ্রীষ্মের সময়ও ইহা প্রায় ১২ ½ বর্গ মাইল অধিকার করিয়া থাকে। খুব বর্ষা ও বণ্যার সময় ত কথাই নাই ; তখন ইহার জলরাশি ৬০ বর্গ মাইলেরও উপর জমিতে ছড়াইয়া পড়ে। হ্রদের জল কোন স্থানেই ১৬ ফিটের উপর গভীর নয়। গড়ে গভীরতা ১২ ফুট বলিয়া ধরিতে পারা যায় ; হ্রদের সকল অংশেই দীর্ঘ, নমনীয়, ভাসমান পানিফল গাছ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু যেখানে জল কম সেখানেই ইহার সংখাধিক্য। পানিফলের প্রতিদ্বন্দী শালুক। কিন্তু কাণ্ডগাত্র-সংলগ্ন হরিৎবর্ণ পালকের ন্যায় প্রত্যঙ্গ, স্ফীত পঁত্রবৃন্তে বায়ুস্থলী ও কণ্টকযুক্ত, চর্ম্মবৎ শক্ত আবরণ বিশিষ্ট ফল— পানিফলকে এমন অস্ত্র শস্ত্র দিয়াছে যে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সহিত জীবন সংগ্রামে ইহা সহজেই জয়ী হইতে পারে। শীতকাল প্রায় জীবন-হীন অবস্থায় কাটাইয়া বসন্তের প্রারম্ভেই নব পত্র পুষ্প লইয়া পানিফল নয়নগোচর হয়। পত্র কক্ষ স্থিত, শ্বেতবর্ণ, একক্ ফুল প্রথমতঃ জল ছাড়াইয়া কিয়ৎ পরিমাণ উর্দ্ধে উঠে কিন্তু পরাগ নিষিক্ত হইলেই পুষ্প বৃন্ত ক্রমশঃ বক্র হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করে ফল জলের ভিতরেই পরিপক্ব হয়। হেমন্তের প্রারম্ভেই ফসল তোলা আরম্ভ হয়। যে বৎসর শরতে বর্ষাবৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম হয়, দেখা গিয়াছে যে সে বৎসর, ফসল বেশ ভাল হয়।

পানিফল কাশ্মীর রাজ্যের একটি আয়ের জিনিষ। উলার হ্রদের পানিফল প্রতিবৎসর ঠিকা বিলি হয়। ফসলের স্বল্পতা অথবা প্রাচুর্য্য হিসাবে পানিফল হইতে রাজ সরকারে ১৫-২০ হাজার টাকা আসে। প্রধান ঠিকাদার প্রায়ই নিজে কাজ করে না ; তাহার অধিনস্থ ক্ষুদ্র ঠিকাদারগণকে অথবা স্থানীয় মোড়লদিগকে সে আবার ঠিকা দেয়। হেমন্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট নৌকা লইয়া হ্রদ বক্ষে পানিফল সংগ্রহ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুবিধাজনক স্থানে বড় বড় নৌকা রাখা হয়। দিনশেষে ছোট নৌকা সকল সংগৃহীত পানিফল আনিয়া বড় নৌকায় দিয়া যায়। প্রথম সংগ্রহের সময় ফলের সহিত পানিফলের ডাঁটা, পাতা, অন্যান্য উদ্ভিদ্ ও নানা প্রকার আবর্জ্জনা থাকে। বড় নৌকায় তুলিবার সময় এইগুলি যথাসম্ভব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অতি প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সংগ্রহের কাজ চলে। উলার হ্রদের একটি বিশেষত্ব এই যে বৈকালে উহার প্রান্তস্থিত হরমুখ পর্ব্বতের অভ্রভেদী শৃঙ্গ হইতে ঝড় উৎপন্ন হইয়া ভীষণ বেগে হ্রদের উপর দিয়া বহিতে থাকে। হ্রদের জলরাশিতে উত্তাল তরঙ্গ উপস্থিত হয়। কাশ্মিরী মাজি সেরূপ সাহসী ও সুদক্ষ নয়। সে এই প্রবল ঝাতা ও তরঙ্গের ভয়ে হ্রদের তটদেশে আলুস, কুনস প্রভৃতি যে সমুদয় নিরাপদ নোঙ্গরের স্থান থাকে বিকালের পূর্ব্বেই সে সকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা হ্রদ প্রবেশের মুখে নিঙ্গল নামক স্থানে আসিয়া থাকে। প্রাতে পুনরায় হ্রদে গিয়া সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ করে। যে সব বড় নৌকায় মাল ভর্ত্তি

হইয়া গিয়াছে সে গুলি অন্য কোথাও সময় ক্ষেপ না করিয়া নিঙ্গল হইতে তিন মাইল নিম্নে সোপর নামক স্থানে একবারে চলিয়া যায়।

কাশ্মীরে অনেক গরীব ও মধ্য বত্ত লোকের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পানিফলের আটা তৈয়ারী করে। কিন্তু পানিফল শিল্পের হিসাবে সোপরই কেন্দ্র স্থল। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশের মুখে বরামূলা নামক বড় সহর ও বাণিজ্যের স্থল হইতে আট মাইল উর্দ্ধে ঝিলম নদীর উভয় তীরেই সোপর সহর অবস্থিত। সোপর ক্ষুদ্র সহর, গৃহের সংখ্যা প্রায় ৭০০ ; এস্থলে ঝিলামের উপর একটি পুল,একটি প্রাচীন মসজিদ ও ডাক বাঙ্গলা আছে। মহাশের নামক রুইজাতীয় মাছ ধরার জন্যও এখান হইতে জলপথে কাশ্মীর উপত্যকার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিবার জন্য অনেকেই সোপরে যান। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীর অধিবাসীর পক্ষে ইহা একটি ব্যবসার স্থান। হ্রদজাত যাবতীয় পদার্থ—মাছ, পানিফল, শালুক ও পদ্ম মূল প্রভৃতি ক্রয় করিতে অনেক পাইকার এখানে আসে। শ্রীনগর যাইবার সফেদা তরুশ্রেণী শোভিত প্রসিদ্ধ রাস্তা হইতে একটি ছোট ধূলিময় রাস্তা দিয়া স্থলপথে সোপরে আসা যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, জীর্ণ ও নবনির্ম্মিত গৃহরাজির ভিতর দিয়া সর্প ভঙ্গিতে কতকগুলি বন্ধুর, অসংস্কৃত গলিপথ চলিয়া গিয়াছে। পানিফলের ত্বক সর্ব্বত্রই ছড়ান। নদীর নিকটে স্ত্রী-মাজিরা পানিফলের বোঝা নামাইতেছে। তীরের অনতিদূরে ভীষণ কোলাহলের মধ্যে পানিফলের সওদা চলিতেছে। ভিড়ের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতা ভিন্ন দর্শকের সংখ্যাও কম নয়। সাধারণতঃ গড়ে প্রায় ২॥—৩৲ মনদরে পানিফল পাইকারী বিক্রয় হয়। কিন্তু সময় বিশেষে ৫।৬৲ পর্য্যন্তও দর উঠে। ব্যবসায়ীরা পানিফল লইয়া গিয়া এক প্রকার বক্র ছুরি দ্বারা ছাল ছাড়াইয়া খোলা যায়গায় মাদুরের উপর শুকাইতে দেয়। সংগ্রহ কারীরা পক্ক ও অপক্ক, ছোট ও বড় পানিফল বাছেনা—সমস্তই মিশ্রিত করিয়া দেয় ; সেজন্য আটা কিছু খারাপ হইয়া যায়। ফল শুষ্ক হইলে ধানকোটার কাঠের উদুখলে কুটিয়া ফেলা হয়। তাহার পর আবার শুকাইয়া ও চালিয়া বড় বড় দানাকে কোটা হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর আটা এইরূপ শুষ্কীকৃত পানিফল চূর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় আটা গুঁড়াইবার আগে বড় বড় দানা গুলিকে ধুইয়া তন্তু-অংশ বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কাশ্মীরের খুব ভাল পানিফল আটাতেও অনেক তন্তু থাকে এবং মলিন শ্বেত অথবা পীতাভ বর্ণের হয়—অধিক দিন রাখিলে উহা ধূসর বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও পানিফলের আটা কাশ্মীরে একটি প্রধান আহার্য্য।—বিশেষতঃ শীতকালে গরীব কৃষক, মাজি ও জেলে প্রভৃতির ইহাই প্রধান অবলম্বন। ছাতু, চাপাটি, মিঠাই ও পিষ্টক রূপেই পানিফল ব্যবহৃত হয়। কি পরিমাণ পানিফলের আটা কাশ্মীরে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় ও অন্য দেশে কি পরিমাণ রপ্তানি হইয়া যায় তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াও আমরা সফল হই নাই। স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে

অবগত আছি যে এক বিঘা জল জমিতে প্রায় ৩½ মন পানিফল ফলে উলারের পানিফল-উৎপাদনের স্থান ২১০০০ বিঘার কম হইবে না। সুতরাং উৎপাদিত পানিফলের পরিমাণ ৭৩০০০ মনের অধিক হইবে। উলার ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থান হইতে যে সমুদয় পানিফল সংগৃহীত হয় সে সমুদয় একত্র করিলে কাশ্মীরে মোট পানিফল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ মণে দাঁড়ায়। কাশ্মীর হইতে সামান্য পানিফল আটাই পঞ্চনদে যায়। লাড়ক্ ও গিলগিটের দিকে কিছু পানিফল ছাতু যায় বটে কিন্তু তাহাও নিতান্ত কম। প্রায় সমস্ত আটাই দেশ মধ্যে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীরের পানিফল লইয়া যে একটি মাঝারি গোছের কল চলিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য।

পার্ব্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা সমতল দেশে পানিফলের আদর কম। ইহার কারণ—অনেক স্থানে পানিফল তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং গৌণ খাদ্য শস্য প্রভৃতি সহজে উৎপাদিত করা যায়। কচি পানিফল কাঁচা অবস্থায় অথবা রাঁধিয়া খাইতে বেশ সুস্বাদু। পাকিয়া গেলে শাঁষ অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে পানিফল শঠি, রাঙ্গা আলু, সিমুল-আলু-প্রভৃতির ন্যায় পুষ্টিকর। যে স্থলে ইহার ব্যবহারে অনিষ্ট-হইয়াছে-সেখানে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে আটা ঠিক উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হয় নাই। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত করিলে পানিফলের আটা ভুট্টার আটার সম্পূর্ণ সমকক্ষে হয়।

ব্যবসায়ের হিসাবে পানিফলের ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়াই বোধ হয়। পার্ব্বত্য-প্রদেশে অন্যান্য ফসলের তুলনায় পানিফল উৎপাদনে অতি সামান্য মজুরীই আবশ্যক হয়। এতভিন্ন বিল জলা প্রভৃতি জলময় পতিত স্থানে ইহার চাষ একটি আয়ের উপায়। চিনে পানিফল এতদ্দেশীয় পানিফল অপেক্ষা বড় হয়। এতদ্দেশেও ছোট বড় জাতির পানিফল দেখা যায়। উপযুক্ত জাতি নির্ব্বাচন করিয়া যদি রোপন করা যায় তবে পানিফলের ফসলে লাভ আছে। সহরাঞ্চলে কাঁচা পানিফল এবং পানিফলের পালোর কাটতি কম নয়। ফলের ত্বক ফেলিয়া না দিয়া ভুট্টার ডাঁটার সহিত যদি কুচাইয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য হয়। ইহাকে পচাইলে যে সার হয় তদ্বারা জমি আলগা হয়। কাদা মাটিতে উক্ত সারে শাক সব্জী ফসলের যথেষ্ট উপকার হয়।

[কৃষক-সম্পাদক লিখিত ও বোম্বাইর Indian Industries & Power পত্রিকায় প্রকাশিত "Waternut Industry of Kashmir" প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

কাক।

পশুগণের মধ্যে শৃগালের ন্যায় পক্ষীগণের মধ্যে কাক ধূর্ত্ততার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। যে খানেই মানুষের বসতি সে খানেই কাক বিদ্যমান। বড় বড় সহরের ত কথাই নাই। এক কলিকাতাতেই ১০ লক্ষের উপর কাক আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে যে ভয়ানক শিলা বৃষ্টি হয় তাহাতে এত কাক মরিয়া ছিল যে গড়ের মাঠ উহাদের মৃত শরীর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মফঃস্বলেও কাকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়—কারণ কাকের বিচরণ ক্ষেত্র—আবর্জ্জনাস্তূপ, আস্তাকুড় প্রভৃতির কোন গ্রামেই অভাব নাই।

লোকালয়ে দৃষ্ট বায়স সর্ব্বভুক। ক্ষিরের মিঠাই হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষির অস্থি-গলিত শব—কিছুই কাকের বাদ যায় না। অবশ্য চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারাই ইহার অধিকাংশ আহার্য্য সংগৃহীত হয়। চৌর্য্য বৃত্তিতেই ইহারা পরম আনন্দ অনুভব করে। ছেলে পিলে, গৃহ পালিত পশু এবং এমন কি অন্য কাকের নিকট হইতে চুরিই ইহার প্রধান ব্যবসা। অন্যান্য পক্ষির শাবক ও ডিম, সুবিধা পাইলে কাক ছাড়ে না।

কাকের যে সদ্গুণ নাই তাহা নয়। অন্য পাখি অপেক্ষা ইহার বুদ্ধি নিশ্চয়ই বেশী—কিছুক্ষণ বসিয়া ইহার গতি বিধি ও কুটিল কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়। নিঃস্বার্থ পরাপকার করিতে কাকের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। বিনা কারণে অন্যান্য পশু পক্ষীকে জ্বালাতন করিতে, কিম্বা নিজের পক্ষে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য ছোট ছোট জিনিষ পত্রাদি কাককে তুলিয়া লইয়া যাইতে অনেক সময় দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন বাগানেও ইহার উপদ্রব কম নয়—ছোট ছোট চারা তুলিয়া ফেলা, ফুল ছিঁড়িয়া দেওয়া, বীজ ঠোকরাইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া—এ সমস্ত কার্য্যে ইহা অন্য কর্ম্মের অবসরে নিযুক্ত থাকে।

পেঁচা দিনের বেলায় বাহির হইলে কাকের হাতে তাহার নিস্তার নাই। সাপের সম্বন্ধেও তাই; কাক, শালিক প্রভৃতি মিলিয়া তাহাকে এত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে প্রাণ লইয়া তাহার পলায়ন কঠিন হয়। গিরগিটি, বেঙ্গ প্রভৃতি অনেক সময় কাকের দল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারায়। কিন্তু কাক এসব খায় না। সুতরাং আক্রমণটা ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য নয়, শুধু অনিষ্টের জন্য বলিয়াই বোধ হয়।

গ্রীষ্ম আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্ব্বেই কাকেরা বাসা করিতে আরম্ভ করে। মাঘ ফাল্গুনে অনেক কাককেই বৃক্ষের কোটরে অথবা দুই ডালের সংযোগ স্থলে বাসা নির্ম্মাণে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। বাসার সৌন্দর্য্য অথবা পরিপাটি কিছুই নাই; কেবল

কতকগুলি কাঠ কাঠি প্রভৃতি ঘাস অথবা অন্য কোন কোমল বস্তু দিয়া জড়ান। অনেক অদ্ভুত রকমের জিনিষে কাককে বাসা প্রস্তুত করিতে দেখা গিয়াছে। শুধু টুকরা তার দিয়া কয়েকটি বাসা প্রস্তুত হইয়াছিল। বোম্বায়ে এক কাক দম্পতি সোনারূপার চশমার ফ্রেম দিয়া বাসা প্রস্তুত করিয়াছিল। উপাদানের দাম আনুমাণিক ৪০০৲ টাকা হইবে। যেখানে টিনের কারখানা আছে সেখানে টিনের টুকরা দিয়াও বাসা প্রস্তুত হয়। বাসা তৈয়ারীর সময় পুং কাক সকল সময়ই স্ত্রী-কাকের অনুগমন করে। মাঝে মাঝে অবসরের সময় ঠোঁট দ্বারা দ্বারা গলা চুলকাইয়া আদর হয়, কিন্তু তাহা বাসা তৈয়ারীর ব্যাঘাত করিতে পারেনা। ২,৩ দিনের মধ্যে বাসা প্রস্তুত হইয়া যায়। নব-নির্ম্মিত বাসায় স্ত্রীকাক ৪।৫টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ্গের অনেক তারতম্য হয়। আকার প্রায় দৈর্ঘে ১½ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১ ইঞ্চি।

ডিম পাড়ার সময়ই কাক কোয়েল দ্বারা প্রতারিত হয়। কোয়েলকে স্থানে স্থানে বসন্ত কোকিলও বলে। পুং কোয়েল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও লম্বা পুচ্ছ-বিশিষ্ট। স্ত্রী-কোয়েলের রং চক চকে কৃষ্ণ ও ধুসর বর্ণের মিশ্রণ; গায়ে সাদা দাগ ও রেখা আছে। স্ত্রী ও পুং কোয়েল যেরূপ ভাবে একযোগ হইয়া কাকের বাসায় একটি ডিম রাখিয়া আসে তাহা বাস্তবিকই কৌতুহলজনক। কাক কোয়েলকে আদৌ দেখিতে পারেনা—ইহা কোয়েল জানিয়া কাকের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাকে দেখিলেই কাক দম্পতি ক্রোধে অস্থির হইয়া পশ্চাদ্ধাবণ করে। কোয়েল কাক অপেক্ষা অনেক অধিক দ্রুতগামী। সেই জন্য কাক দম্পতিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে হয়। পুং কোয়েল এইরূপ ভাবে কাককে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলে স্ত্রী-কোয়েল সেই অবসরে উহাদের বাসায় প্রবেশ করিয়া একটি ডিম পাড়িয়া কুইল্—কুইল্ শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া যায়। সেই শব্দে পুং-কোয়েল বুঝিতে পারে যে কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তখন কোয়েল দম্পতি অন্যত্র চলিয়া যায়।

কাক তাহার শাবকগুলিকে খুবই যত্ন করে। পর্য্যায় ক্রমে একজন আহার অন্বেষণে যায় ও একজন বাসায় থাকে। এতদূর সাবধান হইবার কারণ এই যে কাক তাহার নিজের চরিত্র বিশেষরূপে জানে। কত বাসায় যে সে তস্করতা করিয়াছে, ডিমও শাবক চুরী করিয়াছে তাহা মনে পড়ে এবং তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিবেশী পাখিরা যে সুযোগ খুঁজিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারে। সেইজন্য বাসা ছাড়িয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয় ভাবিয়া সে সকল সময় জাগিয়া বসিয়া থাকে। অনেক পাখি বধ করা, বিশেষতঃ ডিম পাড়িবার সময় মারিয়া ফেলার বিরুদ্ধে একটি আইন আছে। কাক সে আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন কোন স্থানে কাকের বংশ বৃদ্ধিই বরং ভয়ের কারণ। আর তা ছাড়া কাক আত্মরক্ষা করিতেও যথেষ্ট সক্ষম। কিন্তু এমনও দেশ আছে যেখানে কাক প্রবর্ত্তন করিয়া সুফল হইয়াছে।—Agric ultural Journal of India, May, "House Crow" প্রবন্ধ অবলম্বণে লিখিত।

জিনিয়া ও গাঁদা।

বঙ্গ দেশে এই পুষ্পের চাষ দুইবার করা চলিতে পারে। প্রথমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে যখন প্রথম বৃষ্টিপাত হয় তখন একবার ইহাদের বপন করিয়া বৃক্ষোৎপাদন করিতে হয়। সেই সমুদয় গাছ বর্ষাকাল যাবৎ পুষ্পে উদ্যান আলোকিত করিয়া শীতের প্রারম্ভেই শুষ্ক হইয়া যায়। এবং দ্বিতীয় বার আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়; এই সময়ের গাছে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও বৃহত্তর পুষ্প গুচ্ছে সমুদয় শীতকাল ব্যাপিয়া মনঃ প্রাণ পুলকিত করিয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় বীজে চারা হয় বটে কিন্তু তাহাতে জিনিয়ার প্রকৃতি গত সৌন্দর্য্য লোপ-পাইয়া যায়। সেই জন্য বিদেশীয় ক্ষেত্রে বিদেশীয় উদ্যান রক্ষকের দ্বারা সংগৃহিত বীজ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। Landreth কোম্পানীর বীজ দরেও সুলভ এবং সমধিক কার্য্যকর। বীজ গুলি প্রথমে হাপরে চারাইয়া পরে একএকটি করিয়া ৬ ইঞ্চি টবে বসাইয়া প্রায় প্রায় ২০।২৫ দিন রাখিয়া বড় করিতে হয় তাহার পর পাতা-সার পূর্ণ কেয়ারিতে বসাইয়া ঈষৎ যত্ন করিয়া জল সেচনদি করিলেই অভিষ্ঠ মত ফুল পাওয়া যায়।

গাঁদাও বিবিধ আকৃতির ও বিবিধ বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। আদর করিলে সকলেই আদর রাখিতে জানে; গাঁদাই বা না রাখিবে কেন? ঈষৎ যত্ন করিলে গাঁদাও অতি আশ্চর্য্যজনক ফুল দিয়া থাকে। বিদেশীয় উদ্যান রক্ষকগণ নিজের দেশের পুষ্প সমূহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এ বিষয়ে একেবার উদাসীন। গাঁদা সম্বন্ধে আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়া সফল হইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

উৎকৃষ্ট গাঁদার বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে চারা উৎপাদন করিয়া লইতে হয়, পরে সেই চারাগুলি আন্দাজ এক বিঘত প্রমাণ বড় হইলে যত গুলি গাছ প্রয়োজন হইবে তত গুলি ছয় ইঞ্চি টব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দুই ভাগ দো আঁশ মাটি, একভাগ পাতাসার, অর্দ্ধভাগ গোময় সার ও অর্দ্ধভাগ বালির দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ গাঁদার চারার কেবল মাত্র ডগা গুলি কাটিয়া এক একটি করিয়া বসাইয়া নিয়মিত ভাবে জল সেচন করিতে হয়। পরে ঐ ডগা হইতে শিকড় বাহির হইলেও বড় হইলে উহাদের ডগা গুলি পুনরায় ঐরূপ সারময় মৃত্তিকা পূর্ণ ৬ ইঞ্চি টবে বসাইতে হয়। পুনরায় উহারা গাছ হইলে উহাদের ও ডগাগুলি পাত্রান্তর করুণ। এইরূপে ১৬ ষোলবার ৬ ইঞ্চি

টবে ঐরূপ করিয়া ডগা বসাইবার পর যে কমল উৎপন্ন হইবে সেই কমলগুলি এক একটি বড় আঠার ইঞ্চি টবে ২ ভাগ মাটি ১ ভাগ পাতাসার ও একভাগ গোময় সার দ্বারা পূর্ণ করতঃ রোপণ করিলে সেই গাছ গুলি যখন বড় হইবে তখন ইহাদের যে কি চমৎকার ফুল দেখিতে পাইবেন তাহা বর্ণনাতীত। একটি মাত্র ছোট গাছে স্তবকে স্তবকে নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া মন প্রাণ হরণ করিতে থাকিবে।

শ্রীহরি গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

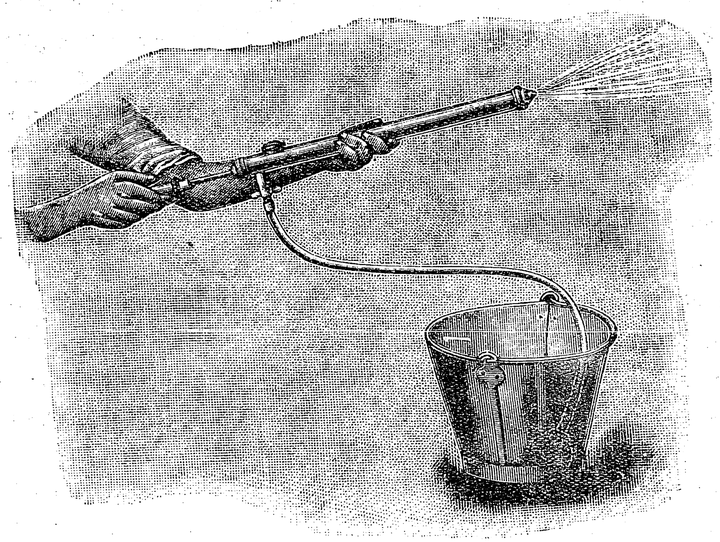

দেশের ও দশের কথা।

কালাস্কর কারখানা ঃ—বোম্বাই প্রদেশে ঔন্ধরাজ্যে কালাস্কর ব্রাদার্স লিমিটেড কোম্পানির কৃষিযন্ত্রাদির কারখানা আমাদের দেশের একটি গৌরবের বিষয়। ২২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কালাস্কর সামান্য বেতনে বোম্বাইর ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষকের কাজ করিতেন। অপরাপর দ্রব্যাদি যথা বোতাম, ছোট বাক্স, বাইসিকেলের অংশাদি প্রস্তুতে বিফল-মনোরথ হইয়া তিনি ১৩ বৎসর পূর্ব্বে মনস্থ করেন যে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্য তৎপরতা কৃষিযন্ত্রাদি প্রস্তুতে প্রয়োগ করিবেন। আবশ্যকীয় মূলধন ও জমি প্রভৃতির অভাবে অনেক দিন তাঁহাকে ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে ঔন্ধ অধিপতির অনুগ্রহে তিনি যথোপযুক্ত কারখানার স্থান ও অর্থ সাহায্য পান। এখন তাঁহার কারখানার স্থান ও রেলষ্টেসন উভয়ই কালাস্করবাড়ী নামে পরিচিত। প্রায় ৩০ বিঘা ব্যাপিয়া নানা প্রকার কল কব্জা চালাইবার গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে। কারখানায় অন্যূন ৪৫০ জন শ্রমিক কাজ করে এবং ইতিমধ্যেই কারখানা হইতে ৮০০০০ অধিক লোহার লাঙ্গল বিক্রয় হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার জমির হিসাবে ১০ রকমের লাঙ্গল প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন তিন প্রকারের আখমাড়া কল, বিচালী কাটা, জল তোলা ও ভূট্টার দানা ছাড়াইবার কলও এখানে প্রস্তুত হয়। ঠিক কৃষিযন্ত্র নয় এমন অনেক দ্রব্যও এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে যথা রেলিং, কামারের যন্ত্র ইত্যাদি। ১৯২০ সালে ১২ লক্ষ টাকা মূল ধন লইয়া একটি লিমিটেড কোম্পানি করিয়া এই কারখানায় কাজ চলিতেছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে, মহীশূর, হাইদ্রাবাদ, ভবনগর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে কালাস্কর লাঙ্গল ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তনে সুফলের আশা আছে। আমরা কালাস্কর কারখানার উত্তরোত্তর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করি।

একটি গাছে ১২টি মোচা ঃ—মেদিনীপুর জেলার অধীন তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মাগুরা গ্রাম নিবাসী শ্রীনাথ মাইতির কদলি বাগানে নানাবিধ কলাগাছ আছে। তন্মধ্যে একটি গাছে ১২টি মোচা হইয়াছে। গাছটি ২.৩ হাত লম্বা; ঐ কলা গাছটিকে দেখিতে অনেক লোক আসিতেছে। মোচার অঙ্কুর কোনরূপ ক্ষত প্রাপ্ত হইলে এরূপ হইতে পারে।

সর্প দংশনের চিকিৎসা ঃ—যে কোন প্রকার সর্পদষ্ট স্থানে ও তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে শ্বেত আকন্দের দুগ্ধবৎ রস প্রলেপ লাগাইয়া দিতে হইবে।

পরে তিন ফোঁটা উক্ত আকন্দের দুধ বা রস কিঞ্চিৎ ময়দাসহ বটিকা প্রস্তুত করিয়া দষ্টব্যক্তির জ্ঞান থাকিলে জলসহ সেবন করাইয়া দিতে হইবে। রোগীর জ্ঞান না থাকিলে উক্ত আকন্দরস ছয় ফোঁটা ও ডিষ্টিলড বা পরিষ্কৃত জল ৫৪ ফোঁটা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিরাপথে ইন্‌জেক্ট করিতে হইবে। বাহ্যিক প্রলেপ, সেবন বা ইন্‌জেকশন ইহার যে কোনটিই হউক, একবারের অধিক করা উচিত নয়। এই প্রক্রিয়ায় দুইটি গোক্ষুরসর্পদষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।—সোনার বাংলা

পতিত জমির চাষঃ—গোয়ালিয়র রাজ্যে অনেক পরিমাণ জমিতে জলাভাবে চাষ হয় না। সেই জন্য রাজ সরকার মনস্থ করিয়াছেন যে চম্বল নদীতে বাঁধ দিয়া খাল কাটিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিবেন। সর্ব্বশুদ্ধ খরচ হইবে প্রায় তিন কোটি টাকা; তাহার মধ্যে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগামী বৎসর কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নারিকেলের গুড়ঃ—বাংলায় নারিকেল গাছে তাড়ি অথবা গুড় প্রস্তুতের জন্য দাগ দেওয়া হয় না। কিন্তু নারিকেলবৃক্ষ-বহুল ভারতের পশ্চিম উপকূলে নারিকেল গুড় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন প্রথায় গুড়ে চুণের মাত্রা অধিক থাকায় গুড় প্রায়ই কালো হইত এবং চিনি প্রস্তুত করা যাইতনা। কয়েক বৎসর পরীক্ষার ফলে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে নারিকেল রস হইতে উৎকৃষ্ট চিনি হওয়া সম্ভবপর। রস হইতে শতকরা ১৪ ভাগ গুড় পাওয়া যায়; ভাল চিনি করিতে হইলে ৯½ ভাগ পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট অংশ গুড় ও চিটারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। নূতন প্রথায় বালির ভিতর দিয়া রস ছাঁকিয়া লওয়া হইতেছে এবং সামান্য পরিমান ফটকিরি সংযোগে চুণ অপসৃত করিবার উপায় পাওয়া গিয়াছে। নারিকেলের রসের সহিত খেজুর ও তাল রসের বিশেষ প্রভেদ নাই। এই নূতন প্রথা এ প্রদেশে অবলম্বিত হইলে অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

লাক্ষার কারবারঃ—বিস্তৃত ভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাক্ষা উৎপাদন করিয়া লাক্ষার কারবার করার জন্য একটি প্রস্তাব হইতেছে। প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লইয়া ৫০টি অংশীদার এই কার্য্যে যোগদান করিবেন। রাচি জেলায় ইহার জন্য অনেক জমি লওয়া হইয়াছে। তাহাতে আপাততঃ ১০০০০ কুসুম গাছ আছে এবং দশ হাজার বিঘাতে অরহরের চাষ করা যাইতে পারে। সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করার জন্য একজন বিলাতী অভিজ্ঞও নাকি ঠিক করা হইয়াছে। লাক্ষা ভারতের একচেটিয়া দ্রব্য বলিলেও চলে। নানা বিধ কার্য্যে ইহার প্রয়োগ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করায় ইহার চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ কার্য্যতঃ গালার কাজ নিরক্ষর লোকদিগের হাতেই আছে। শিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দ এই কাজে হাত দিলে অবশ্য বিশেষ উন্নতির আশা আছে। কিন্তু সেই প্রকার নিয়মিত কার্য্য ও আবশ্যক।

কৃত্রিম কাঠ—নরওয়ে দেশে একজন বৈজ্ঞানিক কাঠের করাতের গুঁড়ার সঙ্গে অন্য কিছু কিছু পদার্থ মিশাইয়া এমন চমৎকার কাঠ গড়িবার উপায় করিয়াছেন যে, সে কাঠ দিয়া আসল কাঠের মত সকল রকমের কাজ করা যায়; আবার মজা এই যে আসল কাঠে শীঘ্রই আগুণ ধরে, কিন্তু একাঠে আগুন ধরা খুব শক্ত।

বাৎসরিক বিজ্ঞান সভা—প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষের এক একটি বড় সহরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের সম্মিলন ও সভা হয়, এবং সেই সভায় নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রবন্ধ পড়া হয়। আগামী জানুয়ারী মাসে এই সভার অধিবেশন হইবে মাদ্রাজ অঞ্চলের বাঙ্গালোর সহরে, আর এবৎসর উহার পৃষ্ঠপোষক রহিবেন মহীশূরের অধিপতি। এবারকার এই সভার সাধারণ সভাপতি হইবেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সভাপতি হইবেন যথাঃ—(১) কৃষি বিষয়ে বি সি বার্ট (২) ফিজিক্স ও গনিতে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক—সি, বি, রমণ, (৩) কেমিষ্ট্রীতে—ডাঃ ই, আর, ওয়াটসন, (৪) প্রাণীতত্ত্বে—কে, এন্ বল, (৫) উদ্ভিদ বিদ্যায়—কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অঘোরকর, (৬) ভূতত্ত্বে—এইচ্ বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ (৭) চিকিৎসাতত্ত্বে—লেফটেনেণ্টে কর্ণেল ক্রিষ্টোফারস্, এবং (৮) নৃতত্ত্বে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় বাহাদুর—অনন্ত কৃষ্ণ আয়ার।

অপঘাত মৃত্যুঃ—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগে ভারতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এরূপে লোক ক্ষয় ত আছেই। তদ্ভিন্ন বন্য পশ্বাদি কতৃক ও অনেক লোক হত হয়। সরকারী রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে গত বৎসর ৩২৬৩ লোক বন্য পশুর আক্রমণে বিনষ্ট হয় এবং সর্প দংশনে ২০,০৯০ লোক মরে। বন্য পশুর মধ্যে বাঘ ভাল্লুক ইত্যাদি বাদে বন্য বরাহ, হাতি ৫৫,৯০ ও হড়ার ৯ মৃত্যুর জন্য দায়ী। ২২৫ জন কুমীরের গর্ভে যায়। এইরূপ অপঘাত মৃত্যুর সংখ্যা অপর প্রদেশে কমিলেও মান্দ্রাজ, ব্রহ্ম, আসাম ও বঙ্গে বাড়িয়াছে। পশ্বাদি দ্বারা লোক ক্ষয় নিবারণ কল্পে গবর্ণমেণ্ট, যাহারা বন্য পশু ও বিষধর সর্পাদি মারিয়া আনে তাহাদিগকে পুরস্কার দেন। গত বৎসর এই খাতে বন্য পশুর জন্য ২, ১০, ৬২২, ও সাপের জন্য ১২৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। নিম্ন লিখিত তালিকার দেখা যাইবে যে পশু যত মানুষ মারে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় তাহারা নিহত হয়ঃ—

	মনুষ্যের মৃত্যু সংখ্যা	পশুর মৃত্যু সংখ্যা
বাঘ	১৬০৩	১৭৬৬
চিতা	৬০৯	৬,১০৮

ভালুক	১০৫	৩১৮৮
নেকড়ে	৪৬০	১৬২৯

কিন্তু তাহা হইলেও পশুর জন্মের হার এত অধিক এবং দেশের লোকের অস্ত্র অভাবে এখন অসহায় অবস্থা যে প্রতি বৎসর প্রায় সিকি লক্ষ লোকের এইরূপ অপঘাত মৃত্যু হইয়া থাকে। গত বৎসর সর্প দংশনে ২০,০৯০ লোকের মৃত্যু স্থলে ৫৮,৩৭০ বিষধর মারিয়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু তবুও সাপের দৌরাত্ম কমিতেছে না। কিছু দিন পূর্ব্বে "সর্প তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে আমরা সাধারণের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করি। বস্তুতঃ সর্প বিষের এক মাত্র পরিক্ষীত বৈজ্ঞানিক প্রতিকার থ্যাণ্ট-ভেনিণ যাহাতে মফঃস্বলের সকল স্থানে সহজ প্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত।

দার্জ্জিলিঙ্গে যাদুঘর ঃ—দার্জ্জিলিঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যাদুঘর আছে তাহার সংস্কার ও পরি বর্দ্ধনের কথা হইতেছে। গঙ্গার উত্তরে বাংলার পশুপক্ষী ও উদ্ভিদের নমুনা, উক্ত যাদুঘরে প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্যে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য সম্পাদন বহু সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। সেইজন্য আপাততঃ দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইবে।

কৃত্রিম কাঠ—নরওয়ে দেশে একজন বৈজ্ঞানিক কাঠের করাতের গুঁড়ার সঙ্গে অন্য কিছু কিছু পদার্থ মিশাইয়া এমন চমৎকার কাঠ গড়িবার উপায় করিয়াছেন যে, সে কাঠ দিয়া আসল কাঠের মত সকল রকমের কাজ করা যায়; আবার মজা এই যে আসল কাঠে শীঘ্রই আগুন ধরে, কিন্তু একাঠে আগুন ধরা খুব শক্ত।

বাৎসরিক বিজ্ঞান সভা—প্রতি বৎসরই ভারত বর্ষের এক একটি বড় সহরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের সম্মিলন ও সভা হয়, এবং সেই সভায় নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রবন্ধ পড়া হয়। আগামী জানুয়ারী মাসে এই সভার অধিবেন হইবে মান্দ্রাজ অঞ্চলের বাঙ্গালোর সহরে, আর এ বৎসর উহার পৃষ্ঠপোষক রহিবেন মহীশূরের অধিপতি। এবারকার এই সভার সাধারণ সভাপতি হইবেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সভাপতি হইবেন যথা ঃ—(১) কৃষি বিষয়ে—বি সি বার্ট, (২) ফিজিক্স ও গণিতে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক—সি, বি, রমণ, (৩) কোষ্ঠিতে—ডাঃ ই, আর, ওয়াটসন, (৪) প্রাণী-তত্ত্ব,—কে এন্ বল, (৫) উদ্ভিদ বিদ্যায়—কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আঘারকর, (৬) ভূতত্ত্বে—এইচ্ বস্ওয়ার্থ স্মিথ, (৭) চিকিৎসা তত্ত্বে—লেফটেনণ্টে কর্ণেল ক্রিষ্টোফারস্, এবং (৮) নৃতত্ত্বে,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়বাহাদুর—অনন্ত কৃষ্ণ আয়ার।

গো-রক্ষণ ঃ—বোম্বাই সহরের মিউনিসিপ্যালিটি স্থির করিয়াছেন যে অতঃপর মিউনিসিপাল সীমানার ভিতর আর আট বৎসরের কম বয়সের গরু হত্যা করা হইবে না। এই নূতন আইনে হিন্দু মাত্রেই যে খুসী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল মিউনিসিপাল সদস্যের চেষ্টায় এই সংস্কার সাধিত হইল তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ। শ্বেতাঙ্গেরা কিন্তু ইহাতে চটিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে আইনের উদ্দেশ্য আদৌ সফল হইবে না; মিউনিসিপ্যালিটির বাহির হইতে উক্ত প্রকারের গোমাংস আসিয়া সহরে বিক্রয় হইবে। এতদ্ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংরক্ষিত গোমাংসের আমদানি বাড়িয়া যাইবে। সে যাহাই হউক, এই নব-প্রবর্ত্তিত বিধি দ্বারা তরুণ-বয়স্ক গরুর আমূল উচ্ছেদ সাধনে যে অনেক বাধা পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চিনের বাজারে ভারতের কার্পাস সূত্র ঃ—ভারতের তুল্য কল উৎপাদিত সূত্রের অনেক পরিমাণ চিনের বাজারে বহু দিবস হইতে বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। তথায় প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিল জাপানের সূতা। এখন শুনা যাইতেছে যে জাপান ১৬নং ও তাহার উপরের সূতা চিনে পাঠাইতেছে। পক্ষান্তরে ভারত হইতে ১৪নং ও তাহার নিচের সূতা যায়। সুতরাং এখন প্রতিদ্বন্দীতা জাপানী সূতার সহিত নয়—চিনের গৃহজাত সূতার সহিত। চিনে এখনও কলের সংখ্যা কম এবং সূতার চাহিদা অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য ভারতের সূতা বিক্রয় হইতেছে। নতুবা দেশীয় কার্পাস, কম মজুরী ও স্থানীয় বাজারের সুবিধা থাকায় চিনের সূতা অনায়াসেই ভারতের সূতাকে বিতাড়িত করিতে পারে। এই সময়ে চিনার বিদেশীয় বণিকগণ ধূয়া ধরিয়াছেন যে সাধারণ দৃষ্টিতে ভারতের সূতার মূল্য কম হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। ভারতের সূতা চীনের সূতা অপেক্ষা ওজনে কম, দেখিতে ময়লা এবং সহজে কাটিয়া যায়। তাঁহারা আশা করেন যে শীঘ্রই ভারতের সূতার চিনের বাজার হইতে তিরোভাব হইবে। wish is the father to the thought—যে যে রকম ইচ্ছা করে সেই রকমই ভাবিতে সে ভালবাসে। অনেক তথাকথিত ভারত-হিতৈষী ভারত-জাত দ্রব্য যদি পৃথিবীর কুত্রাপি না চলে তাহা হইলে বিশেষ সুখী হন।

গ্রন্থ-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

হাড়ের গুঁড়া সার।

সর্ব্বত্র রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া চামারদিগের একটী ব্যবসা। কলিকাতায় হাড় গুঁড়া করিবার ৪।৫টী কল আছে। এই হাড়ের গুঁড়া এদেশে অতিশয় কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং প্রায় সমস্তই বিলাত, মরিষস প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

কলের তৈয়ারী হাড়চুর ৮।১০ রকম আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চুর ঠিক ছাতুর মত। হাড় চুর প্রতি মণ ৫।৬ টাকা দরে কলিকাতায় বিক্রয় হয়। এত অধিক দরে হাড় চুর কিনিয়া সার স্বরূপ ব্যবহার করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষক ইচ্ছা করিলে ঢেঁকী দ্বারা হাড় চুর অতি সস্তা দরে তৈয়ারী করিতে পারে। মফঃস্বলে গোটা হাড় চামারদিগের নিকট হইতে ॥০ মণ দরে কিনিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে আরো কম দরেও পাওয়া যাইতে পারে। পূরাতন হাড় হইলে ঢেঁকী দ্বারা গুঁড়া করিতে মণ করা ॥০ বেশী খরচ পড়ে না। সুতরাং যদি ১ মণ গোটা হাড় ॥০ দরে কিনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে ১ মণ হাড় চুর ১৲ মূল্যে তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

পূরাতন হাড় নরম ও সহজেই চুর্ণ হয়; কিন্তু কাঁচা হাড় চুর্ণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কাঁচা হাড় চুর্ণ করিতে হইলে উহাকে প্রথমতঃ পচাইয়া লইলে সুবিধা হয়। দোঁয়াশ মাটী, ক্ষার কিম্বা ঘোড়ার নাদীর সহিত সমান ভাগে হাড় মিশাইয়া রাশীকৃত করিয়া উহার উপরি ১ হাত পুরু করিয়া মাটী চাপা দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে উহা চোনা কিম্বা জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ২।৩ মাস ভিজা থাকিলে হাড় পচিয়া নরম হইবে, পরে উহা ঢেঁকী দ্বারা সহজেই গুঁড়া করা যাইবে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের যত্নে হাড়চুর সারের উপকারীতা অনেক স্থলে প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা ফসলের বৃদ্ধি হয় দেখিয়া আজকাল অনেক হিন্দুরাও উহা হাতে করিয়া ব্যবহার করিতে আপত্তি করেনা।

হাড় চুর সার সকল প্রকার ফসলের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে আউস ধান, আমন ধান, পাট, গম, যব, আক ও আলু এই কয়েকটী ফসলে হাড় চুর ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

হাড় গোবরের ন্যায় নরম নয়। ইহা জমীতে দিবা মাত্র ফল পাওয়া যায় না। যে কোন সার হউক না কেন না পচিলে ফসলের উপকার করে না। হাড় শক্ত জিনিষ,

পচিতে কিছু সময় লাগে; সুতরাং জমীতে যখন ফসল জন্মিবে তাহার কিছু পূর্ব্বে দেওয়া দরকার। আর এক কথা, জমীতে রস থাকা দরকার; শুষ্ক জমীতে হাড় পচিবে না। উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখা চাই। যে জমীতে অধিক পরিমাণে ঘাস ইত্যাদি জন্মে সেই জমীতে হাড়চুর শীঘ্র পচিয়া যায় ও উপকার দর্শায়। অনেক ধান ক্ষেতের মাটী পচিয়া ফুলিয়া উঠে; সাধারণতঃ উঁহাকে "কাদামারা" কহে। এই প্রকার জমীর পক্ষে ও হাড়চুর অত্যন্ত উপকারী।

আউষ ধান, বোনা আমন ধান ও পাটে হাড়চুর সার দিতে হইলে চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথম ১ কি ২বার লাঙ্গল দিবার পরে সার ছড়াইয়া দিতে হইবে। পরে লাঙ্গল ও মইএর দ্বারা সার জমীর সহিত মিশিয়া যাইবে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হইবা মাত্র হাড় মাটীতে পচিবে ও ফসলের উপকার করিবে। রোপা আমন ধানের জমীতে ও প্রথম ২।১ বার লাঙ্গল দিয়াই সার দিতে হইবে।

গম, যব ও আলু প্রভৃতি যে সমস্ত শস্য শীতকালে হয় সেই সমস্ত ফসলে হাড়চুর দিতে হইলে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ২।১ বার লাঙ্গল দিয়া হাড়চুর ছড়াইয়া দিবে। লাঙ্গল দিতে না পারিলেও জমীর উপর মোটা দানার চুর ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মূল কথা—বর্ষা শেষ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে হাড় প্রয়োগ করা দরকার; নতুবা পরে জমী শুকাইয়া গেলে উহাতে হাড়চুর দেওয়া না দেওয়া প্রায় সমান ফল, কারণ হাড় শুষ্ক মাটীতে পচিতে পায়না।

আকের জমীতে হাড়চুর দিতে হইলে পৌষ ও মাঘ মাসে যখন আকের জমী চাষ করা হয় তখন দিতে হইবে। আক পুতিবার সময় দিলে ও ক্ষতি নাই। যতক্ষণ বৃষ্টি না হয়, কিম্বা জল সেচন না করা যায় ততক্ষণ হাড়চুর সমভাবে থাকে, জল পাইলে পচিবে ও উপকার দেখাইবে। যদি আকের ডগা নালী কাটিয়া বসান হয় তাহা হইলে ডগা পুতিবার পূর্ব্বে শুদ্ধ নালী গুলিতে হাড়চুর ছড়াইলে চলিবে। ইহাতে সার অল্প লাগিবে ও উহার অপব্যয় হইবে না।

বিঘা প্রতি (বিঘার মাপ ৮০ হাত লম্বা ও ৮০ হাত প্রস্থ) নিম্ন লিখিত হিসাবে হাড়চুর দিলে উত্তম ফল পাওয়া যাইতে পারে:—

ধান পাট গম যব	... ...	১ মণ।
আলু	... ...	২ মণ।
আক	... ...	২ মণ হইতে ৪ মণ।

বীরভূম জেলাতে হাড়ের গুঁড়ার এত অধিক প্রচলন যে নিম্নলিখিত ছড়াটি কাহারও কাহারও মুখে শোনা যায় ঃ—

হাড়ের গুড়া উত্তম সার ধানের ক্ষেতে ভাই।
জমীর উপর দিলে পরে দ্বিগুন ফল পাই॥
গোবর বল, খৈল বল, কিছুই কিছু নয়।
এই গুড়াতে ধানের ফলন যেমন বেশী হয়॥
খরচ হিসাব করে দেখলে বেশী কিছু নয়।
চাষের অধিক খরচ ফলনে পুষে যায়॥
প্রথম বৃষ্টির জল জমীতে পড়িলে।
সমভাবে ছড়াইবে চষিবার কালে॥
এক মণ হাড় গুঁড়া এক বিঘা জমীতে।
ধান ক্ষেতে ছড়াইবে বৈশাখে কি চৈতে॥
যত আগে দিবে ক্ষেতে তত পাবে ফল।
পচিলেই বেড়ে যায় এ সারের বল॥
কেহ কেহ ব্যবহার না জেনে না শুনে।
রোপনের আগে দেয় জমীতে শ্রাবণে॥
পায়না হাড়ের গুঁড়া সময় পচিতে।
দ্বিতীয় বৎসরে ফল হয় গো তাহাতে॥
ধান ছাড়া আখে কিম্বা পাটেতেও চলে।
ফল ফুলে ভরা চাই আর যে ফসলে॥
প্রয়োগের বিধি রেখো সাবধানে মনে।
প্রথম লাঙ্গল দিবে বতরের সনে॥
হাড়চুর মাঠা হয়ে মাটীতে মিশিবে।
দুর্গন্ধের লেশ কভু টের না পাইবে॥

শ্রীরাজেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম-সাময়িক জগত।

তরল কয়লা ঃ—প্যারি সহরের মিউনিসিপাল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারের বিশেষজ্ঞ, মুসা ক্লিং কয়লাকে দ্রবীভূত করার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কারবরেটেড্ হাইড্রোজণের মধ্যে কয়লার গুঁড়া নিক্ষেপ এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপ ও উত্তাপ প্রয়োগ করা এই উপায়ের ভিত্তি। অবশ্য এই নূতন প্রথাটি পেটেণ্ট করা হইবে। ফলতঃ ইহা দ্বারা মোটর গাড়ী চালানর ও অন্যান্য যে সকল স্থানে তরল জ্বালানির আবশ্যক হয় সেরূপ স্থলে বিশেষ সুবিধা হইবে।

কৃত্তিম চুল ঃ—সম্প্রতি জর্ম্মণিতে কাচের সূক্ষ্ম তন্তু প্রস্তুত করিয়া ও তাহা রাঙ্গাইয়া যে কৃত্তিম চুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহা দেখিতে ঠিক প্রাকৃতিক চুলের ন্যায়। এই কৃত্তিম চুলে যে পরচুলা তৈয়ারী হইতেছে তাহা দেখিয়া কেহ সহজে নকল চুল বলিয়া ধরিতে পারিবেন না। ইহা স্বাভাবিক চুলের ন্যায়ই হালকা। সকল প্রকার রঙ্গের এবং সাদা অথবা কোঁকড়ান উভয় রকমেরই চুল প্রস্তুত হইয়াছে। কৃত্তিম চুলের চলন পাশ্চাত্য সুন্দরী মহলেও কম নয়। আসল চুলের পরচুলাতে তাঁহাদের বিস্তর ব্যয় হইত। এখন নকল চুল লইয়া তাঁহারা সহজে সখ মিটাইতে পারিবেন।

মৎস্য দ্বারা ম্যালেরিয়া দমন ঃ—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে বিশেষতঃ আমেরিকার অনেক স্থানে মৎস্য দ্বারা মশক কীড়া নষ্ট করিবার ধারাবাহিক চেষ্টা বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৯২০ সালে পেরুতে জ্বরের প্রকোপ ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পায়। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে সেই জন্য প্রতি দেড়মণ জলে ২৪টি ক্ষুদ্র মৎস্য ছাড়িয়া দিয়া ও দেশের খাল বিল পুকুর প্রভৃতি সমস্ত জলাশয়ে এই হিসাবে মৎস্য বিতরণ করিয়া মশক কুল ধ্বংশের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ফলে দেখা যায় যে জুলাই মাস নাগাদ দেশে জ্বর প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। মোটের মাথায় ৭৫০০০০ মৎস্য বিতরিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আবার জ্বরের প্রাদুর্ভাব না হয়, সেইজন্য এবৎসরও আবার "fish drive" অর্থাৎ মৎস্য দিয়া মশা তাড়াইবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ মৎস্যই যে বিপুল-ভোজী তাহা অনেকেই জানেন। মশক জলাশয়ের তীরেই ডিম পাড়ে এবং কীড়া প্রথমাবস্থায় জলেই থাকে। সুতরাং জলাশয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মৎস্য থাকিলে মশক কীড়াকে আর মশা হইয়া উড়িয়া যাইতে হয় না; মৎস্যের উদরেই তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ হয়। পুঁটি, বাটা, টেংরা, পাবদা প্রভৃতি মাছ এই কাজের জন্য বিশেষ উপযোগী। শোল শালও বহুল পরিমাণে কীটাদি খায় বটে

কিন্তু ইহারা ক্ষুদ্র মৎস্যও খাইয়া ফেলে। সেজন্য ইহাদের প্রসার ততটা বাঞ্ছনীয় নয়। ফলতঃ এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরীক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আনারস ব্যবসায়ঃ—অযত্নে উৎপাদিত হইয়াও আনারস অনেক গরিব গৃহস্থকে অল্প বিস্তর লাভ দেয়। ব্যবসায় হিসাবে আনারস উৎপাদন কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেই হইয়া থাকে। এক হাওয়াই দ্বীপে যে আনারস উৎপাদিত হয় তাহার পরিমাণ বৎসরে ৬০ লক্ষ বাক্স এবং মূল্য ১০ কোটি ডলার। এই সমস্ত দেশের আনারস ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। এখন আবার ৭৫০০০ বিঘা জমিতে নূতন করিয়া আনারস বসান হইতেছে। বড় বড় ক্ষেত্রের সঙ্গে আনারস সংরক্ষণের কারখানা আছে। টিনের ভিতর সংরক্ষিত আনারস পৃথিবীর নানা স্থানে চালান যায়। অতি অল্প চেষ্টাতেই এতদ্দেশে অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপাদন করিতে পারা যায়। হাউয়াইতে জলাভাবে যে সব জমি পতিত ছিল সেই সকল জমিতেই আজ কাল আনারস উৎপাদিত হইয়া দেশে প্রচুর ধনাগম হইতেছে।

উদ্ভিদের আহার্য্যঃ—বিলাতের সুবিখ্যাত রথামষ্টেড্ নামক কৃষি-ক্ষেত্রে বহুবৎসরব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশ উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য ১১টি মূল পদার্থ আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে আটটি সকল জমিতেই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে নাইট্রোজেনের অভাব সচরাচর দৃষ্ট হয়, ফসফরাস সম্বন্ধেও প্রায় তাহাই বলিতে পারা যায়। পটাশ সাধারণতঃ কম পরিমাণে না থাকিলেও অনেক জমিতে ইহারও স্বল্পতা আছে। নাইট্রোজেনের সাহায্যে উদ্ভিদ্ তাহার মূল, পত্র ও শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে, , ফসফরাস পুষ্প ও ফল পরিপুষ্টির সহায়তা করে। পটাশিয়ম দ্বারাও কোন কোন ফল বিশেষ উপকার লাভ করে কিন্তু পটাশিয়মের প্রধান কাজ উদ্ভিদে কার্ব্বণ সঞ্চয় ও কাষ্ঠ দৃঢ়ীভূত করিয়া পরমায়ু বৃদ্ধি করা। কোন সার প্রয়োগ করার সময় উদ্ভিদের প্রকৃতি ও জমির অবস্থা উভয়ই বিবেচনা করা দরকার।

উন্নতিশীল ওলন্দাজ রাজত্বঃ—হল্যাণ্ডের সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি প্রতীচ্য সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ শস্য সমৃদ্ধিতে প্রতীচ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছে। যাভা চিনির কথা ত সকলেই জানেন। ইক্ষু ব্যতীত এই সমস্ত দেশে রবর, তামাক, নারিকেল, কাফি, চা, সাগু, সিমুল তুলা, গোলমরিচ ও সিঙ্কোনা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে ৫০ বৎসর আগে এই সমুদয় ফসলের মধ্যে ২।৪টি মাত্র উক্ত দেশ সমূহে উৎপাদিত হইত—তাহাও অতি সামান্য মাত্রায়। বাকি সবগুলিই গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের জলবায়ু অবশ্য নূতন ফসলগুলির পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইত না, যদি ওলন্দাজ রাজসরকার একটি নির্দ্দিষ্ট পথ

অবলম্বন করিয়া অকাতরে অর্থব্যয় না করিতেন। উদ্ভিদ পরীক্ষাগার. বোটানিক গার্ডেন, প্রবর্ত্তন ক্ষেত্র, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিয়া এবং ধারাবাহিকরূপে প্রতিবৎসর চাষের বিস্তার করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সিঙ্কোনা, চিনি, কোপ্রা প্রভৃতি উৎপাদনে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবাসী দ্বারের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াও এখনও উদ্যমহীন।

জল হাওয়া ও ফসল।

তিল ঃ--বপনের সময় জলাভাবে তিল ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টিতে তাহা কতকটা শুখাইয়া যায়। এবার ১১৩০০০ একরে অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ৩০০০ একর অধিক জমিতে তিল বোনা হইয়াছে। একর প্রতি ৬ মন ৫ সের হিসাবে ফসল ধরিলে এবার প্রায় ১৬,৬০০ টন তিল উৎপাদিত হইবে। স্বাভাবিক ফসলের তুলনায় এবার প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ ফসল হইবে।

কার্পাস ঃ—এবৎসর নিখিলভারতের তুলা ফসল সম্বন্ধে যে প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯২৩-২৪ সালে অনুমান ১,২৩,৭৩,০০০ একর জমিতে তুলা চাষ হইবে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ১৩৮০০০ একর কম। অন্য দিকে বর্ত্তমান বৎসর মার্কিণে সম্ভবতঃ ৪০০ পাঃ গাঁটের ১,৩৭,৭৬,০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইবে। ইহাও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫,৩৫,০০০ গাঁট কম।

ইক্ষু ঃ—১৯২৩-২৪ সালের নিখিলভারতের ইক্ষু ফসলের প্রথম বিবরণী বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩২৩০০০ একর বৃদ্ধি পাইয়া এবৎসর আকের জমি ২৭,১৫,০০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভারতের অভাবের পক্ষে এ জমির ফসল যথেষ্ট নয় এবং জগতের শর্করা ফসলের হিসাবেও যে ইহা সামান্য, তাহা এই বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ১৯২১-২২ সালে সমস্ত জগতে ১,৭৬,৬২,০০০ টন পরিষ্কৃত চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। এবৎসর আরও ২৭১০০০ টন অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতে একর প্রতি ১ টনও পরিষ্কৃত সাদা চিনি হয় না।

জল বায়ু ও ফসল।

নানা স্থানে বন্যা ঃ—ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই যথেষ্ট বারি পাতের জন্য স্থলে স্থলে বন্যা দেখা দিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি স্থানে বন্যায় সমধিক ক্ষতি হইয়াছে। মাদ্রাজের উদীপি হইতে মাঙ্গালোর পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল পরিমিত দেশে অল্প বিস্তর জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে ৯,৬১২ ঘর পড়িয়া গিয়াছে, ৪৭৮১০ জন গৃহ হীন হইয়াছে ও প্রায় বার হাজার লোককে খাইতে দিতে হইতেছে। অনুমান এক লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষতি ইহাপেক্ষা আরও অধিক হইবে বলিয়া মনে হয়।

আরা জিলায় যে বন্যা হইয়াছে তাহাতে ৩০বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ডুবিয়া গিয়াছে। এক তৃতীয়াংশ লোক গৃহহীন ও অন্নহীন হইয়া পড়িয়াছে। রেল লাইনের কিয়দংশ ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলের সমস্ত খবর এখনও জানা যায় নাই। লোকের যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে তাহা নিশ্চয়।

ভাগলপুরের বন্যাও কম ক্ষতিজনক হয় নাই। নাথ নগর হইতে সাবুর পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তয় তীর প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। উত্তর তীরেই ক্ষতির পরিমাণ অধিক। অনেক পরিবার বাড়ি পড়িয়া যাওয়ায় রাস্তার ধারে আসিয় বসিয়াছে। সরকার হইতে তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুখের বিষয় যে মাড়োয়ারীরা বন্যা-পিড়ীত ব্যক্তিগণের সাহায্য কল্পে ৫০০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কিছু টাকা উঠিবার আশা আছে।

ভ্রম—সংশোধন।

ছাপাখানার ভূল বশতঃ বর্ত্তমান সংখ্যায় 'কচুরীপানা সমস্যা' ও 'পানিফল' ঠিক স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। একটি অপরটির স্থান অধিকার করিবে। 'দেশের ও দশের কথার মধ্যে'ও 'কৃত্রিম কাঠ' ও 'বাৎসরিক বিজ্ঞান সভা' ডবল কম্পোজ হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

সার সংগ্রহ

বঙ্গদেশের লৌকিক তথ্য—পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা দেশের লোকসংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে, নীচে তাহা দেখান হইল।

বৎসর	লোকসংখ্যা	দশবৎসরে শতকরা	বৃদ্ধি
১৮৭২	৩, ৪৬, ৮৭, ০০৩		
১৮৮১	৩, ৭০, ১৪, ৬২১	(১৮৭২-১৮১১)	৬.৭
১৮৯১	৩, ৯৮, ০৫, ৫২৭	(১৮৮১-১৮৯১)	৭.৫
১৯০১	৪, ২৯, ৮১, ৩৫৯	(১৮৯১-১৯০১)	৭ ৭
১৯১১	৪, ৬৩, ০৫, ১৭০	(১৯০১-১৯১১)	৮.০
১৯২১	৪, ৭৫, ৯২, ৪৬২	(১৯১১-১৯২১)	২.৮

যদিও মোটের উপর সমগ্র-বঙ্গে লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু অনেক জেলায় লোক কমিয়াছে। কোথায় শতকরা কত কমিয়াছে লিখিতেছি। বর্দ্ধমান ৬'৫, বীরভূম ৯'৪, বাঁকুড়া ১০'৪, মেদিনীপুর ৫'৫, হুগলি .৯, নদিয়া ৮, মুশিদাবাদ ৮, যশোর ১.২, পাবনা ২'৭, মালদহ ১'৮। বৃদ্ধির সংখ্যাও দিতেছি। হাবড়া ৫'৭, কলিকাতা ১'৩, চব্বিশ পরগণা ৮, খুলনা ৬'৭, বগুড়া ৬'৬, দার্জ্জিলিং ৬.৫, রংপুর ৫'১, জলপাইগুড়ি ৩'৭, দিনাজপুর ১, রাজশাহী .৬, ঢাকা ৮'৩, মৈমনসিং ৬'৯, ফরিদপুর ৪'৮, বাখরগঞ্জ ৮'২, ত্রিপুরা জেলা ৯'৭, নোয়াখালি ১৩, চট্টগ্রাম ৬.৮, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ১২.৬, এবং ত্রিপুরা রাজ্য ৩২.৬। বাংলা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হারে বাড়িয়াছে।

১৯১১ সালে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে আগ্রাঅযোধ্যা প্রদেশের লোকসংখ্যা অধিকতম ছিল। তাহার পরবর্ত্তী দশবৎসরে ঐ প্রদেশের লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় ১৯২১এর গণনা অনুসারে বাংলার লোকসংখ্যা উহা অপেক্ষা দশ লক্ষ বেশী হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে বঙ্গের লোকসংখ্যাই সকল প্রদেশের মধ্যে অধিকতম। অথচ ভারতগবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ বাংলাদেশকে বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে এত বেশী পরিমাণে বঞ্চিত করেন, যে, বঙ্গের প্রজাদের জন্য বাংলাগবর্ণ্‌মেণ্ট জন-প্রতি যত খরচ করিতে পারেন, তাহা অন্য সমুদয় প্রদেশে অপেক্ষা কম।

সমগ্র বঙ্গে পুরুষদের গড় আয়ু ২৩'৯ বৎসর, স্ত্রীলোকদের ২৩.১। জাপানে ও ইংলণ্ডে ইহার প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের চেয়ে ইংরেজ ও জাপানীদের কৃতিত্ব বেশী হইবার একটি প্রধান কারণ।

১৯১১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক ছিল; ১৯১২ সালে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩২ জন স্ত্রীলোক।

হাজারে ব্রহ্মদেশে ৩০৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, বঙ্গে ১০৪, মান্দ্রাজে ৯৮, বোম্বাইয়ে ৮৩, আসামে ৬৩, বিহার উৎকলে ৫১, পঞ্জাবে ৪৫, আগ্রা-অযোধ্যায় ৩৭।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে লিখনপঠনক্ষম হাজারে ১৪৩, বর্দ্ধমান বিভাগে ১২৭, চট্টগ্রাম বিভাগ ও ত্রিপুরা রাজ্যে ৯৩, ঢাকা বিভাগে ৯০, এবং রাজশাহী বিভাগ ও কুচবেহারে ৭৫।

পশুচারণ ও কৃষি চারি-পঞ্চমাংশ অধিবাসীর উপজীব্য। শতকরা ৭॥০ জন কারিগরী, কলকারখানার মজুরী ও মূলধনী প্রভৃতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহা হইতে দেশের দারিদ্র্যের একটি কারণ বুঝা যায়। শুধু কৃষিতে শতকরা ৮০ জনের দিন গুজরান্ হইতে পারে না। মাল ও মানুষ বহা দ্বারা শতকরা ১॥০ এবং ব্যবসা দ্বারা শতকরা ৫ জন জীবিকানির্ব্বাহ করে। হাজারে ৪ জন পুলিস্ ও ফৌজে কাজ করে; অন্য দেশের তুলনায় ইহা খুব কম। অন্য সরকারী কাজে হাজারে ৩ জন লোক নিযুক্ত আছে। ইউরোপীয় দেশসকলের তুলনায় ইহাও খুব কম। অথচ আমাদের এই বদনাম ইংরেজ ও অন্যেরা করে, যে, আমরা কেবলই সরকারী চাকরী করি বা খুঁজি।

বাংলাদেশ যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে এখানে যে শতকরা একজন মাত্র মানুষ ভিক্ষা-বৃত্তি, গণিকাবৃত্তি বা অন্যবিধ অনুৎপাদক কাজ করে, ইহা অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে।

বাংলায় শহরের সংখ্যা ১৩৫, গ্রামের ৮৯৫২৫। অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষ ২,৪৬,২৮,৩৬৫, স্ত্রীলোক ২,২৯,৬৪,০৯৭। প্রবাসী, শ্রাবণ।

বিলাতী বেগুন। (টোমাটো)—নিরামিষ বা আমিষ-ভোজী উভয়েই বিলাতী বেগুন খাইয়া থাকেন এবং ইহা অতি সহজেই চাষ করা যায়; কাজে কাজেই ইহার চলন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা ভাল লক্ষণ বলিতে হইবে, কারণ বহু খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন—

(ক) ফলমূল মধ্যে ইহাতে ভাইটামিন সর্ব্বোপেক্ষা বেশি পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

(খ) সকল খাদ্য মধ্যে ইহার রক্ত পরিষ্কারক গুণ অধিক।

(গ) ইহার অম্লরস, পাকস্থলি এবং অন্ত্রকে স্বাভাবিক রূপে কার্য্য করিবার উত্তেজনা দেয়।

(ঘ) মুত্র কোষকে (kidney) উত্তেজিত করিয়া প্রস্রাব পরিষ্কার রাখিতে এবং তদ্বারা শারীরিক সকল রূপ বিষ বা ময়লা দূরিভূত করিতে ইহা খুব কার্য্যকরী।

মনে হয় এই ফলটীর (কেহ কেহ কেহ ইহাকে শাক সবজির মধ্যে গণনা করেন, আর কেহ কেহ ফল বলিয়া বিবেচনা করেন) আমাদের খাদ্যের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করা উচিত। স্বাস্থ্য, শ্রাবণ।

পটলের মোরব্বা ঃ—ইহা করিতে হইলে খুব বড় বড় নিরেট পটল বাছাই করিয়া লইতে হইবে। পটল ফোঁপরা, জলে ফেলা, চোপ্‌সা গোছের হইলে ফাটিয়া যায়—জিনিস ভাল হয় না। বেশ ধারাল ছুরি অথবা বঁটী দ্বারা এই পটলগুলির খোসাগুলি পরিষ্কার করিয়া ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে, এবং পটলগুলির কেবল একটী পাশ চিরিয়া ফেলিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন পটলগুলি একেবারে গলিয়া বা ভাঙ্গিয়া না যায়। তাহার পর জল হইতে তুলিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে পটলের বীজগুলি, যে একধারে চিরিয়া দেওয়া আছে, সেইদিকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। এই পর্য্যন্ত করিয়া পটলগুলিকে স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে।

তাহার পর উনানে জল ও চিনি চড়াইয়া রস প্রস্তুত করিতে হইবে। যে প্রণালীতে মিছরী প্রস্তুত করিবার সময় গাদ কাটিরা পরিষ্কার রস করিতে হয়, সেইরূপে রস প্রস্তুত করিয়া সেই রসে পটলগুলিকে দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। পটলের মোরব্বার রস যদি খুব ঘন দানাদার—যেমন কুমড়ার মিঠাই প্রস্তুত হয়,—সেই প্রকারের হয়, তাহা হইলে ১০।১২ দিন কি আরও ২।১০ দিন থাকিতে পারে। কিন্তু সে প্রকারে এ জিনিসটী খাইবার বেশ সুবিধা হয় না, মিষ্টির পরিমাণ অধিক হইয়া যায় ; ইহা স্বাভাবিক ; সেইজন্য ইহা অনেকে পছন্দ করেন না। কিন্তু যদি রস খুব ঘন না করিয়া মাঝামাঝি গোছের করা যায়, তাহা খুবই সুন্দর হয়। তবে ইহা খুব এয়ার-টাইট করিয়া রাখিলে ৮ দিন ত বেশই থাকে ; আরও বেশী দিন রাখিলে একটু গন্ধ হয়, যদিও খাওয়া চলে।

এখন এই রস হইতে সাবধানে পটলগুলি তুলিয়া লইয়া, তাহার যে ধারে চিরিয়া বীজ গুলি বাহির করা হইয়াছিল, সেই দিকে পটলের ভিতর বাদামের কুচি, পেস্তার কুচি, কিস্‌মিস, বড় এলাচের দানা ২।৪টী, টুকরা টুকরা ছোট ছোট' মিছরীর দানা প্রবেশ করাইয়া দিয়া, পুনর্ব্বার রসে ফেলিয়া দিয়া রাখিয়া দিবেন। এইরসে একটু ভাল গোলাপ জলের ছিটা বা মাত্র ২ ফোঁটা উৎকৃষ্ট গোলাপের আতর দিলে মনোরম গন্ধ হইবে। এগুলি কোন এনামেল পাত্রে বা পাথরের পাত্রে বা মুখ চওড়া কাচের শিশিতে রাখিয়া দিতে হয়। সচরাচর আমরা পাঁচপোয়া পটলে ৴১ দানাদার চিনি দিয়া থাকি। মোরব্বা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিলে এই চিনির রসটার দ্বারা মোহন ভোগ, পায়স প্রভৃতি করা যাইতে পারে, নষ্ট হইবে না।

ব্যবসা হিসাবে প্রস্তুত করিলে ইহার প্রতিসেরে কত খরচ পড়ে তাহাও দেখাইতেছি !

১ সের পটল	৶১০
চিনি ৴৮০	৷৶১০

বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্, মিছরী	
এলাচ ইত্যাদি	৷৴০
গোলাপ-জল বা আতর অন্ততঃ	৴০
	৸৶০
পারিশ্রমিক	৷০
মোট—	১৶০

বাজারে কুমড়ার মিঠাই ১৷০—১৷৷০ টাকা সের বিক্রয় হয়, ইহা ১৷৷০ হইতে ২৲ বিক্রয় করা যায়। বলা বাহুল্য, ইহা ভাল রসগোল্লা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জিনিষ হইবে।

শ্রীগোরাচাঁদ দত্ত।

কাজের লোক, মে, ১৯২৩।

মাছ—বাঙ্গালীর মৎস্য প্রধান এবং প্রিয় খাদ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে মাছের মধ্যে Phosphorus আছে, সেই জন্য মস্তিষ্কের এবং চক্ষের পক্ষে মাছ অত্যন্ত উপকারী, এবং ইহা Proteid diet পর্য্যায়ভুক্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে মাছ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হইয়াছে।

রোহিত মৎস্য—রক্তোদর, রক্তচক্ষু, রক্তপক্ষ, কৃষ্ণপুচ্ছ, ঝষশ্রেষ্ঠ এবং রোহিত এই কয়েকটী পণ্ডিতগণ একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। রোহিত মৎস্য সকল মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শুক্রবর্দ্ধক, অর্দ্দিত, রোগনাশক, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত মধুর রস, বায়ুনাশক, ঈষৎ পিত্ত-কারক। রোহিত মৎস্যের মস্তক উর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক।

শিলন্দমাছ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, মধুর বিপাক, গুরু, বায়ুপিত্ত নাশক, হৃদয়গ্রাহী এবং আমবাতজ।

ভেট্‌কীমাছ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্ত-নাশক।

বোয়ালমাছ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, নিদ্রাজনক, রক্তদূষক এবং পিত্ত ও কুষ্ঠ-রোগজনক।

শিঙ্গীমাছ—বায়ুপ্রশমক, স্নিগ্ধ, কফপ্রকোপকারক, তিক্ত কষায়রস, লঘু এবং রুচিকারক।

ইলিশমাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফজনক, কিঞ্চিৎ লঘু, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু-নাশক।

কইমাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, কফনাশক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

বাইণ মাছ—বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক এবং লঘু।

এরং মাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য এবং লঘু।

বড় পুঁঠী মাছ—তিক্ত, মধুর রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, শীতল, রুচিকারক এবং বায়ুর স্বধর্ম্ম-সংস্থাপক।

গরাইমাছ—মধুর তিক্ত কষায় রস, বাতপিত্তনাশক, কফঘ্ন, রুচি-কারক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক এবং বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

মাগুরমাছ—বায়ুনাশক, বলকারক, শুক্রজনক, কফকারক এবং লঘু।

টেঙ্গরামাছ—মেধাজনক, মেদক্ষয় কারী, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক এবং রুচিজনক।

পুঁঠিমাছ—তিক্ত, কটু, মধুর রস, শুক্র কফ ও বায়ুনাশক, মুখরোচক ও কণ্ঠরোগ নাশক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক এবং লঘু।

ক্ষুদ্রমৎস্য—মধুর রস, ত্রিদোষ-নাশক, লঘুপাক, রুচিকারক এবং বলজনক। ইহা সর্ব্ব প্রকারে হিতকর।

অতিক্ষুদ্রমাছ—পুংস্ত্বনাশক, রুচিজনক এবং কাশ ও বায়ুনাশক।

মাছের ডিম্—অত্যন্ত শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, কফ, মেদ, বল ও গ্লানিজনক এবং প্রমেহ-নাশক। বঙ্গসাহিত্য

বৃষ্টি-জল। পৃথিবীর সকল দেশে সমান বারিপাত হয় না। গ্রেট ব্রিটেনে বৎসরে প্রায় ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডে বাৎসরিক বৃষ্টি পতন গড়ে ৩৩·৭৬ তেত্রিশ দশমিক ছিয়াত্তর, স্কট্‌ল্যাণ্ডে ৩৬·৫৬ ছয়চল্লিশ দশমিক ছাপ্পান্ন এবং এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে ৩৮·৫৪ আটত্রিশ দশমিক চুয়ান্ন ইঞ্চি মাত্র।

আমাদের দেশের মধ্যে আসাম অঞ্চলেই বেশী বৃষ্টি হয়। ঐ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বৎসরে ৪০০ ইঞ্চিরও অধিক বৃষ্টি পড়ে। খাসিয়া পর্ব্বতে সম্বৎসরে ৬০০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বারিপাত হইতে শুনা যায়।

ঋতু-ভেদেও বৃষ্টি পতনের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পারিস সহরে শীতকালে ৪·২ চারি দশমিক দুই ইঞ্চি বৃষ্টি পাত হয়, কিন্তু নিদাঘ কালে ঐ স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬.৩ ছয় দশমিক তিন ইঞ্চি।

বৃষ্টি-জলের মাপ নির্ণয় করিবার এক প্রকার যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রের নাম "রেন্ গেজ্" (Rain-gauge); ঐ যন্ত্র বিবিধ আকারের হইতে পারে। "রেন্ গেজে" বৃষ্টির মাপ এক ইঞ্চি হইলে প্রতি একার (কিঞ্চিদধিক ৩ বিঘা) জমিতে জলের পরিমাণ একশত এক টন্ (ton) হয়।

বারিপাতের মাপ (measure) এবং জমির ক্ষেত্রফল জানা থাকিলে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে অতি সহজে জলের পরিমাণ (amount) স্থির করিয়া লইতে পারি :—

$$\frac{\text{যত ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে} \times ১৪৪ \times \text{জমির বর্গফুট}}{১৭২৮}$$

= কিউবিক্ ফুট জল।

এক কিউবিক্ ফুট জলের ওজন ৬·২৩ গ্যালন।

ভূপৃষ্ঠে যে জল পতিত হয় তাহার কিয়দংশ তথা হইতে বাষ্পাকারে বায়ুতে মিশিয়া যায়; কিছু মাটীর ছিদ্র পথ দিয়া মৃত্তিকা গর্ভে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্টাংশ নদী, হ্রদ ও তড়াগাদিতে যাইয়া সঞ্চিত হয়।

বায়ুর গতি, তাপ ও শুষ্কতার তারতম্যানুসারে জল অল্প বা অধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। মৃত্তিকা গর্ভে জল শোষণ কার্য্যটীও নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে :—

(১) বৃষ্টির বেগ।

(২) জমির দৃঢ়তা, ছিদ্রবহুলতা ও সমতলত্ব।

(৩) জমির উপরিস্থ উদ্ভিদ নিচয়ের সংখ্যা ও প্রকৃতি।

(৪) ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালীর অবস্থিতি।

বালুকা ও কঙ্করময় ভূমিতে শতকরা ৯০ ভাগ, খড়িমাটীতে ৪০ ভাগ এবং লাইম-ষ্টোনে (Lime-stone) ২০ ভাগ জল শোষিত হইতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র মাস।

কৃষিক্ষেত্র—যে সকল জমিতে শীতকালে ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সারমিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতি পূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুন চাষী খোঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপে চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীত কালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষ আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট পাটনাই শালগম ও গাজর, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী, তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখন চলিতেছে।

বীজ নারিকেল হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান—বালসম (Balsam), জিনিয়া (Zinnia), কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

২৪ খণ্ড } কৃষক—ভাদ্র, ১৩৩০ সাল। { ৫ম সংখ্যা

সুন্দরবণের স্বাভাবিক সম্পদ।

গঙ্গার-ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তই সুন্দর বন নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে ইহার নাম সুন্দরী বন হওয়া উচিত এবং বোধ হয় সুন্দরী গাছের প্রাধান্য দেখিয়া আগেও ইহার সুন্দরী বনই নাম করণ হইয়াছিল। সে যাহা হউক অনেক রূপে এই ভূখণ্ডের বিশেষত্ব আছে। এস্থলে যে উদ্ভিদ সমষ্টি দেখা যায় ইহার সিমানা পার হইয়া গেলে সে গুলির আর তেমন প্রাচুর্য্য নাই; ইতর জীব জন্তুর মধ্যে কয়েকটি সুন্দর বনেই বাস করে। বাংলার অন্যস্থানে বড় দেখা যায় না। আর এত নদী, নালা, খালবিল-বহুল স্থান ভারতের অন্য কুত্রাপি বিরল। সমুদ্র ও বৃহৎ নদীর সঙ্গম স্থলে কিরূপে ধীরে ধীরে মৃত্তিকা প্রস্তুত হইয়া প্রথমে সামান্য জীব জন্তু ও উদ্ভিদ্, পরে উচ্চতর শ্রেণীর গাছ ও প্রাণী এবং অবশেষে মানবের বাসযোগ্য হয়—তাহা অনুশীলন করিতে হইলে সুন্দরবনের ন্যায় বিশাল স্বাভাবিক প্রদর্শন ক্ষেত্র আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।

বাংলার তিনটি জেলার—২৪-পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ—দক্ষিণাংশ লইয়াই সুন্দর-বন। প্রস্থে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও দৈর্ঘে সুন্দরবন প্রায় ২০০ মাইল ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহার মোট বর্গ ফল ৭০০০ বর্গ মাইলের কম হইবেনা। পশ্চিমদিকে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে মেঘনা সুন্দর বনকে বাংলার অন্যান্য উপকুল জেলার সহিত বিভাগ করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ ভাবে সুন্দর বনকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব সুন্দরবন। এই ভাগগুলি যথাক্রমে ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাখর-

গঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। তিনটি ভাগেরই সাধারণ দৃশ্যে ও উদ্ভিদ এবং প্রাণী সমষ্টিতে অল্প বিস্তর বিশেষত্ব আছে। এখনও সুন্দরবনের অধিকাংশ জলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিপূর্ণ। দ্বীপগুলি জোয়ারে একবারেই ডুবিয়া যায় অথবা সামান্য পরিমাণে জলের উপর জাগিয়া থাকে। আজকাল পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে অনেক জঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ চলিতেছে, কিন্তু সেগুলি সমুদ্র হইতে অনেক দূরে। কেবল পূর্ব্ব প্রান্তেই হরিণ ঘাটা ও পদ্মানদীর মধ্যবর্ত্তী অংশে একবারে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত চাষের বিস্তার হইয়াছে।

ব্যাঘ্র, কুম্ভীর ও বিষধর সর্পের আবাস ভূমি সুন্দরবন সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে। কিন্তু তাহা হইলেও পর্য্যাপ্ত ধান্য ফসল, অগণিত সংখ্যায় মাছ এবং কাঠ প্রভৃতি বনজাত দ্রব্যের লোভে অনেক বাঙ্গালীই সুন্দরবনে যাতায়াত করে। সুন্দরবনের যে সমস্ত অংশ চাষ হইয়াছে সেগুলিকে সাধারণ কথায় লাট অথবা আবাদ বলে। প্রতি বৎসর ধান চাষের সময় বহুসংখ্যক মজুর এই আবাদে যায় এবং চাষ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বসতি বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যে সংখ্যায় লোকে চাষের সময় সুন্দর বনে যায় তাহার অনুপাতে, অতি কম ব্যক্তিই উক্ত স্থলে ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া থাকে। তাহারা ধান কাটা শেষ হইলেই চলিয়া আসে।

সুন্দর বনের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানের জমি একাধিকবার উঠিয়াছে ও নামিয়াছে। সুতরাং চিরকালই এই অঞ্চল যে নিবিড় জঙ্গলময় ছিল তাহা বলা যায়না। বরং মন্দাবাড়ী নদীর পশ্চিম তীরে, জাঠা প্রভৃতি স্থানে পুরাতন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয় যে কোন সময়ে সুন্দর বনের বিশেষ বিশেষ স্থলে সমৃদ্ধিশালী জনপদ সমূহ বিরাজ করিত। ইহা অবশ্য জানা আছে যে অন্তহীণ জলপথ, দুর্গম বন প্রভৃতির সুবিধা পাইয়া বহুদিন ধরিয়া লবণ চোর ও ডাকাতগণ এই স্থানকেই তাহাদের প্রধান আড্ডা করিয়াছিল। যেখানে এই শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল সেখানে উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ ও কয়েক জাতীয় প্রবর্ত্তিত উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য সুন্দরবনে শান্তি বিরাজ করিতেছে; জল পথে কিম্বা স্থলে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া ধন প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও অধিবাসীগণকে জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ ও গাছে সাপের ভয়ে থাকিতে হয়। এ হিসাবে কুলী মজুর অপেক্ষা, কাঠুরিয়া ও ধীবরগণের বিপৎ পাতের সম্ভাবনা অধিক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সুন্দর বনের উদ্ভিদ সমষ্টির বিশেষত্ব আছে। গরাণ ও ভোরা সুন্দর বন এবং ভারতের অন্য ২।৪ টি উপকূল প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। তরল অথবা ঈষৎ কঠিন কর্দ্দমের উপরেই ইহারা জন্মিয়া থাকে এবং বহু সংখ্যক বায়ব্য মূল দ্বারা নিজেদিগকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে। যেখানেই

কর্দ্দমাক্ত জমির আধিক্য, যেমন পশ্চিম ও মধ্য সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে, সেই খানেই গরাণের আধিক্য। পক্ষান্তরে পূর্ব্বাংশে নানাপ্রকারের ঘাস ও নল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমূহ অধিকার করিয়া আছে। কোন কোন স্থানে বড় গাছের জঙ্গলে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ সামান্যই আছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে সুন্দর বনের গাছ আকারে খুব বড় হয় না। গোলপাতা, হেতাল, পসর, কাঁকড়া, গেঙ্গোয়া, বাঁই প্রভৃতি, এ স্থলের বিশিষ্ট উদ্ভিদ্, তাহার দৃষ্টান্ত। বাঁইর বেড় প্রায় ১২-১৫ ফিট এবং উচ্চতা ৪০-৬০ ফিট হয় এবং ইহাই এখানকার বড় গাছ। প্রবল মরসুম বায়ুর প্রভাবে অধিকাংশ গাছই খর্ব্ব ও বক্রাকার ধারণ করিয়াছে। অধিকাংশ গাছেরই বিশেষত্ব—তাহাদের মূল প্রণালী ও মূল হইতে উৎপন্ন ঘন ঋজু উর্দ্ধগামী Root suckers। মূল গাছ হইতে উহার শিকড় এমন কি দেড় শত ফিট পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ঘণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে Root suckers (শোষনী মূল) বহির্গত হয়। এক একটি গাছের এইরূপ অপেক্ষাকৃত বিশালমূল প্রণালী না থাকিলে অর্দ্ধ কঠিন মৃত্তিকায় গাছ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না, এবং শোষনী মূল নমনীয় যষ্টির ন্যায় তরল মৃত্তিকার উপর বাহির হইয়া না থাকিলেও উদ্ভিদের শ্বাস প্রশ্বায় ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া যাইত। বস্তুতঃ এইরূপ মূল প্রণালীও আশ্চর্য্য রকমের শ্বাষযন্ত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থায়ই ফল।

উদ্ভিদের ন্যায় সুন্দরবনের পশ্বাদির তেমন বিশেষত্ব নাই। তবে এ স্থানের পশুসমষ্টিও কম কৌতুহলজনক নয়। বন্য শূকর, হরিণ ও মহিষের দল চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঘের ত কথাই নাই। সুন্দর বনের বড় বাঘের (Roy al Tiger) বলবীর্য্য ও চাতুরী সম্বন্ধে অনেক গল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল খাল ও ফাঁড়িতে কুমীর বর্ত্তমান। পাতরাজ সাপ (Snake eating cobra) অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণ কেউটে, গোক্ষুরা ও অন্যান্য সাপের সংখ্যাও কম নয়।

সুন্দরবনে অনেক প্রকারের পাখীও পাওয়া যায়; তবে অবশ্য বক বগলা জাতীয় পাখীর সংখ্যাই অধিক। উত্তরাংশের দিকে তিতর বটের প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠ, নানাপ্রকারের মাছরাঙ্গা প্রভৃতি পাখীও স্থানে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। সুদৃশ্য পালকের জন্য পাখী শিকার করা যাহাদের ব্যবসায় সেই শ্রেণীর শিকারীর সুন্দরবনে এখনও আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু বসতির বৃদ্ধির সহিত আবির্ভাব হইবার দেরিও নাই। উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ সামান্য মূলধন লইয়াই সুন্দরবনে পাখীচাষের কাজ করিতে পারেন এবং তাহাতে লাভ হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে কীট জাতির সংখ্যা অগণিত বলিলেও চলে। অধিকাংশই অবশ্য গাছের শত্রু, কিন্তু কয়েক জাতির দ্বারা, যেমন গোবরা পোকা, আবর্জ্জনা পরিষ্কার ও মৃত্তিকা প্রস্তুতের কাজও হয়।

তেলিনী পোকাও (Cantharides flies) এক এক স্থলে অনেক পাওয়া যায়। ইহা গায়ে বসিলে চামড়া ফোস্কা হইয়া যায়। কিন্তু সংগ্রহ করিলে এগুলি ব্যবসায়ের জিনিষ এবং বাজারে উত্তম দরেও বিক্রয় হয়। লোকে কিন্তু এখন সোনা পোকা ভিন্ন অন্য কোন পোকাই সংগ্রহ করে না। কীট পতঙ্গের কথা বলিতে গেলে মৌমাছির কথাও বলিতে হয়। সুন্দরবনে প্রভূত পরিমাণে মৌচাক হয় ও মধু সংগ্রহের জন্য বহু লোককে জঙ্গলে মৌমাছির ঝাঁকের পিছনে ছুটিতে দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে নানাপ্রকারের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এই সমস্ত লোকে যেরূপ প্রাণপণে মধু সংগ্রহ করে তাহার অনুপাতে সামান্যই তাহাদের লাভ হয়। অনেক মধু সংরক্ষন ও শোধন প্রথার অজ্ঞানতা হেতু নষ্ট হইয়া যায় এবং মোমও উপযুক্তরূপে সংগৃহীত হয় না। রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া এবং আধুনিক যন্ত্রাদি লইয়া যদি কেহ এই কাজে হাত দেন তাহা হইলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং নদীর মোহনার ও সমুদ্রের মাছের সুন্দরবনে অভাব নাই। বস্তুতঃ আবাদে সময়ে সময়ে কুলি মজুরগণের মধ্যে যে উদরাময় মড়ক দেখা দেয় তাহার প্রধান কারণই অসম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত অপর্য্যাপ্ত মৎস ভক্ষণ। শীতকালে বাছাই করিয়া নানা-প্রকারের মাছ কলিকাতার বাজারে আসে। বড় বড় নৌকার সহিত খাঁচা সংযুক্ত করিয়া দিয়া মাছ ও কাঁকড়াও আনা হয়। ধীবরেরা শুঁটকি ও লোণা মাছের কাজও অল্প বিস্তর মাত্রায় করে। কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতার মহাজনগণ দাদন দিয়া খোসা ছাড়ান শুটকি চিংড়ির কাজ করিতেছেন। চীন, ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই দ্রব্যের চাহিদা খুবই অধিক। এই কয় প্রকারে মৎসের কতক সদ্ব্যবহার হইলেও ইহা বলিতে পারা যায় সে ধৃত মৎসের অনেক পরিমাণ নষ্ট হইয়া যায়। বন্দোবস্ত ও ত্বরিত চালানের অভাবে অনেক মাছ ভাল অবস্থায় বড় বড় কাটতির স্থানে আসিতে পারেনা। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎসও মৎসজাত দ্রব্যাদির কারবার করিলে মালাবার উপকুলে মাছের কারবার যেরূপ লাভজনক হইয়াছে এখানেও সেই রকম হইতে পারে। সুন্দরবনের কাঁকড়াও প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বাজারে বড় বড় ডিম ওয়ালা কাঁকড়া এমন কি এক একটা দু তিন আনা দরে বিক্রয় হয়। এ গুলির চালানেও লাভ আছে। লাটদারগণের পক্ষে কাঁকড়া কিন্তু সব সময় শুভ নহে। নানাজাতীয় কাঁকড়া সুন্দরবনে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কোন কোনসময়ে ইহারা যখন দল বাঁধিয়া উপরে উঠিতে থাকে তখন কোন বাধা বিঘ্নই গ্রাহ্য করেনা; বড় বড় বাঁধের ভিতর গর্ত্ত করিয়া নিজেদের রাস্তা করিয়া লয়। কাকড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভেড়ী ভাঙ্গিয়া লোণা জল ঢুকিয়া চাষ নষ্ট হওয়া আবাদের বিরল ঘটনা নহে। এজন্য চকদার গণকে সকল সময় কাঁকড়ার দলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আপাততঃ সুন্দরবনে ধান চাষ ব্যতীত অন্যতম আয়ের আকর বণজ দ্রব্যাদি। ধান ব্যতীত অন্য কোন ফসল এস্থানে উৎপাদন করিতে পারা যায় কিনা তৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে—কারণ যে বৎসর ধান না হয় অথবা কম হয় সে বৎসর চকাদারগণ অনন্যোপায় হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে সুন্দরবনের ব্যবহারিক পরিনতির (economied development) উপায় একমাত্র কৃষি নহে। রাস্তা ঘাটের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে এস্থলে অন্যান্য শিল্পেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বনজ দ্রব্য সম্বন্ধে এখনও কিছুই করা হয় নাই। সরকারী বণবিভাগ কেবলমাত্র জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, খড়, ঘাস প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াই কর্ত্তব্য সাধন করেন। কিন্তু তন্তু, কাগজ প্রস্তুতের উপাদান, কষও রঞ্জক পদার্থ, সুরা ও শর্করা প্রভৃতি প্রস্তুতের কাঁচা মাল সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আমাদের শিল্প বিভাগের চেষ্টায় কতিপয় সুন্দর বনের উদ্ভিদ্ হইতে কষ ও রং প্রস্তুতের উপযোগীতা সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্তু এখনও ব্যবসায়ের হিসাবে কোন ফল পাওয়া যায় নাই। গোলপাতার এখন কেবল পাতাই প্রধানতঃ বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহা হইতে শর্করা ও শিল্পে ও মোটর প্রভৃতি চালাইবার উপযুক্ত সুরা পাওয়া যাইতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমানিত হইয়াছে এবং গোলপাতার স্পিরিট প্রস্তুত সেখানে এখন একটি চলতি শিল্প। বণজ উদ্ভিদাদির মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট তন্তু প্রদান করিতে পারে; পেটারি, বন চেঁড়স, চেলওয়া, ঝনঝনি প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। পসর, ডাকর ও চকণ বীজ যথেষ্ট পরিমাণে তৈল উৎপাদন করিতে পারে। অনেকগুলি ঘাস ও নল মাদুর, ঝুড়ি, পেটারা ও গৃহসজ্জা প্রস্তুতের উপযোগী। ফলতঃ মৎস ও মৎসজাত দ্রব্যাদি, কষ ও রঞ্জক পদার্থ সার, দেশলাই, দড়িদড়া, সার, শর্করাও সুরা এবং তৈল—এই কয় শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার অনেক উপাদানই সুন্দরবনের জঙ্গলে আজকাল অনাদরে নষ্ট হইতেছে। ভারতীয় শিল্পের এই নব অভ্যুত্থানের সময় সুন্দর বনের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

WATER DAMAGE

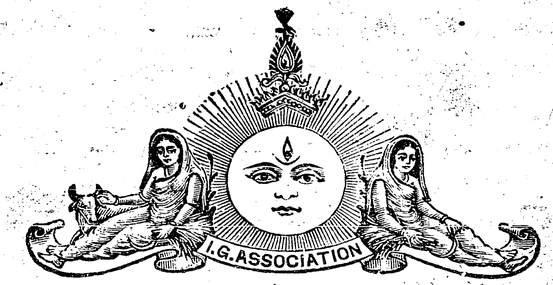

কৃষক—ভাদ্র, ১৩৩০ সাল।

কৃষি ও অন্নকষ্ট।

শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই অন্ন সমস্যা বড় কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেকারের (unemployed) সংখ্যা সর্ব্ব স্থানেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং কিরূপে জন সাধারণের অন্ন সংস্থান হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। আমাদের নিজের কথা বলিতে গেলে স্পষ্টই বলিতে হয় যে সাধারণ বাঙ্গালী যুবকের অন্ন পাওয়া কঠিন হইয়াছে। এত বড় কলিকাতা মহানগরী, যাহাকে ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহা নগরী বলা হয় এবং যাহার গৌরবে বাঙ্গালী নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে, সেখানেও বাঙ্গালীর অন্ন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। সুদূর মাড়োয়ার, পাঞ্জাব, অন্ধ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উৎকল ও বিহার হইতে শত শত ব্যক্তি আসিয়া কলিকাতায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দেশেই নিরুপায়। প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সে ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। বিগত আদম-সুমারীর রিপোর্ট দেখিলে এ কথার যার্থাত্য সকলই বুঝিতে পারিবেন। আবার এইরূপ বেকারের দল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধ্যেই অধিক। বর্ত্তমান জীবন যাপনের মূল্যের (cost of living) অতিবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যেরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে সেরূপ বোধ হয় আর কোন জনশ্রেণীই হয় নাই।

পাড়াগাঁয়ে, মফঃস্বসলের ক্ষুদ্র সহর সমূহে জীবন সংগ্রামের এই ভীষণ চিত্র নয়ন-গোচর না হইলেও বড় বড় নগরে আজকাল ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যেটুকু

সামান্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি ছিল তাহা হইতে সে অনেক দিন অবসর গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল কলিকাতার মুদি, ময়রা, ফিরিওলা ক্ষুদ্র দোকানদার প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্তই কম। হুগলি, হাবড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়ও এইরূপ অবস্থা ক্রমশঃ দাঁড়াইতেছে। তৎপরে চাকরীর বাজার। অনেকেই বদনাম করিতেন যে বাঙ্গালীরা, কেরাণীগিরি করিতেই পটু। কিন্তু এখন কলিকাতার যে কোন বড় আফিসে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে যেখানে সবই বাঙ্গালী ছিল, সেখানে কত মান্দ্রাজী, ভাটিয়া ও পাঞ্জাবী আসিয়াছে। এই সমুদয় বঙ্গের বাহিরের লোকের আগমনে বাঙ্গালী যে শুধু অনেক সংখ্যক চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতেছে তাহা নয়, প্রতিদ্বন্দীতায় পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালীর পক্ষে অল্প বেতনে পরিবার প্রতিপালন করাও দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কারণ অন্যান্য প্রবেশর ভারতবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীর জীবন যাপনের মূল্য অধিক। যে পরিমাণ অর্থে একটি মাড়োয়ারীর পরিবার দিন কাটাইতে পারে, সেই পরিমাণ অর্থে একটি বাঙ্গালী পরিবারের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ সংকুলাণ হওয়া কঠিন।

এই অন্ন সমস্যা ও বেকারবৃদ্ধির প্রতিকার কি? অনেকেই শিক্ষার দোষ দিতেছেন। তাহার অবস্থার তুলনায় যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালী সন্তান লেখা পড়া শিখে তাহাতে সাংসারিক হিসাবে তাহার কোন উপকার হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য(economic value) কিছুই নাই, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সেই জন্য বৃত্তি শিক্ষার (Vocational education) উপর আজ-শিক্ষিত সমাজের এত নজর পড়িয়াছে। যে কয় বৎসর বিপুল শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া বাঙ্গালী যুবক শুধু Cultural শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সে সময়টা যদি কোন বিশেষ বৃত্তি শিক্ষায় নিযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে সংগ্রামে এত অভিভূত হইয়া পড়িতে হয় না। এতৎ প্রসঙ্গে অনেকেই পরামর্শ দিতেছেন যে আবার গ্রামে ফিরিয়া যাও, কৃষি কার্য্য কর, তাহাতে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে পারিবে। কাপ্তেন পিটাভেল একটি কৃষি-উপনিবেষের মতলবও করিয়াছেন এবং সমবায় প্রথার তথায় কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

কিন্তু ইহা মনে রাখা দরকার যে বাংলার শত করা ৮০ জন এখনই জীবন যাপনের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। শুধু কৃষির দ্বারা কোন দেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। পুরাতন ভারতে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট ও অন্য প্রকারের অনেক শিল্প ছিল বলিয়া ভারত তখন জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমান ইংলণ্ডও এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে। কৃষির উপর যে ভদ্র সন্তানগণের দৃষ্টি পড়ে ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এরূপ ধারণা সাধারণের মনে জন্মাইয়া দেওয়া

WATER DAMAGE

ঠিক নয় যে কৃষি কার্য্য অত্যন্ত সোজা ব্যাপার। যেখানেই খানিকটা জমি পাওয়া যায় সে খানেই চাষ করিয়া বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিগত কয়েক বৎসরের মধ্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বিফল-মনোরথ হইয়াছেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারমান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক বেকার প্রশ্ন আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে জীবিকা উপার্জ্জনের প্রতিদ্বন্দীতায় বাঙ্গালীর হটিয়া যাওয়ায় অন্যতম কারণ এই যে সে Soft job অর্থাৎ 'আয়েসের' কাজ চায়। এই উক্তিটি ভিত্তিহীন নহে। যে সকল কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় সংকল্প ও মৌলিককতা আবশ্যক সেরূপ কার্য্যে যে বাঙ্গালী নাই তাহা নহে। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী যুবক আজকাল জীবন যাপন যে একটা ঘোরতর সংগ্রাম তাহা যেন উপলব্ধি করিতে পারে না; কোন্ কার্য্যে সামান্যতম মানসিক অথবা কায়িক ক্লেশ হইবে তাহাই যে খুজিয়া বেড়ায়। যদি সকল বাঙ্গালীরই মানসিকতা এইরূপ হইত তাহা হইলে আমরা বাঙ্গালীর উন্নতির আশা রাখিতাম না। সুখের বিষয় এই যে এইরূপ কষ্টসাধ্য কার্য্য দূরে পরিহার করার ভাবটা সহরবাসী অথবা সহরের প্রভাবের অধীন বাঙ্গালীর কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। যাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ তাঁহারা কৃষি কার্য্যে যে কখন সফলতা লাভ করিবেন না তাহা স্থির নিশ্চয়। কারণ কৃষি অত্যন্ত কঠিন মনিব। প্রায় রাতদিন তাহার সেবা করিতে হয়, এখানে আফিসের মত বাঁধা সময় নাই এবং পারিশ্রমিকের ও নির্দ্দিষ্ট হার নাই। সকলই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সময়োপচিত কার্য্য কলাপের উপর নির্ভর করে।

ইহা মনে করা ঠিক নয় যে যে কোন প্রকারের কৃষি কার্য্য করিয়া ভদ্রসন্তান জীবন যাপন করিতে পারেন। সাধারণ ধান চাষ করিয়া কৃষক যে পরিমাণ মুনাফা লইয়া সন্তুষ্ট হয় সে পরিমাণ মুনাফার শিক্ষিত ভদ্র লোকের কিছুই হইবে না; এতদ্ভিন্ন ভদ্র লোকে সে পরিমাণ মুনাফাও পাইবেন না। কারণ চাষের অন্যতম খরচ, মজুরীর জন্য চাষাকে কিছুই দিতে হয় না। সুতরাং গতানুগতিক ভাবে চাষ করিয়া ভদ্র সন্তানের ভরন পোষণ নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। কৃষি কার্য্য যদি ভদ্রলোকের জীবিকা হয় তাহা হইলে কৃষি হইতে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক আয় হওয়া দরকার। কৃষকের ও ভদ্রলোকের জীবন যাপনের মূল্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এতদ্ভিন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকের এমন কতকগুলি অভাব পূরণ করিতে হয় যাহা তাঁহার পক্ষে আবশ্যকীয়, কিন্তু কৃষকের পক্ষে বাবুগিরি।

এই সমুদয় বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্ত্তন দ্বারা ফসলের উৎকর্ষতা ও উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি করিতে পারিলে তবে কৃষিকার্য্য শিক্ষিত

ব্যক্তি মণ্ডলীর জীবিকারূপে পরিগণিত হইতে পারে। কার্য্যতঃ দুই প্রকারে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে সফল হইতে পারেন, যথা—যাহারা অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন তাঁহাদিগের পক্ষে অধিক পরিমাণে জমি লইয়া নির্ব্বাচিত কয়েকটি ফসল উৎপাদন করা এবং যাঁহাদের মূলধন কম তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত কাটতির বাজারে নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যবসায়িক সব্জি উৎপাদন (Market Gardening)। আরও এক শ্রেণীর কৃষি কার্য্য আছে যাহাতে এ পর্য্যন্ত সামান্য লোকেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাহা Seed farming অর্থাৎ নানা প্রকার ফসলের বীজ উৎপাদন। ইহাতে অবশ্য বিশেষ জ্ঞানের দরকার। কিন্তু এই শ্রেণীর ক্ষেত্রের আপাততঃ গুরুতর অভাব আছে। উৎকৃষ্ট বীজের অভাবে দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র অথবা উদ্যানজাত ফসল অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং বাছাই করা গাছ হইতে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন শুধু যে ব্যবসায়ের হিসাবে লাভজনক হইবে তাহা নহে। ইহার দ্বারা দেশেরও প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

কৃষি সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির সাধনও অন্ন সমস্যা সমাধানের সহায়তা করিতে পারে। কার্পাস উৎপাদনও সুতা প্রস্তুত, রেশম কীট পালন ও রেশম সুত্র তৈয়ারী প্রভৃতি ত বড় বড় কাজ। এ ছাড়াও বাঁশ, নল, খাগড়া, নারিকেল ছোবড়া প্রভৃতি দ্বারাও আগে যথেষ্ট কারুকার্য্য প্রস্তুত হইত। এখনও তাহাই হইতে পারে। যদিও প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদির ধরণ ধারণ বর্ত্তমান যুগের পছন্দমত করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণ কৃষকের কৃষিকার্য্য করিয়া অনেক উদ্বৃত্ত সময় থাকে। সেই সময়ের উপযুক্ত কাজ তাহাকে দিতে পারিলে তাহার আয় অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ভদ্রলোক চাষ আরম্ভ করিলে তিনিও এইরূপ সময় সদ্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। কৃষিকে লাভজনক করিতে হইলে তৎসংক্রান্ত শিল্পগুলিরও পুনঃ-প্রতিষ্ঠা অথবা নব-প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।

কপি চাষ।

ভাদ্র মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সমতল প্রদেশে কপির বীজ বপনের সময়, সুতরাং এখন এই চাষ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা নিতান্ত অসময়োচিত হইবে না। সাধারণতঃ আমরা কপি বলিতে ফুলকপি, বাঁধা কপি এবং ওলকপিই বুঝিয়া থাকি। দেশ ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, কিন্তু এদেশে পাটনাই এবং বিলাতি এই দুই প্রকার জাতি চলিত।

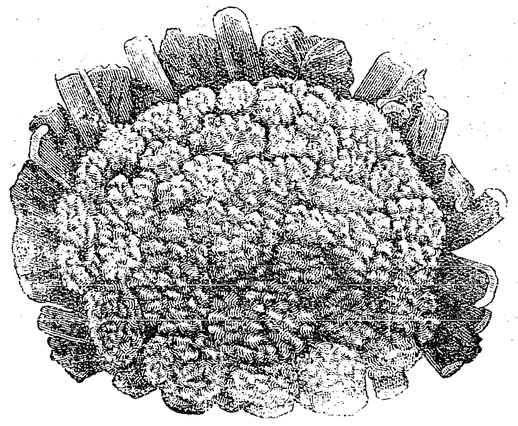

ফুলকপি। পাটনাই ফুলকপি এদেশের জল বায়ু যতটা সহ্য করিতে পারে বিলাতি ফুলকপি তত পারে না। কিন্তু খুব সাবধানে প্রখর রৌদ্র ও ঘন বর্ষার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়া চাষ করিতে পারিলে বিলাতি ফুলকপি যথেষ্ট সুফল দিয়া থাকে। আলজিয়ার্স, স্নোবল, অটমজায়েণ্ট, ফ্রেঞ্চওয়াল্‌চার্ণ এবং আর্লিলণ্ডন নামক ফুলকপি গুলিই বিখ্যাত।

বাঁধা কপি। বাঁধা কপির আকার এবং বর্ণ ভেদে অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে রিডম্যাণ্ড, ব্রনস্‌উইগ্‌ এবং সটনের ইম্পিরিয়াল বাঁধা কপিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

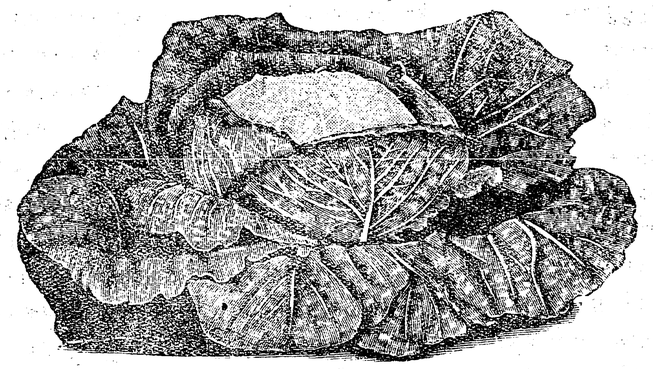

ওলকপি। সাদা ও লাল বর্ণ ভেদে ওলকপি দুই প্রকারেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

চাষের জন্য জমি। সাধারণতঃ কপি চাষের জন্য দোয়াঁশ মাটী ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা সুফসল হইবে না। রোপনের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে জমি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। অনেকবার চাষ দিয়া, সার মিশাইয়া এবং যতদূর সম্ভব ঢেলা শূন্য করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। চারা পুতিবার অগ্রে দেড় বা দুই হাত অন্তর নালি কাটিয়া, সেই নালির মধ্যে সার মিশাইয়া ও জল দিয়া কপি চারা বসাইবার যোগ্য করিয়া লইতে হইবে। বাঁধা কপির জন্য ঐপ্রকার নালির মত সারি করিয়া তাহার মধ্যে এক হইতে দুই হাত অন্তর গর্ত্ত করিবে, এবং সার মাটি দিয়া ঐ গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

চারা। অনেকে চারা ক্রয় করিয়া বসাইয়া থাকেন। এরূপ স্থলে ভাল জাতীয় চারা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। সাধারণত কোন চাষীর ক্ষেত্রে (হাপরে) বেশী চারা হইলে সে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চারা গুলি তুলিয়া বিক্রয় করে। আমাদের মতে ভাল জাতীয় বীজ সংগ্রহ করিয়া 'হাপরে' চারা করিয়া লওয়া উত্তম। 'হাপরে'র জমি ও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত রাখা উচিত, তবে চাষের জমি অপেক্ষা 'হাপরে'র জমিতে সার কম দিলেই হয় এবং কম দেওয়াই ভাল। 'হাপর' দুই তিনটী হওয়া উচিত, কেন না, চারা বসাইবার পূর্ব্বে দুই তিনবার নাড়িয়া বসান খুব ভা , বিশেষতঃ ফুলকপির জন্য। ওল-কপির চারা একবারের বেশী নাড়া উচিৎ নয়, বরং একেবারেই চাষের জমির নালিতে ও চারা করা যায়, উহা আর নাড়িতে হয় না।

বীজ খুব ঘন ঘন ভাবে বপন করা ভাল নহে ; চারা ঘন হইলে, মধ্য হইতে তুলিয়া একটু পাতলা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। খর রৌদ্র ও ঘন বৃষ্টি হইতে চারাকে রক্ষা

করিবার জন্য 'ছাউনি' বা ঢাকা' ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন একেবারেই উহারা রৌদ্র বা হিমের সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হয়, অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত কালীন রৌদ্রে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে রাত্রির হিমে উহাদিগকে খোলা রাখা দরকার। মোটের উপর স্মরণ রাখিবেন চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বেশীক্ষণ করিয়া অনাবৃত রাখিয়া অল্পে অল্পে উহাদিগকে রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করাইতে হইবে।

বাঁধা কপির চারা একবার নাড়িয়াই ক্ষেত্রে রোপন করা মন্দ নহে, তবে ফুলকপির চারা দুইবার খুব সাবধানে নাড়িয়া পরে রোপন করিলে সুফসল হয়। চারা অন্ততঃ চারি পাঁচটি পাতা বাহির হইবার পর প্রথম নাড়িবার কাল। চারা কিন্তু বেশীক্ষণ করিয়া আবৃত রাখিলে নিস্তেজ হইয়া—'টানিয়া' যায়,সুতরাং রোপনের পূর্ব্বে এ বিষয়ে'বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার।

সার। কপি চাষে ভেড়ার সার ভাল। সর্ষপ-খৈল, গোময় প্রভৃতি সার মন্দ নহে। মনুষ্য মলের সার দিয়াও বেশ ভাল ফসল হইতে দেখা যায়। অনেক জমিতে বহু পূর্ব্বে পচা পাঁক মাটী মিশাইয়া একটী বর্ষা খাওয়াইয়া লইয়া, পরে উপর্য্যুপরি কয়েক-বার চষিয়া সর্ষপ খৈল, ঘুঁটের গুঁড়া বা শুষ্ক গোময়, এবং শুঁট্‌কী মাছের গুঁড়া মিশাইয়া জমি প্রস্তুত করনানন্তর তাহাতে রোপন করিয়া বেশ সুফসল পাইয়াছেন। নূতন মাটী পূর্ব্ব হইতে মিশান থাকিলে ফসল ভাল হয়।

প্রতি তিন বিঘা আন্দাজ জমিতে ১০০ পাউণ্ড পটাস্, ১০০ পাউণ্ড ফস্ফরিক এসিড্ এবং ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সার প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশের মাটীতে যথেষ্ট পটাস্ স্বাভাবিক ভাবে আছে, অভাব বোধ হইলে ভস্ম-সার ব্যবহারে উহা পূর্ণ হইতে পারে। হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়া ফস্ফরিক এসিডের কাজ পাওয়া যায়। সোরাচূর্ণ, গোময় বা খৈল ব্যবহারে নাইট্রোজেনের উপকারিতা লাভ হয়। প্রত্যেক গাছের জন্য রোপনের তিন চারিদিন পূর্ব্বে এক এক মুষ্টি খৈলসার নালিতে বা গর্ত্তে মাটীর সহিত মিশান দরকার। রোপনের পর বাঁধা কপির বাঁধিবার সময় এবং ফুলকপির ফুল বাহির হইবার সময় প্রত্যেক গাছের জন্য দুই মুষ্টি করিয়া ভেড়ার সার বা খৈল সার প্রয়োজন। ইহা ঐ সময়ে গাছের গোড়া গুলি একটু খুলিয়া ৩।৪ দিন পরে দিয়া, মাটি চাপা দিবার পরে সেঁচের জলে ডুবাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ফসল খুব ভাল জন্মে।

বীজ সংগ্রহ। ১ বিঘা পরিমাণ জমিতে রোপনের উপযুক্ত চারা প্রস্তুত করিতে প্রায় ৩ তোলা পরিমাণ বীজের প্রয়োজন। ইহাতে যত চারা হইবে তাহার মধ্যে নিস্তেজ গুলি বাদ দিতে হইবে। সুতরাং বীজের পরিমাণ একটু বেশী থাকাই ভাল। বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশ্বাসযোগ্য স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক, নতুবা ইচ্ছানুরূপ ভাল ফসল পাইতে বিঘ্ন হইতে পারে।

'হাপর' ও সেচন। 'হাপর' সাধারণতঃ একটু উচ্চ জমিতে হওয়া দরকার। বীজ বপনের পূর্ব্বে জল সেচন করিয়া জমিকে 'ঘো'-মুক্ত বা রসময় শুষ্ক

করিয়া লইতে হইবে। হাপরের জমি সার মিশাইয়া ও কোপাইয়া ধুলার মত করিতে হইতে হইবে। বীজ বপনের পূর্ব্বে অন্ততঃ ২।৩ বার এই রূপ করা দরকার। বপনের পর মাটী একটু চাপিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ৩।৪ দিন হইতে ৭ দিনের মধ্যেই চারা বাহির হইয়া থাকে। চারা ঘন বাহির হইলে আবশ্যকমত তুলিয়া অন্য 'হাপরে' বসান চলে, তবে এ কাজে বিশেষ সাবধানতা দরকার। 'হাপরে' মধ্যে মধ্যে জল সেচন আবশ্যক, 'ঝাঁজরা' দ্বারা বা বিচালির আটির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া তদ্দ্বারা এই জল সেচন কার্য্য হওয়া উচিত।

রোপন—চারা রোগণের সময় সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক গর্ত্তে অল্প অল্প জল দিবে। বৈকালে, সন্ধ্যায় অথবা প্রথম রাত্রেই পূর্ব্বে প্রস্তুত জমিতে রোপণ কার্য্য করিবে। পর দিন রৌদ্র খরতর হইবার পূর্ব্বেই চারাকে রক্ষার জন্য ছাউনী বা ঢাকার ব্যবস্থা করিবে, তবে এই ঢাকা দুই চারিদিনের জন্য চারা বেশ বসিয়া গেলে আর দরকার নাই। চারা বসিবার কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ অল্প অল্প সেচনের আবশ্যক। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা হৈমন্তিক চাষ, সুতরাং খর রৌদ্র হইতে রক্ষার জন্য উপযুক্ত সেচনের অভাব যেন কখনও না হয়, অথচ অতি সেচন ও ইহার পক্ষে অনিষ্ট কর। বাঁধাকপি বাঁধিবার এবং ফুলকপি ফুলিবার সময় প্রত্যেক গাছের গোড়া খুপিয়া শিকড়ে একটু হাওয়া লাগাইয়া এবং পুনরায় সার দিয়া মাটী চাপা দিবে। এই সময়ে প্রচুর সেচন দরকার, যেন প্রত্যেক গাছের গোড়া পর্য্যন্ত জলে ডুবে। এই সেচনের দ্বারা ফলন ভাল হয়, বাঁধাকপি বড় হয়, এবং ফুল কপির ফুল নিরেট, বড় ও সুস্বাদু হইয়া থাকে। কিন্তু ওলকপিতে এই প্রচুর সেচন আবশ্যক হয় না।

বাঁধাকপি যত ফাঁক্ ফাঁক্ বসান দরকার, ফুলকপি এবং ওলকপি তার চেয়ে ঘন ঘন বসাইলে ক্ষতি হয় না। বরং তাহা করিলে ফসল বেশী হয়। বাধাকপির চারা এক হইতে দুই হাত অন্তর ফাঁক্ রাখিয়া এক একটী বসাইতে হয়। ফুলকপির চারা এতদপেক্ষা একটু ঘন অর্থাৎ অনুমান এক হইতে দুই ফুট অন্তর ফাঁক্ রাখিয়া বসাইলে চলিতে পারে। ওলকপি এক বিঘা জমিতে ৫০০০ গাছ পর্য্যন্ত বসান চলে।

রোপনের পর গাছ যত বড় হইতে থাকিবে, ক্রমশঃ পার্শ্বের মৃত্তিকা কোদালীর দ্বারা টানিয়া টানিয়া গাছের মূলে দিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে ৩।৪ দিন অন্তর জল সেচন করিয়া মাটীকে সরস রাখিতে হয়। প্রত্যেকবার জল সেচনের পর মাটির 'ঘো' হইলে গাছের গোড়া খুসিয়া বা আল্গা করিয়া দিতে হয়। ছোট ছোট 'হাত আচড়া' বা 'ফর্ক' দ্বারা এই কার্য্য করা কর্ত্তব্য, কারণ অন্য যন্ত্রে গাছের শিকড় কাটিয়া যাইবার বিশেষ ভয় আছে।

অনিষ্টকারী পোকা—কপির গাছ যত বড় হইতে থাকে, ক্রমশঃ ইহার অনিষ্টকারী কীটের ও উপদ্রব বাড়িতে থাকে। প্রথমে গাছের পাতার নিম্নভাগে

সূজীর দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক ডিম্ব দেখা যায়। পরে সুতার মত সুক্ষ্ম এবং খুব ছোট ছোট সাদা একপ্রকার কীট বা পোকা গাছের পাতার ও ডাঁটায় বিচরণ করিতে দেখা যায়। কালক্রমে ইহারা পাতার ন্যায় বর্ণ ধারণ করে। এই পোকাগুলি ক্ষুদ্র প্রজাপতির মত এক প্রকার সাদা পোকার জাতি। প্রায়ই সন্ধ্যা কালে ইহাদিগকে কপিক্ষেত্রে উড়িতে দেখা যায়। ইহারাই কপিপাতায় নিম্নদেশে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে এবং তাহা হইতে উল্লিখিত সুত্রবৎ পোকা গুলি জন্মে।

লবণের গুঁড়া এই সকল দলবদ্ধ কীটের উপর ছড়াইয়া দিলে উহারা মরিয়া যায়। অথবা 'ব্রাশ' কিম্বা সুক্ষ্ম চিম্‌টা দ্বারা ইহাদিগকে গাছের পাতা হইতে পৃথক্ করা চলে। কিন্তু যাহাতে ঐ প্রজাপতিবৎ উড্‌ডীয়মান পোকাগুলির বিনাশ হয় তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তজ্জন্য মাটীর পাত্রে কেরোসিন ও ফিনাইল মিশাইয়া রাখিয়া তাহার উপর ছোট ছোট আলো বসাইবে। এই প্রকার কয়েকটী আলো ২০।২২ হাত অন্তর ক্ষেত্রের মধ্যে সন্ধ্যায় সময় এক ফুট উচ্চ করিয়া রাখিবে। রাত্রি নয়টা দশটার পর আর আলো রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে ঐ সকল উড্ডীয়মান পোকা গুলি আলোর নিকট উড়িয়া আসিয়া ক্রমে ফিনাইল মিশ্রিত কেরোসিনে পাড়িয়া মরিয়া যায়। আলোকেই উহা দিগকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। পাহাড় বা শীত প্রধান স্থানে এই আলোক ক্ষেত্রকে প্রয়োজন মত গরম রাখিবার জন্যও ব্যবহৃত হইলে এক সঙ্গে দুই কাজই হইয়া থাকে

ক্ষেত্র নিরূপণ—ছায়াবিহীন দোয়াঁস মাটীর ক্ষেত্র যাহা জলে ডুবিয়া যায় না তাহাই কপি চাষের উপযুক্ত। মাটী বেশী আটাল বা শক্ত হইলে পশু শালার আবর্জ্জনা প্রভৃতি মিশাইয়া উহাকে ক্রমশঃ দোঁয়াশ মাটীতে পরিণত করিতে হইবে। মাটি প্রস্তুত করিবার সময় প্রচুর সেচনের আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং 'যো' থাকিতে থাকিতেই কর্ষণ করা উচিৎ।

কপির সঙ্গে আলু চাষ—আউস ধানের ক্ষেত্রে ধান উঠিয়া যাইবার পর রীতিমত চাষ দিয়া ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কপির চাষ চলিতে পারে, এবং চাষী যদি বেশ বিচক্ষণ হয়, তা হইলে একসঙ্গে কপি ও আলুর চাষ করিতে পারে। কিন্তু বাঁধাকপির সঙ্গে আলুর চাষ চলে না। ফুলকপি বা ওলকপির সঙ্গে আলুর চাষ চলিতে পারে।সেরূপ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, পূর্ব্বে যে নালি বা সারির কথা বলা হইয়াছে, ঐ প্রকার নালি. নালা বা সারির একটীতে কপি একটীতে আলু এই পর্য্যায়ে চাষ করা চলে। এরূপ স্থলে ব্রকোলি ফুলকপির চাষই উপযুক্ত।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবর উৎপাদন।

বর্ত্তমান জগতে নানাবিধ কার্য্যে রবরের এত প্রয়োগ হইতেছে যে স্বাভাবিক রবরে সংকুলান হইতেছেনা। সেইজন্য কৃত্রিম রবর প্রস্তুতের চেষ্টাও চলিতেছে। এতদ্দেশে রবর চাষ অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই। কার্য্যতঃ ১৯০০ সাল হইতেই ব্যবসায়িক হিসাবে রবর উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে প্রধানতঃ তিনটি গাছ হইতেই রবর সংগ্রহ হয়। দেশী রবর Ficus elastica নামক বটজাতীয় বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায় এবং প্যারা ও সিয়ারা রবর যথাক্রমে Hevea Braziliensis এবং Manihot Glaziovii বৃক্ষের নির্য্যাস।

সম্প্রতি-প্রকাশিত সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৯২২ সালে রবরের জমি মোট ১২৭ ৪৫৮ একরে দাঁড়াইয়াছে। রবর প্রস্তুতের জন্য আঠা গাছের গায় দাগ দিয়া বাহির করিতে হয়। অবশ্য গাছ পূর্ণ বয়স্ক না হইলে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ আঠা পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ জমিতে রবার গাছ রোপিত হইলেও বর্ত্তমানে ৬১,০৬৮ একর জমির গাছ রবার উৎপাদনক্ষম হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে রবারের জমির পরিমাণ মোট জমির অনুপাতে নিম্নরূপ :—ব্রহ্ম ৪৮, ত্রিবাঙ্কুর ৩২, মান্দ্রাজ ৮, কোচিন ৭, আসাম ও কুর্গ প্রত্যেক ২ এবং মহীশূর ১। বিগত বৎসর নিম্নলিখিত পরিমাণে তিন শ্রেণীর রবার উৎপাদিত হইয়াছে :—

প্যারা রবর—	১১৮,৩২, ৮৬৬	পাউণ্ড
দেশী—	১৬, ৩৮০	"
সিয়ারা—	১ ১২০	"
মোট—	১১৮, ২০, ২৮৬	"

ফসল হিসাবে কোচিণই সর্ব্বাগ্রগণ্য (একর প্রতি ২০৯ পাঃ) এবং মহীশূর সর্ব্ব নিম্ন (একর প্রতি ৩২ পাঃ)। রবার বাগান সমূহে মোটে প্রতিদিন ৩০,৩৫৬ লোক কাজ করে। ১৯২২-২৩ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১২০ লক্ষ পাউণ্ড রবার গিয়াছে। তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর যুক্ত রাজ্যেই যায়। মান্দ্রাজ বন্দর সমূহই অধিক পরিমাণ রবর রপ্তানির স্থান। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর এতদ্দেশ হইতে ২৬ লক্ষ পাঃ রবর রপ্তানি হইয়াছিল। সে হিসাবে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত দেশে এমন একটি বড় কারখানা স্থাপিত হয় নাই যেখানে রবরজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে।

পাট ফসল।

আগামীবারের পাট ফসল সম্বন্ধে সরকারী শেষ Forecast প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এক শ্রেণীর ব্যবসাদারের চক্ষে পাট ফসল ধান অপেক্ষাও মূল্যবান। পাটের কলে ও ব্যবসায়ে ইংরাজ বণিকের বহু পরিমাণ অর্থ নিযুক্ত আছে। পাটের লেহ্য ব্যবসায় ভিন্ন ইহাতে কত প্রকার Speculation ও চলে; সুতরাং পাট বঙ্গদেশের এক হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফসল বলিলেও চলে। অন্য দিকে পাট চাষ প্রসারের বিরুদ্ধবাদিরা বলেন যে পাট ক্রমশঃ খাদ্য শস্যের জমি অধিকার করিতেছে; পাট বিক্রয়ের নগদ পয়সা চাষীর কোন স্থায়ী উপকার সাধন না করিয়া প্রধানতঃ বিলাসিতায় ব্যয় হয় এবং সর্ব্বোপরি পাট পচানর জন্যই অনেক গ্রামে অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি।

পাট বঙ্গদেশের এক রকম এক চেটিয়া ফসল। বঙ্গের বাহিরে উৎকল বিহারে ও আসামে সামান্য পরিমাণ পাট হয়। আগামী বারে এই তিন অঞ্চলে নিম্নরূপ ফসল উৎপাদন হইবে বলিয়া অনুমাণ করা হইয়াছে।—

	চাষের জমি একর হিঃ	উৎপাদন ৪০০ পাঃ গাঁট হিঃ
বাংলা	২০,১৪,৬১৫	৬২,৩৪,৫১৬
আসাম	১১৪,৩০০	৩২২,৫০০
উৎকল ও বিহার	১৮৩,৭৭০	৩৯৬,৫২৭

এতদ্ভিন্ন নেপালেও কিছু পাট হয়। সরকারী বিবরণীতে তাহার জমির পরিমাণ দেখা যায় না, কিন্তু উৎপাদন ৭২, ৩৮১ গাঁট হইবে বলিয়া অনুমাণ করা হইয়াছে।

বাংলার বাঁকুড়া, বীরভূম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর পাট হয়। নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান পাট উৎপাদক জেলার নাম উল্লেখ করা গেল:—

	পাটের জমির পরিমাণ একর হিঃ	ধানের জমির পরিমাণ এঃ হিঃ
মৈমনসিং	৫,৩৫,১৬৯	২২,১৮,৪০০
ঢাকা	২৪৫,১০০	১০,৩২,১০০
ত্রিপুরা	২,২৩৯২৬	১১,৭১,৬০০
রংপুর	২,৩৬,৫০৯	১১,৪৭,৩০০
ফরিদপুর	১৭১,৬০০	১১,৯৩,০০০

পাবনা	৯৫,১৬৩	৮,৮৯,৫০০
রাজসাহী	৬৭,৬৫৩	৪,৯৩,৪০০
বগুড়া	৭০,৮১৫	১১,৬১,৭০০
নদীয়া	৫৯,৫৭০	৮২৭,৭০০
যশোহর	৫৯,১৯২	১১,৪৩,৮০০
দিনাজপুর	৫২,৫০০	১২,৬৭,২০০

অন্য সমস্ত জেলায় এবারে পাটের জমি অর্দ্ধ লক্ষ একরের কম। চট্টগ্রামে পাট চাষ অতি সামান্য। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও দার্জ্জিলিঙ্গে ৫০০০ একরের কম। পূর্ব্বোক্ত তালিকার দেখা যাইবে যে পাট চাষের জমির তুলনায় প্রত্যেক জেলাতে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য শস্য সচরাচর কত পরিমাণ জমিতে আবাদ হইয়া থাকে। খাদ্য শস্যের জমির অনুপাতে গঁড়ে প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশে পাট উৎপাদিত হয়। কিন্তু তদপেক্ষা বেশীও কয় জেলায় দেখা যাইতেছে। তাহা হওয়া অবশ্য বাঞ্ছণীয় নয়।

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনার এবারে ২৪ পরগণা, ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই সামান্য পরিমাণে পাটের জমি কমিয়াছে; অন্য সব জেলাতে বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির হার আবার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান, মালদহ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় দ্বিগুণের অধিক। সুতরাং সম্প্রতি পাটের উপর লোকের অধিক ঝোঁক বাড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। ফলনের হার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (একর প্রতি ৩-৭ গাঁট) দেখা যায়। গড়ে প্রায় বিঘা প্রতি ১ গাঁট পাট পাওয়া যায়।

গত কয়েক বৎসরে পাটের জমির ও মূল্যের বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯ ১৩-১৪ সালে ৬০ কোটি টাকার পাট ও পাট জাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। তখন প্রায় ৩৩½ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইত ও ১০৪ লক্ষ গাঁটের উপরেও পাট উৎপাদিত হইত। সে সময়ের তুলনায় পাট চাষ আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে আবার সেই যুদ্ধের পূর্ব্বের উৎপাদনের পরিমাণে উঠিতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ পাটের কলে সাহেবেরা প্রায় ১৫ কোটি টাকা মূলধন নিযুক্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত পরিমানে পাট উৎপাদিত না হইলে এই সব কারখানা ভাল চলিবনা। এতদ্ভিন্ন ডণ্ডির কলওয়ালাগণের টান, আছেই। তবে পাটের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষক ব্যতীত অন্য কতক লোকেরও যে অন্ন-সংস্থান না হয় তাহা নহে। এতদ্দেশের ৭৫ টি পাট কলে প্রায় ৩ লক্ষ কুলি মজুর খাটিয়া খায়; এতদ্ভিন্ন পাটের বহনাবহন ও চালান প্রভৃতি কাজে অন্ততঃ আরও এক লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। অবশ্য লাভ সর্ব্বাপেক্ষা কলওয়ালাগণেরই অধিক। তাঁহারা গত কয়েক বৎসরে শতকরা ৩০০ গুণের উপর লাভ করিয়াছেন। সে হিসাবে কৃষকেরা গড়ে ৫০ গুণ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ! তথাপি পাট বঙ্গদেশের একটি বিশিষ্ট পণ্য এবং

বোম্বাই যেমন তুলা ব্যবসায়ের ও কলের কেন্দ্র, পাট সম্বন্ধে কলিকাতাও তাহাই। অধিকন্তু তুলা অন্য দেশেও উৎপাদিত হয়, কিন্তু পাট বঙ্গদেশেরই ফসল। পাটের উৎকর্ষ সাধিত হওয়া সেইজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। খাদ্য শস্যের সহিত উপযুক্ত অনুপাতে চাষ হইলে পাট বাংলার যে সমৃদ্ধি সম্পাদণের বিশেষ সহায়তা করিবে তাহা সুনিশ্চিত।

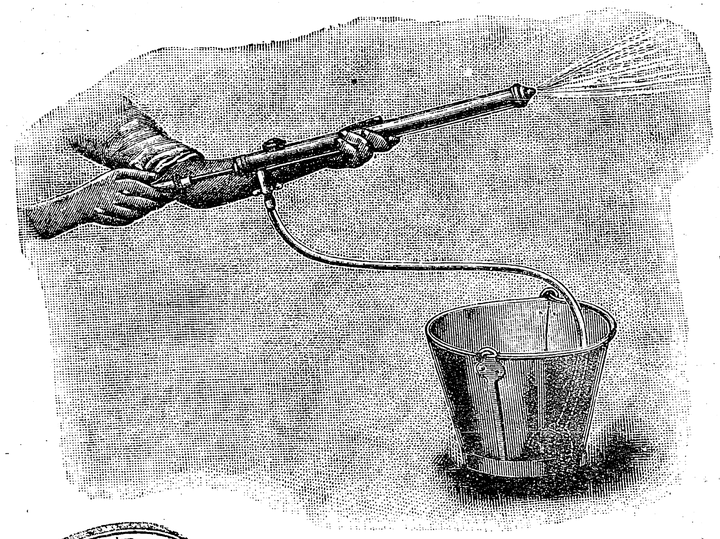

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

দেশের ও দশের কথা।

আসামে চা-উৎপাদন ঃ—আসাম সরকার ১৯২২ সালে আসামে চা-বাগান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে উক্তবৎসরে চাষের জমির পরিমাণ ৪৭৬ একর কমিয়া গেলেও উৎপাদন-১৭,১৭০,৪৮২ পাঃ বাড়িয়াছে। অধিক মাত্রায় চা উৎপাদিত হওয়ার প্রধান কারণ অবশ্য—উৎপাদনের উন্নত প্রথা। চা-বাগানের সত্তাধিকারীগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সমূহ প্রবর্ত্তনের যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে উৎপাদনের হার বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক।

ভারতবাসীর সম্মান ঃ—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ইউরোপের কয়েটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা তাঁহার আধুনিকতম গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। উক্ত নিমন্ত্রণ সমূহ রক্ষা করিবার জন্য তিনি সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আমরা আরও শুনিয়া সুখী হইলাম যে বোম্বাইর স্বনামধন্য বণিক স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস বসু-বিজ্ঞান-শালার উন্নতি কল্পে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পাট ব্যবসায় ঃ—সম্প্রতি কলিকাতায় কয়েকটি পাটকল রুশিয়া হইতে ২০ লক্ষ থলে সরবরাহ করায় অর্ডার পাইয়াছে। এবার রুশিয়ায় ফসল ভাল হইয়াছে; সেইজন্য রুশিয়ায় বর্ত্তমান বৎসর থলের যথেষ্ট কাটতি হইবার আশা আছে। কিন্তু কলিকাতার পাটের কলওয়ালাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডণ্ডির সওদাগরগণ। তাঁহারাও কিছু অর্ডার পাইয়াছেন। কমদরে দিতে পারেন বলিয়া বক্রি অর্ডার কলিকাতার ব্যবসায়ীগণের হাতে আসাই সম্ভব।

তুলার ভেজাল ঃ—বোম্বাই সহরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন্ আসোসিয়েসন কোম্পানির ডাইরেক্টরগণের কমিটির অধিবেশনে ভারতীয় কার্পাস চাষ ও ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হয়। তুলাবীজ ছাড়াইবার ও গাঁট বাঁধিবার কলগুলি যাহাতে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের অধিনে কাজ করে তদর্থে কমিটি মন্তব্য প্রকশে করেন। অপরাপর বিষয়ের মধ্যে পঞ্জাবী মার্কিণ ও দেশী কার্পাস মিশ্রিত করার অবৈধতা বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য। অবশ্য পঞ্চনদে উভয় জাতির উৎপাদন অনিবার্য্য। এই দুই জাতি মিশাইয়া দেওয়ার ব্যাপারটা ক্ষেত্রে চাষীদিগের দ্বারা সংঘটিত হয় না। বীজ ছাড়ানর ও গাঁট বাঁধিবার সময় কলওয়ালারাই ইচ্ছা করিয়া

এই কাজ করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের কিছু লাভ আছে বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট পাঞ্জাবী-মার্কিণ তুলা উৎপাদকের সমূহ ক্ষতি। সে তাহার ভাল জিনিষের দর পায় না। এতদ্ভিন্ন আরও গুরুতর ক্ষতি এই যে উভয় শ্রেণীর বীজ মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল তুলার বাছাই বীজ পাওয়া অসম্ভব হয় এবং উৎকৃষ্ট তুলার চাষ দেশে ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। গত দুই বৎসরে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে পাঞ্জাবী মার্কিণ তুলা ইউরোপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু অবাধ ভাবে এইরূপ মিশ্রণ চলিলে ভারতীয় উৎকৃষ্ট তুলার কাটতি বিলাতী বাজারে একবারেই কমিয়া যাইবে। ইহা এতদ্দেশীয় তুলা ব্যবসায়ের পক্ষে অতীব অশুভজনক বিষয়। কমিটি এসম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিলে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইবেন।

সক্কর-পয়োপ্রণালি ঃ—সিন্ধু প্রদেশে যে বিশাল পয়োপ্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য মহামান্য ভারত সচিব অনুমোদন করিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে জগতে তাহার সমকক্ষ জল সেচনের ব্যবস্থা কমই থাকিবে। সক্কর সহরের নিকট সিন্ধুনদ গর্ভে প্রায় ১ মাইল বাঁধ দেওয়া হইবে। ঠিক বাঁধের উপরি ভাগ হইতে নদী তুল্য তিনটি খাল কাটিয়া পশ্চিম সিন্ধু প্রদেশে জল প্রদান করা হইবে। পূর্ব্ব সিন্ধুর জন্য ও ঐ প্রকার ৪টি খাল কাটা হইবে। এই কয়েকটি খাল ও তৎসংলগ্ন নালা প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বসমেত ৭০০০ মাইল জল পথ প্রস্তুত হইবে। কার্য্য শেষ করিতে ১২ বৎসর সময় লাগিবে এবং খরচ পড়িবে ১৮ কোটি টাকা। সিন্ধু প্রদেশ বেশ বড় হইলেও পাহাড় পর্ব্বত এত আছে যে কেবল অর্দ্ধেক মাত্র দেশে চাষ চলিতে পারে। আবার এই অর্দ্ধাংশেরও অনেকাংশে জলাভাবে অনাবাদী পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমান পয়োপ্রণালী তৈয়ারী হইলে নিম্নলিখিত পরিমাণে নিম্নলিখিত ফসলগুলি উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।—

কার্পাস	১৯০,০০০ টন
গোধুম	৯৩৫,০০০ „
ধান ও অন্যান্য শস্য	১০,০০,০০০

এই সমুদয় ফসলের দাম বৎসরে প্রায় ১৯ কোটি টাকার ও অধিক হইবে।

সূর্য্যমুখী গাছ ঃ—শোভার জন্য সূর্য্যমুখী বাগানে রোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিশেষ উপকারী গাছ। সূর্য্যমুখী বীজের তৈল উৎকৃষ্ট আহার্য্য তৈল এবং বাজারে ইহা পরিষ্কৃত হইয়া অলিভ্ তৈলের সমান দরে বিক্রয় হয়। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যমণি গাছ উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। ইহার চাষ অতি সহজ এবং ঘণ করিয়া সূর্য্যমুখী জন্মাইলে জমি হইতে আগাছা প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভিকে শুধু সূর্য্যমুখী গাছ কুচাইয়া খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে দুধের মাত্রা আদৌ কম হয় না। গর্ত্ত করিয়া শুষ্ক গাছ

রাখিলে ও তাহাতে বৃষ্টির জল না পড়িলে অনেক দিন অবিকৃত ভাবে সূর্য্যমুখী পশুখাদ্য রূপে রাখিতে পারা যায়।

ভারতীয় শর্করা ঃ—এতদ্দেশে প্রায় ১৮টী আধুনিক প্রকারের চিনির কারখানা আছে। কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত প্রণালীতে ইক্ষু হইতে শতকরা ৫৭·১৪ ভাগের অধিক চিনি পাওয়া যায় না। যবদ্বীপ ও কিউবাতে যে সকল কারখানা আছে, তাহাতে শতকরা ৮৬·৪ ভাগ পাওয়া যায়। হাওয়াইতে যে সকল কারখানা আছে, তাহাতে ১৯২১ সালে শতকরা ৮৯·৬ ভাগ চিনি পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রণালী সমূহের উন্নতি আবশ্যক।

কাগজের উৎপাদন ঃ—ভারতবর্ষে ভারতীয় কারখানায় প্রায় ৩২৯০০ টন (৮৪৪৭৫৭ মণ) কাগজ প্রস্তুত হয়; আর প্রায় ২১০০০ টন (৫৭৭২৫০ মণ) বিদেশ হইতে আমদানি হয়। বর্ত্তমানে ভারতে কাগজের কারখানা ৯টী, ইহার মধ্যে ১টীও দেশের লোকের নহে। আরও নূতন কারখানা খোলার চেষ্টা চলিতেছে। বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুতের অনেক দিন হইতে কল্পনা হইতেছে কিন্তু এখন বাঁশের কাগজ বাজারে আসে নাই।

চর্ম্ম-শিল্প ঃ—বর্ত্তমান ভারতে যে সকল শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তন্মধ্যে চর্ম্ম পরিষ্কার ও মসৃণ করা (ট্যানিং) বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৯১৩-১৪ সালে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৮৭০০০ টন (২৩৭০৭৫০ মণ) ট্যান করা চামড়া বিদেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমানে রপ্তানী ২৪০০০ টনে (৬৫৪০০০ মণ) উঠিয়াছে। ইহা যুদ্ধের সময়ে রপ্তানি চামড়া হইতে কম। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক।

চামড়া কাষের উপাদান ঃ—কয়েক বৎসর হইতে চামড়া কাষের জন্য কি কি উদ্ভিজ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে কতকগুলি উদ্ভিদ্ বিশেষ কাযে লাগিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্জ্জুন বৃক্ষের উল্লেখ করিতে পারা যায়। পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানে ইহা দেখা যায় এবং অর্জ্জুন ছাল ও উপকারী ঔষধ। এখন প্রমাণ হইয়াছে যে চামড়া কাযের একক উপাদান সমূহের মধ্যে অর্জ্জুনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার কাযে চামড়া হালকা ও শোষণশীল হয়; কাষের গাঢ়ত্বের তারতম্যে ভারি চামড়াও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে শতকরা ২২ ভাগ কষায় পদার্থ আছে। এই সম্পর্কে করমচা ও বণ কুলেরও উল্লেখ করিতে পারা যায়।

হোগলার উপকারিতা ঃ—হোগলার পরাগ-রেণু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে আমরা কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশে দেখিয়াছি। ইহার মূলও কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য। দুর্ভিক্ষের

সময় ইহাও লোকে খাইয়া থাকে। Typha latifolia জাতীয় হোগলার মূলে যথেষ্ট পরিমাণে (শতকরা ৮১ ভাগ) শ্বেতসার পাওয়া যায়। পশুখাদ্য রূপে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে অল্প দিনের মধ্যেই গবাদি পশু এই খাদ্য খাইয়া স্থূলকায় হইয়া উঠে। জাপানে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যরূপে হোগলার যথেষ্ট আদর আছে।

বাঙ্গালীর বৃত্তি-শিক্ষা ঃ—বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মিঃ কেরী সেদিন সরকারী কমার্সিয়াল ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছেন যে স্কুল কলেজে ব্যবসা শিক্ষা লাভ করা মন্দ নয়। তাহাতে দক্ষ ক্রেতা অথবা অথবা বিক্রেতা হওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর শিক্ষার সম্পর্ক টাকার চলাচলের সহিত, অর্থ উৎপাদনের সহিত নয়। সুতরাং ইহার একটা সীমা আছে। ছয় বৎসরের মধ্যে ব্যবসায়-উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িবে যে তাহাদের কর্ম্ম যোটা শক্ত হইয়া পড়িবে। শিল্প অথবা কৃষি দ্বারা অর্থ উৎপাদনই সেই জন্য বর্ত্তমান অন্নকষ্টের প্রধান প্রতীকার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এবং যত অধিক বাঙ্গালী যুবক সেই পথ অবলম্বন করে ততই মঙ্গল। কথাগুলি বিশেষরূপে ভাবিবার যোগ্য।

রেশম কমিটি ঃ—বাংলায় রেশম শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য যে কমিটি ছিল সম্প্রতি তাহার পুনর্গঠন হইয়াছে। এবারে সরকারী সভ্য আছেন,—কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার (সভাপতি), রেশম তত্ত্বের ডেপুটি ডাইরেক্টার (সম্পাদক), সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার এবং বাঁকুড়ার কালেক্টার মিঃ জি, এস, দত্ত। বেসরকারী সভ্যদের মধ্যে কলিকাতা এণ্ডারসন রাইট্ কোং ও পলাসীর রোজ ফিলেচার কোম্পানির একজন করিয়া প্রতিনিধি এবং মুর্শিদাবাদ ১, মালদহ ২, রাজসাহী ২, বগুড়া ১, ঘীরভূম ১ ঢাকা ১ ও মৈমনসিঙ্গের ১ জন করিয়া সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। কেবল মাত্র পরামর্শ দানই কমিটির কার্য্য হইবে। বৎসরে ২ বার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইবে এতদ্ভিন্ন সভাপতি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে। কমিটির গঠন ও নিয়মাদি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকিবে। পুরাতন কমিটি দ্বারা যে কাজ হইয়াছে তাহা জানাই আছে। এক্ষণে এই নূতন কমিটি রেশম-শিল্পের কি উন্নতি সাধন করিতে পারেন দেখা যাউক।

সাররূপে সোহাগা ঃ—বিগত মহাযুদ্ধের সময় অনেক দেশে সোহাগা-সংযুক্ত পটাশ লবণ সাররূপে প্রয়োগ করিয়া ফসলের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এখন সে সকল জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে সোহাগা সামান্য মাত্রায়ও উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর; কোন কোন ফসল যদিও একর প্রতি ২০ পাউণ্ড সোহাগা সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ

৪ পাউণ্ড সোহাগা প্রয়োগেই ইহার অনিষ্টকারী ক্রিয়া প্রতীয়মান হয়। ভূট্টা, সিম প্রভৃতি অতি সামান্য পরিমাণে সোহাগা সহ্য করিতে পারে। পক্ষান্তরে আলু ফসল অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমানেও ততটা খারাপ হয় না। আরও দেখা গিয়াছে যে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপর সোহাগার অল্প অথবা অধিক মাত্রায় অনিষ্টকারিতা নির্ভর করে।

তীর্থ-সংস্কার—'প্রজাপতি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি যে বাঙ্গলার বহু তীর্থ-ক্ষেত্রে নানারূপ অনাচারের অভিযোগ যাত্রিগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। "এ বিষয়ে হিন্দুজনসাধারণের পক্ষ হইতে সংবাদপত্রে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন যাত্রী কোন তীর্থস্থানে কোনরূপে নিগ্রহভোগ করিলে তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে তাহা জ্ঞাপন করা উচিত। এইরূপ নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার প্রতিকারকল্পে আমরা একটী সমিতি গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমিতির সদস্যগণের নাম শীঘ্রই সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ তীর্থক্ষেত্রে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত বা অন্য কোনরূপে অসুবিধাপ্রাপ্ত যাত্রিগণ তাঁহাদের অভিযোগ আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। সে সকল অভিযোগ আমি যথাসময়ে সমিতির গোচর করিব। প্রত্যেক অভিযোগই গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং অভিযোগকারীর ইচ্ছা না থাকিলে আমরা তৎপর নাম ধাম সংগোপিত রাখিব। সমিতির জন্য সদস্যনির্ব্বাচনকল্পে অতি শীঘ্রই এক সভা আহূত হইবে।"

সম-সাময়িক জগত।

মার্কিণে ধান চাষঃ—আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ১৯২২ সালের কৃষি বিবরণীতে দেখা যায় যে অন্যান্য শস্যের হিসাবে ধান উৎপাদন করা হইলেও কোন কোন প্রদেশে, বিশেষতঃ যেগুলি উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত, ধান প্রধান ফসল। দক্ষিণ পশ্চিম টেক্সাসে ইহাই একমাত্র আয়কর ফসল। এই জেলায় প্রায় ৪ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। সমস্ত যুক্ত রাষ্ট্রের ধান্য ফসল ১০ কোটি পাউণ্ডের উপর হইবে। ১৬৯৪ সালে দক্ষিণ কেরোলিনায় পরীক্ষার হিসাবে ২।৪ বিঘা জমিতে প্রথমতঃ ধান চাষ হয়। তার পর লুইসিয়ানা অঞ্চলে বারিসেচনের ব্যবস্থা করিয়া ১৮৮৭ সাল হইতে বিস্তৃত ভাবে ধান চাষের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্যবসায়ের হিসাবে কিন্তু প্রথম ধান ফসল কেরোনিয়ায় ১৯১২ সালে উৎপন্ন হয়। আপাততঃ লুইসিয়ানা, টেক্সাস, আরাকানসাস ও কালিফার্ণিয়াই মার্কিণে ধান চাষের প্রধান কেন্দ্র।

খাদ্যশষ্যরূপে গড়গড়ির চাষঃ—গড়গড়ির ফল অনেকে দেখিয়াছেন। ইহা নানা বর্ণের হয় এবং সেগুলি গাঁথিয়া মালা, পর্দ্দা প্রভৃতি কয়েক প্রকারের গৃহ সজ্জা প্রস্তুত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহার খোসা এত কঠিন ও শাষ এত কম যে খাদ্য শষ্যরূপে ইহার মূল্য কিছুই নাই। আসামে কিন্তু গড়গড়ি খাদ্যশষ্যরূপে কোথাও কোথাও উৎপাদিত হয় এবং ইহা হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপে কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে গড়গড়ি উপযুক্ত চাষ দ্বারা পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হইতে পারে। এখানে গড়গড়িকে অ্যাড্‌লে বলে—ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Coix lachryma-Jobi। ইহার ফসল বিঘাপ্রতি ১৫ মণ এবং চাষও সহজ। গড়গড়ি সাধারণ চালের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ইহার আটা অথবা ময়দার সহিত ¼ ভাগ গমের ময়দা মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট ময়দার সমকক্ষ হয়। বন্য গড়গড়ির খোলা খুব শক্ত হইলেও চাষের ফলে ইহা এত নরম হইয়া যায় যে আঙ্গুলের চাপে ভাঙ্গিয়া যায়। জাতি বিশেষে খোসার ওজন সমস্ত শষ্যের ওজনের শতকরা ২৩—৪৭ ভাগ মাত্র। আজ কাল ফিলিপাইনে ৭টি জাতির চাষ হইতেতেছে। যেখানে খুব বর্ষার পরে মাটি একেবারেই শুকাইয়া যায় সেরূপ স্থলে গড়গড়ি বেশ জন্মান যাইতে পারে। আমাদের দেশে নানাজাতীয় বন্য গড়গড়ি আছে। সেগুলিকে চাষ করিলেও উন্নত হইয়া খাদ্য শস্যে পরিণত হইতে পারে।

জর্ম্মণীর নূতন শিল্পঃ—জর্ম্মণী সম্প্রতি এক প্রকার নূতন শ্লেট আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক প্রচলিত শ্লেটের মত। কিন্তু ইহা কিছুতেই ভাঙ্গে না।

বিলাতে নানাদেশে এই শ্লেটের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। প্রচলিত শ্লেট পেন্‌সিল দিয়া ইহাতে লেখা যায়। পেন্‌সিল অপেক্ষা শ্লেট অধিকতর শক্ত হওয়াতে অতি সহজে লেখা যায়; লেখাতেও অতি সুন্দর ও পরিষ্কার হয়। আর একটি সুবিধা এই যে এই শ্লেটে লাইন কাটা আছে। বার্লিনের ইণ্ডো-জর্ম্মণ কোম্পানী ভারতবর্ষে এই শ্লেট প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বিলাতে তামাকের চাষঃ—তামাকের চাষ ইংলণ্ডের পুরাতন ব্যবসায়। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সার জন হকিন্স ইহা প্রথম ইংলণ্ডে আনয়ন করেন। এবং সেই বৎসরে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে বিলাতে ইহার চাষ আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার পর ক্রমে সেই চাষের উন্নতি হইতে থাকে এবং ইহার ৯৪ বৎসর পরে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ৩৯টী প্রদেশে তামাকের চাষ এত বাড়িয়া উঠে যে তখন ইহা একটী প্রসিদ্ধ লাভজনক ব্যবসায়ের মধ্যে স্থান লাভ করে।

ইহার পর সহসা কোন হেতু না দেখাইয়া পার্লীয়ামেণ্টের আইনে ইংলণ্ডে তামাক উৎপাদন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। ভার্জ্জিনিয়ার কৃষকদিগের উৎকোচ দানই এই আইনের হেতু বলিয়া অনেকের সন্দেহ হয়। তখন ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রদেশের কৃষকেরা এই আইন মানিতে অস্বীকার করিয়া তামাক চাষ আরম্ভ করিলে অশ্বারোহী সৈনিক পাঠাইয়া তাহাদের চাষ-আবাদাদি বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

ভার্জ্জিনিয়ায় কোন কৃষক ইয়র্কের কোন উপত্যকায় গোপনে তামাকের চাষ আরম্ভ করিলে তাহার প্রতিবেশী অপর এক কৃষকও তাহাকে অনুসরণ করিয়া উহার চাষ আরম্ভ করে। তখন এই দুই কৃষক আইনভঙ্গ অপরাধে কঠোর শাস্তির সহিত কারারুদ্ধ ও তাহাদের রোপিত তামাক সাধারণের সম্মুখে দগ্ধ করা হয়, এবং তাহাদের ৩০০০০ পাউণ্ড জরিমানা করা হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে তামাকের চাষ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত ছিল। তাহার পর অনেক কৃষক ইহার চাষ আরম্ভ করে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ২৪০ একর জমি তামাক চাষের উপযুক্ত হইয়া উঠে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই চাষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অনেকে মনে করেন, বিলাতী তামাক এক সময় জগতে বেশ সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে।—সম্মিলনী

বিদেশে রেড়ীর চাষঃ—রেড়ী ফসল ভারতের প্রায় একচেটিয়া ছিল। এখনও জগতের বাজারে ভারতোৎপাদিত তৈলের পরিমাণই অধিক। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রেজিলে অল্প বিস্তর রেড়ীবীজ উৎপাদিত হইতেছে। কল মসৃণ করিবার তৈল হিসাবে রেড়ী তৈলের কাটতি অধিক। কিন্তু আজকাল হাওয়া জাহাজে ও কৃত্তিম চামড়া প্রস্তুতেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে লাগিতেছে। সেজন্য ইহার চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

পল্লী-যুধিষ্ঠির।

(কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ)

দুঃশাসন ত অনেক ভাল দুর্য্যোধন ত বীর
সবার চেয়ে অতি ভীষণ পল্লী-যুধিষ্ঠির।
মাথায় টিকী স্বল্প ভাষী
মিষ্ট বিনায় মুচকী হাসি
হরির নামে ভয়ে তাঁহার চক্ষে বহে নীর।

(২)

সদাই ন্যায়ের পক্ষপাতী,চটেন দেখে দোষ,
অত্যাচারের শত্রু মুখে, বেজায় অসন্তোষ
নিলামে দাম বাড়িয়া নিয়ে
অক্লেশে কন মিথ্যা গিয়ে।

(৩)

সদ্য দলিল জাল করাতে নাইক দ্বিধা তার
দু এক বিঘা জমি যদি পায় সে পুরস্কার।
সাক্ষী শেখায় রাত্রি জাগি,
অনেক করে পরের লাগি,
হিন্দুগণের দেবতা তিনি মুসলমানের পীর।

(৪)

'সাইলক'ও হায় কল্‌কে না পায়, কাঁদ্‌ছে 'ইয়া গো'
সয়তানেরো ঈর্ষাতে হায় জল্‌ছে হিয়া গো।
সত্যানুরাগ প্রবল বড়
সবাই তারে প্রণাম কর
সশরীরে তাহার বাপু স্বর্গে যাওয়াই স্থির।

(৫)

অনেক কুকুর এবার তাহার সঙ্গে যাবে ঠিক
তাদের অগাধ পুণ্যেরি হায় হয় না যে নিরিখ্।
ধর্ম্মকথার জবাব কাটে, শক্তিবানের চরণ চাটে,
পল্লী মায়ের বাস্তুসাপে আস্ত নোয়াও শির।
সবার চেয়ে অতি ভীষণ পল্লী যুধিষ্ঠির।

আলু—চাষ।

একটী বেলে দোয়াঁশ মাটীর জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া ২৷৷০ বিঘা জমী মনোনীত করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে চাষ দিলাম। ঐ জমীতে ঐ বৎসর পাট দেওয়া হইয়াছিল। ৪খানি হালে দুই দিবস রীতিমত চাষ দেওয়াইয়া, একদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে মই দেওয়াইয়া, জমীকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রত্যেক ভাগে পাঁচ কাঠা করিয়া লইলাম। পোস্তা হইতে "কানপুরী টুকরি" আলু-বীজ খরিদ করিয়াছিলাম। ২রা কার্ত্তিক বীজ লাগাইতে আরম্ভ করি এবং দুই দিনে ঐ কার্য্য শেষ করি।

প্রথমতঃ পাঁচ কাঠা জমীকে বিঘা প্রতি ৮৴০ হিসাবে রেড়ীর খৈইল ব্যবহার করি। খৈইল ঢেঁকিতে কুটিয়া মাটীর সহিত মিলাইয়া প্রত্যেক বীজ বসাইবার সময় সামান্য সামান্য দেওয়া হয়। ঐরূপ দ্বিতীয় পাঁচ কাঠায় বিঘা প্রতি ৬৴ মণ হিসাবে খৈল সার ঐরূপ ভাবে দি। তৃতীয় পাঁচ কাঠা জমীতে ঐ খৈইল বিঘা প্রতি ৪৴ মণ হিসাবে দি। এবং তৎপরবর্ত্তী পাঁচ কাঠায় বিঘা প্রতি ২৴ মণ হিসাবে রেড়ীর খৈইল ঐরূপে দি। এইরূপে ১৴ বিঘা জমী শেষ হইল। তাহার পর একবন্দে কোন সার প্রয়োগ করি নাই। তাহার পর পাঁচ কাঠা জমীতে সরিষার খৈইল উক্ত রূপে গুঁড়া করিয়া, সামান্য মাটি মিশাইয়া, বিঘা প্রতি ৮৴ মণ হিসাবে দিয়াছিলাম। তাহার পর পাঁচ কাঠা জমীতে গোবর সার বিঘা প্রতি ৫০৴ মণ হিসাবে দিয়াছিলাম। দেশে চাষীরা সাধারণতঃ গোবর যেরূপে স্তূপ করিয়া রাখিয়া দেয়, ইহা সেইরূপ সার। ভাল উপায়ে রক্ষা করা গোবর সার নহে, জমী চাষ দিবার পূর্ব্বে উহা দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর শেষ পাঁচ কাঠা জমীতে ছাই প্রয়োগ করি। দেশে কাঠের জ্বাল দেওয়া হয়। উনানের ছাই বাড়ীর বাহিরে প্রায় সকলেই এক যায়গায়, ফেলিয়া রাখে। ঐ ছাই গাদার ছাই। উহা চাষের পূর্ব্বে জমীর উপর প্রায় ৩ ইঞ্চি করিয়া বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরে লাঙ্গল দেওয়া হয়। সর্ব্ব সমেত ২৴ বিঘা জমী হইল। প্রত্যেক বিভিন্ন পরিমাণ ও রকমের সার দেওয়া জমীর মধ্যবর্ত্তী স্থান কিছু কিছু ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল; ইহাতে বাকী দশ কাঠা জমী নষ্ট হয়। পাছে ফসল জন্মাইবার পর মিশাইয়া যায় এজন্য খালি কিছু কিছু জমী মধ্যে মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম।

বীজ বিঘা প্রতি একমণ ত্রিশ সের লাগিয়াছিল। ঐ জমীতে ঐ বৎসর পাট হইয়াছিল পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাটে কোন সার প্রয়োগ করা হয় নাই। তাহাতে বিঘা প্রতি ৬৷৷ মণ হিসাবে পাট জন্মাইয়াছিল।

২রা কার্ত্তিক ও ৩রা কার্ত্তিক বীজ লাগাইতে গেল। তিন দিন সামান্য সামান্য

জল প্রত্যেক বীজের উপর, সন্ধ্যার পর দেওয়া হইয়াছিল। পরে দশদিন আর কোন রূপ কাজ করা হয় নাই। ১৭ই কার্ত্তিক ছেঁচ্ দেওয়া হয়। তখন গাছ গুলি প্রায় ২॥ ইঞ্চি তিন ইঞ্চি করিয়া হইয়াছে। প্রথম প্রথমে গাছের কোন ইতর বিশেষ দেখা গেলনা। আমি ঐ ডাঙ্গার মধ্যস্থানের পুষ্করিণীতে কানপুর এম্পায়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির একটী জল ছেঁচা কল বসাইয়াছিলাম। উহার দ্বারাই ছেঁচ্ সমস্ত ডাঙ্গায় হইত। সমস্ত ডাঙ্গাটী প্রায় ১৪/ বিঘা। জল ছিঁচিবার সময় ২জন লোক জল, হাতল ঘুরাইয়া তুলিত এবং একজন নালি সাফ্ করিয়া প্রত্যেক আলুর সারিতে জল পঁহুছিবার বন্দোবস্ত করিত। ৪ ঘণ্টা কাজ করিলে অর্থাৎ সকাল হইতে বেলা ১১ টার মধ্যেই ঐ ২॥ বিঘা জমীতে জল দেওয়া শেষ হইত। এই জল দেওয়ার ৩ দিন পরে অর্থাৎ ২০ কার্ত্তিক তারিখে ৫টা লোকে ২॥ বিঘা জমীর ঘাস প্রভৃতি যাহা জন্মাইয়াছিল তাহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল এবং আলুর গাছের গোড়া গুলি সামান্য ২ আল্‌গা করিয়া দিয়াছিল। এই সময় দেখা গেল সরিষার খৈল যে জমীতে দেওয়া হইয়াছিল সেই জমীর একশত গাছের মধ্যে ৪টা গাছ মরিয়াছে। কারণ কি ঠিক্ করিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ সরিসার খৈলে একটু ঝাঁজ্ আছে বলিয়া। ঐ ঐ স্থানে অর্থাৎ যেখানে যেখানে গাছ মরিয়া গিয়াছিল, সেই সেই খানে আমি পুনরায় নূতন বীজ বসাই সে গাছ কিন্তু বাঁচিয়াছিল। তাহার পর ২০ দিবস আর কোন কাজ করা হইল না। ১১ই অগ্রহায়ণ পুনরায় একটী ছিচ্ দেওয়া হইল। এবং ১৪ই পৌষ আর একটী ছেচ্ দিলাম * ১১ই অগ্রহায়ণ ও ১৪ই পৌষ যে ছেঁচ্ দেওয়া হইল, ছেঁচ্ দেওয়ার ২।৩ দিন পরে মাটী একটু ঝর ঝর হইলে, প্রত্যেক গাছের গোড়ায় লাইন করিয়া ৪ইঞ্চি করিয়া মাটী দেওয়া হইয়াছিল। দেশের পাপীরা প্রায় তিন মাটী দেয় কিন্তু আমি ২ বারের বেশী দিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না। মাঘ মাসের অর্দ্ধেক গত হইতে দেখিলাম দু একটা গাছ শুকাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফাগুন মাসের ১২ তারিখের ভিতর প্রায় সমস্ত গাছ শুকাইয়া গেল। ক্বচিৎ দু একটা কাঁচা রহিল।

১৫ই ফাল্গুন হইতে আলু খুঁড়িয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম।

যে জমীতে বিঘা প্রতি ৮/ মণ হিসাবে সার দিয়াছিলাম তাহাতে বিঘা প্রতি ৬৫/০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইল। যাহাতে ৬/ হিসাবে সার দিয়াছিলাম তাহার ফলন বিঘা প্রতি ৫০/ মণ হইয়াছিল। যে জমীতে ৪/ মণ বিঘা প্রতি সার দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলন হইল বিঘা প্রতি ৩৮/ মণ। যে জমীতে বিঘা প্রতি ২/০ মণ করিয়া সার দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে ফলন বিঘা প্রতি ২৫/ মণ। সার অর্থে সমস্ত জমী গুলিতেই রেড়ীর খৈল।

যে জমীতে কোন সার দেওয়া হয় নাই তাহার ফলন হইল বিঘা প্রতি ২০/ মণ।

যে জমীতে বিঘা প্রতি ৮/ মণ সরিষায় খৈল দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলন হইল বিঘা প্রতি ৬০/ মণ। যে জমীতে গোবর সার দেওয়া হইয়াছিল তাহার ফলন বিঘা প্রতি ৩০/ মণ। যে জমীতে ছাই দেওয়া হইয়াছিল তাহার উৎপন্ন খুব বেশী হইল—বিঘা প্রতি ৬৮/ মণ। অলু আকারে বেশ বড় বড় হইল। আলুর রংও বেশ সাদাটে হইল।

আমি ঐ সমস্ত বিভিন্ন জমী হইতে উৎপন্ন আলু রক্ষা করিবার মনস্থ করিলাম। কোন্ আলু কত দিন রক্ষা করা যায় দেখিবার জন্য আমি প্রত্যেক বিভিন্ন সারের, উৎপন্ন আলুর এক মণ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে লইয়া এক একটী বড় বড় ছিদ্র-যুক্ত পাত্র বালির উপর স্তবকে স্তবকে রাখিয়া হাওয়া-যুক্ত স্থানে রক্ষা করিলাম।

রেড়ীর ও সরিষার খৈল যে জমীতে ৮/ মণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অতি অল্পই নষ্ট হইল। মণ প্রতি /২॥ সেরের বেশী নষ্ট হইল না। অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর আশ্বিন পর্য্যন্ত।

৬/০, ৪/০, ২/০ মণ হিসাবে যে সমস্ত জমীতে সার দেওয়া হইয়াছিল—তাহার মধ্যে প্রথমোক্তটী ৮।৯ মাস পরে কিছু কিছু নষ্ট হইয়া, শেষ পর্য্যন্ত কত ৩৩ সের ছিল—এবং শেষোক্ত দুইটী ৫ মাস পর্য্যন্ত কোন রূপ নষ্ট হয় নাই। আষাঢ়ের শেষ হইতে পচিতে আরম্ভ হয়, এবং আশ্বিন পর্য্যন্ত ৩১ সের করিয়া ছিল।

বিনা সারের জমীর আলু শেষ পর্য্যন্ত ॥৮ সের ছিল—উহা ও আষাঢ় হইতে পচিতে আরম্ভ হয়।

যাহাতে গোবর সার দেওয়া হইয়াছিল উহা ৪ মাস ঠিক্ ছিল, পরে পচিতে আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ৮১॥ সের ছিল।

যে জমীতে ছাই দেওয়া হইয়াছিল উহার আলু আড়াই মাস ঠিক্ ছিল। তাহার পর আলুর গায়ে একটা একটা কাল দাগ দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পর যে পচিতে আরম্ভ হইল, ঐ দাগ লাগার সময় হইতে দেড় মাহার মধ্যে একটী আলু ও রক্ষা করা গেল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যবসা হিসাবে অর্থাৎ রোজ বাজারে বিক্রয় করিলে, ছাই দেওয়া জমীর উৎপন্ন ফসলে বিশেষ লাভবান হইতে পারা যায়। ছাই ফেলিতে বিশেষ কোন খরচ নাই; অথচ ফলনের পরিমাণ অনেক বেশী। আমার ধারণা এই যে আলু যখন বাড়িতে থাকে, মাটী সরাইয়া দিয়ে উহার বাড়িবার যায়গা হয়। ছাই যুক্ত মাটীতে, আলু যেমন বাড়ে, উহা সরিয়া যায় এজন্য আলু বাড়িতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। আলুর জমী সেজন্য বেলে হওয়া আবশ্যক। দোঁয়াশ জমীকে পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়া খুব নরম করে নেও; ছিঁচ্ দিবার পর আবার মাটী শক্ত হইয়া যায় এবং আপু

যদৃচ্ছা বাড়িবার পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্ন হয়। এজন্য নদীর চর জমীতে আলু চাষ খুব প্রশস্ত। চর জমীর মাটী প্রায় বেলে মাটী হইয়া থাকে।

আমি যে খৈল সার দিয়াছিলাম, উক্ত সারের আন্দাজ ৩ ভাগ আলু বসাইবার সময় দিয়াছিলাম, বক্রী এক ভাগ আলুর লাইনে প্রথম বার মাটী দিবার সময় দিয়াছিলাম—পর বৎসর পুনরায় ঐ জমীতে বিনা সারে পাট দিয়াছিলাম। তখন সমস্ত জমিটী এক সঙ্গে চষিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহাতে বিঘা প্রতি ৯/ মণ পাট হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা গেল যে আলু উৎপন্ন হইবার পর ও যথেষ্ট সারের ক্ষমতা ছিল। সুতরাং আলুর ফলন খুব বেশী না হইলেও, পাটেতে তাহার পূরণ হইয়া গেল।

শ্রীবিমলা চরণ রায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল; বিলাতী সব্জী বীজ বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা, এবং নাবী জাতীয় সীম সালগম, বীট, গাজর, পিয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচারাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্লাদি—সুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করা যায়। বাঙলার ক্ষেতে তুলা চাষেরও এখন একটা ভাল সময়। একবার বৈশাখ মাসেও তুলাচাষ হইয়াছে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে

তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কলা বাহির হইলেই পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এইমাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কলা সমেত এমটী পিয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর "যো" হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিয়াজ বসাইবে। পেয়াজের বীজ বপন করিয়াও পেঁয়াজ চাষ করা যায়। প্রথম বর্ষে খুব ক্ষুদ্র পেয়াজ হয়, দ্বিতীয় বর্ষে সেই পেঁয়াজ পুতিলে বড় পেঁয়াজ হয়।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি, ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যকমত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকেন না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকা কালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এইকারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

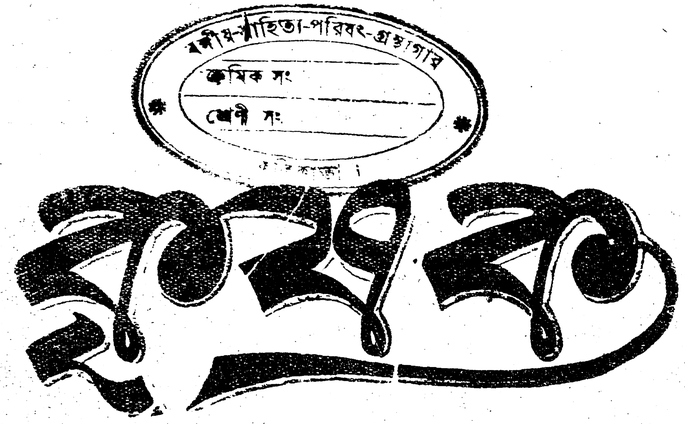

২৪ খণ্ড } কৃষক—আশ্বিন, ১৩৩০ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বনভূমির উপকারিতা।

যে সময় মানুষের জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, যে সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মর্ম্ম মানব ভাল করিয়া বুঝিতে শিখে নাই, সে সময়ে অরণ্য কেবল অনিষ্টের আকর বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য-সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কর্ষিত ভূমির ন্যায় অরণ্যও অতীব প্রয়োজনীয়। অরণ্যজাত নানাবিধ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য হিসাবে অরণ্য অত্যাবশ্যক। দেশমধ্যে বারিপাত, মৃত্তিকায় জল-সংস্থান, প্রবল বন্যা নিবারণ—এ সমুদয়ের সহিত অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেই কত দেশ অরণ্যশূন্য হইয়া অনুর্ব্বর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে পঞ্চনদের কতিপয় স্থান ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতে অরণ্যের পরিমাণ যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা পুরাকালের পুস্তকাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখনও ভারতে বনভূমি নিতান্ত সামান্য নয়। বৃটিশ-শাসিত সমস্ত ভারতের ও ব্রহ্মদেশের আয়তন ১০, ৭৯, ৬৩৭ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে শুধু বনভূমিরই আয়তন ২৫০৪৭৩ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে ১৭০০০০ একর জমিতে নূতন জঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বেসরকারী জঙ্গলও আছে;

কিন্তু তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোটের উপর, ভারতের সমস্ত বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের এক চতুর্থাংশের কম হইবে না।

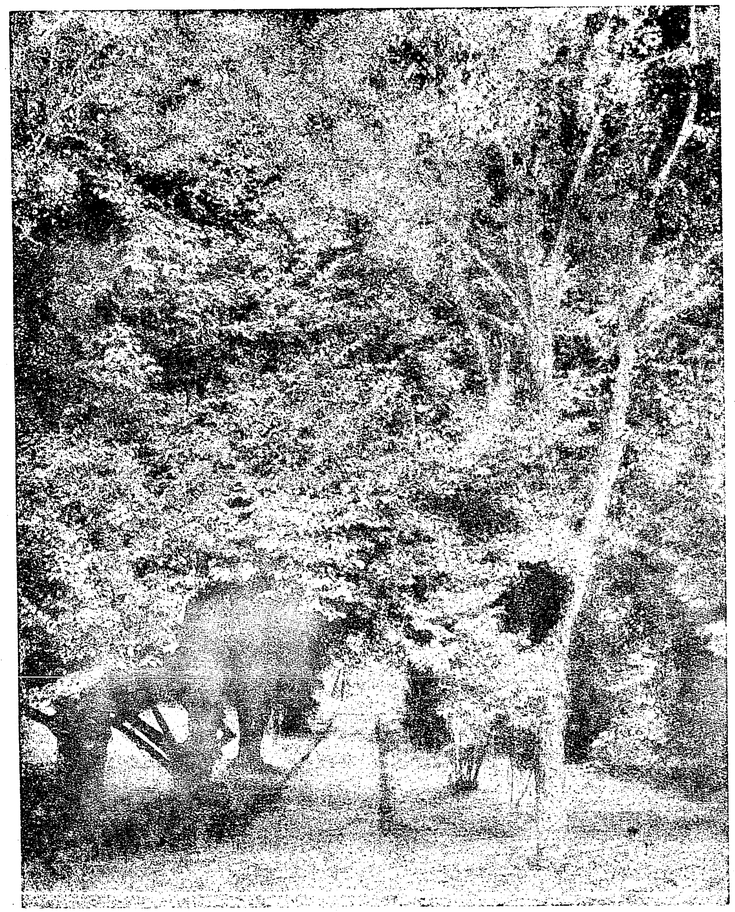

ভারতে অরণ্যের পরিমাণ কম না হইলেও, উহার সংস্থান সর্ব্বপ্রদেশে সমান নহে। অরণ্যের প্রকৃতিও, অর্থাৎ নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতাদির সমাবেশও দেশভেদে বিভিন্ন প্রকারের। প্রধানতঃ সাত প্রকারের জঙ্গল এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য জঙ্গলের ঠিক শ্রেণীবিভাগ করা যায় না, কিন্তু তবু বিবিধ উদ্ভিদ্‌জাতির প্রাধান্যে ও জল,

বায়ু, মৃত্তিকা এবং ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার পার্থক্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহের অরণ্য বিশেষ-বিশেষ লক্ষণযুক্ত।

১। উত্তর ভারতীয় অরণ্য ঃ—ইহা হিমালয়ের গাত্র ও পাদদেশ দিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, দার্জ্জিলিং, আসাম ও সমুদ্র-উপকূলে চট্টগ্রাম—এই সমস্ত দেশ দিয়াই এই বিশাল অরণ্যমালা চলিয়া গিয়াছে। এত দূরব্যাপী জঙ্গলের বৃক্ষলতাদি যে সর্ব্বস্থলে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়ের বনানীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে কি উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে, কি উপত্যকায়, সর্ব্বস্থানেই কনিফার (Conifer) শ্রেণীর গাছ—দেবদারু, চিল,—রেওয়ার ও মোরু, ভুজ, সফেদার, বেদ প্রভৃতিরই প্রাধান্য। উত্তর-পূর্ব্বে উচ্চদেশে কনিফার শ্রেণীর বৃক্ষ থাকিলেও, নিম্নদেশে উহার সংখ্যা নিতান্ত কম এবং তৎপরিবর্ত্তে অধিক উত্তাপসহ উদ্ভিদ সমূহের—যথা ম্যাগ্‌নোলিয়া, শিশু, খয়ের প্রভৃতিরই প্রাদুর্ভাব বেশী। বেতের জঙ্গল, আসামে নাগকেশর ও টুণ এবং সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী স্থানে গর্জ্জন ও জারুলের সমাবেশ উত্তর-পূর্ব্ব অরণ্যানীর বিশিষ্ট লক্ষণ। এই হিমালয়ের অরণ্যের নিম্নভাগে গড়ওয়াল, কুমায়ুণ, খেড়ী, নেপাল তরাই ও গারো পর্ব্বত-অঞ্চলে বহুবিস্তৃত শালের জঙ্গল। পঞ্চনদের দিকে শুষ্ক মৃত্তিকার উপযোগী ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির জঙ্গলও স্থানে-স্থানে রহিয়াছে।

২। পূর্ব্ব-ভারতের অরণ্য ঃ—গঞ্জাম ও বিজয়পত্তনের জঙ্গলে ইহা প্রারব্ধ হইয়াছে। দেশাভ্যন্তরে কর্ণূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণে সালেম ও নেলোর জেলায় গিয়া ইহা পশ্চিম-ভারতের জঙ্গলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

৩। পশ্চিম-ভারতের জঙ্গল ঃ—বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলা হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত বোম্বাই, কোলাবা, কানাড়া, মালাবার ও নীলগিরি পর্ব্বত দিয়া ইহা ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই বন-বিভাগের উত্তরাংশে যথেষ্ট আবলুষ ও সেগুন গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; মধ্যাংশে হরিতকী, জারুল ও চালতা জাতীয় বৃক্ষাবলী এবং দক্ষিণাংশে পুন্নাগ চাপা, ঠেঙ্গণ, আম, কুচিলা, দারুচিনি, গর্জ্জন, নাগকেশর প্রভৃতি বহুবিধ জাতীয় উদ্ভিদের নিবিড় জঙ্গল।

৪। মধ্য-ভারতের জঙ্গল ঃ—পূর্ব্বপ্রান্তে সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম-প্রান্তে বঙ্গদেশ এতদুভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মধ্য প্রদেশ, খান্দেশ, সাতপুরা ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ ব্যাপিয়া মধ্যভারতীয় অরণ্য বিরাজ করিতেছে। এই সমুদয় স্থানে বারিপাত কম এবং উদ্ভিদও তদনুরূপ। পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণে সেগুন, মধ্য ও পূর্ব্বে শাল এবং দক্ষিণসীমায় চন্দন—এই তিনটি বৃক্ষজাতিই এই বন-বিভাগের বিশিষ্ট লক্ষণ। তদ্ভিন্ন সাঁই, অঞ্জন, কুসুম, রক্তচন্দন, শিমুল প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে এতদঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। ব্রহ্মদেশের জঙ্গল ঃ—দেশের আয়তনের অনুপাতে ব্রহ্মদেশেই অরণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। আবার সমস্ত ভারতের অরণ্যের মধ্যে কি প্রসারতায়, কি বৃক্ষজাতির বাহুল্যে, উভয় হিসাবেই ব্রহ্মদেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এতদ্দেশে অনেক শ্রেণীর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতগাত্রের বনশ্রেণী পূর্ব্ব-হিমালয়ের বনের ন্যায়। টেনা সেরিম, পেগু, মার্টাবান ও পূর্ব্ব আরাকানে সেগুনই অধিক। গাম্ভার, জাম, সিরিস প্রভৃতিও এইস্থানে পাওয়া যায়। এক-এক স্থানে শুধু গর্জ্জনেরই জঙ্গল। আবার শুষ্ক স্থানে খদিরেরই প্রাধান্য।

৬। উপকূল অরণ্য ঃ—ভারতের বড়-বড় নদী—গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী, ইরাবতী, প্রভৃতির মোহানায় ব-দ্বীপ সমূহের উপর এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর উদ্ভিদাবলী জন্মিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের জঙ্গল ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। এইরূপ জঙ্গল টেনাসেরিম, আরাকান, চট্টগ্রাম, মালাবার ও ভারতের অন্যান্য উপকূলে দৃষ্ট হয়। সুন্দরী, ভোরা, গরাণ প্রভৃতি গাছ এই সমুদয় কর্দ্দমময় স্থানের প্রধান উদ্ভিদ্।

৭। বিচ্ছিন্ন বনশ্রেণী ঃ—ভারতের নানাস্থানে, পশ্চিমে সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড় ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি জঙ্গল আছে। সাধারণ হিসাবে পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে কোনটিতেই উহাদিগকে স্থান দিতে পারা যায় না। উহাদিগের উদ্ভিদাবলীও স্থান হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের।

মোটামুটি হিসাবে ভারতীয় বনশ্রেণীকে উক্তরূপে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। প্রদেশ হিসাবে বিভাগ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অরণ্য-সংস্থানের যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ঃ—

প্রদেশের নাম		মোট ভূমির সহিত বনভূমির অনুপাত।
১। বেলুচিস্থান—	...	১·৪
২। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	...	১·৮
৩। বিহার ও উড়িষ্যা—	...	৩·৪
৪। যুক্তপ্রদেশ—	...	৩·৯
৫। আজমীর মাড়ওয়ার—	...	৫·১
৬। পঞ্চনদ—	...	৮·৬
৭। বোম্বাই—	...	৯·৯
৮। বঙ্গদেশ—	...	১৩·৫
৯। মান্দ্রাজ—	...	১৩·৮

১০। মধ্য-প্রদেশ ও বেরার—	...	১৯·৭
১১। কুর্গ	...	৩২·৯
১২। আসাম—	...	৪৬·৬
১৩। ব্রহ্মদেশ—	...	৬২·৯
১৪। আণ্ডামান—	...	৭০·৩

উপরিউক্ত তালিকায় প্রদেশগুলি অরণ্যের আধিক্যের হিসাবে পর-পর সজ্জিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এক এক প্রদেশ প্রায় জঙ্গলবিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, আণ্ডামানের ন্যায় স্থানে প্রায় সমস্ত জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। সেইজন্য স্থান-বিশেষে অরণ্য-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষের ও বসবাসের জমি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং কোথাও বা অরণ্য স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হয়।

অরণ্য সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্যই অরণ্য-বিভাগের সৃষ্টি। সাধারণ লোকের নিকট অরণ্য রাখা কি কাটিয়া ফেলা একটা অতি সামান্য কাজ, তাহাতে কোন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু আধুনিক জগতে বনবিদ্যা কৃষিবিদ্যার সমশ্রেণী অধিকার করে। প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড় বড় কলেজ, যন্ত্রাগার, পরীক্ষা ও প্রদর্শনক্ষেত্র আছে, এবং উক্ত স্থানে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে তবে কোন ব্যক্তির বনবিভাগে কর্ম্মপ্রাপ্তি ঘটে। আমাদিগের দেশে দেরাদূনে অবস্থিত বনবিদ্যার কলেজ ও মৌলিক গবেষণাগারই বনবিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অধিক দিনের নহে। তার ও ডাক বিভাগের ন্যায় বনবিভাগও লর্ড ড্যালহৌসির সৃষ্টি। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয় এবং কয়েক স্থানের জঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া উন্নতির চেষ্টা করেন। আপাততঃ জার্ম্মাণি আমাদিগের শত্রু হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতের বনবিভাগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, একজন জার্ম্মাণ—স্যর ডেটীক ব্র্যাণ্ডিস্। সে সময়ে বনবিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ প্রধানতঃ জার্ম্মাণি অথবা ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। তৎপরে ইংলণ্ডের কুপার্স হিল কলেজে ও অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবর্গ ও ডব্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমান দেরাদূনে অবস্থিত কলেজ ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেই বনবিভাগে নিযুক্ত অধিকাংশ দেশীয় কর্ম্মচারি শিক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন।

ভারতে জঙ্গলের আধিক্য হিসাবে ভারতবাসী যে অরণ্য-বিদ্যায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের

ন্যায় উচ্চস্তরের বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত এখনও এতদ্দেশে হয় নাই। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সবেমাত্র রাজসরকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, চিল, প্রভৃতি আয়কর বড়-বড় বৃক্ষের সংরক্ষণ ও বাছাই কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু আরও যে নানা প্রকার অরণ্যজাত দ্রব্য দ্বারা ধনাগমের উপায় হইতে পারে, সে বিষয়ে রাজসরকারের কিম্বা জন সাধারণের বিশেষ চেষ্টা নাই। ১৯১৯।২০ সালের বনবিভাগের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিভাগের মোট আয় ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রকৃত আয় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। মোট বনভূমির অনুপাতে এই হিসাবে প্রতি বর্গ মাইলে ৬৪৲ টাকা লাভ হয়। অপরাপর দেশের হিসাবে ইহা অতি সামান্য। অরণ্য-বিদ্যায় অবহেলাই ইহার অন্যতম কারণ। অরণ্য সকল অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিদর্শিত হইলে এবং নানাবিধ অরণ্যজাত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলে, আয় যে চতুর্গুণ হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সরকারী হিসাবে অরণ্যজাত ফসলকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—মুখ্য ও গৌণ ফসল। মুখ্য ফসলের মধ্যে অবশ্য কাষ্ঠই সর্ব্বপ্রধান, এবং ইহা হইতেই সরকারের সর্ব্বাধিক আয় হয়। ভারতের অরণ্যে বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং জাতি-বাহুল্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় অরণ্যে অন্ততঃ ২৫০০ জাতীয় বৃক্ষ আছে। তবে প্রধান কাষ্ঠ-উৎপাদক বৃক্ষাদির মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, আবলুষ, চন্দন, রক্তচন্দন, পাদক, পিংকাড়ো, গর্জ্জন, বকুল, খয়ের, প্রভৃতিই অন্যতম। বাঁশ, জ্বালানি-কাঠ ও ঘাস, এই বিভাগের অন্তর্গত। এই তিন প্রকারের দ্রব্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় সামান্য নহে। বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ এই শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন মাত্রা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকেন। সেইজন্য বৎসরের পর বৎসর মুখ্য ফসল উৎপাদনের অধিক পরিমণে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

কিন্তু ভারতীয় অরণ্যসমূহের গৌণ অরণ্য-ফসলও নিতান্ত নগণ্য নহে। দুই-একটি স্থল ব্যতীত এই শ্রেণীর ফসলের ক্রমোন্নতি-সাধন অথবা উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এমন কি, অনেক স্বভাবজ উদ্ভিদাদি, যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা অন্য দেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্য নিয়োগ করিতে আদৌ কাল বিলম্ব হইত না—সেরূপ দ্রব্যাদিও অবহেলায় বনমধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আপাততঃ যে সকল গৌণ ফসল হইতে বনবিভাগের আয় হয়, সেগুলি শুধুই যে অনায়াসলব্ধ, তাহা নহে, অধিকন্তু সেই সমুদয় ফসল অবৈজ্ঞানিকভাবে আরণ্য জাতি প্রভৃতির দ্বারাই সংগৃহীত হয়। এইরূপ শৈথিল্য ও অবজ্ঞার সহিত সংগৃহীত হইয়াও ইহা হইতে

সরকারের প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গৌণ আরণ্য ফসল হইতে কিরূপ আয় হয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশের নাম	গৌণ অরণ্য ফসল হইতে আয়।	বনভূমির বর্গ-মাইল প্রতি আয়ের অনুপাত।
১। পঞ্চনদ	২৩,৪৭,১২০৲	২৮২৲
২। যুক্ত প্রদেশ	৮,৮৮,৯৪৯৲	২১৩৲
৩। আজমীর মাড়বার	২৩,৮৩৭৲	১৮৬৲
৪। সীমান্ত প্রদেশ	৩৬,৮৮১৲	১৫৬৲
৫। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২২,৩৪,৮১১৲	১১৪৲
৬। বোম্বাই	১১,৮৩,৫৮৯৲	৯৭৲
৭। মান্দ্রাজ	১৮,৬৮,৪৩২৲	৯৫৲
৮। বিহার ও উড়িষ্যা	২,৩৩,৪২২৲	৮৪৲
৯। বেলুচিস্থান	৪৩,৬১৭৲	৫৬৲
১০। কুর্গ	২৪,৩৮৪৲	৪৯৲
১১। বঙ্গ	৩,৫৩,৯৭৪৲	৩০৲
১২। আসাম	৬,৯৯,৮২৮৲	৩১৲
১৩। ব্রহ্ম	৮,৫৩,৯০৫৲	৬৲
১৪। আণ্ডামান	৫,১৫৭৲	২৲

উপরি-উক্ত তালিকার সহিত ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত তালিকার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অরণ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেই গৌণ অরণ্য ফসল অধিক হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদেশ ও আণ্ডামানের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অরণের অনুপাতে এই দুই দেশে শতকরা ৬২·৯ ও ৭০·৩ অংশ জমিতে অরণ্য আছে। কিন্তু এই দুই দেশে গৌণ অরণ্য ফসল হইতে আয় বর্গমাইল প্রতি যথাক্রমে ৬৲ ও ২৲ টাকা। পক্ষান্তরে প্রদেশসমূহের মধ্যে অরণ্যের বাহুল্যতায় পঞ্চনদ নবম স্থান অধিকার করিলেও গৌণ অরণ্য ফসল হইতে আয়ের হিসাবে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, জঙ্গলের বিস্তৃতিতে নহে, বরং তত্ত্বাবধারণের গুণে গৌণ অরণ্য ফসলের আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চনদ ও যুক্ত-প্রদেশে বন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গৌণ অরণ্য ফসল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যতটা চেষ্টা করেন, ততটা অন্য কোথাও হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অরণ্য বিভাগের উদ্যমে যে সমুদয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে তার্পিণ ও রজন উৎপাদন অন্যতম এবং পঞ্চনদের জাল্লো এবং যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালী এই দুই স্থানে দুইটি প্রধান তার্পিণের কারখানা অবস্থিত। আরণ্য ঘাস ও বাঁশ হইতে কাগজ-উপাদান, কাষ্ঠ হইতে নানাবিধ কার্য্যে

প্রয়োগের জন্য কাষ্ঠ-পিণ্ড—এই সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রস্তাবনা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, হইলেও তাহা উক্ত দুই দেশে কিম্বা বঙ্গদেশে হইবে।

গৌণ আরণ্য ফসল হইতে যে কত প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা মোটামুটি কয়েক শ্রেণীর ফসলের উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপতঃ শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ —

(১) তন্তু ; রজ্জু প্রস্তুতের উপযোগী মুঞ্জঘাস, কেয়া, আঁতমোড়া, আকন্দ, বনঢেঁড়স প্রভৃতি ; কাগজের জন্য সাবাই ও অন্যান্য জাতীয় ঘাস ও বাঁশ ; ব্রুসের জন্য হেঁতাল, গোলপাতা ইত্যাদি।

(২) ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদাদি, মসলা ও গন্ধদ্রব্য ; গন্ধতৃণ, রোজা-তৃণ ও চন্দন-কাষ্ঠ আপাততঃ বড় বড় ব্যবসায়ের দ্রব্য। দারুচিনি, ছোট এলাচ, গোলমরিচ, জায়ফলও জঙ্গল হইতে কতক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ঔষধে সুপরিচিত বহু সংখ্যক উদ্ভিদ্ জঙ্গলে জন্মাইয়া থাকে ; মিঠা তেলিয়া, বচ, খোরাসাণী আজোয়ান, কুচিলা, কুট প্রভৃতি কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এগুলির এখনও রীতিমত সংগ্রহের ব্যবস্থা নাই।

(৩) খাদ্য দ্রব্য ঃ—আম, কাঁঠাল, জাম, খোবানি, আখরোট, নানা জাতীয় ঘাস প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে দরিদ্র আরণ্য জাতিসমূহের সময়ে সময়ে আহার যোগাইয়া থাকে। সাগু ও আরারুটও অনেক পরিমাণে বন্য উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হয়।

(৪) রঞ্জক পদার্থ ঃ —বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার আজ-কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া রং করিবার জন্য এখনও বাবলা, তারওয়ার, সোঁদাল ও গরাণ ছাল এবং হরিতকী ও বাবলা ফল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সমস্তই আরণ্য দ্রব্য।

(৫) আঠা ও বৃক্ষাদির নির্য্যাস ঃ—বাবলা আঠা, পলাশ, সিমুল ও বিজাশাল গঁদ, ধূনা, লবান প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্রব্য। চির বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে। গজ্জন ও ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ইন ও খিটসি তৈল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবার চাষের চেষ্টা আসাম ব্রহ্মদেশে ও কোচিনে চলিতেছে।

(৬) গৃহসজ্জাদি এবং ইমারৎ ও নৌগঠনের কাষ্ঠাদি ঃ—এই সমুদয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নানাবিধ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, বেত, উইলো, মুঁজ, নল, প্রভৃতির সাহায্যে যেরূপ টেবিল, চেয়ার, ঝুড়ি, মাদুর, বাক্স, পেটারা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, এতদ্দেশে এখনও সেরূপ হয় নাই। চীন ও বিশেষতঃ জাপানে এই সমুদয় উপাদান হইতে মনোহর কারু-কার্য্যসম্পন্ন আসবাবাদি নির্ম্মিত হয়।

(৭) বিশেষ কার্য্যাদি : পেন্সিল, খেলানা, প্যাকিং-বাক্স, ঝুড়ি, ক্রিকেট, টেনিস, প্রভৃতি ক্রিড়ার সরঞ্জাম, শ্লীপার ও কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী কাঠ ভারতীয় অরণ্যসমূহে যথেষ্ট পরিমাণ আছে ; কিন্তু এ সকলের সামান্য অংশ মাত্রই ব্যবহারে আসিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌণ আরণ্য ফসলের কেবলমাত্র শ্রেণীরই উল্লেখ করা চলে। আমরা প্রত্যেক শ্রেণীতে যে দুই চারিটি দ্রব্যের নাম করিয়াছি সেগুলি শুধু শ্রেণীর প্রতিভূ। প্রত্যেক শ্রেণীতে ঐ প্রকারের বহুসংখ্যক দ্রব্য আছে এবং সে গুলির নামোল্লেখ করিতে গেলে একটি ছোট-খাট পুস্তিক হয়। তবে এই স্বল্প তালিকা হইতেই বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌণ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্যতার অনুপাতে কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা নগণ্য। যে সমুদয় ফসল আজকাল অবহেলায় অপচয় হইতেছে, তৎসমুদয়ের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ সুমহান, তাহা আমরা জঙ্গলের জনৈক কর্ম্মচারীর উক্তির দ্বারা দেখাইব।

Indian Indiustrial Commission এর অধিবেশনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মধ্য-প্রদেশের Chief Conservator of Forests, মিঃ হিল্ বলিয়াছেন : It was in the utilisation of the minor forest products that the greatest possibilities of commercial development existed. There was a great amount of work still to be done and the prospects were such as to justify fully a large staff of experts. The existing staff could only undertake enquiries into a few of the numerous products available. What was essentially wanted was a body of highly trained practical experts who would make full investigations into single products or groups of products on a large scale to demonstrate their commercial value."

ভাবার্থ ঃ—গৌণ্য আরণ্য ফসলের সদ্ব্যবহারেই ব্যবসায়ের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা। এখনও বিপুল পরিমাণ কার্য্য অসাধিত রহিয়াছে। ঐ সমুদয় কার্য্যের ভবিষ্যৎ এরূপ আশাপ্রদ যে বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান কর্ম্মচারিবর্গ অপরিমিত ফসলসমূহের মধ্যে কেবল দুই একটির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু এমন একদল উচ্চশিক্ষিত, ব্যবহারজ্ঞান-সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বিশেষ বিশেষ ফসল অথবা ফসলশ্রেণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করেন ও উহাদের ব্যবসায় হিসাবে আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন, ইহাই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। স্থূল হিসাবে ধরিতে গেলে, এখন রাজসরকার বন-বিভাগ রাখিয়া প্রধানতঃ কাষ্ঠে-

রই কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু তাহাকরিলেই চলিবেনা। গৌণ আরণ্য ফসল সমূহ যাহাতে অপচিত না হইয়া, ব্যবহারে আসিয়া দেশের ধনাগমের পন্থা সুগম করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে শুধু পরামুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাতুলের কার্য্য। সরকারের কর্ত্তব্যের ন্যায় জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞ অথবা কর্ম্মচারিগণ বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎসমুদায় যে ব্যবসায়ে লাভজনক হইতে পারে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমুদয় দ্রব্য লইয়া সরকার যে এক-একটা ব্যবসা খুলিয়া বসিবেন, সেরূপ আশা করাই অসঙ্গত। দেশের জনসাধারণও এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন, তাঁহারাও যেন প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ না হন।

বস্তুতঃ কাঁচামাল লইয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্টের কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞই বিগত শ্রম-সমিতিতে নানারূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বন-বিভাগের ব্যবহারতত্ত্ববিৎ মিঃ পিয়ারসন্ বলেন যে, একেবারে নূতন ধরণের কায হইলে স্বয়ং, এবং তাহা না হইলে অংশীদাররূপে গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন। পক্ষান্তরে Chief Conservator মিঃ হিলের মত এই যে, সরকারের আর্থিক দান অনাবশ্যক। ইহাতে বর্ত্তমান কারবারসমূহের অনিষ্ট হইতে পারে এবং স্বাধীন চেষ্টাও পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি না পাইতে পারে। উভয় পক্ষের উক্তির মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কতক পরিমাণে পথ প্রদর্শন করা আবশ্যক; কারণ দেশীয় ব্যক্তিবর্গ এখনও গৌণ আরণ্য ফসল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই বিষয়ে প্রথমতঃ তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরে বিশেষ-বিশেষ কার্য্যে যোগদানের প্রবৃত্তি সঞ্চারণ, এই দুইটিই আপাততঃ মুখ্য কার্য্য। এই দুইটি কার্য্যে শিক্ষিত জনগণ সাহায্য না করিলে শুধু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কোন ফল ফলিতে পারে না। সুতরাং সরকারের কার্য্য আংশিক রূপে শিক্ষাপ্রদ এবং অবশিষ্ট ব্যবসায়োপযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমরা এতক্ষণ নানাবিধ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্য ও ব্যবহারাভাবে অপচয়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উক্ত অপচয় কি প্রকারে নিবারিত হইয়া আরণ্য সমূহ অধিকতর ধনোৎপাদনের উপায় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। বন-বিদ্যা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা, বনবিভাগের পুনর্গঠন ও অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীনিয়োগ এবং বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত সংশিষ্ট অর্থনীতির প্রশ্নাদির উল্লেখের এস্থলে স্থানাভাব। শুধু সাধারণের পক্ষ হইতে কোন্ কোন্ কার্য্যের অচিরে অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা আমরা বলিব।

(১) ভারতীয় বনসমূহে ব্যবসায়োপযুক্ত কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়, স্থানবিশেষ তাহাদের প্রাচুর্য্য কিরূপ, যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে কিরূপে তৎসমুদয় সংগৃহীত হইতে পারে—

এই সমুদয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি যে, বন-বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ কাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন আরণ্য পদার্থের সঠিক খবর কদাচিৎ দিতে পারেন। ফলতঃ ইচ্ছা থাকিলেও কোন ব্যবসায়ী কোন বিশেষ আরণ্য ফসল কাজে লাগাইতে পারে না। সুতরাং যতশীঘ্র উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই ভাল।

(২) ব্যবহারিক আরণ্য ফসল বিষয়ক প্রদর্শনাগার প্রতিষ্ঠা।—ব্যবসায়ীর সম্মুখে ব্যবসায়োপযুক্ত দ্রব্যের নমুনা থাকিলে তবে উহার সন্ধান লইতে প্রবৃত্তি হয় এবং এইরূপ অনুসন্ধানই কালক্রমে ব্যবহারে পর্য্যবসিত হয়। প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রে এইরূপ এক-একটি প্রদর্শনাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। উহাতে শুধুই যে কাঁচামাল থাকিবে তাহা নহে, কাঁচা মালের পাশে উহা হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহারও নমুনা থাকা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

(৩) সাক্ষাৎ ভাবে আরণ্য ফসল হইতে আপাততঃ অতি অল্প সংখ্যক শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন বিশেষ শিল্প অথবা ব্যবসায়ের অন্য আরণ্য পদার্থ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সরকারের যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। অবশ্য এস্থলে আরণ্য পদার্থ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ কোন কাজে আসে নাই। কার্য্যতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, কোন বিশেষ ফসল অধিক পরিমাণে ব্যবহারের পথ সুগম না করিয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ সময়ে-সময়ে বরং বাধাই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধুয়া এই যে ফসল অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিলে উহা একবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সংগ্রহের সহিত সমমাত্রায় সংরক্ষণ ও উৎপাদনও যে সম্ভব, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। কোন নূতন জিনিষ বাজারে চালাইতে হইলেই, ব্যবসায়ীকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য কিছু অধিক মাত্রায় লাভ দিতে হইবে। ব্যবসায়ের এ মূলমন্ত্রটা বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক-কালব্যাপী কিম্বা স্বল্প হারে জমা, সম্ভবমত সামান্য রয়েল্‌টি অথবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ সাহায্য প্রদান না করিলে আরণ্য ফসল হইতে নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

(৪) আরণ্য ফসল-সম্ভূত অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়—উপযুক্ত কলকব্জাদির অভাব। আমাদিগের দেশের জল-হাওয়া ও আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত স্বল্প মূল্যের কল সব সময়ে পাওয়া যায় না। সেই জন্য যাহাতে বিশেষ বিশেষ প্রকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উপযোগী কলকব্জাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজনীয়। শ্রমসমিতির সভাপতি স্যর টমাস্ হল্যাণ্ড বোম্বাই সহরে ভারতীয় মহাজন সমিতির নিমন্ত্রণে গিয়া এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আরণ্য দ্রব্যাদি হইতে তৈল, গন্ধদ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে।

(৫) বন-বিভাগ হইতে নানা বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা-বহুল ইংরেজিতে লিখিত। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ যে অবোধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণও উক্ত গ্রন্থাদির অস্তিত্ব প্রায়ই অবগত নহেন; এবং অবগত থাকিলেও নিতান্ত জটিল বোধে পাঠে বিরত থাকেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর অবগতির নিমিত্ত রচিত গ্রন্থাদি বৈজ্ঞানিক ভাষাই রচিত। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাদিগের দেশের স্বভাবজ দ্রব্যকে ভিত্তি করিয়া এই সমুদয় গ্রন্থ লিখিত এবং যাহাদিগকে উক্ত সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার অবগত করান বনবিভাগের চরম উদ্দেশ্য, তাহাদিগের জাতীয় ভাষা ইংরেজি নহে। কৃষিবিভাগ আজকাল অনেকটা ঠকিয়া শিখিয়া দেশীয় ভাষায় তথ্যাদি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বন-বিভাগেরও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে। বনবিভাগের অনেক বিবরণী ও পুস্তিকার মধ্যে ব্যবসায়ীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় আছে। সাধারণের অবগতির জন্য এইরূপ পুস্তিকাদির সার-সঙ্কলন করিয়া সহজ ইংরেজী ও প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে দেশে যে ফসলের ব্যবসায় চলিতে পারে, অথবা যেস্থলে যাহার প্রাচুর্য্য অধিক, সেই দেশে স্থানীয় ভাষায় সেই ফসল সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে প্রচারিত হইলে লোকের অনুসন্ধিৎসা যে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিই সকল শিল্প বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। আমরা অবশ্য ইহা বলি না যে, বনবিভাগের সমস্ত গ্রন্থাদিরই অনুবাদ প্রকাশিত হউক। সামান্য বিবেচনা করিলে কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে বিষয়-বিশেষ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এইরূপ স্থলেই জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রাদেশিক ভাষায় সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতে চাহি যে, কাঁচা মাল উৎপাদন ও সংগ্রহ-আজকাল সভ্যজগতের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার দেশে যাহা কিছু কর্ষিত অথবা বন্য ফসল আছে, সকলেই তৎসমুদায়ের পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। আমাদিগকে উৎপাদন করিতে হইবে না; প্রকৃতি আমাদিগের জন্য যাহা উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তাহাই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলেও আমাদিগের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

দ্রষ্টব্য গ্রন্থাদি ঃ—

১। Pearson, R. S.—Commercial Guide to Forest Economic Products of India.

২। Troup, R. S.—Indian Woods and their Uses.

৩। Dutt, N. B.—Commercial Medicinal Plants of India, Rep. Ind. Assosc. for Cult. Sc., 1914.

৪। Statistical Abstract for British India, Vol. II, Financial Statistics, 1913-14.

৫। Report of Evidence given before the Indian Industrial Commission, 1916-17.

কৃষি-সংবাদ আলোচনা।

সরকারী রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই ১৯২০-২১ সালে বাঙ্গালাদেশে হাসিল, চাষযোগ্য অথচ চাষে অব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৫০,১১,৩২৪ একর। এই প্রকার জমির পরিমান উহার পূর্ব্ব দুই বৎসরে যথাক্রমে ৪৮,৫০,৬৩৮ একর এবং ৪৬,৪২,৩৩৬ একর ছিল। এই বৃদ্ধির হার প্রত্যেক জেলার দুই বৎসরের অঙ্কের তুলনায় নিম্নোদ্ধৃত পরিমান পাওয়া যায়।

জেলা।	হ্রাস।	জেলা।	বৃদ্ধি।
বীরভূম···	৭,২১৪ একর	বাঁকুড়া...	১,০০০ একর
হুগলী...	২,৪১০ একর	মেদিনীপুর...	৮৮,৬৬০ একর
হাওড়া···	৯,৬০০ একর	২৪-পরগণা···	২২,০৫০ একর
খুলনা···	৭,৭০০ একর	বর্দ্ধমান...	৬৩,৪০০ একর
নদীয়া···	৯৯,৭৯৪ একর	মুর্শিদাবাদ...	১৩,৭০০ একর
যশোর···	১,৯০০ একর	মালদহ...	৫৬.৮১০ একর
রংপুর···	১,০০,০১০ একর	দিনাজপুর...	১,৮৩,১০০ একর
বগুড়া···	৪৭,৩০০ একর	রাজসাহী...	১,০৭,৬০০ একর
জলপাইগুঁড়ি...	১,৩৮,৬৮৮ একর	পাবনা...	৫,৩০০ একর
বাখরগঞ্জ···	২০০ একর	দার্জিলিং...	১,৬২৩ একর
মৈমনসিংহ...	১২২ একর	ঢাকা...	২৮,৬০০ একর
ত্রিপুরা...	৯০০ একর	নোয়াখালী..	১০০ একর
		চট্টগ্রাম···	১,৬৩,১২৫ একর

বলা বাহুল্য চাষকরা জমির পরিমানও সমগ্র বঙ্গদেশে ১৯২০-২১ সালে পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ৫,১০,৪০০ একর কমিয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, জলপাইগুঁড়ি ও দার্জিলিং জেলাগুলিতেই এই হ্রাসের পরিমাণ ন্যূনাধিক ভাবে দৃষ্ট হইল।

পতিত জমির পরিমাণ ১৯১৯—২৯ এবং ১৯২০-২১ সালের মধ্যে তুলনায় দেখা যায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসরে ২,৬২,৫৪১ একর বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির হার ন্যূনাধিক পরিমাণে বীরভূম, মালদহ, রংপুর, জলপাইগুঁড়ি, ফরিদপুর এবং মৈমনসিংহ জেলাগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই হ্রাস বৃদ্ধির কারণ চিন্তা করিবার বিষয়। স্থানীয় লোক সংখ্যার হ্রাস, বারি

পাতের অভাব এবং বাহুল্য, লোকের আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতা এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় লোকের কৃষি-বিমুখতা এই কয়টী কারণেই এই প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষে 'চাকুরে কেরাণী'র সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে ও তাহারই ফলস্বরূপে উপস্থিত 'বেকার সমস্যা' আমাদিগকে ওই শেষোক্ত কৃষিবিমুখতা কারণটী সংযুক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে; তবে ইহা নিশ্চয় যে সর্ব্বত্র ইহাই একমাত্র কারণ নহে। উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকলগুলিই এই হ্রাস বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে, অথবা ইহার আরও অন্যান্য কারণ থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু মূল বিষয়টি যে বিশেষ চিন্তা করিবার জিনিস তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কৃষি শব্দটী বর্ত্তমানে 'উৎপাদন' এই অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যদিও ইহা শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অনেক বেশী ভাব পোষণ করে। আমাদের মনে হয় 'উৎপাদন'ই ইহার অর্থ হওয়াও উচিত, এবং সেই হিসাবে কৃষিই বাণিজ্যের মূল। কোন বস্তু উৎপন্ন না হইলে তাহার বিনিময় চলেনা। মনুষ্যের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই এক-স্থানে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে, এই জন্য বিনিময় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত হইয়া সকল স্থানের মনুষ্যের অভাবমোচনে সহায়তা করে; ইহারই নাম ব্যবসা। সুতরাং কৃষিই ব্যবসার মূল।

দেশের এই অবস্থার জন্য আমরা কৃষককে দোষ দিবনা। আমরা যে তাহাকে অশিক্ষিত ও অপদস্থ করিয়া রাখিয়াছি, সেই টুকুর সুযোগ লইয়া আজ বিদেশীয় বণিক তাহাকে ভুলাইয়া সুলভে তাহার উৎপাদিত ফসল লইয়া যাইতেছে, এবং ফলে দেশের দুর্দ্দশা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এই সকল মূল বিষয় গুলি চিন্তা করা দরকার। যে দেশ বাণিজ্যে যত উন্নত, সে দেশের কৃষি ও সেই পরিমাণে উন্নত। কৃষিকে বাণিজ্যের অঙ্গচ্যুত করিলে ইহার অবনতির পথই খুলিয়া দেওয়া হয়।

পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলির ইতিহাস হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন দূরস্থিত বিভাগগুলি রাস্তা, রেলওয়ে, নৌকা, ষ্টিমার, জাহাজ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রভৃতির দ্বারা কেমন সুসম্বদ্ধ হইয়া উক্ত উন্নতিপথে সাহায্য করিতেছে। দেশের মধ্যে এইপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকে। একস্থানের অতিরিক্ত উৎপন্ন জিনিস সহজে অন্যস্থানে বিনিময়ের বা বিক্রয়ের জন্য পাঠাইবার সুবিধা থাকিলে, এবং সত্বর সংবাদ আদান প্রদান দ্বারা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারিলে, লোকের উৎপাদনচেষ্টা বলবৎ হয়, এবং এইরূপ চেষ্টাই উন্নতির কারণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশেই অধিকাংশ রেলপথ, ষ্টীমার লাইন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রভৃতি ইংরাজ বণিকগণের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ক রূপে তাঁহাদিগেরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নতুবা দার্জিলিং, ডুয়ার্স, আসাম, বেহার প্রভৃতি স্থানে 'চা' ও নীল প্রভৃতির চাষ করিয়া, সেই উৎপন্ন দ্রব্য কলিকাতায় বসিয়া বিক্রয় করা সম্ভব হইত কি? এই সকল দেখিয়া উহাদের উপকারিতা এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত উহাদের ঘনিষ্ট সংস্রব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে স্থানীয় লোকের দ্বারা কৃষি, ও শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কতটুকু চেষ্টা হইয়াছে? যাহা হইয়াছে তাহা দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য। কিন্তু ইংরাজ বণিকগণের চেষ্টার সহায়তায় স্থানীয় মূলধন অনেক পরিমাণে খাটিতেছে। বিদেশীয় বণিকগণ টাকার ব্যবহার জানে, উহাকে বিনিময়ের ভিতর দিয়া বাড়াইতে জানে এবং উহারই সাহায্যে অভাব পূর্ণ ও দুর্দ্দশা মোচন করিতেও জানে।

দেশের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। দেশের লোক যদি কৃষক হইতে,—উৎপাদক হইতে এখনও ঘৃণা বোধ করে, তবে বর্ত্তমানের 'বেকার সমস্যা' যাহা প্রকৃতই অন্ন সমস্যা—তাহার মিমাংসা সুদূর-পরাহত হইবে। দেশে ব্যায়ামশালার প্রতিষ্ঠা, অস্পৃশ্যতা পরিহারের জন্য আন্দোলন ইত্যাদি কত কথাই শুনিতেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ফুটবল, ক্রিকেট, থিয়েটার প্রভৃতির দ্বারা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে গ্রামে গ্রামে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ও তাহাতে ফসল উৎপাদনের জন্য লোক নিযুক্ত না করিয়া নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা ফসল উৎপাদন ও সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানার্জ্জন চেষ্টা করিলে, এক সঙ্গে অনেক কাজ সিদ্ধ হয় না কি? ইহার জন্য পরিশ্রমের দ্বারা ব্যায়ামের কাজ, প্রয়োজন মত নিযুক্ত কৃষক মজুরের সঙ্গে কাজ করিয়া সংস্কারজাত অমূলক ঘৃণার ক্রমশঃ অপনোদন, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞানাদি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত জ্ঞানকে বাস্তবিক কার্য্যে প্রয়োগ করণ, এবং সর্ব্বোপরি কৃষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই প্রকার আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ও তাহাতে নিজে কাজ করা, ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার চেয়ে কম আনন্দ প্রদ নহে। যদি খেলার জন্য মাঠ পাওয়া যায়, তবে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপনের জন্য জমি কেন পাওয়া যাইবে না?

দেশে যদি প্রয়োজনীয় বস্তু সকল উৎপাদিত না হয়, তবে অভাব মোচনের জন্য নিশ্চয়ই স্থানীয় অধিবাসীগণকে ভিন্ন দেশ হইতে উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু এই সংগ্রহ ব্যাপার কিসের বিনিময়ে হইবে? টাকাই বল, বা অন্যদেশের প্রয়োজনীয় বস্তুই বল; কিছুই যদি না থাকে, তবে কিসের বিনিময়ে দেশবাসী ভিন্ন দেশের কাছে নিজেদের প্রার্থনীয় বস্তুর আমদানি করিবে? এবং ভিন্নদেশবাসী কেনই বা ইহাদের

প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে? এই সকল বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সকলের মিমাংসা কে করিবে?

গত ১৯০৬—০৭ সালে বঙ্গদেশে দশহাজার বা-তদূর্দ্ধঅধিবাসী সম্পন্ন নগরের সংখ্যা ১০৪টী ছিল, ১৯১২-১৩ সালে এবং ১৯১৭-১৮ সালে উহার সংখ্যা ৭১ এবং ৭০ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ১৯০৬-০৭ সালে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ ইহার সহিত সংযুক্ত এবং পূর্ব্ববঙ্গ ইহা হইতে বিচ্যুত ছিল। তথাপি গতি যে নিম্নাভিমুখী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার কারণ বহুসংখ্যক বিভিন্ন কৃষিশিল্পবানিজ্য কেন্দ্রের কার্য্য কয়েকটী মাত্র বিশিষ্ট কেন্দ্রে একত্রিত করার চেষ্টায় দূরবর্ত্তী নগরগুলি ক্রমশঃ ধ্বংশের পথে চলিতেছে। অবশ্য নৈসর্গিক কারণেও নগর ধ্বংশের কথা শুনা যায়, কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র, সুতরাং এ গণণার বাহিরে। সমগ্র দেশের অধিবাসী সংখ্যা তুলনায় দেখা যায়, নাগরিকের সংখ্যা ১৯১২-১৩ সালে ১৭,৪০,৮২০ এবং ১৯১৭-১৮ সালে ১৭,১৩,৪০৬ ছিল। এখানেও সংখ্যাহ্রাস বেশ পরিস্ফুট। বীরভূম, মশোহর, বগুড়া ও নোয়াখালী জেলায় উল্লেখ যোগ্য নগর একটীও দৃষ্ট হইল না, এবং দিনাজপুর, রাজসাহী, রংপুর, জলপাইগুঁড়ি ও চট্টগ্রামের কোথাও একাধিক নগর দৃষ্ট হইল না। এই সকল দেখিয়া কৃষিশিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রের একত্রীকরণ চেষ্টাই যে এই নগরলোপের কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অবশ্য যাঁহারা চাকরী করিয়া জীবনের অর্দ্ধেক কাল গত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নব উদ্যমে নূতন জীবিকার জন্য চেষ্টা করা এক প্রকার অসম্ভব; কিন্তু তাই বলিয়া স্কুল কলেজের সদ্যপ্রসূত যুবকগণ যদি এখনও চক্ষু মুদিয়া থাকেন, তাহা কখনই শোভন হইতে পারে না। তাঁহারা লাঙ্গল ধরিয়া কৃষক ভাইদের পাশে দাঁড়াইয়া, অথবা কারখানার শ্রমজীবি ভাইদের পাশে ছেনি ও হাতুড়ি হাতে বসিয়া, নূতন নূতন কৃষিশিল্প সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা তাহাদের দিন, এবং তাহাদের সঞ্চিত পূরা কালের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করুন, এবং সেই সঙ্গে পুঁথির জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মিশ্রণে দেশকালোপযোগী উন্নত পন্থার আবিষ্কার করুন। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও হইবে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্নতা দূরীভূত হইয়া একপ্রাণতার প্রতিষ্ঠা ও 'বেকার সমস্যা'র মিমাংসা হইয়া যাইবে। ইহার জন্য চাই প্রথমে ইচ্ছা—প্রবল ইচ্ছা, তারপর কঠোর চেষ্টা ও অর্থসাহায্য। অর্থসাহায্য বিষয়টী অবশ্য চিন্তা করিবার জিনিস।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
৩ কলিকাতা।

নারিকেল।

ব্যবহারিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বাহুল্যে নারিকেল বৃক্ষের সহিত তুলনা করিবার উদ্ভিদ্ কমই পাওয়া যায়। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে নারিকেলই প্রধান ফসল। দ্বীপবাসী গণের আহার্য্য ও এমন কি কোন কোন স্থলে পরিধেয়ের জন্যও দ্বীপবাসীগণ নারিকেল গাছের উপর নির্ভর করে। নারিকেলের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ইহা গ্রীষ্ম-মণ্ডলের সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। নারিকেল সমুদ্রের জলস্রোতে বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত ও নীত হয় এবং তথায় গিয়া নিজ বংশ বিস্তার করে। সেইজন্য নারিকেলের প্রসার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। নারিকেল ভারতের আদিম অধিবাসী না হইলেও ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব হইতে ইহা ভারতে জন্মিতেছে এবং নানা প্রকার সামাজিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া কলাপে নারিকেলের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে বহু পুরাকাল হইতে নারিকেল এতদ্দেশে ছিল। দক্ষিণ ভারতে নারিকেল-উৎসব এখনও প্রচলিত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে এই উৎসব যথেষ্ট ঘটার সহিত সম্পাদিত হয় ও সমুদ্রে নারিকেল নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। ভারত ব্যতীত এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মিয়া থাকে।

সমস্ত জগতের নারিকেল ব্যবসায়ে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা উৎপাদিত হয়। সকলেই বুঝিতে পারেন যে নারিকেলের ন্যায় উপকারী দ্রব্য সহজে লোকে বিক্রয় করে না। হয় উৎপাদনের প্রাচুর্য্যের জন্য কিম্বা কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের বিনিময়ে সাধারণতঃ নারিকেল বিক্রয় হয়। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপবাসীগণ তুলা, লবণ, বস্ত্র, চিনি প্রভৃতির বিনিময়ে নারিকেল বিক্রয় করে। বস্তুতঃ ব্যবসায়ে যে পরিমাণ নারিকেল অথবা নারিকেলজাত দ্রব্য আসে, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ নারিকেল উৎপাদনের স্থানে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানেই নারিকেল জন্মিয়া থাকে কিন্তু ব্যবসায়ের হিসাবে কয়েকটি স্থান প্রধান। এস্থলে আমরা প্রধান প্রধান নারিকেল উৎপাদনের কেন্দ্রের উল্লেখ করিতেছি :—

	কোপ্রা, টণ	তৈল, টণ
ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজ—	২৪৩,৫০০	১ টণ-২৪২ পাঃ
ফিলিপাইনস্	৮০,৯০৪	১১,৭৫৪
সিংহল	৫৫৮১৫	২৪,৩২৪

ভারত	৩৮১৯২	৪,৫২৩
মলয়দ্বীপ	১৯,২০৮	
নব গিনি	১৬১৯০	

উক্ত দেশ সমূহ ব্যতীত সম্মিলীত মলয় দ্বীপ, সিচিলিস্ টোঙ্গা, সুলেমান, গিলবার্ট ও ইলিস দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, জঞ্জিবার, ফরাসী ইণ্ডো-চিন, ওসেনিয়া, ফিজি, নব

ক্যালিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট নারিকেল উৎপাদিত হয়। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে এই দেশ গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নয়; কারণ ইহাদের মধ্যে কোন দেশ হইতেই ১০,০০০ টণের অধিক কোপ্রা রপ্তানি হয় না। সমস্ত পৃথিবীর কোপ্রা রপ্তানির পরিমাণ ৫৪০,০০০ টণ। এই রপ্তানিতে ভারতেব অংশ মোটে শতকরা ৭ ভাগ। ভারতের উপকুল প্রদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই নারিকেল দেখিতে পাওয়া যায়। কত জমি নারিকেল বৃক্ষ দ্বারা অধিকৃত তাহা আন্দাজ করা দুর্ঘট। উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রঃ—কথিয়াবাড়, কানাড়া, রত্নগিরি—বোম্বাই; মালাবার, দক্ষিণ কানাড়া ও গোদাবরী মান্দ্রাজ; কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য; এবং গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী নদীর মোহানায় নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহ। উৎপাদনের হিসাবে মান্দ্রাজকেই সর্ব্বপ্রধান বলিতে হইবে। এই প্রদেশে অন্ততঃ আট লক্ষ একর জমিতে নারিকেল চাষ হয়। তন্মধ্যে আবার মালাবার অঞ্চলেই নারিকেলের জমি প্রায় ৫ লক্ষ একর। মালাবারের কোপ্রা জগতের বাজারে সুপ্রসিদ্ধ। ইহার সমকক্ষ কোপ্রা আর দেখা যায় না। ভারতের অনেক স্থানেই নারিকেল কোপ্রা প্রস্তুত ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বঙ্গ, বোম্বাই ও মলয় উপকূলের কথা বলিতে পারা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে ডাব হিসাবে বৎসরে অন্ততঃ ৪০ কোটি নারিকেল খরচ হয়।

নারিকেলের ফসল উৎপাদিত হইতে সময় লাগিলেও চাষ তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহা খুব ভালই জন্মায়; কিন্তু সমুদ্র হইতে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্তও নারিকেল চাষ করিতে পারা যায়। অনেক স্থলে নারিকেল নিজেই বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করে। জঙ্গলী গাছ সমুহ প্রায় ৭০ ৮০ কুট উচ্চ ও বেড়ে নিম্নাংশে ১০-১২ কুট হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ভারতে খুব বড় নারিকেল-বাগিচা নাই। অধিকাংশই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান। অনেক অভিজ্ঞেই বলেন যে নারিকেল চাষের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অবস্থা আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি প্রধানঃ—বৎসরে অন্যূন ৫০ইঞ্চি বারিপাত, অঙ্গারক পদার্থ-সংযুক্ত বেলে মাটি, জল নিকাসির ব্যবস্থা, ৭৫-৮৫ ডিগ্রি (ফারেনহিট) উত্তাপ, প্রবল বাত্যা হইতে রক্ষা করিবার উপায় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিটের অনুচ্চ অঞ্চল। দেশ হিসাবে নারিকেল চারা বসাইবার ব্যবধানের তফাৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ চারিদিকে ২০ ফুট তফাতে চারা রোপণ করাই ভাল। সচরাচর ৬ বৎসরেই নারিকেল গাছের ফলন আরম্ভ হয়। ভারতের নানা প্রদেশের নারিকেলে-উৎপাদনের হার তুলনা করিলে দেখা যায় যে গড় পড়তায় গাছ প্রতি বৎসরে প্রায় ৭০টি নারিকেল ফলে। অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ৯ মণ কোপ্রা পাওয়া যায়। জগতের শ্রেষ্ঠতম নারিকেল উৎপাদন কেন্দ্র, ওয়ান্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজে উৎপাদনের হার গাছ প্রতি ৮০-৯০ নারিকেল এবং চতুর্থ বৎসর হইতেও ফলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এখানেও গলিত উদ্ভিজ্জ সার সংযুক্ত উপকূল

প্রদেশের জমিতে নারিকেল অধিক ফলে; কঠিনকর্দ্দ সময় জমিতে ফলন গাছ প্রতি ২৫-৩০টি ফলের অধিক নয়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ফুল হয় এবং ঐ সময় হইতে ফল পাকিতে প্রায় ১০ মাস লাগে। পুরাতন ও অযত্ন রক্ষিত গাছের নারিকেলের ফল অপক্ক অবস্থাতে পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ভারতে সাধারণতঃ নারিকেল গাছে সার দেওয়া হয় না। কিন্তু সবুজ সারে ফলন বেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উই ও গোবরা পোকা, কাঠবেরালী ও প্রান্ত মুকুল পচিয়া যাওয়ায় অনেক পরিমাণ নারিকেলের ক্ষতি হয়। বড় বড় বাগিচার নারিকেল ফসল তৈয়ারী না হওয়া পর্য্যন্ত ৪।৫ বৎসর সময় অন্য প্রকার ফসল চাষ করিয়া কতকটা খরচা পোষাইয়া লইতে হয়) এইরূপ অবস্থায় কি ফসল চাষ যুক্তি যুক্ত তাহা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে কলা ও সিমুল আলুই এই হিসাবে উৎকৃষ্ট ফসল বলিয়া বোধ হয়। এক হাজার কলা গাছ হইতে তিন বৎসরে ৩ হাজার টাকা পাওয়া যাইতে পারে; খরচ ৭৫০৲ টাকার অধিক নয়। সিমুল আলুর ফসল হইতে প্রায় আট মাস লাগে; বিঘাপ্রতি ৪০-৪৫ মণ আলু পাওয়া সম্ভব। এই আলুর বাজারদর মণ করা ২৲—২৷৷০। চাষের খরচ ৭৲-৮৲ টাকার ভিতর।

নারিকেল গাছ হইতে বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু জগৎব্যাপী ব্যবসায়ের হিসাবে কোপ্রা (শুষ্কীকৃত শাঁষ), ছোবড়া, তৈল ও খৈলই প্রধান। অনেকগুলি নারিকেলজাত দ্রব্য ভারতের গ্রামে গ্রামে দৃষ্ট হয় এবং সাধারণ গৃহস্থের ঐ গুলি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। সংক্ষেপতঃ সেগুলির এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়:—(১) 'খোপা' অর্থাৎ শুকনা নারিকেল শাঁষ; পঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিমে অনেক স্থলেই ইহা খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়। (২) হুঁকার জন্য নারিকেল খোলা। (৩) গৃহ ও গ্রাম্য সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য গুঁড়ি ও পাতার বোটা। (৪) রুপ প্রস্তুতের জন্য তন্তু। (৫) পাতার সির হইতে ঝাঁটা। (৬) রস হইতে গুড় অথবা (৭) তাড়ি। পাতা প্রভৃতি হইতে জ্বালানি; মালাবার অঞ্চলে নারিকেলের শুষ্ক পাতা ও 'বাগলা' প্রভৃতি অনেক গৃহস্থেরই জ্বালানি হিসাবে প্রধান অবলম্বন, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। (৯) এই নারিকেল পত্রাদির ছাই বেশ ভাল সার; ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ থাকায় ফল বৃক্ষাদির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। (১০) বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে নারিকেলের কয়লার যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস্ শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। বিগত যুদ্ধের সময় গ্যাস্ প্রতিরোধক যন্ত্রে (Anti-gas appartus) এই কয়লা ব্যবহৃত হইত। (১১) নারিকেলখোলা অল্প তাপে পোড়াইলে তাহা হইতে এসেটিক এসিড্ পাওয়া যায় এবং (১২) নারিকেলে আঠার স্যালিসাইলিক এসিডের মাত্রাও কম নয়। ঔষধার্থে নারিকেল গাছের বিভিন্ন অংশ নানাদেশে ব্যবহৃত হয়। বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করিলাম না।

যদি মানবের পক্ষে কোন একটি ফল খাইয়া জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে নারিকেলই সেই ফল। ইহা যে শুধু কল্পনা নয়, তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ ইংগ্লহাড নামক প্রসিদ্ধ নারিকেলতত্ত্ববিদের উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রায় ১৫ বৎসর হইল তিনি নারিকেল ভিন্ন অন্য সমস্ত আহার ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য আদৌ খারাপ না হইয়া বরং দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, ভারতে অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হওয়ার তুলনায় নারিকেলের খাদ্যাথ্য ব্যবহারই সর্ব্ব প্রধান। সোডা, লেমনেড কিম্বা তৎ-শ্রেণীয় পানীয় কিম্বা কোন প্রকারের সরবতের সহিত ডাবের জলের তুলনা হয় না। ঠাণ্ডা করা ডাবের জলের সমকক্ষ কোন পানীয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই। ডাবের কচি শাঁস যে উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহা সকলেই জানেন। নারিকেল তদপেক্ষা গুরুপাক হইলেও নানা প্রকার উচ্চ শ্রেণীর খাদ্যে ও মিষ্টান্নে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাঝারি গোছের ডাবে ৮ আউন্স অর্থাৎ ১ পোয়া এবং নারিকেলে ৩½ আউন্স জল থাকে। নারিকেল যত পরিপক্ক হইতে থাকে ততই জলের মাত্রা কমিয়া যায় ও স্বাদ ও খারাপ হইয়া যায়। অবশেষে অঙ্কুরোদ্গমের সময় সমস্ত জলই চলিয়া যায়। নারিকেলের তদ্রূপ অবস্থাকে সাধারণ কথায় 'ফোঁপল' বলে। ইহা কোমল এবং মিষ্টস্বাদ যুক্ত। ছোট ছোট বালক বালিকা দিগের ইহা প্রিয় খাদ্য। কলিকাতার ফিরিওলারা আস্ত অথবা কুচাণ' ফোঁপল উচ্চ দরেই বিক্রয় করে। কিন্তু নারিকেলের ন্যায় উপকারী গাছের বীজ এইরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া উচিত নয়। পক্ক নারিকেলের ৫৭·২৮ অংশ ছোবড়া, ১১·৫ খোলা, ১৮,৫৪ শাঁষ, এবং ১২·৫ জল। শাঁষ ও জলে নিম্ন লিখিত রূপ উপাদান দৃষ্ট হয়ঃ—

	শাঁষ	জল
জলীয়াংশ	৪৬·৬৪	৯১·৫০
নাইট্রোজেন যুক্ত অংশ	৫·৪৯	.৪৬
তৈল	৩৫·৯৩	০·০৭
নাইট্রোজেন ব্যবতীতঅংশ	৮·০৬	৬·৭৮
ভস্ম	৩·৮৮	১,১৯

নারিকেল ও নারিকেলজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের পরিমাণ ঠিক হিসাব করিতে পারা যায় না। কারণ অনেক নারিকেলজাত দ্রব্য ব্যবসায়ে না আসিয়া উৎপাদনকারীর নিজের ব্যবহারেই প্রযুক্ত হয়। নারিকেল তৈল; ছোবড়া হইতে প্রস্তুত দড়াদড়ী; ঝাটা,

হুকা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। তাহার ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। সেই হিসাবে ডাব অথবা শুষ্ক শাঁষের ব্যবহারের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। ফলতঃ গ্রাম্য ব্যবহারাদি বাদ দিয়া যে পরিমাণ নারিকেলজাত দ্রব্য সমূহ ব্যবসায়ে আসে তাহার একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৯২২-২৩ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণে নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়।

দ্রব্যাদির নাম	মূল্য (টাকা)
নারিকেল	৩৭,৪০৪
" ছোবড়া, আস্ত	১,১৭,৮১৩
" " জাত দ্রব্য	১,১০,৪৪,৫৬১
" " দড়ি দড়া	১১,৯৩,৮০১
" কোপ্রা	৫০,৫৪,৪৪৮
" তৈল	২০,২০,৯৮৯
" খৈল	১,২৯,৭৭৯

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে নারিকেল ব্যবসায়ের কোন আন্দাজ পাওয়া যাইবে না। ১৯১৩—১৪ সালে প্রায় তিন কোটি টাকার নারিকেল জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে কোপ্রার অংশ প্রায় অর্দ্ধেক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোপ্রার মধ্যে মালাবার কোপ্রাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে কারণে মালাবার কোপ্রা জগতের বাজারে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে—সূর্য্যোত্তাপে শুষ্কিকরণ ও কোপ্রায় তৈলের পরিমাণের আতিশয্য। অন্যান্য দেশে কলে কোপ্রা শুষ্ক করা হয়। তাহাতে প্রায়ই কোপ্রা বিবর্ণ হইয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মণি ও ফ্রান্সেই অধিক পরিমাণ কোপ্রা যাইত এবং হামবর্গের কল সমূহ নারিকেল তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারতের কোপ্রা শীত কালেই বাজারে আসে ও কোচিন, কালিকট, তেলিচারী, বদাগ্রা, বোম্বাই প্রভৃতি বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়।

সাধারণ তৈল কেবল মসলারূপেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারিকেল তৈলের বিশেষত্ব এই যে ইহা প্রকৃত খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। শুধু নারিকেল তৈলের মাখন অথবা নারিকেল তৈল সংযুক্ত অন্যান্য প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের আজকাল সভ্য জগতে

যথেষ্ট প্রচলন। এতদ্দেশে কেবল পণ্ডীচারীতেই নারিকেল—মাখম প্রস্তুতের একটি কারখানা আছে। তদ্ভিন্ন টাটা কোম্পানির ত্রিবাঙ্কুরের কারখানায়ও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যোপযোগী উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইতেছে। খাদ্য-উপকরণ ব্যতিরেকে নারিকেল তৈল প্রভূত পরিমাণে সাবান, বাতি ও গ্লিসরিণ প্রস্তুতে নিযুক্ত হয়। নারিকেল তৈলের সাবাণ লবণ জলে ভাসে ও লবণাক্ত জলেও প্রচুর ফেণা উৎপাদন করে বলিয়া জাহাজী সাবাণ প্রস্তুতের জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী। নারিকেল শাঁষে তৈলের পরিমাণ শতকরা ৩০-৫০ ভাগ।—টাটকা শাঁষ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা সুস্বাদু এবং অম্লবিরহিত। ২২—২৪ ডিগ্রিসেণ্টিগ্রেডে নারিকেল তৈল জমিয়া শক্ত হইয়া যায়। কেশ বর্দ্ধনের জন্য ও নারিকেল তৈল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দেশী প্রথায় নারিকেল তৈল ঘানিতেই তৈয়ারী করা হয়। প্রথমে সমান পরিমাণ জল দিয়া নারিকেল শাঁষ সিদ্ধ করিয়া পরে শাঁষ পিষিয়া ও থলের মধ্যে দিয়া তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়। উক্ত তৈল মিশ্রিত জলে উত্তাপ দিলে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে এবং সহজে উঠাইয়া লওয়া যায়। ইহাতে ১০০ নারিকেল হইতে প্রায় ৭ সের তৈল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় তৈল উৎপাদনের মাত্রা অনেক অধিক।

বাজারে কোচিন তৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। অপরাপর শ্রেণীর নারিকেল তৈল অপেক্ষা ইহার মূল্য শতকরা ১৫-২০ গুণ অধিক। ইহা বিবেচনার বিষয় যে বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল ঘানী হইতেই প্রস্তুত; কলে নয়। কোচিণে এখন ও দেশী ঘানিতে অথবা হাত-চালান কলে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহাই বিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

নারিকেল তৈলের খৈলও বিশেষ মূল্য বান দ্রব্য। দক্ষিণ ভারতে ইহার নাম পুন্নাক। সাধারণতঃ সামান্য আঠা দিয়া ইহা পিষ্টকাকারে প্রস্তুত হয়। পশুখাদ্য হিসাবেই ইহা ব্যবহার করা প্রশস্ত। কারণ তদ্দ্বারা পশু গণের যথেষ্ট পরিপুষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তম সার পাওয়া যায়।

নারিকেল ছোবড়া বিশেষ ব্যবহারীক দ্রব্য।—দড়ি,দড়া কাছি; ঘরে বিছানার মাদুর পাপোষ,' ম্যাটিং, ব্রুশ, গদি, জিন, ব্যাগ ও থলে—এ সমস্ত কাজের জন্যই ছোবড়া উপযুক্ত। ১০ মাসের নারিকেল হইতেই উৎকৃষ্ট ছোবড়া পাওয়া যায়। ছোবড়া হইতে নানাবিধ প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুতের বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে। তাহা এস্থলে বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে সব দেশে নারিকেল অদৌ জন্মে না সেই দেশ গুলি নারিকেলজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতে অগ্রগণ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জর্ম্মাণির উল্লেখ করা যাইতে

পারে। নারিকেল মাখম, খাদ্য, গৃহসজ্জা ও অন্যান্য যৌগিক পদার্থ উৎপাদনে জর্ম্মণি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে যেরূপ আর কোন দেশেই পারে নাই। দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের দ্রব্য হইয়াও নারিকেল শিল্পের এখন ও এতদ্দেশে উন্নতির হিসাবে কিছুই করা হয় নাই।

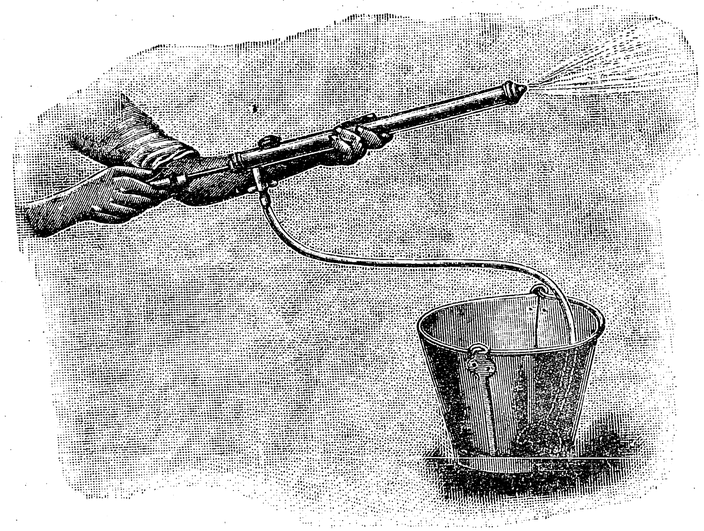

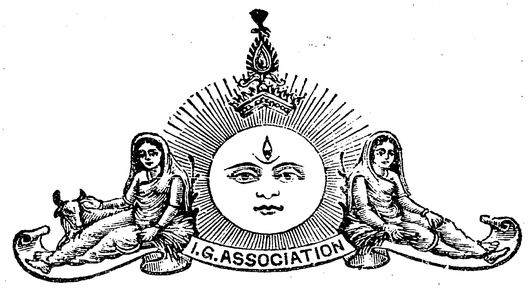

আশ্বিন—১৩৩০ সাল।

এ কাল ও সেকাল।

বর্ত্তমান ও অতীতের আলোচণায় দুই প্রকার মত দৃষ্ট হয়। একদল বলেন যে যাহা সে কালে ছিল, সমস্তই ভাল, একালে সমস্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। অন্যদিকে আর একদল বলেন যে অতীতে অনেক জিনিষই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ছিল। তাহা দূরীভূত হইয়া জগত ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে। দুই দলের মতেই যে কিছু বাড়াবাড়ি আছে, তাহা বলা বাহুল্য। সমস্ত মানব জাতির ইতিহাস সমষ্টিভাবে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হয় যে মানব সমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, যদিও বিশেষ বিশেষ জাতি হিসাবে ইহা ঠিক সত্য নয়। আবার যে সমস্ত জাতি অতি প্রাচীন, তাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী জীবনে উন্নতি অবনতি উভয়ই দৃষ্ট হয়। ভারত তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাচীণ পণ্ডিত চানক্যের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। চাণক্য, কৌটিল্য, বাৎশায়ণ, বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ভারতের এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তি সামান্য শিশুরঞ্জন গল্পাবলী হইতে অতি গুড় ও জটিল রাজনীতি, অর্থনিতি এবং ন্যায় সম্বন্ধে যে বিপুল গবেষণা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশ চিরগৌরবান্বিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আজকাল সভ্য জগতের সম্মুখে প্রায় ২০০০ বৎসরের প্রাচীন ভারতের একটি বাস্তব সামাজিক চিত্র উপস্থিত করিয়াছে। এই 'অর্থশাস্ত্রের' আলোচনা অনেক দেশেই চলিতেছে।

আমরা এস্থলে কেবল প্রাচীন কৃষি সম্বন্ধীয় অবস্থার আলোচনা করিব। তাহা হইতে পাঠকগণ সে কালের ও এ কালের কৃষি, কৃষক ও সাধারণ পণ্যের কথা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন।

কৃষিই বর্ত্তমানের ন্যায় সে কালে ভারতবাসীগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল। "গ্রামের মধ্যভাগে বাস্তু বা বাসের স্থান ছিল। সাধারণতঃ সমান্তরাল দুই তিনটি রাস্তা থাকিত ও তাহার উত্তর পার্শ্বে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। এই বাস্তুখণ্ডের চতুষ্পার্শে চাষের জমি ও উহারপর বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমি বা গোপ্রচার থাকিত। এই গোচারণ ভূমি সাধারণ সম্পত্তি এবং উহাতে সকলের অধিকার ছিল। কেহ অযথা উক্ত গোচারণ ভূমি অন্যায় ভাবে অধিকার করিলে বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতেন। গোচারণ ভূমির বিস্তার একশত ধনুর কম হইত না। মৌর্য্যযুগের অবসানের পর গণ্ডগ্রামে আরও অধিক পরিমাণে গোচারণ ভূমি রাখিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ গ্রামগুলি কৃষক-বহুল ও শূদ্রপ্রায় হইত।"

চাষ বিস্তারের জন্য সাধারণতঃ এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি গ্রামে একবর্ণের অথবা এক ব্যবসায়ের লোকের বাস ছিল। একবর্ণের লোক থাকিয়া সামাজিক ভিন্ন অন্য কি সুবিধা হইত বলা যায় না; তবে এক ব্যবসায়ের লোকের একস্থানে বাসে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের ভূরি-উৎপাদন (mass production) মূল্য নিয়ন্ত্রিত করণ (control of prices) ও বিক্রয়ের যে সুবিধা হইত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান Trade guilds ও Co-operative Societies এর উদ্দেশ্যও তাই।

পল্লীমঙ্গল সাধণের জন্য সমবায় চেষ্টার তখন অভাব ছিলনা। "সাধারণের হিতার্থে কোনকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে উহাতে গ্রামবাসিমাত্রকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত; কেহ নিজ সামর্থ্যমত সাহায্যদানে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যাংশ দানে বাধ্য করা হইত"। সুতরাং পুষ্করিণী খনন, রাস্তা ঘাট সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে কেহ উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। একথাও এখানে বলা দরকার যে সে সময়ে Statistics রাখার ব্যবস্থা ছিল। যে পাঁচজন প্রধান গ্রাম কর্ম্মচারী থাকিতেন তাঁহাদিগের উপর গ্রামের লোকের, তাহাদের জীবিকার, আয় ব্যয়ের ও গো মহিষাদি পশুরও সংখ্যার হিসাবাদি রাখিতে হইত।

শ্রম ও পণ্য সম্বন্ধেও অর্থ-শাস্ত্রে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। Octroi Duty অনেক নগরেই ছিল। শুল্ক আদায়ের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারি থাকতেন। তাঁহার লোকেরা নগর ত্যাগ অথবা প্রবেশের সময় মোট-ঘাট পরীক্ষা করিত। যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ বস্তু থাকিলে তাহা বাজেয়াপ্ত হইত। পণ্য ব্যতীত ভারবাহীপশু ও ভারবাহীদিগের উপরেও শুল্ক ছিল। অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রয় করা

নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ স্বদেশীয় পণ্যে বণিকেরা শতকরা পাঁচ টাকা ও আমদানী পণ্যের উপর ১০ টাকা হিসাবে লাভ গ্রহণ করিতে পারিতেন।

"বাণিজ্য দ্রব্যাদির ক্রয় মূল্যাদির নিরূপণের জন্য শুল্কাধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ ভিন্ন পৌতবাধ্যক্ষ ও সংস্থাধ্যক্ষ নামে আরও দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা দ্রব্যাদির বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন। ক্রয়-বিক্রয় জুয়াচুরি নিবারণার্থ ওজন বাটখারা প্রভৃতির তত্ত্যাবধান করিতেন। আবার কারুশিল্পিদিগের কার্য্য তত্ত্যাবধারণের জন্যও পারিশ্রমিক নিরূপণের জন্য তিন জন মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বোর্ড ছিল। কারু শিল্পিরা যথেচ্ছ পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন না, তাঁহারা ইহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। প্রভু ও শিল্পি বা কর্ম্মকারদিগের মধ্যে বেতন লইয়া মতভেদ হইলে সাধারণতঃ তদ্বিষয়ে দক্ষ শিল্পিদিগের হস্তে উহার বিচারভার দেওয়া হইত। অথবা কারুশিল্পিদিগের বেতন হ্রাসের জন্য কোন দল পাকাইলে দলের লোকেরা দণ্ডিত হইতেন

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রম, শ্রমিক, বাণিজ্য কৃষি, শিল্প সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ের ব্যবস্থা হইতে বিশেষ পৃথক নহে। আজকালও এ সমস্ত কর্ম্ম চালাইবার জন্য ঐ প্রকার কর্ম্মচারীই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে পূর্ব্বে যে কার্য্য সল্প খরচে সাধারণের আন্তরিক আগ্রহে সচ্ছন্দে সম্পাদিত হইত, আজকাল তাহা বহু ব্যয়ের মধ্য দিয়াও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ইহার মধ্যে ইংরাজের প্রভাব কতটা আছে ও কতটা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক অবনতি-জনিত তাহা ভাবিবার বিষয়।

পটল-চাষ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা।

পটল চাষের সময় আসিয়াছে, তাই এ সম্বন্ধে দু' চারিটি কথা আমাদের পাঠকগণকে এখনই বলা উচিৎ।

যিনি নূতন ক্ষেত্র করিবেন তাঁহাকে আশ্বিন মাসেই উহা প্রস্তুত করিতে হইবে, কারণ কার্ত্তিক মাসই পটলের গেঁড় বা মূল রোপণের কাল। চারি ধারের পগারের নূতন মাটি উঠাইয়া ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া দিবেন এবং চাষ দিয়া ক্ষেত্র খানীকে বেশ আল্‌গা করিবেন। পুরাতন পাঁক্‌মাটি দিয়া অনেকে পটল ক্ষেতের উর্ব্বরতা বাড়াইয়া থাকেন। ছাই এবং খইল সার ব্যবহার করা খুব ভাল। গোশালার আবর্জ্জনা পটল ক্ষেতের উর্ব্বরতা বাড়াইতে খুব উপযুক্ত।

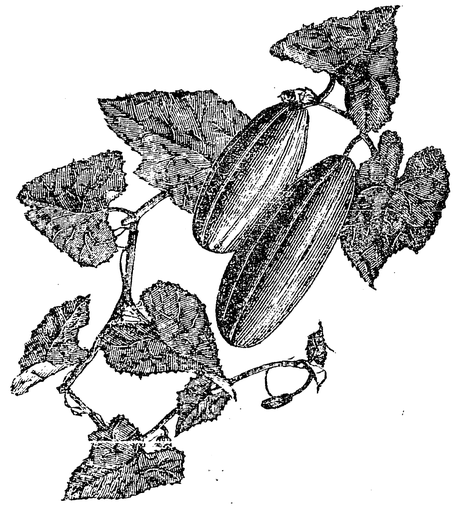

পটলের মূল বা গেঁড় রোপণ করিতে হয়। 'সন্‌কে' গেঁড় বা মাত্র পূর্ব্ব বৎসরের (এক বৎসরের) সরু সরু ছোট মূলই রোপণ করিবেন। পুরাতণ মোটা মূলে গাছ খুব হয় বটে কিন্তু তেমন ফল হয় না। মূল আবার দুই জাতীয় হয়,—পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয়।

পুরুষ জাতীয় মূলের গাছে ফুল পর্য্যন্ত হয়, ফল ধরেনা, তবে ক্ষেত্রে উহারও কিছু প্রয়োজন আছে। স্ত্রী জাতীয় মূলের গাছে যে ফুল হয়, তাহাতে কীট বাহিত করান সাহায্যে ফল ধারণের সহায়তা করে।

সারি বাঁধিয়া ছয় সাত হাত অন্তর এক একটি মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় দু' তিনটি করিয়া মূল রোপণ করিবেন, এবং উহার উপর অল্প পরিমাণে খড়কুটা দিয়া ঢাকিয়া দিবেন; ইহার কারণ রৌদ্রে মাটি নীরস হইয়া যেন গেঁড়ের মাথাগুলি না শুকাইয়া যায়। অথচ লক্ষ্য রাখিবেন যেন মাদায় জল না বসে, কারন তাহাতে মূল পচিয়া যাইবে। মাদা গুলি বরং একটু উচ্চ হওয়া কর্ত্তব্য এবং দুইটি মাদার সারির মধ্যের স্থান নালার মত থাকিবে, উহা অন্তত আধ হাত পরিমাণ গভীর হইবে।

পৌষ মাঘ মাসে যদি বৃষ্টি না হয় তবে একবার নালা গুলিতে জল সেচন করিতে হয়। আগাছা জন্মিলে মাঝে মাঝে উঠাইয়া দিতে হয়। ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্র মাস হইতেই গাছ ভাল হইলে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইবে। ফল ধরার পর পাঁচ দিন পরেই পটল খাইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

গাছ বেশী সাঁড়াইয়া বা বাড়িয়া গেলে ডগা কাটিয়া পল্‌তা খাওয়া ভাল। পটলের পাতাই পল্‌তা শাক। ইহার রস পিত্তঘ্ন। অরুচির রুচি জন্মাইতে তিক্ত পল্‌তা শাকের খুব আদর আছে।

বার মাসিয়া পটল। আসল পটলই গাছ করার গুণে বার মাস ফল দানের যোগ্য হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে গাছ করিয়া অনেকেই বার মাস ফল আহরণ করিয়াছেন, তবে চৈত্র হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেমন ফলে অন্য সময়ে তত বেশী ফলে না।

চেলা বাঁশের বা কঞ্চির ৩ হাত উচ্চ বেড়া ঝাঁপের মত বুনিয়া প্রস্তুত করিয়া সাত হাত বা আরও বেশী অন্তর এক একটী বেড়া লম্বালম্বি খাড়া করিবে এবং মাঝে মাঝে এক একটি শক্ত খুঁটির অবলম্বন দিয়া উহাদিগকে ঠিক রাখিবে। এই বেড়ার দুই পাশে মাদা করিয়া মূল বসাইবে এবং গাছ ঐ বেড়ার গায়ে তুলিয়া দিবে। গাছ বড় হইয়া উঠিলে, শিকড় না কাটিয়া যায় এমন ভাবে গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে খুসিয়া খইল মিশান মাটি দিয়া চাপা দিবে। বেড়ার দুই পাশে মাদার সারি ও তাহার ঠিক পরেই নালি থাকিবে। বেশী বৃষ্টি হইলে জল নালি দিয়া বাহির হইয়া যাইবার পথ রাখিবে, এবং অনাবৃষ্টি হইলে জল সেচন করিয়া মাঝে মাঝে নালি ভিজাইয়া দিবে। এই প্রকারে প্রস্তুত গাছে বার মাসই ফল ফলিবে। যে ক্ষেত্রে এইরূপে পটল গাছ বসাইবে, তাহার দুইটি সারির বা বেড়ার মধ্যে যেন অন্য ফসল লাগাইবার জন্য যথেষ্ট স্থান থাকে, তাহা হইলে একই ক্ষেত্রে হইতে বহুবিধ তরকারী তোলা চলিবে। তবে সাবধান পটল গাছের বেড়ায় অন্য গাছ উঠিতে দিবে না। (প্রাপ্ত)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক মাস।

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জীবীজ বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ-আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত নতুবা বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায় সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্লাদি—সুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি, ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করিতে হয়।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৫ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কলা বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—বল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রে পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এত দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকা কালে কলিচুণের ছিটা দিলে বা অল্প পরিমাণ গুঁড়া চুণ ছড়াইয়া দিলে বাঙলা দেশে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

২৪ খণ্ড } কৃষক—কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল। { ৭ম সংখ্যা

ব্যবসায়িক মুরগি-চাষ।

আমাদিগের দেশ কৃষি-প্রধান। অধিকাংশ লোককেই জীবন-ধারণের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু কৃষি সমস্ত বৎসর ধরিয়া কৃষককুলকে কার্য্য যোগাইতে পারে না। চাষের সময় অতীত হইয়া গেলে তাহাদিগকে আলস্যে দিন কাটাইতে হয়। পূর্ব্বে পল্লী সমূহে যে সমুদয় ক্ষুদ্র শিল্প ছিল তৎসমুদয় অনেকের অর্থার্জ্জনের সহায়তা করিত। এখন সেইরূপ উপ-জীবিকার অভাব হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের অন্ন কষ্ট এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে কৃষির আনুসঙ্গিক অন্য কোন কার্য্য দ্বারা লোকে নিজ নিজ আয় বৃদ্ধি করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ধারাবাহিক চেষ্টা হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। মুর্গি চাষ একটি শ্রেষ্ঠ উপজীবিকা স্বরূপে অনেকেই অবলম্বন করিতে পারেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের পক্ষেও ইহা একটি জীবিকা হইতে পারে। উন্নত জাতীয় পক্ষী লইয়া আধুনিক প্রকার মুর্গি চাষ করিলে তদ্বারা যে কিরূপ লাভ হওয়া সম্ভব তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে বিগত কয়েক বৎসর হইতে মুর্গি-চাষ প্রসারের যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। ফলও বিশেষ আশাপ্রদ দেখা যাইতেছে। সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোকে এই প্রদেশে মুর্গি চাষ করেঃ—১ম, সাহেবেরা প্রধানতঃ নিজেদের

ব্যবহারের জন্য মুর্গি চাষ করেন ; উদ্বৃত্ত ডিম ও পাখিও ইঁহারা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ২য় অনেক স্থলে দেশীয় ভদ্রলোকগণ, অবশ্য প্রধানতঃ মুসলমান, সখের জন্য মুর্গি চাষ করেন। ৩য় ; ব্যবসায়ী শ্রেণী, মুর্গি-চাষ ইহাদের জীবিকা কিম্বা উপজীবিকা। উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্তই প্রধান ; প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগের দ্বারাই ব্যবসায়ের মুর্গি উৎপাদিত হইয়া থাকে। কাহারও চাষ অধিক মাত্রায় নয় ; সকলেই ক্ষুদ্র চাষী। ব্যবসায়ীরা পাঁচ বাড়ী হইতে পাখিও ডিম সংগ্রহ করিয়া বাজারে আনে। ইতর শ্রেণীর লোকেরাই মুর্গি চাষ জীবিকারূপে অবলম্বন করে। ইহাদিগের জমি জায়গা না থাকাতে ইহাই ইহাদিগের পক্ষে উপযুক্ত কাজ। মুর্গিচাষে ইহাদের দক্ষতাও কম নয়।

সাহারাণপুর, মিরট, মোরাদাবাদ প্রভৃতি যুক্ত-প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে বেশ বড় ডিমের কারবার চলে। সাহারাণপুরই ইহার কেন্দ্র। নানাস্থান হইতে এখানে ডিম চালান আসে এবং এখান হইতে আবার শিমলা, মুসোরী প্রভৃতি বড় বড় গিরি-নগরে যায়। পেশোয়ার হইতেও বহুসংখ্যক ডিম এখানে আসে।

যাহাতে মুর্শি-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়া সকল শ্রেণীর লোকের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয় সেইজন্য যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বতন গবর্ণর, স্যর হারকোর্ট বট্‌লার, একটি প্রাদেশিক পক্ষীচাষ-সমিতি গঠন করিয়া বিলাত হইতে একজন অভিজ্ঞ আমদানি করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধারণে লক্ষ্ণৌ সহরে একটি প্রদর্শন-ক্ষেত্র খোলা হয়। ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে উত্তম জাতীয় মুর্গি আনাইয়া প্রজনন দ্বারা এত সুফল পাওয়া গিয়াছে যে দুই বৎসরের মধ্যেই প্রদর্শন ক্ষেত্রের খরচ ক্ষেত্র হইতেই উঠিতেছে। লক্ষ্ণৌর ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া আরও দশটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২২-২৩ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে ১০০টি মুর্গি হইতে ১০,৯২২ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই মুর্গি চাষে লাভের মাত্রা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। সমস্ত পাখি অথবা ডিম যে বক্রি হয় তাহা নহে। উপযুক্ত অথচ অবস্থাহীন লোককে বিনামূল্যে প্রজনকের জন্য ডিম ও পাখি দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন দেশীয়ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে যে মেলা হয় তাহাতে উন্নত জাতীয় মুর্গি প্রদর্শন ও ম্যাজিক লণ্ঠনে পালন প্রথা প্রভৃতি দেখাইয়াও মুর্গি চাষের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বিদেশীয় মুর্গির মধ্যে পাড়া গাঁয়ের পক্ষে Leghorn ও সহরাঞ্চলের সংকীর্ণ স্থানে Australian Black Orpington এবং Rhode Island Red ই উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে সরকারী ব্যতীত বেসরকারী চেষ্টায়ও মুর্গি চাষের উন্নতি সাধিত হইতেছে। বেসরকারী চেষ্টায় American Presbyterian Missionএর ক্ষেত্র

বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহা একজন সুদক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত পাদরী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রধানতঃ যাহাতে ইতর জাতিগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় সেইজন্য মুর্গি চাষ কুটিরশিল্পরূপে প্রবর্ত্তন করিতে মিশন কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এতদর্থে গবর্ণমেণ্টও আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেছেন।

এই ক্ষেত্রে নানাবিধ জাতীয় মুর্গী ও মুর্গী চাষের সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে দেখা যায় যে Leghorn জাতিই নিম্ন প্রদেশ ও মফস্বলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এতদ্দেশে খাদ্যের জন্য পাখি অপেক্ষা ডিমই অধিক আবশ্যকীয়। পাড়া গাঁয়ে মুর্গিকে চরিয়াই আহার সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাদের স্বল্পভোজী হওয়াও দরকার—এ সমস্ত গুণ লেগহর্ণের আছে। অধিকন্তু লেগহর্ণ ছুটিতে ও উড়িতে খুব মজবুত বলিয়া কুকুর শেয়াল প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ততটা নাই। ইহারা রাত্রে গৃহের নিকটবর্ত্তী গাছে থাকে এবং রৌদ্র ও বৃষ্টিতে সহজে ইহাদের কিছু হয় না।

ইটা ক্ষেত্র প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে অবস্থিত। প্রজননের জন্য ৮টি আড়গড়া, প্রায় ৬০০ মুর্গী রাখার জন্য ৬টি ঘর, ডিমে তা দেওয়ার একটি ঘর, রুগ্ন পাখির জন্য হাঁসপাতাল, incubater ঘর ও খাদ্য-গুদাম ও প্রায় ১০০ ফলের গাছ এই ক্ষেত্রে আছে।

বিশুদ্ধ জাতীয় মুর্গির ডিম ও দেশী মুর্গির সংযোগে উন্নত জাতি প্রজননের জন্য মোরগ এই ক্ষেত্র হইতে সরবরাহ হয়। মিশন-সংশ্লিষ্ট লোকেরা প্রতি ডিম ৵০ হিসাবে পাইয়া থাকেন। সাধারণের পক্ষে প্রজননের জন্য ডিম ও পাখির মূল্য যথাক্রমে প্রত্যেকটি ১৲ ও ১৫৲—২৫৲ টাকা। বলা বাহুল্য ডিম ও পাখির যে পরিমাণ চাহিদা আছে, ক্ষেত্র সে পরিমাণ উৎপাদন করিয়া উঠিতে পারে না।

নির্ব্বাচিত কয়েকটি গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজনন ক্ষেত্র স্থাপনে উত্তম ফল দর্শাইয়াছে। একজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যে মুর্গি চাষে মনোযোগ প্রদান করিতেছে এবং ক্রমশঃ চাষির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।

পক্ষী মেলায় যে সমস্ত মুর্গি প্রদর্শিত হইয়াছিল সেগুলি সমস্তই দেশীয় লোকের। প্রদর্শিত পক্ষী সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দেশীয় মুর্গির ওজন ১৩ আউন্স ; পক্ষান্তরে উন্নত জাতির মুর্গির ওজন ৭ পাউণ্ড। দেশী মুর্গির ৬টি ডিমের ওজন ৫ আঃ ; ঐ সংখ্যায় উন্নত মুরাগর ডিমের ওজন ১৪ আঃ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রজননে উৎপাদনের মাত্রা ৩.৪ গুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

যুক্ত-প্রদেশে যে উপায়ে মুর্গি চাষের উন্নতি বিধান করা হইতেছে, বাংলায়ও ঠিক সেই সমুদয় অবলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে সে দিকে কোন চেষ্টাই দেখা যাইতেছে না। কলিকাতার নিকটে ২।৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুর্গী ক্ষেত্র আছে বটে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তাহা নাই বলিলেই হয়। অথচ দুর্গি চাষের ন্যায় লাভজনক ব্যবসায় কমই আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

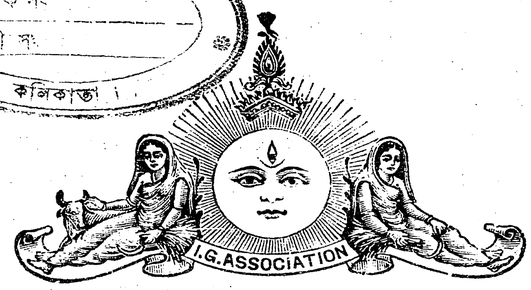

কৃষক—কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল।

ধুঁদুল-শিল্প।

সাধারণতঃ সব্জী হিসাবেই ধুঁদুল এতদ্দেশে প্রধাণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধুঁদুল অপেক্ষা ঝিঙ্গাই অনেকে পছন্দ করেন; সেইজন্য খাদ্যরূপেও ধুঁদুলের ব্যবহার কম। কিন্তু ধুঁদুল চাষ করিয়া জাপাণীরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে। ধুঁদুলের ছোবড়া লইয়া সেখানে একটি বৃহৎ শিল্প বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে এই শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

ধুঁদুল দেশভেদে ঘিয়া তোরিয়া ও পুরুল নামে পরিচিত। বর্ষাকালেই ইহার চাষ হয়, কিন্তু অন্য সময়েও ধুঁদুল উৎপাদিত হইতে পারে। শুধু ভারতে নয়, আমেরিকা, আফ্রিকা, জাপান, মলয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতে যথেষ্ট পরিমাণে ধুঁদুল জন্মে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Luffa aegyptiaca এবং ইহা লাউ কুমড়া, শষার ন্যায় Cucurbitacae বর্গের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত বর্গান্তর্ভুক্ত অনেক গাছের ন্যায় ধুঁদুলও লতানে গাছ। কাছাকাছি অন্য কোন অবলম্বন না পাইলে ইহা বড় বড় বৃক্ষেও লতাইয়া যায়। পাতাগুলি ৫টি ভাগে বিভক্ত এবং কাণ্ড অপেক্ষাকৃত কঠিন। ধুঁদুলের পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকারের পুষ্প আছে। পুং পুষ্প গুচ্ছবদ্ধ ও লম্বা বোঁটা-বিশিষ্ট। স্ত্রী পুষ্প একক ও ইহার বোঁটা ছোট। সাধারণতঃ খাদ্যার্থ যে ধুঁদুল উৎপাদিত হয় তাহার ফল প্রায় ১ ফুট দীর্ঘ হয়। কর্ষিত জাতি ব্যতীত ধুঁদুলের কতিপয় বণ্য ও অর্দ্ধবণ্য জাতি আছে। তাঁহাদের ফল অল্প বিস্তর তিক্ত রস যুক্ত এবং কোন কোনটি বিশেষরূপে রেচক। ফলের হিসাবে কিন্তু শেষোক্ত জাতি গুলিই উৎকৃষ্টতর। ইহাদের

ফল প্রায় ৩ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং ব্যাসও প্রায় ৩ইঞ্চি। উহার ফল আগাগোড়া প্রায় সমান ভাবে গোল।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে গাত্র পরিষ্কারের জন্য স্পঞ্জ যথেষ্ট পরিমানে সভ্য জগতে ব্যবহৃত হয়। এই স্পঞ্জ একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল বিশেষ। ভূমধ্য সাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ জন্মায় এবং স্পঞ্জ উত্তোলন মুক্তাশুক্তি উত্তোলণের ন্যায় বেশ বড় ব্যবসায়। কিন্তু প্রাণীজ স্পঞ্জ যে পরিমাণে পাওয়া যায় তদপেক্ষা জগতে স্পঞ্জের চাহিদা অধিক এবং প্রাণীজ স্পঞ্জের দামও অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। আমরা সচরাচর যে ধুঁদুলের ছোবড়া ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহাতে মোটামুটি স্পঞ্জেরই কাজ হয়। কিন্তু ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে ধুঁদুলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট স্পঞ্জের ন্যায় কোমল, নমণীয় ও সুদৃশ্য হইতে পারে। ধুঁদুল হইতে স্পঞ্জ উৎপাদিত হইতে পারে বলিয়াই ইহার ইংরাজি নাম Sponge Gourd। চাষের ধুঁদুলের সাঁস খুব নরম হইলেও ইহাতে অল্প বিস্তর তন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য অথবা বিশেষরূপে স্পঞ্জের জন্য উৎপাদিত ধুঁদুলে এই তন্তু জাল প্রকৃষ্টরূপে পরিপুষ্ট

প্রাণীজ স্পঞ্জের পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্য স্পঞ্জের ব্যবহার নিতান্ত আধুণিক নয়। আমাদের দেশের ন্যায় অনেক দেশের লোকেই, যাহারা কখন প্রাণীজ স্পঞ্জ দেখে নাই, বহুকাল হইতে ধুঁদুলের ছোবড়া গাত্র পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, কিন্তু জাপানই যুঁধুল শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাধাণ্য লাভ করিয়াছে। এখানে ছোবড়ার নরম ও বর্ণহীন করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বহু বিস্তৃত ভাবে চাষ করিয়া ও এক স্থানে প্রভূত পরিমাণে ছোবড়া একত্রে পরিষ্কৃত করার ব্যবস্থা করিয়া খরচের হার অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। প্রস্তুতী কৃত স্পঞ্জ এরূপ ভাবে বাজারে চালান দেওয়া হইতেছে যে তাহা প্রাণীজ স্পঞ্জের সহিত গুণে সমতুল্য অর্থচ দরে অনেক কম। জার্ম্মনিতেও বিদেশ হইতে ছোবড়া ক্রয় করিয়া তাহা পরিস্কৃত করিয়া বিক্রয়ের কারবার ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। ফলতঃ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে উদ্ভিজ্জ্য স্পঞ্জের ব্যবসায় বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহাতে বোধ হয় যে বর্ত্তমান যুগে ধুঁদুলের ভবিষ্যত উজ্জল। যুদ্ধের সময় উদ্ভিজ্জ্য স্পঞ্জ ব্যবসায় অপরাপর ব্যবসায়ের ন্যায় হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু আবার উহার পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

জাপানের নানা স্থানে ধুঁদুল চাষ হয়, কিন্তু ইউসিন্ ও হামামাৎসু নামক দুটি জেলাকেই ইহার কেন্দ্র বলিতে পারা যায়। সময়ে সময়ে অন্যান্য ফসলের ধারে ধারে ধুঁদুল দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার চাষ হয়। নদী কিম্বা জলাশয়ের নিকটে এই সমুদয় ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহাতে ধুঁদুল পচাইবার সুবিধা হয়। জাপানী কৃষক অত্যন্ত পরিশ্রমী; তাহারা সামান্য কাজেও অবহেলা

করেনা। বীজ বপণের অনেক পূর্ব্ব হইতেই জমি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সার দেওয়া হয়। তাহার পর ফাল্গুণ চৈত্র মাসে সামান্য বারিপাত হইলে বীজ বোনা হয়। এক মাসের চারা হইলেই তাহার লতাইবার জন্য কোন প্রকার অবলম্বন আবশ্যক হয়। কৃষকেরা সেই জন্য ক্ষেতের উপরে বাঁশ, কঞ্চি অথবা অন্য প্রকার গাছের ডালপালা দিয়া একটি মাচান তৈয়ারী করিয়া দেয়। জমি হইতে এই মাচান প্রায় ৫ ফুট উচ্চ। ধুঁদুল খুব শীঘ্রই বাড়িয়া যায় এবং জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফুল হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে গাছের গোড়ায় তরল সার দেওয়া হয়। শ্রাবন ভাদ্র মাসেই ফল পাকিয়া যায়। ফলের ইষৎ পীতাভ বর্ণ হইলেই উহা তুলিয়া ফেলা হয়। আর অধিক দিন গাছে থাকিলে ছোবড়া শক্ত হইয়া যায় এবং স্পঞ্জ তেমন নরম হয় না।

যাহারা সামান্য পরিমাণে চাষ করে, তাহারা বাজারের জন্য ধুঁদুল প্রস্তুত করিতে ততটা যত্ন করে না। ফল তুলিয়া ও তাহার অগ্রভাগের কিয়দংশ ছাঁটিয়া দিয়া উহা জলে নিক্ষেপ করা হয়। স্রোতের জল হইলেই খুব ভাল হয়। ১০।১৫ দিন জলে ভিজিয়া ছাল ও শাঁষ পচিয়া গেলে ফল উপরে তুলিয়া লইয়া ছাল পরিষ্কার করিয়া চাঁছিয়া ফেলা হয়। সেই সঙ্গে চাপ দিয়া শাঁষও বাহির করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পর আবার ধুঁদুল গুলি ধুইয়া খোলা যায়গায় দড়িতে ঝুলাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে ফলগুলিকে একখণ্ড কাষ্ট দ্বারা পিটিয়া তৎপরে ঝাড়িয়া দিলে বীজ বাহির হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে পরিস্কৃত স্পঞ্জ বাজারে প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহার দর কিছু কম। যেখানে বিশেষ ভাবে স্পঞ্জের জন্য ধুঁদুল চাষ হয় সেখানে ছোবড়া প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করা হয়। সে সকল স্থানে ২ ইঞ্চি বোঁটা সহ ফল গুলি তুলিয়া তাহাদের অগ্রভাগ সামান্য ছাঁটিয়া দেওয়ার পর আকার হিসাবে উহাদিগকে বাছাই করিয়া উন্মুক্ত ঘরে ২।৩ দিন ঝুলাইয়া রাখা হয়। ছাল ও শাঁষ ক্রমশঃ নরম হইয়া থাকে এবং অগ্রভাগের ছিদ্র দিয়া রস গড়াইয়া পড়িতে থাকে। ৩ দিন পরে ফল গুলিকে নামাইয়া উহাদের একধার চিরিয়া দেওয়া হয়। বড় বড় কাঠের টবে আড়াই সের চুণের সহিত ২৫ সের জলের হিসাবে চুণের জল তৈয়ারী করা থাকে। ফল চেরা হইলেই উক্ত জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এ জলেই ২।১ দিন ফলগুলি থাকে। পরে উহাদিগকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া বড় বড় টেবলের উপর বিছাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। শুকাইবার জন্য বিশেষ ঘর আছে। আবশ্যক হইলে কৃত্তিম উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারাও ফল শুকান হইয়া থাকে। উত্তাপ দেওয়ার বিশেষ, কৌসল দরকার। বেশী হইলে ছোবড়া সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এবং কম হইলে ছাতা ধরিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়। শুষ্ক হইলে বীজ ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছোবড়াকে উপযুক্ত আকারে কাটিয়া লওয়া হয়। ২ ইঞ্চি কম লম্বা ছোবড়ায় কোন কাজ হয় না। সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়।

উভয় দিক হইতে সামান্য সামান্য অংশ বাদ দিয়া একটি মধ্যমাকার ধুঁদুল হইতে ২০ ইঞ্চ টুকরা ছোবড়া পাওয়া যাইতে পারে। বাজারের চলতি ছোবড়া সাধারণতঃ ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ ও ২০ ইঞ্চি লম্বা। বড় সাইজের ছোবড়ার ১০০০—১৫০০ টুকরায় ও ছোট সাইজের ছোবড়ার ৪০০০—৫০০০ টুকরায় এক একটি গাঁট বাঁধা হয়। আকার, গঠন ও বর্ণ হিসাবে মূল্য নিরূপিত হয়। ১০-১২ ইঞ্চি সাইজের ছোবড়ার দাম শতকরা ৯৲-১২৲। ১৪-১৬ ইঞ্চি ১৩৷৷০—১৯৷৷০; এবং ১৮-২০ ইঞ্চি ১৮৲-২২৷৷ টাকা। জাপান লুফ্‌ফা অর্থাৎ ধুঁদুল ছোবড়া ব্যবসায়ে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করে। এক ইয়োকোহামা বন্দর হইতেই যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৩, ৩৬, ৩২০ টুকরা ছোবড়া বিদেশে যাইত। উহার মূল্য অর্দ্ধ লক্ষ টাকার উপর। অন্যান্য বন্দর হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে ছোবড়া রপ্তানি হয়; বস্তুতঃ যুদ্ধের সময় কিছু কমিয়া গেলেও জাপাণী লুফ্‌ফা ব্যবসায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আগে জার্ম্মনিই জাপানের প্রধান ক্রেতা ছিল, কিন্তু আজ কাল ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ও রুসিয়াও জাপাণী ছোবড়া ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সাধারণতঃ শষা, লাউ, কুমড়া চাষ অপেক্ষা ধুঁদুল চাষে অধিক ব্যয় অথবা পরিশ্রম লাগেনা। স্পঞ্জের জন্য ধুঁদুল চাষ করিয়া জাপানের ন্যায় এতদ্দেশও যথেষ্ট লাভ করিতে পারে। ইহা কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে খাদ্যের জন্য যেমন স্বল্প তন্তু বিশিষ্ট নরম ফল দরকার স্পঞ্জের জন্য তেমনি দৃঢ় তন্তু জাল সম্পন্ন ফল আবশ্যক। জাপাণে যে জাতীয় ধুঁদুল হইতে স্পঞ্জ প্রস্তুত হয় তাহার নাম Luffa Cylindrica। এতদ্দেশে সে জাতি নাই, কিন্তু প্রবর্ত্তন করাও কঠিন নয়। এতদ্ভিন্ন কর্ষিত ধুঁদুলের অনেক ভেদ দৃষ্ট হয়। সামান্য চেষ্টায় এমন একটি ধুঁদুল জাতি নির্ব্বাচণের দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে যাহা হইতে জাপানের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ছোবড়া প্রস্তুত করা সম্ভব। বর্ত্তমান অন্ন সমস্যার দিনে যতই নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় ততই মঙ্গল। ধুঁদুল শিল্পের প্রতি আমরা সেইজন্য সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আশা করা যায় যে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া অনেকেই সফলকাম হইবেন।

বণ্য কাক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সাধারণ অথবা সহরবাসী কাকের কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বণ্য কাকের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। জঙ্গলী কাক ও সহরাঞ্চল সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পল্লীবাসী মানবের ন্যায় ইহারা সহরে কেবল বেড়াইতে আসে মাত্র। স্থায়ী ভাবে বসবাস করেনা। ভারতের নিম্নপ্রদেশ মাত্রেই দুই শ্রেণীর কাক দেখা যায়। বণ্য কাক (Corvus Coronoides) ও সহুরে কাকের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে পূর্ব্বোক্তের গলা কাল, আকার এবং ঠোঁট অধিক পরিপুষ্ট; শেষোক্তের গলা ধুসরবর্ণের এবং আকার ও ঠোঁট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ডানা ও ঠোঁটের দৈর্ঘ ভেদে কয়েক প্রকার জঙ্গলী কাক দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের বণ্য কাকের ডানা ও ঠোঁট উভয়ই ক্ষুদ্রতর; পক্ষান্তরে হিমালয়ের কাক বৃহত্তর ও পালকের গোড়ায় মলিন অথবা বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ দাগযুক্ত। আণ্ডামানের কাকও বেশ বড়।

পল্লীগ্রামে অথবা জঙ্গলে থাকার প্রবৃত্তি বাদ দিলে বণ্য কাকের অন্যান্য অভ্যাস গৃহ-কাকেরই মত। মনুষ্য সমাজের পরজীবি নয় বলিয়া বণ্য কাক গৃহ কাকের ন্যায় সাহসী নয়। বণ্য কাকের levaillanti নামক একটি উপজাতি আছে, যাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ মনুষ্য-বসবাসের নিকটে থাকিতে শিখিতেছে। আবর্জ্জনা স্তূপ অথবা কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে ইহারা আহার সংগ্রহ করে। লাঙ্গল দেওয়া অথবা সেচনের সময় অন্যান্য পাখির সহিত এই কাকও উপস্থিত হয় এবং মাটি হইতে পোকা বাহির হইলেই উহারা ভক্ষণ করে। গরু, মহিষ, ছাগ প্রভৃতির গায়ের ইকুন ও তাহাদের মলে প্রাপ্ত কীট ও ইহাদিগের ভক্ষ্য। আবর্জ্জনা ভিন্ন অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ফড়িং, বিছা, কেঁচো, ক্ষুদ্র ভেক ও টিকি টিকি প্রভৃতিই প্রধান। ভেক ও গিরগিটি প্রভৃতিকে অত্যন্ত জ্বালাতন করিয়া মারিয়া ফেলিলেও অনেক সময় দেখা যায় যে গৃহ কাকের ন্যায় বণ্য কাকও এ সমস্ত খায় না। ছোট মুরগী, পায়রা ও এমন কি ছাগলওকেও ইহারা বিরক্ত করিতে ছাড়ে না। অন্যান্য পক্ষীর শাবক ও ডিম খাওয়া ইহাদের বদ্ধমূল অভ্যাস। সেইজন্য নিজ বাসায় নিকট কাক দেখিলেই অনেক পাখি তাহাকে আক্রমণ করে এবং যতক্ষণ না বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাসা নিরাপদ মনে করে না। পশ্বাদির শব কাকের প্রিয় খাদ্য। নদীর জলে কাক-পরিবেষ্টিত মড়া ভাসিয়া যাইতে বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাণীজ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ আহার্য্যই ইহারা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। কোন কোন ফসলেরও ইহারা

অল্প বিস্তর ক্ষতি করে। বাগাণে ভুট্টা এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রায় পক্ক ধাণের শিষ বণ্য কাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। চিনার বাদামেরও ইহারা কম ভক্ত নয়। স্থানে স্থানে কাক হইতে চিনার বাদাম রক্ষা করার জন্য বিশেষ ভাবে মজুর নিয়োগ করিতে হয়। সিমুলফুল, ডুমুর ও তুঁত কাকের প্রিয় খাদ্য। পক্ষীতত্ত্ববিৎ মেসন সাহেব বলেন যে তিনি যতগুলি কাক-পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ অধিক মাত্রায় দেখিতে পাইয়াছেন। কৃষির হিসাবে বন্য কাককে না শত্রু না মিত্র বলিতে পারা যায়। অনিষ্টকারী পোকা মাকড় ভক্ষণ করিয়া একদিকে ইহারা যেমন কৃষির উপকার করে অন্যদিকে তেমনি চারা গাছ উৎপাটিত করিয়া ও পাকিবার সময় ফলও শস্য প্রভৃতি নষ্ট করিয়া যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করে। আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ইহারা অবশ্য স্বাস্থ্য বিধানের কতকটা সহায়তা করে, কিন্তু ইহার চৌর্য্য বৃত্তিতেও গৃহস্থকে উত্যক্ত হইতে হয়। কাক জাতীয় অন্যান্য পাখির ন্যায় বন্য কাকেরও চকচকে জিনিষের উপর নজর কিছু অধিক। রূপার দ্রব্যাদি, যেমন চামচ প্রভৃতি ইহারা দেখিতে পাইলেই উঠাইয়া লইয়া যায়। চকচকে দ্রব্যের হিসাবে এখন কি বরফের টুকরা পর্য্যন্তও বাদ যায় না। চকচকে দ্রব্যের উপর এত টানের কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া কাকেরা অন্য স্থানে ফেলিয়া দেয় কিম্বা মাটিতে পুতিয়া রাখে। এক স্থান হইতে তুলিয়া আবার অন্য স্থানে পুতিতেও দেখা গিয়াছে। গোলফ খেলার বলের উপরও ইহাদের নজর কম নয়। একবার ডিম ভ্রমে একটি গোল্ফ বল লইয়া গিয়া একটি কাক উহা তা' দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

গৃহ কাকের ন্যায় বন্য কাক ততটা দলবদ্ধ হইয়া থাকে না। তবে একজোড়া বন্য কাকের চারণ ক্ষেত্রের গণ্ডী মধ্যে অন্য পাখীকে ইহারা প্রবেশ করিতে দেয় না। বন্য কাকের বাসা বাঁধার ও ডিম পাড়িবার সময় দেশ ভেদে বিভিন্ন। মাঘ হইতে চৈত্রই সাধারণ সময়—দক্ষিণাঞ্চলে ইহাপেক্ষা একটু আগে এবং উত্তরাঞ্চলে একটু পরে কাকেরা বাসা বাঁধে। উচ্চ গাছেই নীড় নির্ম্মিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল পালা ও ঘাস প্রভৃতি দিয়া বাসা বেশ সুদৃঢ় করা হয়। সাধারণতঃ ৪-৫ টি ডিম হইয়া থাকে। ডিমের জমির রং নীলাভ সবুজ, তাহার উপর লাল অথবা পাটকিলে বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু আছে। ডিমের আকার গৃহ কাকের ডিম অপেক্ষা কিছু বড়। Agriculturall Journal of India, vol XVIII, pt, V 1923.

কৃষি-বাণিজ্য।

আমাদের দেশে কৃষি ও বাণিজ্য দুইটি পৃথক বৃত্তি। কিন্তু ইংরাজী 'বিজ্‌নেস্ Business কথাটির ভিতর এই উভয় বৃত্তির ভাবই পুষ্ট; তা' ছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তী বাহন বৃত্তি, যদ্দ্বারা এক স্থানের উৎপন্ন বস্তু অন্য স্থানে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য নীত হয়, তাহার ভাব ও পোষিত হয়। আমাদের 'ব্যবসায়' কথাটিকে ইংরাজী 'বিজ্‌নেস্' কথার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিলে বোধ করি অর্থ বোধে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না।

ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তিনটিই প্রধান; উৎপাদন (কৃষি), বাহন (গোযান, জলযান ও রেলযান প্রভৃতি চালন) এবং বিনিময় (ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য)। এই তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে পরস্পরের উন্নতি এবং না থাকিলে সকলেরই ক্ষতি। জিনিষ উৎপন্ন না হইলে বাহকের কার্য্য চলে না; এবং বণিকের ক্রয় বিক্রয় ও চলে না; কিসের বাহন বা ক্রয় বিক্রয় চলিবে? আবার উৎপন্ন বস্তুর উপযুক্ত মূল্যে আদান প্রদানের ব্যবস্থা না হইলে উহার ও সার্থকতা থাকে না, সুতরাং বাহিত এবং বিক্রীত হইয়াই ফসল কৃষিকে সফল করিয়া থাকে।

যদি দেশর উন্নতি করিতে হয় তবে প্রদেশের উন্নতি প্রার্থনীয়; প্রদেশের উন্নতি কল্লে বিভাগ বা জেলার উন্নতি, এবং জেলার উন্নতি বিধানার্থ পল্লীর উন্নতি বা জমিদারীর উন্নতি প্রার্থনা করিতে হয়। কৃষির উন্নতি না হইলে জমিদারীর বা পল্লীর বা পল্লীর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। জমিদারেরা যদি এ বিষয়ে আলোচনা না করেন, দেশের ধনীরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হ'ন, তবে দরিদ্র কৃষক কুলের উপর দায় চাপাইয়া যাহা হয়, এখন তাহাই হইতেছে। দেশ ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে দ্রুত গতিতে চলিতেছে। কৃষকের ছেলে ও লেখা পড়া শিখিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্র নামধারী লোকের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবনকে আপিসের কেরাণী গিরী ও কারখানার মজুরি প্রভৃতির দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নির্জ্জীব করিতে ছুটিয়াছে। দেশে পতিত জমির পরিমাণ বাড়িতেছে, জন সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, গোকুল নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে, এবং প্রত্যেক আবশ্যকীয় জিনিস,—দুগ্ধ হইতে ভাত, কাপড়, তরিতরকারী, ও ডাল কড়াই,—ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সুস্থ অপেক্ষা রোগী লোকের সংখ্যাই দেশে প্রবল। কে এ সকলের প্রতিকার করিবে? দেশের জমিদার ও ধনী সন্তান গণ! তোমরা যদি ঘুমাও, ঘুমাইয়া স্বপ্নের আনন্দে এখনও বিভোর থাকি, তবে যেদিন চক্ষু মেলিয়া

চাহিবে,—দেখিবে তোমরা শ্মশানের জমিদার, বনের জমিদার, সাপ-বাঘ-শিয়াল-কুকুরই তোমাদিগের প্রজা। আর ধনী, তোমার সমস্ত ব্যাঙ্কের বা কোম্পানীর কাগজের সুদ দিয়া ও তখন এই দেশে বসিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় হইবে না। আজ যাহাদের উপেক্ষা করিতেছ—উাহারা ত মরিতেই চলিয়াছে,—কাল উহাদের অভাবে তোমাকেও উহাদের অনুগামী হইতে বাধ্য হইবে!

পৃথিবীর যে দেশের উন্নতির আলোচনা করিবে, দেখিতে পাইবে,—উৎপাদন, বাহন এবং ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই দেশ উন্নত হইয়াছে। দূরে না যাও, জাপানের দিকে দেখ। দেশটির সমুদ্রোপকুল ভাগ জলযানে বেষ্টিত; অভ্যন্তর ভাগ রেলযান ও পশুযান প্রভৃতি সাহায্যে সুসম্বদ্ধ। এক জায়গার কাঁচামাল বা উৎপন্ন বস্তু সুবিধামত দূরবর্ত্তী স্থানের কর্ম্মশালে সহজে উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নির্ম্মিত হইতেছে। ক্ষেত্র হইতে ফসল সহজে দূরবর্ত্তী জনাকীর্ণ নগরের বাজারে নীত হইয়া কৃষকের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। অতিরিক্ত উৎপন্ন বস্তু আবার জলযানে বাহিত হইয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাজারে বিক্রীত হইয়া বিনিময়ে অর্থ বা নিজেদের আবশ্যকীয় বস্তু আহরণ করিতেছে। কৃষক, শিল্পী, বাহক এবং বণিক সকলেই পরিশ্রমের মূল্য পাইয়া উৎসাহিত এবং অধিক উৎপাদনে, বাহনে বা বিনিময়ে ব্যাপৃত। চারিদিকেই স্বচ্ছলতা, ব্যস্ততা, কর্ম্ম-কুশলতা, এবং স্বাভাবিক আনন্দ।

ব্যবস্থাপক সভাতেই যাও, আর বাহিরে দাঁড়াইয়াই চিৎকার কর, এখন ও যে অর্থ আছে তাহাকে "লক্ষ্মীর কৌটার" মধ্যে সযত্নে বসাইয়া না রাখিয়া, উহাকে খাটাও, পরিবর্ত্তে স্বচ্ছলজীবি প্রজা পাইবে, সুলভে আবশ্যকীয় বস্তু পাইবে এবং জমির উন্নতির সহিত জমিদারীর আয়ও বাড়িবে। আর এই সকল করিবার চেষ্টায় মূলধন রূপে নিয়োজিত অর্থ ও সুদের চেয়ে অনেক বেশী টাকা আনিয়া দিবে। চাই চাষযোগ্য জমি সকলের সহিত নগরের সংযোগ সাধন, দূর পল্লীতে ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য দ্বারা আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং ক্রমশঃ সম্ভব হইলে যোগ্য উপদেশ শিক্ষাদির সাহায্যে উহা উৎপাদনে ও চেষ্টা করা; চাই জনবিরল স্থানে সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি করন; আর চাই নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম বৃদ্ধির চেষ্টা; ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে স্বচ্ছন্দে বাস করাইবার ও শিক্ষা দিবার জন্য পাঠশালা, দেবালয়, সাধারণ মেলা ও পাঠাগার প্রভৃতির ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা সুন্দর বনের পরিস্কৃত চাষ যোগ্য বিস্তৃত ভূভাগকে গ্রহণ করিতে পারি। ঐ সকল ভূখণ্ডের উপযুক্ত রূপে ব্যবহার হইলে, স্থানীয় জমিদারগণ সমৃদ্ধিশালী হইবেন। এখন তথাকার অনেক স্থলেই যাতায়াতের অসুবিধা, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাইবার অসুবিধা প্রভৃতি কারণে একমাত্র ধান্য ব্যতীত অন্য চাষ প্রায় হয় না,

প্রজা সংখ্যা খুব কম, শিক্ষাদির ব্যবস্থা অসম্ভব বলিয়া ভদ্রলোকের বাস আদৌ নাই। ঐ সকল অঞ্চলের উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ বলিলেই চলে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা যে হইতে পারে না, তাহা ও বলা যায় না; বরং ব্যবস্থা হওয়াই সঙ্গত। মাতলা নদীর পরপার-বর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ সহজেই কলিকাতা নগরীর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ক্রমশ. উন্নত হইতে পারে। তৎপক্ষে স্থানীয় জমিদার গণের চেষ্টা থাকিলে ঐ ভূখণ্ডে ৪৮।৫০ মাইল উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটী রেলপথের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং উহার শাখা চড়াবিদ্যা নামক স্থান হইতে ১২ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে বুড়া-কালিগাছি নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অনেক স্থানের যাতায়াতের পথ সুগম করিতে পারে। কথিত রেলপথ পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ক্যানিং ষ্টেসনের সহিত একটী 'ফেরী' দ্বারা সংযুক্ত থাকিলে প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার সহিতই ঘনিষ্ট ভাবে সম্বন্ধ হইবে। তদ্বারা ঐ সকল অঞ্চলে কয়লা, আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাপড় প্রভৃতির আমদানী এবং ঐ সকল স্থান হইতে মাছ, ধান, কাঠ, গোলপাতা, মধু ও খড় প্রভৃতির রপ্তানী; এবং লোক জনের সহজ ও শীঘ্র যাতায়াত সম্ভব হইবে। বেশী লোক সমাগম হইলে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যে কাট্‌তি ও হইবে, এবং যাতায়াতের সুবিধা পাইলে লোকের বাস করিবার অনিচ্ছা ও তিরোহিত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ও শিক্ষার সুব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবে হইয়া পড়িবে। প্রয়োজন মত পুষ্করিণী খাত হইয়া স্থানীয় জমির উচ্চতা বাড়াইয়া বহু-বিধ ফসলের চাষের ও ক্রমশঃ সুব্যবস্থা হইতে থাকিবে। অধিবাসী লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারের ও সংখ্যা বাড়িবে, আর জনহীন প্রান্তর গুলির মধ্যে মধ্যে পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। আমরা যে অঞ্চলের উল্লেখ করিলাম, তথায় রেলপথ নির্ম্মাণে অধিক সংখ্যক বিস্তৃত সেতু নির্ম্মানের প্রয়োজন ও ঘটিবে না, কারণ উত্তর অঞ্চলের ভূভাগ স্বাভাবিক ভাবে উচ্চ হইয়া বহু ক্ষুদ্র নদী স্রোত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এবং দক্ষিণ অঞ্চলে সেতু নির্ম্মাণোপযোগী নদীর সংখ্যাও কম। ক্যানিং এর পরপারবর্ত্তী স্থান হইতে দক্ষিণে প্রায় ২৪।২৫ মাইল এবং পূর্ব্ব দিকে চড়াবিদ্যা পর্য্যন্ত ৪ মাইল গিয়া উত্তর দিকে ২০ মাইল পর্য্যন্ত এই পথ বিস্তৃত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা আর একটী ৩০ মাইল ভূখণ্ডের কথা বলিতে পারি। ইহাও সুন্দর বন অঞ্চলে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের চাম্পাহাটি ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রস্তাবিত পথটী দক্ষিণ দিকে ৩০।৩২ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, এবং এই পথের পশ্চিমাংশে ইতি মধ্যেই অনেক জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। এ পথটি অচির-কাল মধ্যেই সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব।

নূতন জনপদ, বাজার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট সহায়ক হয় বলিয়া, এবং সুদূর পল্লীর কৃষি-সম্পদের আদান প্রদান সুলভ, সুগম এবং সহজ হয় বলিয়া সকল সভ্য ও উন্নতিশীল দেশেই রেলপথের বিস্তার সাধিত হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে স্থানীয়

লোকের চেষ্টায় এ কার্য্য হয় নাই বলিলেই চলে। যে সকল রেলপথ আছে, তাহা বিদেশী বণিকগণ কর্ত্তৃক তাহাদেরই কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহাদের কার্য্যে ঐ পথগুলি যথেষ্ট সহায়তাও করিতেছে।

যে সকল অঞ্চলের উল্লেখ করা হইল, ঐ সকল স্থানে গরু, ছাগল ও ভেড়া প্রভৃতির "ফার্ম্মিং" বা 'পালন ও উৎপাদন' ব্যবসায় বেশ চলে। গোদুগ্ধ উপযুক্তরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নগরে নগরে চালান দেওয়া; ভেড়ার লোম সংগ্রহ পূর্ব্বক লোম বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানায় চালান দেওয়া প্রভৃতি লাভজনক ব্যবসায়। ক্ষীরের ব্যবসায় করিলে ও লাভমন্দ হইবে না। তারপর ইট্ ও টালীর ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্বারা সুলভে যাহাতে গৃহোপকরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায় এবং সহজে যাহাতে অনেকেই উহা ব্যবহার করিতে পারেন সে ব্যবস্থা করিলে খড়গুলি নগরের পশু খাদ্যের অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবে।

এই সকল বিষয়ে আমাদের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু মাত্র আলোচনাতেই কার্য্য হইবে না। দেশের লোকের সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের ইচ্ছা আছে জানিতে পারিলে আমরা ক্রমশঃ সকল বিষয়ই পাঠক বর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইব। চাই চেষ্টা ও উদ্যোগ; চাই জাগরণ ও সাড়া; চাই নিজেদের জীবন রক্ষায় নিজেদের শতমুখী যত্ন ও অধ্যবসায়।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সম-সাময়িক জগত।

জীবানুর-আবশ্যকীয়তা ঃ—আজ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ জীবানুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে কেবল ১০০ মাত্র মনুষ্যের অনিষ্ট কারী। অন্য গুলি সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ ভাবে মানবের উপকারই করিয়া থাকে। সকল প্রাণীকেই জীবন ধারণের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। আবার উদ্ভিদ বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য জমিতে অঙ্গারিক দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। অঙ্গারিক দ্রব্য প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সমূহের শরীরের পচণ-জনিত। যদি জীবাণু না থাকিত তাহা হইলে কোন উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদেহ জীবনাবসানে পচিত না, জমিতে সার হইত না, সার বিহনে উদ্ভিদ্ জন্মিত না এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব লোপ পাইলে অল্প দিনের মধ্যে প্রাণীমণ্ডলী ও অনাহারে মারা যাইত। সাক্ষাৎ ভাবে যে সমুদয় জীবাণু কাজে লাগে তন্মধ্যে শিকা, ল্যাকটিক এসিড, পনীর প্রভৃতি প্রস্তুতের বীজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেহে কতিপয় অনিষ্টকারী জীবাণু দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু সে গুলির একবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে তৎসঙ্গে অনেক উপকারী জীবানু ও মারিয়া ফেলিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের লালায় প্রাপ্ত দুই প্রকার জীবাণুর উল্লেখ করিতে পারা যায়। এই দুইটি ব্যতীত খাদ্য সম্পূর্ণ রূপে হজম করা অসম্ভব। এইরূপ আরও অনেক জীবাণুর দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। ফলতঃ যতক্ষণ শরীর সবল থাকে ততক্ষণ দুষ্ট জীবাণুতে কিছু করিতে পারে না।

আহার্য্যরূপে করাতের গুঁড়া ঃ—অনেকেই মনে করেন যে করাতের গুঁড়া অনাবশ্যকীয় বস্তু ও ইহা সামান্য ব্যবহারেই আসে। বর্ত্তমান জগতে কিন্তু কোন জিনিষই প্রায় অব্যবহার্য্য থাকিতেছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ সমূহে দুর্ভিক্ষের সময় করাতের গুঁড়া খাওয়াইয়া গরু বাছুর বাঁচাইয়া রাখার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে উইস কন্ সিন্ কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে অন্যান্য আহার সংযোগে করাতের গুঁড়া পশু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই নূতন প্রথায় করাত-গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত বায়ু দিয়া চাপ দেওয়া হয়। দুই বৎসর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে ইহাতে পশ্বাদি বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছে। খাদ্যে করাত গুঁড়ার পরিমাণ ¼ অংশ থাকিলে কোন গরুই খাইতে আপত্তি করে না। তাহার অধিক হইলে অবশ্য অভ্যাস হিসাবে কোন কোন গরু না খাইতে পারে। কোন গরুরই স্বাস্থ হানি হয় নাই, কিন্তু করাত গুঁড়া স্বল্প মাত্রায় কোষ্ঠ বদ্ধতা আনয়ন করে। দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপাদনের মাত্রা সমানই থাকে এবং অন্য খাদ্য

অপেক্ষা ইহাতে পশ্বাদির ওজন কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই পরীক্ষা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পশু খাদ্যে এক তৃতীয়াংশ মাত্রায় করাত গুঁড়া দিলে কোন অপকারই হয় না। পক্ষান্তরে ইহা ভূট্টা, যব অথবা গমের ভূষির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

সজ্জী বীজ—জীবাণু আক্রান্ত বীজ যে অঙ্কুরিত হয় না, তাহা অনেকেই জানেন। খারাপ বীজ ব্যবহারে যে কি অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা কৃষি-ব্যবসায়ী মাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বিলাতের Ronshein & Mooro নামক কোম্পানি জারমিসান নামে একটি ঔষধ বাজারে চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, যদ্বারা যে কোন বীজকেই বপন করিবার পূর্ব্বে জীবাণু-হীন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জার্ম্মণিতে ঔষধ সংক্রান্ত অনেক পরীক্ষা হইয়া স্থীরিকৃত হইয়াছে যে জারমিসান বীজ সতেজ করিবার উত্তম ঔষধ। তুঁতের জলের ন্যায় ইহার অঙ্কুরণ নষ্ট করিবার প্রবণতা নাই। গম, রাই শষ্য, যব, যই, ভূট্টা, সালগম প্রভৃতি ফসলের বীজ জারমিসান প্রয়োগ করিলে বীজ অঙ্কুরণের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, গাছও তেমনি সতেজ হয়।

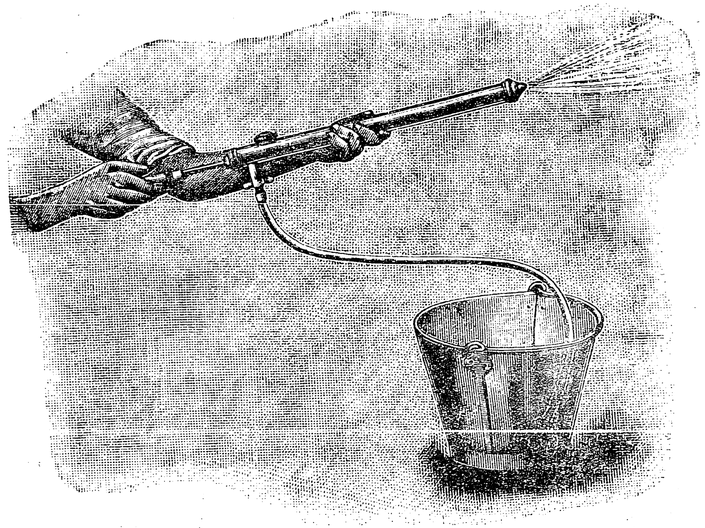

দেশের ও দশের কথা।

কার্পাস-গবেষণা বৃত্তি ঃ—ভারতীয় কেন্দ্র-কার্পাস-সমিতি তুলা-বিষয়ক গবেষণার জন্য ৬টি বৃত্তি দান করিতেছেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণ ইহার জন্য আবেদন করিতে পারেন। বোম্বাইয়ে নির্ব্বাচিত আবেদন-কারীগণকে স্বীয় খরচায় যাইতে হইবে। মাসিক ১৫০৲ হারে বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং প্রথম বৎসরের কার্য্য ভাল হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বৃত্তি চলিবে। বৃত্তিধারীগণকে কোন কার্পাস-বিশেষজ্ঞের অধিনে কার্য্য করিয়া গবেষণা প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। বৃত্তি-ধারীগণকে চাকুরী দেওয়ার কোন চুক্তি নাই; কিন্তু সমিতির বিশ্বাস যে এই শ্রেণীর কর্ম্মীর ভারতে বিশেষ অভাব আছে এবং সেই জন্য তাঁহারা উপযুক্ত ছাত্রগণের নাম তুলা উৎপাদন অথবা ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি অথবা কোম্পানির গোচর করিবেন। বৃত্তি গুলি কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নরূপে দেওয়া হইবে ঃ— উদ্ভিদবিদ্যা কার্পাস-প্রজনণ ৩টি; কীটতত্ত্ব, কার্পাসের কীট রোগ—২ অথবা ১টি; ছত্রকতত্ত্ব; তুলার ছত্রকরোগ ১ অথবা ২টি।

ম্যালেরিয়া-বীজ আবিষ্কারের ইতিহাস ঃ—যখন স্মরন করা যায় যে দেশের জন-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের ও উপর কৃষি-জীবি তখন ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে অন্যান্য শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা কৃষকের উপরই ম্যালেরিয়ার কৃপাদৃষ্টি অধিক। যে জীবাণু মশক শরীর হইতে মানব দেহে ম্যালেরিয়া আনয়ন করে তাহা সর্ব্ব প্রথমে স্যর রোনাও কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মানব-হিতার্থে যে সমুদয় ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রসের নাম অন্যতম। তাঁহার আবিষ্কৃয়ার ফলে কোন দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত করিয়া লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির জীবন রক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে। রস্ সাহেব এতদ্দেশে Indian Medical Service এ নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সিবিল সার্জ্জনের ন্যায় তাঁহার জীবন কেবল অর্থোপার্জ্জনে পর্য্যবসিত হয় নাই। বৎসরের বৎসর পর তিনি ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি-তত্ত্ব অনুশীলনে কাটাইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার ধারণা হয় যে মশকের সহিত ম্যালেরিয়ার কোন না কোন সম্পর্ক আছে। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নানা জাতীয় মশকের শত শত শরীর ব্যবচ্ছেদ করেন। কিন্তু কোনটিতে ম্যালেরিয়া বীজ পান নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া তিমি এই অনুসন্ধান কার্য্য পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছেন, এমন সময় একটি নূতন শ্রেণীর মশক তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে। ইহাদের অধিকাংশের ও শরীর

ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি বিফল-মনোরথ হন। কিন্তু শেষ কয়েকটি শব ব্যবচ্ছেদের সময় ঘন কৃষ্ণ ক্ষুদ্র দানাবৎ ম্যালেরিয়া জীবাণু ধরা পড়ে। এই শ্রেণীর মসকের নামই Anopheles এবং ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনের প্রথমাংশ ইহাদের শরীরেই অতিবাহিত হয়। চিকিৎসা বিদ্যার নব যুগ প্রবর্ত্তক এই মহান আবিষ্কৃয়া ১৮৯৭ সালে সমাধিত হয়। সেই সময় হইতে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া চিকিৎসা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং কত দেশে কত অগণ্য ব্যক্তির প্রাণ রস্ সাহেবের আবিষ্কৃয়ার ফলে রক্ষা পাইয়াছে। বিলাতে যাওয়ার পর রস্ সাহেব তাঁহার আবিষ্কারের জন্য নানা দেশের বৈজ্ঞানিক সভা সমিতি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দেশে জীবনের মুখ্যতম সময় নিয়োগ করিয়া তাঁহার আবিষ্কিয়া সাধিত হইয়াছিল সে দেশের গবর্ণমেণ্ট ভারতে থাকা কালীন তাঁহার জন্য কিছু করে নাই। সুখের বিষয় যে বিলাতে Ross Research Institute নামক ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ব্যাধি অনুসন্ধানগার রস্ সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবাসীগণ রস্ সাহেবের নিকট চিরকালই কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কলা, এরোরূট।

কয়েকটী ফসলের সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি; জানিনা, সাধারণ পাঠকমণ্ডলী উহা হইতে কোন কার্য্যকরী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন কি না! বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এদেশের উপযোগী এবং অত্যাবশ্যক দুইটি চাষের বিষয় বিবৃত করিব। কলা এবং এরোরূট, দুইই এক সঙ্গে একই জমিতে চাষ করা চলিতে পারে, এবং বঙ্গদেশের জমি ইহাদের চাষের খুব উপযুক্ত। শিক্ষিত বাঙ্গালী মনোযোগের সহিত এই দুইটী চাষ করিলে বিশেষ সফলতা লাভ করিবেন। কিন্তু পূর্ব্বে ও বলিয়াছি, এবং এখন ও বলি, চাষ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে সফলতার আশা কম। আমার মতে, এই দুইটী চাষে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফল এবং মূল হইতে খাদ্য প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা করেন, এবং উহাদের গুণাবলীর বহুল প্রচার দ্বারা দেশের জনসাধারণকে উহাদের সহিত বিশেষ পরিচিত করিয়া, বহুল ব্যবহারের পথ প্রস্তুত করেন।

কলা। কদলীফল কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই খাদ্য। কাঁচা কলা হইতে সুমিষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং উহা গমের ময়দা অপেক্ষা ২৫ গুণ অধিক পুষ্টিকর। বোম্বাই প্রদেশে কলার ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উহা কলিকাতার বাজারে ও বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশেই যে কলার ময়দা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়। এই ময়দা সুমিষ্ট এবং ইহা হইতে প্রস্তুত খাবারও বেশ সুস্বাদু। সুপুষ্ট কলা হইতেই ময়দা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকার কলা হইতেই ময়দা হইতে পারিবে, তবে কাঁচকলার ময়দা পরিমাণে কিছু বেশী পাওয়া যাইবে, কিন্তু ইহা অন্যান্য কলার ময়দার মত তত সুস্বাদু হইবে না। সুপুষ্ট কাঁচা কলার খোসা বাদ দিয়া শস্যাংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া যন্ত্র সাহায্যে চাপ দিলে রস বাহির হইয়া যাইবে। এই রসশূন্য খণ্ড গুলি শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া লইলেই ময়দা প্রস্তুত হইবে। এই ভাঙ্গার কার্য্যও রোলার যন্ত্র সাহায্যে করিতে হইবে, তবেই পর্য্যাপ্ত এবং উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইবে।

ময়দা করিবার পূর্ব্বে যে রস বাহির করিয়া লওয়া হইবে, উহা উৎকৃষ্ট কষ। উহা হইতে লিখিবার এবং জুতায় লাগাইবার কাল কালী প্রস্তুতের উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে।

কলা পাতার কাঁচা ডাটার মধ্য হইতে মোমের মত একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়; তাহা হইতে জ্বালিবার জন্য সুন্দর বাতি তৈয়ার হইতে পারে। শুষ্ক ডাটা

পোড়াইয়া "পটাস্" প্রস্তুত হইতে পারে। কলা গাছের খোলার যে আঁশ আছে, উহা হইতে দড়ি বা রসারসি, মোটা কাপড় বুনিবার মত সুতা এবং কাগজ প্রস্তুতের উপাদান পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুর-সরকারের চেষ্টায় কয়েক জাতীয় কলার গাছের আঁশ হইতে সুতা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র বয়ন কার্য্যও করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহা প্রায় রেশমী বস্ত্রের অনুরূপ। যন্ত্রের সাহায্যেই অবশ্য সুতা বাহির করা হইয়াছে, এবং তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

কলার মোচা এবং থোড় যে আমাদের খাদ্য তাহা বলিয়া জানাইবার আবশ্যক নাই। কাঁচা কলা, থোড় এবং মোচা সকলই উপাদেয় তরকারী।

পাকা কলার ব্যবসায় করিয়া হণ্ডুরাস ও মধ্য আমেরিকার কৃষকগণ প্রভূত ধনশালী হইয়াছেন। ইউরোপই পাকা কলার বড় খরিদ্দার, জাপান এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও কলার চাহিদা আছে। পাকা কলা হইতে 'সিরাপ্' এবং চাট্‌নী ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এরোরূট। ইহার পালো যে পুষ্টিকর খাদ্য তদ্বিষয়ে এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই বিশেষ জানে। শিশু এবং রোগীর জন্য লঘুপাক পথ্য হিসাবে সকল গৃহেই ইহার ব্যবহার আছে।

উৎপাদন:—এই দুইটী চাষের জন্যই বেলে দোয়াঁশ মাটির ক্ষেত্র উপযুক্ত। পটাস এবং ফস্ফরিক এসিড সার—উভয়ই প্রয়োজনীয়। এক একর জমিতে ৭০ পাউণ্ড হিসাবে উভয় সার প্রয়োগ করিলে দুইটী চাষেরই পক্ষে যথেষ্ট হইবে; তবে যে লাইনে কলা গাছের সারি বসিবে তাহাতে যে পরিমাণ সার দিবে তাহার অর্দ্ধেক এরোরূটের সারিতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমে নূতন মাটির দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে। নূতন পুকুর কাটা মাটিতেই কলা বাগিচা সুন্দর নির্ম্মিত হয়। কলার তেউড় এক লাইনে বা সারিতে ৪ হাত অন্তর এক একটি গাছ বসান যাইতে পারে। আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসই কলার তেউড় বসাইবার কাল। সারি গুলি চারি হইতে ছয় হাত অন্তর হইলে ভাল হয়। কলা গাছের মূল হইতে নূতন তেউড় বাহির হয়। কখন একটী ঝাড়ে মূল গাছটি বাদে ছোট বড় দুটীর বেশী গাছ রাখিবে না; বেশী তেউড় জন্মিলে তুলিয়া অন্যত্র বসাইয়া দিবে।

এরোরূটের সারি যথাস্থল থাকিবে। প্রত্যেক ঝাড় অন্ততঃ দুই হাত বা তিন হাত অন্তর থাকিবে। গাছের গোড়ার মাটি যেন বেশ আল্‌গা থাকে, কোনও ক্রমে যেন চাপে বসিয়া না যায়। এরোরূটের চাষ হলুদ চাষেরই মত। ইচ্ছা করিলে কলা বাগিচায় এরোরূটের পরিবর্ত্তে হলুদেরও চাষ করা চলে।

কলা বাগিচার কিনারায় বাতাস আটকাইবার মত বড় গাছের বেড়া দিতে পারিলে ভাল হয়। নতুবা জোর বাতাস বহিলে কলাগাছের অনিষ্ট হইতে পারে। শুষ্ক

কলাপাতার ভস্ম সারই কলাগাছের উৎকৃষ্ট সার। তা' ছাড়া কোমরের পোণ পোড়াইবার জন্যও তাহারা শুক্‌না কলা পাতা সংগ্রহ করে।

এক একর বা কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা জমিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গাছ বসাইলে অন্ততঃপক্ষে ১৫০০ ঝাড় কলাগাছ থাকিবে। যদি বৎসরে ১০০০ কাঁদি কলা ধরা যায়, এবং প্রত্যেক কাঁদিতে গড়ে ৪০টি করিয়া কলা ধরা যায়, তবে এক বৎসরে ৪০০০০ কলা পাওয়া যাইবে। ইহার অর্দ্ধেক কলা ময়দার জন্য ব্যবহার করিলে, ২০০০০ কলায় অনুমান ২০ মণ শুষ্ক ময়দা প্রস্তুতের শস্য, অতন্তঃ অর্দ্ধেক বা ১০ মণ ময়দা পাওয়া যাইবে। ২০০০০ হাজারে পাকা কলা এবং ১০ মণ ময়দা চাষের খরচা প্রভৃতি বাদ দিয়া সম্পূর্ণই মুনফা বা লাভ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এরোরুট বা হলুদের ফসলের ওইরূপে মুনফা ধরিয়া দেখা যায় এক একরে খরচা বাদে বৎসর ৫০০৲ টাকা লাভ দাঁড়ায়। আমরা বিস্তৃত হিসাব দিলাম না; ব্যবহারিক জ্ঞানে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভের সংবাদও পাইয়াছি। সুতরাং উদ্যোগীগণের জন্য আমরা শুধু একটা এষ্টিমেট্ মাত্র দিলাম। প্রকৃতপক্ষে প্রচার কার্য্য ও বাজার নির্দ্ধারণে একটু মনোযোগী হইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে, অনেক সময়ে লাভের পরিমাণ দ্বিগুণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে। তা' ছাড়া চাষের খরচা প্রথম বৎসর অপেক্ষা পর পর বৎসরে ক্রমশঃই অনেক কম হইবে। তখন লাভের হার আরও বেশী হইবে সন্দেহ নাই।

শিক্ষিত দেশবাসী যদি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ নিজ অভিজ্ঞতার এই লাভের পথকে আরও প্রসারিত করিতে পারিবেন, এবং বুঝিবেন ২৫।৩০ টাকা মাসিক বেতনের কেরাণীগিরিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক গুণে সুখের। ইহাতে বেলা ৯ টার পূর্ব্বে, যখন পর্য্যন্ত ভাল ক্ষুধা হয় না, অর্দ্ধাসন লইয়া আট ঘণ্টা অবিরত পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইতে হয় না। ইহাতে ক্ষুধার সময় মত আহার লইয়া বিশ্রামের সহিত সমস্ত দিনে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ও শরীর ক্লান্ত হয় না, এবং স্বাস্থ্যের ও উন্নতি হয়। অপর দিকে কেরাণীর ৩০৲ আয়ের ২৫৲ টাকা ভাল জামা কাপড় ও জুতা প্রভৃতি বিলাস দ্রব্যে, অর্দ্ধাসন সংগ্রহে এবং প্রাত্যহিক যাতায়াত খরচায় ব্যয় হইয়া বৎসরে গড়ে ৬০৲ টি মাত্র টাকা লাভ, এবং অর্দ্ধাসনে অবিরত পরিশ্রমের ফলে একটী শীর্ণ ও রুগ্ন দেহ লাভ। সে দেহ রৌদ্র, শীত এবং বর্ষা সহ্য করিতে অক্ষম, এবং সামান্য কারণেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু কৃষি-নিরত স্বাধীন জীবি জনের শরীর সবল, রৌদ্র-শীত-বর্ষা-সহিষ্ণু এবং স্বাস্থ্য-সুখে সে সদাই প্রফুল্ল। তাহার বিলাসিতার প্রয়োজন হয় না, সে সারাদিন ভীত-ত্রস্ত ভাবে বিরক্তির সহিত কাজ না করিয়া, প্রফুল্ল মনে মুখে গান ও হাতে কাজ লইয়া মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস ও সরল এবং পরিশ্রমী দেশ বাসীর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করে।

জাত্যভিমান অনেক সময়ে বাবু ভাইদের কথিত জীবিকা গ্রহণে বাধা থাকে! কিন্তু আপিস বা কারখানার সকল জাতি একসঙ্গে মিলিয়া একই কাজ করিতে কোন ও দ্বিধা বোধ হয় না। তবে বাধাটা এক্ষেত্রে আসে কেন? সংস্কারের ফল। অভ্যাসের দ্বারা আপিস ও কারখানার মধ্যবর্ত্তী বাধা যখন ঘুচিয়াছে তখন এ বাধা ও ঘুচিবে। চাই চেষ্টা এবং উদ্যম। অবশ্য কলম ছাড়িয়া, সার্ট-কোট-জুতা খুলিয়া একেবারেই আমরা এক কোমর জলে নামিয়া হল চালনা এবং ধান্য রোপনের উপদেশ দিই না; প্রথমে উচ্চ জমিতে কলা বাগিচা, এরোরুটে, হলুদ ও আদার বাগিচা, কড়াই চাষ, তুলার চাষ, আলু পটলের চাষ এবং প্রয়োজন মত চাহিদার বাজারে উহাদের কাটতি করা, অথবা উহা হইতে সম্ভব মত খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার এবং প্রচার ও বিক্রয়ের দ্বারা ক্রমশঃ সকল চাষের জন্য নিজেদিগকে প্রস্তুত ও অভিজ্ঞ করা আবশ্যক। ইহাতে দেশের নিরক্ষর কৃষক কুল ও সঙ্গে সঙ্গে কালোপযোগী ব্যবহারিক স্থানে শিক্ষিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রমশঃই পল্লীরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠকবর্গ মল্লিখিত মান্দ্রাজের "Swarajya" পত্রিকায় প্রকাশিত Arrowroot" ও বোম্বাইর "Indian Industries & Power" পত্রিকায় প্রকাশিত Commrcial Possibilities of Indian Plantains" প্রবন্ধ পাঠ করিলে আরোরুট ও কদলী জাত খাদ্যাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে কতক খবর পাইতে পারেন। কৃঃসঃ]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জল, হাওয়া, ফসল।

বিভিন্ন দেশের ধান্য ফসল ঃ—(১) আনাম—এবার ২০,০৯,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা জমির পরিমাণ শতকরা ৬ গুণ অধিক। (২) ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জ—ফসল প্রায় শতকরা ১গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান বৎসরে ১৮,৭৩,০০০ টণ দাঁড়াইয়াছে। (৩) সিংহলেও শতকরা ৮গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুমান, ২,৫০,০০০ টণ ধান্য এ বৎসর উৎপাদিত হইবে। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে ৮৮৩০০০ একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছে।উৎপাদন—আন্দাজ ৬৬১০০০ টণ হইবে। (৫) জাপানে শতকরা ৪ ভাগ ধানের জমি কমিয়া গিয়াছে। এ বৎসর প্রায় ৮১,৫৪,০০০ টণ ধান হইবে। (৬) কোরিয়া—এখানেও জমি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান বৎসর ৩৫,৮২,০০০ একর দাঁড়াইয়াছে।

তিল ঃ—গত বৎসর সমস্ত ভারতে তিলের জমির পরিমাণ ৩৪,৩২,০০০ একর ছিল। এবার সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে ৩০,১৬,০০০ একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে।

চিনার বাদাম ঃ—এই ফসলের জমিও শতকরা ৯ ভাগ কমিয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এবার জমির পরিমাণ ১৬, ৮৭,০০০ একর।

ইক্ষু ঃ—আখের জমি শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবার ২৭,৮৭,০০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। শর্করা অধিক মাত্রায় উৎপাদিত হইলে দেশের মঙ্গল।

কিউবা ইক্ষু চাষের অন্যতম কেন্দ্র। পৃথিবীতে এত অধিক মাত্রায় শর্করা আর কুত্রাপি উৎপাদিত হয় না।—এবার কিন্তু কিউবায় উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৪০ লক্ষ টণের স্থানে এবার ৩৬ লক্ষ টণ শর্করা হইবে বলিয়া আন্দাজ করা যায়। অন্যান্য ইক্ষু চাষের কেন্দ্রের উৎপাদন নিম্নরূপ ঃ—

হাওয়াই	৪৬০,০০০	টণ
ফিলিপাইনস্	৩০০,০০০	"
লুইসিয়ানা	২১৯০০০	"
পোর্টো রিকো	৩৩৮০০০	"
ব্রেজিল	৬২৮০০০	"
আর্জ্জেণ্টাইন	৩১৪০০০	"
যবদ্বীপ	১৭,৫০০০০	"
ফর্ম্মোজা	৩৪৯০০০	"
মরিচ দ্বীপ	১৯৫০০০	"

সার-সংগ্রহ।

দুধের তৈয়ারী জিনিষ। দুধের জিনিষ বলিতে আমরা দৈ, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু সম্প্রতি মাখন তোলা দুধ হইতে এক প্রকার উপাদান বাহির করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রস্তুত জিনিষ হাতীর দাঁত, মহিষের সিং প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারী জিনিষের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছে। ইহা আগুনে দাহ্য নয়, সম্পূর্ণরূপে গন্ধহীন এবং চমৎকার পালিশ করা যায়, আবার কাচের মত non-conducter বলিয়া বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জামে ইহার ব্যবহার চলে। এই উপাদানে এমন সব জিনিষ তৈয়ার হইতে পারে যাহা দেখিতে অনেক বহুমূল্য পাথরের অনুরূপ। সুদৃশ্য অলঙ্কার, চিরুণী, ব্রুস্, বোতাম, সিগারেট্ কেস্, পেন্সিল, কলম, অর্গান বা পিয়ানোর চাবী, দরজার হাতল, প্রভৃতি বহুপ্রকার জিনিষ দুধ হইতে প্রস্তুত হইতে পারে।—প্রাচী।

সারু। ইহা এক প্রকার কচু। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নার নিকটবর্ত্তী প্রবন্ধপুর, রসিকপুর, হরিদাসপুর প্রভৃতি স্থানের ইহা একটী বিখ্যাত জিনিষ। **উপযুক্ত** ভূমি—গ্রীষ্মকালে যে সব পচা পুকুর, খানা, ডোবা, বিল, ইত্যাদিতে অল্প জল থাকে বা শুষ্ক হইয়া যায়—সেইগুলিই ইহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। স্বচ্ছ জলাশয় অপেক্ষা পঙ্কিল জলাশয়েই ইহা সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্য সারই ইহার খাদ্য। রোপণ প্রণালী—মাঘ মাসের শেষে পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ে অল্প জল থাকিতে থাকিতে ছেঁচিয়া শুষ্ক করতঃ ৫।৬ দিন উহাতে রৌদ্র লাগাইতে হইবে। পরে সারের ছোট ছোট চারা আনিয়া এক হাত অন্তর এক একটী পুঁতিয়া দিতে হইবে। ৮।১০ দিন পরে জলাভাব হইলে অল্প পরিমাণে জল ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপে গাছ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জল দিতে হইবে। গাছগুলি একটু বাড়িয়া উঠিলে গোড়ার ডাঁটা ২।১টী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তাহার পর বর্ষা আসিয়া পড়িবে। তখন আর জল দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। বৃষ্টির জলেই গাছ বাড়িতে থাকিবে। ৩।৩½ বা ৪ হাত জল হইলে আর উহা পুকুরে রাখা যাইবে না। তখন ইহা ব্যবহারোপযোগী হইবে। উহার মূলদেশে ছোট ছোট যে চারা জন্মিবে তাহাই পুকুরের ধারে অল্প জলে চারাইয়া রাখিতে হইবে। উহা হইতে পরবৎসর চাষ হইবে। পাতা ও ডাঁটা বাদ দিলেও এক একটী সার /৫।৵৬ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গোল আলুর চাষ বিস্তার হইবার পূর্ব্বে ইহা লোকের প্রধান তরকারী রূপে গণ্য হইত। সর্ব্বত্রই ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। লোকের কৃষি-প্রীতি অন্তর্হিত হওয়ায় এই সব জিনিষের ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। নচেৎ

ইহার অনেক উন্নতি হইত। এক একটী ছোট পুকুর হইতে খরচ খরচা বাদে উক্ত স্থানের কৃষকেরা প্রায় ৩০।৪০৲ টাকা পাইয়া থাকে। স্থানীয় বাজারে টাকায় ২।৩টীর অধিক সার পাওয়া যায় না। কলিকাতা বা অন্য সহরে পাঠাইলে কৃষকের আয়ের মাত্রা অধিক হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীরামজীবন গুছাইত।—মাহিষ্য সমাজ।

বাঁশের বীজ। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন—কোন কোন বাঁশের প্রচুর পরিমাণে বীজ হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, মালাবার প্রদেশে এক জাতীয় বাঁশের ঠিক ধানের মত প্রচুর পরিমাণে এক রকমের বীজ হয়। সেখানের মপ্‌লারা (Moplahs) সেগুলিকে এখন খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। এসম্বন্ধে এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—

ভারতের দক্ষিণাংশে বন্য প্রদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই বাঁশের এক রকম বীজ দেখা যায়, নীলগিরি পর্ব্বতের টোডারা, কয়েমবেটোর ও মহীশূরের সলিগারা (Sholigra) এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরা এই জাতীয় বাঁশের বীজ তাহাদের দৈনিক খাদ্যরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। মহীশূরের কোন কোন অঞ্চলে এই বীজ প্রধান খাদ্য রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে।—কায়েম্‌বেটোর অঞ্চলের কোলেগাল নামক বন্য প্রদেশের সালিগার জাতিরা বাঁশের বীজের চূর্ণ মধুর সঙ্গে মিশাইয়া মাখানো ময়দার মত এক প্রকার সুমিষ্ট জিনিষ তৈয়ারী করে, সেগুলোকে তারা লম্বা বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে ভরিয়া রাখে, বর্ষার দিনে সেগুলি খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা দুর্ভিক্ষের সময় প্রচুর পরিমাণে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখে; নিম্নভূমিতে যখনই খাদ্যের অভাব ঘটিলে, বাঁশের বীজ পাঠাইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের যথেষ্ট সাহায্য করা হইয়া থাকে। আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলেও বাঁশের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলি দেখিতে ঠিক ধানেরই মত, তবে কিছু বড় আর মোটা। মহাজন-বন্ধু।

বাগ-বাগিচা বাঙ্গালা দেশে ফল-ফুলের বাগ-বাগিচার প্রথা নাই বলিলেই চলে। একমাত্র মালদহ জেলায় কেবল আমের বাগান করার প্রথা আছে এবং সেখানকার অধিবাসিগণ ব্যবসায় নীতির ভিতর দিয়া বাগান করা এবং তাহা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের উপায় অবগত আছেন, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে আর কোনরূপ লাভজনক বাগান করার প্রথা নাই। কলিকাতায়, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মাদ্রাজ হইতে প্রত্যেক বৎসর বহু লক্ষ টাকার আম আমদানী হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট লেংড়া ও বোম্বাইয়া আম বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইতে পারে। উত্তর-বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য-বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় মালদহের এবং লেংড়া ও বোম্বাইয়া আম উৎপন্ন হইতে পারে। যাহারা এ সকল আমের বাগান করিয়াছে, তাহাদের বাগানে ভাল ফল ফলিতেছে দেখা যায়। এইরূপ

পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রত্যেক বৎসর হাজার হাজার টাকার কুল ও পেয়ারা আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে কাশী ও এলাহাবাদের পেয়ারা এবং কাশী ও পশ্চিমা নারকেলি কুল অতি উৎকৃষ্ট জন্মিতে পারে। কলিকাতার আশে-পাশে যে সকল, কুলের বাগান আছে, তাহাতে বেশ ভাল ও সুমিষ্ট ফলই হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম ত্রিপুরার পাহাড়ে ও পতিত স্থানে প্রচুর পরিমাণে পেয়ারার বাগান হইতে পারে এবং ঐ সকল স্থানে যে উৎকৃষ্ট পেয়ারা উৎপন্ন হইবে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ চট্টগ্রাম পাহাড়ে ইউরোপীয়ানরা যে সকল বাগ-বাগিচা করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎভাবে তাহার ফলভোগ করিতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের যুবকগণ, চেষ্টা করিলে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং আসাম প্রদেশের সমতল ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র এবং উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুর জেলায় সামান্য খাজানায় যথেষ্ট খিলা বা পতিত জমি বন্দোবস্ত পাইতে পারেন। বিঘা।০ আনা খাজানায় জমি অবাধে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। এই পতিত জমীগুলিকে বাগানের ও চাষের উপযোগী করিয়া বাগ-বাগিচার কাজ আরম্ভ করিলে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। পেঁপের ও কলার বাগানও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে—যাহার ফল এক বৎসরের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। স্থায়ী বাগানের মধ্যে তরি-তরকারি ও শাক-সব্জির কৃষি সহজেই চলিবে, এবং কয়েক মাস মধ্যেই তাহার ফল ভোগ করা যায়। আমাদের দেশের কৃষকগণ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কেবল ধান, পাট ও কিঞ্চিৎ মশুর, কলাই ও বুট ইত্যাদির কৃষি ব্যতীত আর বড় একটা কিছুই জানে না বা করে না। আমাদের শিক্ষিত যুবকদল পতিত জমি ও পাহাড়-জঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া বাগ-বাগিচার কাজ আরম্ভ করিলে এবং আতা বা শরিফার বাগান করিলে এবং জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও শিলং প্রভৃতি শীত-প্রধান জেলায় নাশপাতি ও ছেব বা আপেলের বাগান করিলে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। শিলংএ আমরা ছেবের ও আপেলের গাছে যথেষ্ট ফল ফলিতে দেখিয়াছি। আনারসের বাগান সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। দেশে টাকার অভাব নাই; কেবল কুড়াইয়া লইবার লোকের অভাব। কোন যুবকের মতিগতি এ সকল ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না।

ছোলতান

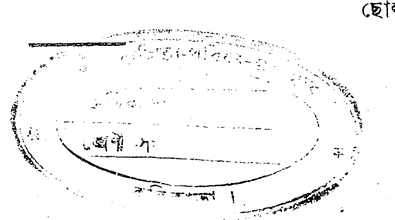

কষ-উৎপাদক উদ্ভিদ্।

ইতিপূর্ব্বে আমরা "ভারতীয় রঞ্জক পদার্থ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহা অনেকে আগ্রহে পাঠ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতিপয় কষ-উৎপাদক বৃক্ষের উল্লেখ করা হইতেছে। এই সমুদয় বৃক্ষ অনেকের গৃহপ্রান্তে, চাষের জমিতে অথবা গ্রামে স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। উপযুক্ত চেষ্টায় এই সমুদয় উদ্ভিদ্ উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। চামড়া কষের জন্য যে সমুদয় উদ্ভিজ্য-পদার্থ আবশ্যক হয় তাহাদের সংখ্যা অথবা পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। ভারত হইতে একবৎসরে যে পরিমাণ কষের ছাল, ফল প্রভৃতি বিদেশে রপ্তাণি হয় তাহার হিসাব দেখিলে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত হিসাব ১৯২২—২৩ সালের।—

আমদানি	টাকা
কষের ছাল	১,৪৮,৯১৩
খদির	৯,৩৩,২৬১
হরিতকী, কষায় (সার)	৬৫৫
জাফ্রাণ	১২,২৩,০৬০
রপ্তানি	
কষের ছাল	১৫,৯৮৯
খদির	৭,৬২,২৩৬
নীল	১৬,৯৪, ৪৩৮
হরিতকী	৭৪,৮০,৫১২
ঐ (কষায় সার)	৯ ৮৪,১৩৪
হলুদ	২,৭১,০৭৪
আমদানি ও রপ্তাণির মোট	১৩,৫, ১৪, ২৭২

উক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে কষের ছাল প্রভৃতির ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষেতের পার্শে অথবা বাগানে কিম্বা গৃহ প্রাঙ্গণে কষ-উৎপাদক বৃক্ষ রোপণ করিয়া বিশেষ লাভ আছে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গাছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

সোঁদাল (Cassia fistula); উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইহাকে আমলতাস বলে। যখন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সোঁদালের দীর্ঘ, পীতাভ পুষ্পগুচ্ছ বহির্গত হয় তখন গাছ অতীব

সুদৃশ্য হয়। সোঁদালের লম্বা লম্বা কাঠির ন্যায় ফল অনেকেই দেখিয়াছেন। ভারত ও ব্রহ্মের সমস্ত নিম্নপ্রদেশে ও হিমালয়ের পাদদেশে ৩০০০ ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত সোঁদাল দেখিতে পাওয়া যায়। সোঁদালের সাঁষ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা রেচক। তামাকের মশলারূপেও বাংলায় ইহার ব্যবহার আছে।

সোঁদালের গাছ খুব বড় হয় না। ২০ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট বেড়ের গুঁড়ি সব গাছ হইতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার কাঠ খুব শক্ত। বর্ণ প্রায় ইটের ন্যায় অথবা গাঢ়তর। খুঁটি, বিম, গাড়ীর চাকা, ধান কুটিবার থল, নৌকা গঠন, হালের কাঠ হিসাবে সোঁদাল কাঠ ভারতের নানা স্থলে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জ্বালানি কাঠ কয়লাও পাওয়া যায়।

চামড়া কষের জন্য সোঁদাল ছাল মূল্যবান্ উপাদান। কলিকাতায় চলিত ভাষায় ইহাকে সুঁদাল ছাল বলে। দক্ষিণ ভারতে ও যুক্ত প্রদেশেও ইহার যথেষ্ট চলন আছে। সাধারণতঃ জঙ্গলের সোঁদাল গাছ জমা দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে বনবিভাগের কম লাভ হয় না।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে সোঁদাল ছালের চামড়া কষের জন্য ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে কষায় পদার্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

চামড়া গুঁড়া দ্বারা শোষণীয় কষায় পদার্থ	শতকরা ১৮.৩৬
দ্রবণীয় অ = কষায় পদার্থ	„ ১৮.৩১
অদ্রবণীয় পদার্থ	„ ৩৬.৩৩
মোট	১০০,০০

মিশ্রিত কষায় পদার্থে সোঁদাল ছাল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিখ্যাত তারওয়ার ছালের সহিত সংমিশ্রণে ইহা উৎকৃষ্ট কষ উৎপাদন করে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়, যখন বিপুল পরিমাণে চামড়া আবশ্যক হইয়াছিল, তখন সোঁদাল ছাল প্রচুর মাত্রায় ব্যবহৃত হইত।

গরাণ ছাল :—গরাণ নামে যে ছাল সাধারণতঃ কলিকাতায় আমদানি হয় ও যাহা প্রচুর পরিমাণে চামড়া রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা এক গাছের ছাল নয়। ৫।৬ জাতীয় বৃক্ষের ছাল; ৫।৬ জাতীয় বৃক্ষের ছাল তাহাতে মিশ্রিত থাকে, কিন্তু তিনটি গাছের ছালই প্রকৃত পক্ষে উপকারী।—ভোরা (Rhizophora Mucronata); ইহাকে বড় গরাণও বলে। ইহা ছোট গাছ এবং ভারত, ব্রহ্ম ও আণ্ডামান দ্বীপের উপকূল অংশে জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে এই ছালের যথেষ্ট কারবার আছে। কষ ও রং ব্যতীত ভোরার ফল আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয় ও ইহার রস হইতে

এক প্রকার আসব প্রস্তুত হয়। বায়ব্যমূলে লবণের অংশও নিতান্ত কম নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রেঙ্গুনে তদানীন্তন বন বিভাগের রসায়ণ-তত্ত্ববিৎ সর্দ্দার পুরণ সিংহের তত্ত্বাবধারণে গরাণ ছাল হইতে কষায় সার প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই কারখানায় উৎপাদিত সার কষ হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ব্যবসা হিসাবে বিশেষ লাভ হয় নাই। Rhizophora conjugata ভোরায় আর একটি জাতি। ইহাতে কষায় পদার্থ কিছু কম হইলেও ব্যবসারে ইহার চলণ আছে। Kandelia Rheedli ছালও গরাণ ছাল নামে বিক্রয় হয়। ইহার গাছ ২০ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। সুন্দরবনের সমস্ত বড় বড় নদীর ধারে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়।

উক্ত তিনটি গাছের ছালে নিম্নলিখিত পরিমাণে কষ পাওয়া যায় :—

	শোচনীয় কষ	দ্রবনীয় অ-কষ	অদ্রবনীয় পদার্থ
Rhizophora mucronata	২৬.০৪	১২.২৩	১১.৭০
R. Conjugata	৭.৩০	৬.১৮	৮.২৮
Kandelia Rheedii	৬৬.৬৬	৮১.৫৯	৮০.০২
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

Rhyzophera mucronata র ছালে ও কষায় সারে অধিক পরিমাণে কষ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ছাল তুলিবার সময় ভেদে কষের তফাৎ হয়। এতদ্ভিন্ন ছাল তুলিবার পর যত শীঘ্র শুষ্ক করা যায় ততই অধিক মাত্রায় কষায় পদার্থ পাওয়া যায়। গরাণ ছাল ভাল করিয়া সংগ্রহ করিলে এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় উহার কষায়-সার প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হওয়া সম্ভব।

কাশ্মীরের স্বভাবজ সম্পদ

অতি পুরাকাল হইতেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি বিশ্ব-বিখ্যাত। দেশীয় ও বিদেশীয় কতই কবি, ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকের লেখনীতে হিমালয়-ক্রোড়স্থিত এই ক্ষুদ্র উপত্যকার মাধুরী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর শুধুই রূপ, গন্ধ ও বর্ণের অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র নহে, ইহার জলে ও স্থলে যে অগাধ সম্পদ লুক্কায়িত রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুগোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তৎসমুদয় ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা সকল লেখক সম্যকরূপে বিবেচনা করেন নাই। আমরা সেইজন্য কাশ্মীর সম্বন্ধীয় অন্যূন পঞ্চাশখানি আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে কেবল দুই-চারিখানিতেই কাশ্মীরের খনিজ, উদ্ভিজ্জ প্রাণীজ পদার্থ সমূহের উল্লেখ দেখিতে পাই। আবার এবম্বিধ পুস্তক সমূহের মধ্যে লরেন্স সাহেব "ভ্যালি অব্ কাশ্মীর" নামক গ্রন্থই এখনও প্রামাণ্য হইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরের কৃষি ও শিল্পজাত অথবা স্বভাবজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সাধারণের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি এতটা কম হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশ্মীর বড় সহজগম্য স্থান ছিল না। পূরাকালে কাশ্মীর যাইবার ৫।৬টি রাস্তা ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু ঐ সমুদয় কখনই ব্যবসায়ের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী ছিল না। বহুমূল্য পশমী ও রেশমী বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা কাঠের কাজ—যে সমুদয় দ্রব্য সমধিক ব্যয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দূর দেশেই লইয়া গিয়া বিক্রয়ে লাভ থাকে—সেই প্রকার দ্রব্যই সচারাচর বিদেশে বিক্রয়ের জন্য যাইত। অপরাপর অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া বণিকগণের তেমন লাভ হইত না বলিয়া ঐ সমুদয় বহির্ব্বাণিজ্যে স্থান পাইত না।

বস্তুতঃ ১৮৯০ সাল হইতেই কাশ্মীরের সহিত বহির্জগতের অবাধ সংযোগ স্থাপিত হয়। এই বৎসরেই প্রথমে রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত শকট-পথ খোলা হয়; এই পথের কোহালা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত অংশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতেও বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ আবটাবাদ হইতে বরাহমূলা পর্য্যন্ত একটি অন্তরীক্ষ-রেলপথ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। উহা রাজধানী শ্রীনগরের সহিত বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী দ্বারা সংযোজিত হইবে। এই পথ প্রস্তুত করিবার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। আপাততঃ রাওলপিণ্ডির পথে বরাহমূলার দূরত্ব প্রায় ১৫০ মাইল। ডাক টোঙ্গা যাইতে প্রায় তিন দিন এবং কেরাচি অথবা মালগাড়ী যাইতে

অন্যূন ১৫ দিন লাগে। সেই স্থলে আকাশ-রেল-পথের দূরত্ব প্রায় ৭৫ মাইল, ভ্রমণের সময় প্রায় ১৫ ঘণ্টা লাগিবে। যাত্রীগণের ইহাতে বিশেষ সুবিধা না হইলেও ব্যবসায়ী গণের যথেষ্ট উপকার হইবে।

কাশ্মীর-গমনের বর্ত্তমান পথের অবস্থা এইরূপ। এক্ষণে প্রকৃত দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে কাশ্মীর—কাশ্মীর ও জম্মুর মহারাজার রাজ্যের এক অংশ মাত্র। সম্পূর্ণ রাজ্য জম্মু, কাশ্মীর, গিলগিট্, লাডক, ভাণ্ডারা জায়গীর, পুঞ্চ এবং সীমান্ত প্রদেশস্থ এপাথা লইয়া গঠিত। ইহাদের মোট আয়তন ৮৪, ৪৩২ বর্গ লাইল। তাহার মধ্যে প্রকৃত কাশ্মীর প্রায় ৭০০০ বর্গ মাইল। কাশ্মীরকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—উত্তর কাশ্মীর অথবা কামরাজ, দক্ষিণ কাশ্মীর এবং মজঃফরাবাদ। অনেক কাশ্মীর-পর্য্যটকই অবগত আছেন যে, উক্ত দেশের অধিকাংশ স্থানই গিরি-সঙ্কুল ও বন্ধুর। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গসমূহ মনুষ্যাবাস-বিরল এবং তদ্রূপ স্থান চাস-আবাদের পক্ষেও অপ্রশস্ত। বস্তুতঃ কাশ্মীরের যে অংশটুকুতে ঝিলম অথবা তাহার শাখানদীসমূহ প্রবাহিত, সেই অংশই কাশ্মীরের লোকালয় এবং তাহাকেই কাশ্মীর-উপত্যকা বলা হয়। এই স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ মাইল এবং প্রস্থে ২৫ মাইল। আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল।

ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের ন্যায় কাশ্মীরও কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। উহলো কৃষকের অত্যাবশকীয় উদ্ভিদ। ইহা হইতে পশুখাদ্য গৃহ নির্ম্মাণ উপকরণও দুই চারি প্রকার গৃহ-সজ্জার দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। কিন্তু জাপানে এইরূপ বৃক্ষ হইতে উৎপাদিত নানাবিধ ব্যবহার্য্য সাজ, সজ্জা, পেটরা, ঝুড়ি, মাদুর, খেলনা, প্রভৃতির বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কাশ্মীরে বেত ও সমধর্ম্মবিশিষ্ট অন্যান্য, উদ্ভিদের সাহায্যে একটি বড় সাজ-সজ্জার কারখানা খোলা যাইতে পারে, এবং তাহাতে লোকসান হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

কাশ্মীর রাজ্যের বন-বিভাগ দুই-একটী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তন্মধ্যে তার্পিন উৎপাদন অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে, কাশ্মীরে পাইন (চির) ও ফায়েল-অধিকৃত স্থানের আয়তন, ১০০০ বর্গ মাইলের কম হইবে না। সুতরাং তার্পিন প্রস্তুতের উপাদানের অভাব নাই। প্রতিবন্ধক কেবল গন্ধবিরোজা সংগ্রহের অসুবিধা এবং উৎপন্ন তার্পিন ও রজন সমতল দেশে চালান দেওয়ার ব্যয়-বাহুল্য। রামপুর ও মোহরার নিকটবর্ত্তী স্থানে কারখানা খোলা হইলে বৈদ্যুতিক শক্তি সহজে পাওয়া যাইতে পারে।

ক্রমশঃ

বাগানের মাসিক কার্য্য

অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতী সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া ষ্ট্যাটারিসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগানে—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ার নূতন মাটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবরসার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি ক্ষেত্রে—মুগ, মুসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশু খাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া

দওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়, ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টি গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যকমত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোঁড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার—সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটের মাটির দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভূষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভূষা যথেষ্ট, ভূষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছের ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

২৪ খণ্ড } কৃষক—অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল। { ৮ম সংখ্যা

লেবু।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার লেবু দৃষ্ট হয়;—কাগজী, পাতী, গোঁড়া, সরবতী, ও বাতাবী। ইহার মধ্যে বাতাবী খুব বড় ফল, বাকীগুলি ক্ষুদ্র জাতীয়। তবে সরবতী জাতীয় লেবু গুলি অপেক্ষাকৃত বড় বটে। খাদ্য হিসাবে লেবুর উপকারিতা যথেষ্ট। ইহাতে পুষ্টিকারক ও রোগনিবারক 'ভাইটামিন' থাকাতে, ইহা মানুষের একটী প্রয়োজনীয় খাদ্য রূপে গণ্য। এই হিসাবে কাগজী অথবা পাতী লেবু হইতে গোঁড়া লেবুর বিশেষত্ব অধিক। আমরা শাকাদি হইতে যে খাদ্যাংশ গ্রহণ করি, শাকাদির অভাবে লেবুর রস হইতে সে অভাব পূর্ণ করিতে পারি। কমলালেবু শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশের ফল। ইহার রস মিষ্ট অথবা অম্ল-মধুর। এ দেশে আসামের খাসিয়া পাহাড়ে, হিমালয়ে এবং মধ্য ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলেই ইহারা জন্মিয়া থাকে।

আমেরিকা দেশের অনেক স্থলে লেবুর রস স্নানের জলে মিশাইয়া স্নান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ ব্যবহারের কারণ; ইহা ব্যবহারে সহজে শরীরের ময়লা নাশ ও লাবণ্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। লেবুর রসে যকৃতের ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে, এজন্য অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পিত্তাধিক্য প্রভৃতি রোগে গরমজল, মিছরীর গুঁড়া বা

চিনির সহিত লেবুর রস পান আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে। এ ছাড়া আচার হিসাবে এবং চুক্ বা লেবুর আরক রূপে আমরা যথেষ্ট লেবু ব্যবহার করিয়া থাকি।

লেবুর বাতঘ্ন এবং জ্বরঘ্ন গুণ ও আছে, তবে কাগজী লেবুতেই তাহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। প্রাত্যহিক আহারে অন্নের সহিত কাগজী লেবুর রস ব্যবহার করিয়া কেহ কেহ বাতরোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সমগ্র কাগজীলেবু খোসা সহ খণ্ড খণ্ড করিয়া গরমজলে সিদ্ধ করিয়া জল সিকি ভাগ থাকিতে নামাইয়া শীতল করিবে। আট নয় ঘণ্টা হিমে রাখিবার পর চাপিয়া লেবুখণ্ডগুলির রস জলে মিশাইবে এবং ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে খালি পেটে নিয়মিত এক সপ্তাহ পান করিলে পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের উপশম হইয়া থাকে।

চুক বা লেবুর আরক অম্ল ও অজীর্ণ রোগের ঔষধ। ইহা গোঁড়া লেবুর রস হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোঁড়া লেবুর রস ছাঁকিয়া মাটির পাত্রে জাল দিবে। যখন রস ঘন হইয়া গুড়ের মত হইবে, তখন নামাইয়া কাঁচের বা চিনা মাটীর পাত্রে যত্নে রাখিয়া দিবে। জারক লেবুর মত ইহাও আচার রূপে অনেকে ব্যবহার করেন। বিশেষতঃ গর্ভিণী স্ত্রীলোকেরা অরুচি অবস্থায় এই সকল আচার ব্যবহার করিলে গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টিলাভে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। আরক লেবু প্রস্তুত করিতে কাগজী অথবা পাতী লেবুই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু রসের জন্য গোঁড়া লেবুই গৃহীত হয়। গোঁড়ালেবুর রসেই কাগজী বা পাতিলেবু জারিত হইয়া থাকে।

লেবু যে আমাদের এত উপকারী, ইহা অনেকেই জানেন না। যদি আমাদের দেশ ব্যবসায়ীর দেশ হইত, তাহা হইলে ইহার গুণাবলী এত অজ্ঞাত থাকিতনা, এবং ইহার বহুল ব্যবহারও হইয়া পড়িত। শিক্ষিত, উন্নত এবং বাণিজ্য-প্রধান দেশে উৎপাদকেরা বা চাষীরা নিজ নিজ উৎপন্ন ফসলের গুণাবলী সাধারণে নানা প্রকারে প্রচার করে এবং তাহাতে তাহাদের ফসলের ও কাটতি বাড়ে। আর আমাদের দেশে এমন উপকারী ফসল লেবুর রীতিমত চাষ ত দূরের কথা, যাহার দু'একটী গাছ আছে তাহারই ফল প্রয়োজন মত ব্যবহার হয় না, পক্ক এবং অপক্ক ফল গাছের তলার শোভা বৃদ্ধি করে। শুধু চাষ করিলেই হয় না। যে ফসলের চাষ করা হইবে তাহার গুণাবলী জানিয়া সাধারণের মধ্যে উহার প্রচার দ্বারা স্থানীয় বাজারে উহার কাটতী বাড়াইলে তবেই আশানুরূপ সফলতা লাভ হইতে পারে। চাষের পূর্ব্বে লেবুর কাটতির জন্য চেষ্টা করিতে আমরা দেশবাসীকে প্রথমেই অনুরোধ করি। লেবু হইতেই Lime juice প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখানকার রাসায়ণিক-দ্রব্য-প্রস্তুতকারকগণ যদি এ পক্ষে মন দেন, তাহা হইলে সুলভে এখানে উহা প্রস্তুত হইতে পারে। কারণ সুদূর মফঃসলে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়; তথা হইতে ইহার আমদানীর বিশেষ ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে।

যাঁহাদের লেবুর গাছ আছে, তাঁহারাও একটু মনোযোগী হইয়া ইহার চাষের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করিলে অনেক লেবু নষ্ট হইতে পারে না। লেবু গাছের গোড়ার মাটি নীরস হইয়া পড়িলে ফল অপক্ক অবস্থায় অনেক ঝরিয়া পড়ে; সুপুষ্ট হইতে পারেনা, আকার ক্ষুদ্র হয়, এবং ছালও মোটা হইয়া থাকে, সুতরাং রস কম হয়। এসকলের প্রতীকার করা কর্ত্তব্য. নতুবা এই ফসল হইতে লাভের সম্ভাবনা কম।

সুফল পাইতে হইলে, প্রত্যেক ফলবান গাছে প্রতি বৎসর সার দেওয়া দরকার। একটি লেবু গাছের জন্য এক বৎসরে ২০ তোলা চুণ, ১৮ তোলা পটাস, ৮ তোলা নাইট্রোজেন ও ১৬ তোলা ফস্‌ফরিক এসিড দরকার হয়। গোময় ও কলাগাছ ভস্ম প্রভৃতিতে পটাস সার যথেষ্ট পাওয়া যায়, হাড়চূর্ণ হইতে ফস্‌ফরিক এসিড ও চুর্ণ সার পাওয়া যায়, এবং কাঁচা গোবর বা ঝুল প্রভৃতি হইতে নাইট্রেজেন সার পাওয়া গিয়া থাকে। এদেশের এটেল মাটিতেও পটাস সার স্বাভাবিক ভাবে থাকে। প্রতি বৎসর গাছ ফুলিবার পূর্ব্বে গোড়া খুলিয়া সার দেওয়া এবং জল দেওয়া উচিৎ। তারপর গাছে ফল হইলে গোড়ার মাটীকে সরস রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে জল দেওয়া দরকার। এরূপ করিলে গাছে ফলও বেশী হয় এবং ঝরেনা, বা অকালপক্ক হয় না। প্রয়োজন মত পুষ্টফল মাঝে মাঝে পাড়িয়া বাজারে চালান দেওয়া চলে, এবং গাছেরও অনেকদিন ফল রাখিবার ক্ষমতা থাকে।

একটী গাছে অনেকবার লেবু ফলাইবার ইচ্ছা থাকিলে, একেবারে অনেক ফল প্রাপ্তির আশা ছাড়িতে হইবে। শীতের শেষেই লেবু গাছে ফুল ধরে। এই সময়ে গাছের অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিমান ডালের ফুলগুলি নষ্ট করিয়া দিবে। যে ডালের ফুল ভাঙ্গিবে তাহার সমস্ত মুকুল ও ফুল গুলিই নষ্ট করিবে, সাবধান, যেন একটীও না থাকে; কিন্তু যে ডালের ফুল রাখিবে, তাহার একটীও নষ্ট করিবেনা বা হইতে দিবেনা। ইহার ফলে ঐ গাছে অসময়ে ফুল ফল হইবে। ইহা পরিক্ষিত। আর কাঁচা অবস্থায় ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেও নাকি ঐরূপ অসময়ে ফলে—শুনিয়াছি। ইচ্ছা করিল কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন এবং পরীক্ষার ফল পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

লেবুর খোসা হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহা পীতাভ এবং সুগন্ধি। টাট্‌কা তৈলের বায়ুনাশক এবং উত্তেজক গুণ আছে। দুই এক ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিলে পেট ফাঁপার উপশম হইয়া থাকে। লেবুর খোসা পিশিয়া সেই রস হইতে চোয়াইয়া তৈল বাহির করা চলে। তৈলের সহিত উহার বিশভাগের একভাগ পরিমাণ এলকোহল বা সুরাসার মিশাইয়া রাখিলে, উহা অনেকদিন অবিকৃত থাকে; নতুবা কিছুদিন পরে উহার গন্ধ নষ্ট হয়। এই লেবুর তৈল অন্য তৈলকে সুগন্ধি করিবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মফঃস্বলে যে সকল স্থানে ভাল সোডাওয়াটার পাওয়া যায় না, তথায় গ্রামবাসীগণ

লেবুর রস সোডার সঙ্গে পান করিলে সমান উপকার পাইবেন। এই মিশ্র বস্তুর অম্ল দমন ও পিপাসা শান্তি করণের গুণ যথেষ্ট আছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[লেবু ও লেবুজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে মল্লিখিত ও বোম্বাইর Indian Industries and Power, February,, 1922 পত্রিকায় প্রকাশিত Lime and Lemon Industry in India প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন—কৃঃ সঃ]

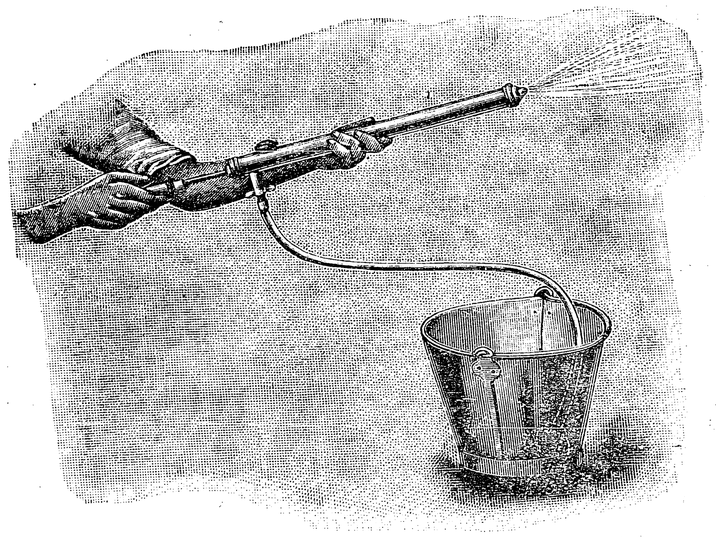

লাক্ষা।

লাক্ষা চাষ একটী বিশেষ লাভ জনক ব্যবসা। ইহার চাষ করিতে পারিলে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হয়, পূর্ব্বে এতদাঞ্চলে লাক্ষা চাষ ছিল না বা উহার চাষ প্রণালী কেহই জানিত না; অথবা ইহা দ্বারা যে বেশ একটী ব্যবসা চলিতে পারে ও ইহা বহু কাজে ব্যবহৃত হয় তাহা কাহারও জানা ছিল না। কয়েক বৎসর হইল মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে কতিপয় মুসলমান আসিয়া এ অঞ্চলে লাক্ষা চাষ আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করতঃ কেহ কেহ চাষ করিতেছে। ইহারা কুলগাছে লাক্ষা কীট পালন করিয়া লাক্ষা উৎপাদন করে। পূর্ব্বে এদেশে কোন কোন কুলগাছে স্বভাব-জাত অযত্ন সম্ভূত লাক্ষা দেখা যাইত। তাহা কেহ ইচ্ছা করিয়া সংগ্রহ করিত না।

এক্ষণে তিন প্রকার প্রণালীতে লাক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। (১) যে সকল বৃক্ষে স্বভাবতঃই লাক্ষা জন্মে, তথা হইতে উহা সংগ্রহ করা, কিন্তু তথায় বীজ নিঃশেষ না করিয়া কিছু রাখিয়া দিতে হইবে।

(২) বৃক্ষের ত্বকের অনিষ্ট না করিয়া প্রতিবর্ষে নিয়মিত রূপে বীজ কীট উক্ত বৃক্ষে সংক্রামিত করণ এবং বৎসরের মধ্যে একাধিক বার না হয়, এমত ভাবে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা বৃহৎ বৃক্ষের জন্য।

(৩) এক বৎসর যে সকল বৃক্ষ বাঁচিয়া থাকে, এমত বৃক্ষে গালার চাষ প্রশস্ত। অরহর প্রভৃতি বৃক্ষ ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কুসুম বৃক্ষ, পলাশ, কুল, বাবলা, খদির, অশ্বত্থ, বট, শিরিশ, প্রভৃতি বহু বৃক্ষে লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল বৃক্ষে লাক্ষার চাষ করিতে পারিলে উক্ত দ্রব্যের উৎপাদন বিলক্ষণ রূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে ও বহু লোকের অন্ন-সংস্থান হয়। কোন সময়ে বৃক্ষে বীজ কীট প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে হয়, তাহা জানা সকলেরই আবশ্যক। অনেক স্থানে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ কার্য্য সম্পাদন হয়। কীট বৃক্ষে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে হইবে, উহা দ্বারা বৃক্ষ পূর্ণ হইবে কিনা। পলাশ ও কুল গাছই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বৃক্ষ ক্ষুদ্র হইলে সকল বিষয়েই সুবিধা হয়। এই প্রকার বৃক্ষ পতিত জমীতে, বাঁধের ধারে, রাস্তার পার্শ্বে, মাঠের মধ্যে, জলের ধারে, নদী বা নালা পার্শ্বে থাকিলে লাক্ষা জন্মিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এইরূপ জমীর ভারতবর্ষে অভাব নাই। পল্লীগ্রামে যে সকল বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ করা হয়, তন্মধ্য হইতে কিছু কিছু বৃক্ষ রাখিয়া দিয়া লাক্ষা চাষ করিলে ভাল হয়। ইহাতে অর্থও যথেষ্ট উপার্জ্জিত হইতে পারে

এবং একটী ধনাগমের পথ প্রশস্ত হওয়া সম্ভবপর হয়। উৎকৃষ্ট উৎপাদনের স্থান হইতে রেল বা জাহাজে যোগে লাক্ষা কীট আমদানী করিলে বেশ চলিতে পারে।

যে সকল কীটানু বৃক্ষে ছাড়িয়া বা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের আবার শত্রু চারিদিকে; সুবিধা পাইলেই ক্ষতি করিয়া বসে। ইহাদের প্রধান শত্রু, পিপীলিকাগণ ইহাদিগকে নষ্ট করে না সত্য, কিন্তু যে ক্ষতি করিয়া যায় তাহা নষ্ট করা অপেক্ষা অধিক গুরুতর। ইহারা বৃক্ষত্বকে যে লোহিত বর্ণ মিষ্ট লালা ও রস ঢালিতে থাকে তাহা খাইবার জন্য পিপীলিকাগণ বড় আগ্রহ প্রকাশ করে। গালার চাষ করিতে হইলে এই গুলির দিকে নজর রাখিতে হয়। এই পিপীলিকাগণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বৃক্ষতলে, গুঁড়ির চারিদিকে ছাই ছড়াইয়া রাখিতে হয়; অথবা আলকাতরার মণ্ডলী বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে প্রদান করিতে হয়। বৃক্ষ কিঞ্চিৎ খুঁড়িয়া বৃক্ষের ত্বক হইতে এক বা দেড় হাত বিস্তৃত করিয়া বৃক্ষের চারিদিকে আলকাতরা ঢালিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে আর পিপীলিকা জাতীয় কোন প্রাণীর উক্ত বৃক্ষে সমাগম হইতে পারেনা। কেহ কেহ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে চর্ব্বি ঢালিয়া রাখে। ইহার দ্বারাও ঐ একই প্রকার কার্য্য সাধিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু প্রজাপতি। ইহারা লাক্ষা প্রস্তুত হইতে দেয় না। রস প্রস্তুত হইতে না হইতে খাইয়া ফেলে। ইহারা এমন মত্ত হইয়া রস খাইতে থাকে যে লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিবার সময়ও কোন কোন প্রজাপতি খাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুন চৈত্র হইতেই গালা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা বৃক্ষ হইতে তুলিয়া লইয়া বিক্রয়ার্থ রাখিতে বা অপর বৃক্ষে কীটানু সহ প্রদান করিতে হইলে তাড়াতাড়ি উহা ধৌত করিয়া লইতে হয়। তাহা না করিলে প্রজাপতিগণ উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। লম্বা লাক্ষা অক্ষতভাবে রাখিবার জন্য গন্ধকের ধোঁয়া ঐ লাক্ষার উপর প্রদান করিতে হয়। শত্রুর হস্ত হইতে রাখিবার জন্য উহাই একমাত্র উপায়। গালার বীজ কীটের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার রংয়ের আজকাল প্রচলন নাই। বিলাতীরঙ্গেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতেছে। প্রাচীনকালে ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। কালমহিমায় সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। লাক্ষার চাষ করিতে হইলে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। অথচ লাভও কম নহে। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি পতিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। লাক্ষার চাষ করিতে পারিলে দেশের একটী অভাব পূরণ হইতে পারে। লাক্ষার কাটতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বার্ণিস, পালিশ, স্ফোরক দ্রব্য, গ্রামোফোন রেকর্ড, বোতাম, চিরুণী, শীল মোহরের গালা, ইলেকট্রীক ইনসিউলেটার, এরোপ্লেন—এই সমস্ত প্রস্তুত করিতে ইহার বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীগুরু চরণ রক্ষিত।

কৃষি-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতে রেলপথের বিস্তার।

সম্প্রতি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বৈঠকের (Imperial Economic Conference) যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড ও উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা বা বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে অবাধ বাণিজ্যের প্রসারণ ও ভারতে রেলপথের এবং কল কারখানার বিশেষ বিস্তৃতি সাধন কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শীঘ্রই ভারতে রেলপথ বিস্তারের জন্য বিলাতে সাত কোটী পাউণ্ড ধার লওয়া হইবে। প্রস্তাবিত রেলপথ বিস্তার ও কলকারখানাদি স্থাপনে যে মূলধন নিয়োজিত হইবে, বলা বাহুল্য, উহা বিদেশেই সংগৃহীত হইবে; সুতরাং সে সকল প্রতিষ্ঠানে এদেশের অপেক্ষা বিদেশের প্রভূত উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

ভারতের যাবতীয় রেলপথই ভারত কর্ত্তৃপক্ষের (India Government) State property বা সরকারী সম্পত্তি। তবে যাঁহারা সমবায় মূলধন সংগ্রহ করিয়া উহাদের নির্ম্মান ও পরিচালন করেন, তাঁহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপযুক্ত পরিমাণে লাভ দিবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন। মাত্র দুই একটী সামান্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই হয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, না হয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কি ভারত গভর্ণমেণ্ট দায়ী আছেনই। ভারতের মূলধন এরূপ কার্য্যে খুব কমই নিয়োজিত আছে। কারণ ভারতবাসীগণ অদ্যাপি রেলপথের উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে, 'কৃষি-সংবাদ-আলোচনা' ও 'কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য' বিষয়ক প্রসঙ্গে রেলপথের উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে দূরবর্ত্তী পল্লী সকলের উন্নতি সাধিত হয় না, কৃষি ও শিল্পের যথেষ্ট প্রসার হয় না; সুতরাং কৃষি ও শিল্পীজীবিগণেরও কর্ম্মের প্রসারণ, এবং সেই সঙ্গে উপার্জ্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা উন্নতি ও সচ্ছলতা ঘটে না। কিন্তু যদি দেশীয়গণের চেষ্টায় দেশীয় মূলধনে এই সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই দেশের আশানুরূপ উন্নতির আশা করা যায়। কথিত রেলপথ বিস্তারের জন্য যে টাকা বিলাতে ধার করা হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—দেশবাসীগণ উহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিবেন কি না? কখনই নহে। তবে কেন দেশীয় ব্যবসায়ীগণ ও ধনীগণ এ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন? তাহার একমাত্র উত্তর,—তাঁহারা এ সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারণা করিতে পারেন না।

এ দেশে এ দেশীয় লোকের চেষ্টায় যে একটা রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই

বেঙ্গল প্রিভিন্সিয়াল রেলওয়ের বর্ত্তমান অবনতির জন্য দায়ী কে? ইহার উত্তর আমাকে দিতে হইবে না। 'সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর অব রেলওয়েজ' ইহার যথার্থ উত্তর 'রেলওয়ে বোর্ড'কে সম্প্রতি জানাইয়াছেন। দেশবাসী পরিচালকগণ অতিরিক্ত কার্পনাদোষে অন্ধ হইয়া অবিবেচক কর্ম্মচারীর হস্তে ফেলিয়া রাখিয়া দেশীয় প্রতিষ্ঠাণ গুলির অবনতি সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া; কয়েকজনের দোষে সমগ্র দেশবাসীর নিন্দা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে রেলপথ বিস্তারের চিরকালই পক্ষপাতী। সেই জন্য রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিবার কতকগুলি নিয়ম তাঁহারা স্থির করিয়া দিয়াছেন। তদনুযায়ী জরিপাদি করিয়া প্রস্তাব করিলে, প্রত্যেক রেলপথের একটী ভবিষ্যত চিত্র উহার মধ্য দিয়া চিত্রিত হইয়া উঠে, এবং উহার ভবিষ্যত সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহগুলির মীমাংসাও এই সঙ্গেই হইয়া যায়। আমরা যথাসম্ভব এইগুলির আলোচনা করিতেছি।

প্রত্যেক 'রেলওয়ে'র অর্থনৈতিক জটিলতা, গঠন ও পরিচালনা, এবং 'রেট্' বা ভাড়ার হার, এ সমস্তই উহার স্থানীয় অবস্থার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে; সুতরাং প্রস্তাবক ও নির্ম্মাতার পক্ষে স্থানীয় অবস্থার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া তবে রেলপথ নির্ম্মানের আনুমাণিক খরচ, সম্ভাবিত আয় এবং পরিচালনার ব্যয় স্থির করিয়া তবে আর্থিক সমস্যার মীমাংসা করা উচিৎ। কারণ উক্ত তিনটী বিষয়ের অঙ্কের উপরেই সেই রেলওয়ের লাভালাভ নির্ভর করে। ইহা স্থির হয় যে, 'রেলওয়ে' পরিচালনাও একটী বাণিজ্য বিশেষ।

রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাবক ও নির্ম্মাতা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে জরিপ করিবার সময় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন, স্থানীয় ব্যবসায়ের সুবিধার্থে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াও কত শীঘ্র এবং সোজাপথে দুইটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। কারণ দূরত্বের অনুপাতে নির্ম্মাণ খরচের আধিক্য বা অল্পতা স্থির হয়, এবং নির্ম্মাণ খরচের অল্পতা ও আধিক্যের উপর উহার লাভ লোকসান অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র ও বিশিষ্ট লোকালয় গুলির সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কশূন্য হইয়া চলিলে 'রেলওয়ে' নির্ম্মাণের বিশেষ উদ্দেশ্য গুলিও ব্যর্থ হয়, সুতরাং স্থান নির্ণয় ইহার একটি অতি আবশ্যকীয় বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ের উপর রেলওয়ের সাফল্য ও স্থায়িত্ব সম্পূর্থ নির্ভর করে। রেলওয়ের নির্ম্মাণ-প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে জরিপের সময়েই অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্থানীয় যাত্রী সংখ্যা ও মালের পরিমাণ, যাহা প্রস্তাবিত রেলওয়ে দ্বারা বাহিত হওয়া সম্ভব, তাহা নিরূপন করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ে খুলিবার পর তিন চারি বৎসরের মধ্যে স্থানীয় বিশেষ বিশেষ কৃষি শিল্প ব্যবসায়ের উক্ত রেলপথের সহায়তায় যতদূর উন্নতি হওয়া সম্ভব এবং তদ্বারা রেলপথটিরও যে পরিমাণ আয়ের সম্ভাবনা, এ সকল বিষয়ও নিরূপণ করা উচিত।

নির্ম্মাণযোগ্য রেলপথের প্রস্তাব কালীন নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

(ক) যে প্রদেশে রেলপথ নির্ম্মিত হইবে, উহার সন্নিহিত স্থানের কৃষি ও শিল্প বিবরণ, স্থানীয় জলসেচের তৎকালীন অবস্থা, সন্নিহিত প্রদেশে কতগুলি ধর্ম্মমন্দির আছে ও কতগুলি সাময়িক মেলা বসিয়া থাকে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ, এবং উক্ত প্রদেশে কোথায় কতগুলি আদালত এবং সরকারী অফিস প্রভৃতি আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত ও আলোচিত হওয়া উচিৎ।

(খ) সন্নিহিত প্রদেশের লোকসংখ্যা, উহা কিরূপ ভাবে বিন্যস্ত, এবং বিশেষ সমৃদ্ধ স্থানগুলির বিশেষ পরিচয় সংগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

(গ) স্থানীয় অধিবাসীগণের অবস্থা, গ্রামগুলির অবস্থা, স্থানীয় ভূমিস্বত্ব কিরূপ, এবং খাজনা ও আয়কর হিসাবে সরকার কত টাকা ঐ স্থান হইতে আদায় করিয়া থাকেন, তাহার পরিমাণ নিরূপণ।

(ঘ) স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ বিবরণ, অর্থাৎ কোন কোন স্থান হইতে, কি কি দ্রব্য, কত পরিমাণে স্থানীয় বাজারে আমদানী হয়, এবং স্থানীয় কি কি দ্রব্য, কত পরিমাণে, কোন কোন প্রদেশে বা নগরে রপ্তানী হইয়া থাকে; আর এই সকল আমদানী বা রপ্তানী কোন পথে কি উপায়ে ঘটিয়া থাকে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক।

(ঙ) যে যে পথ ও নদী প্রভৃতি দ্বারা স্থানীয় গ্রাম ও বাজার গুলি অন্য প্রদেরেশ সহিত সম্বন্ধ, তাহার পরিচয় ও প্রয়োজন।

(চ) এই গুলি ছাড়া, নিরূপিত রেলপথের প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্থানীয় শিল্পের ও কৃষির অবস্থা কতদূর উন্নত হইতে পারে, এবং কি কি নূতন শিল্পেরই বা অভ্যুত্থান সম্ভব, ও তজ্জন্য আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তৎসমুদয়ের নিরূপণ করাও আবশ্যক।

উপরি উক্ত বিষয় গুলির আলোচনা দ্বারা ভবিষ্যৎ আয়ের এবং ব্যয়ের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, সংগৃহীত বিবরণ হইতে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় গাড়ীর চলাচলের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, তাহার সম্ভাবিত ব্যয় স্থির করিবে।

'রেট্' বা ভাড়ার হার সংগৃহীত বিবরণ হইতেই স্থানীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করিতে হয়।

বলা বাহুল্য, কথিত বিষয় গুলির বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করিলে,

উহা দ্বারা নির্ম্মিত রেলপথের এবং সন্নিহিত প্রদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্মের প্রসার প্রভৃতি দ্বারা অধিবাসীগণের আর্থিক ও শারিরীক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দেশের ধনী ও জমিদারগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে, নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি যথেষ্ট সাধন করিতে পারেন। ইহাই প্রকৃত স্বাবলম্বন, এবং ইহা দ্বারাই দেশ সমৃদ্ধ হইয়া থাঁকে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

SEEDS
INDIAN GARDENING ASSON.
FLOWERS VEGETABLES
ASSOCIATIONS TESTED
SEEDS
WHICH ALWAYS SUCCEED.
PLANTS MANURES
162, BOW BAZAR STREET
Tel. "KRISHAK" CALCUTTA.

কাশ্মীরের স্বভাবজ সম্পদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

Agricultural Statistics of India, Vol II., 1912—13 নামক কৃষি-বিবরণে দেখা যায় যে, কাশ্মীর দেশে উৎপাদিত ফসলসমূহের মধ্যে ধান্য, গোধূম, যব, বজরা, মণ্ডুয়া, ভুট্টা, তিসি, তিল সরিশা, কার্পাস, তামাক, সিদ্ধি, ফল এবং সব্জী প্রভৃতিই অন্যতম। ইহার মধ্যে, কেবল চারিটি ফসল বড় বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়—ধান্য গোধূম, ভুট্টা ও তিসি। ইহাদের চাষ লক্ষাধিক বিঘাতে হইয়া থাকে। ধান্যই সর্ব্বপ্রধান ফসল। মোট ৭৮৯,৮৯৯ একর কর্ষিত জমির মধ্যে ২৯৮,৬৫১ একরে ধান্য উৎপাদিত হয়। সুতরাং আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ ধান্যই অধিকার করে। পূর্ব্বোক্ত চারিটি প্রধান ফসলের পর যব ও সরিশার উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহাদের প্রত্যেকের চাষের জমি ৩০,০০০ বিঘার উপর। অন্য সমুদয় ফসলের উৎপাদনের মাত্রা সামান্য। ইহা হইতে সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, কাশ্মীরের প্রায় তিন লক্ষ লোকের আহার্য্যের সংস্থান করিয়া উক্ত দেশ হইতে কোন কৃষিজাত দ্রব্য আপাততঃ রপ্তানি হইতে পারে না। আবার ফসলসমূহের এমন কোন বিশেষ গুণ কিম্বা উৎকর্ষতা নাই যে, বিদেশে নীত হইলেও তৎসমুদয় প্রতিযোগিতায় বাজারে স্থান পাইতে পারে। পক্ষান্তরে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধুনা কর্ষিত জমি ভিন্ন কাশ্মীরে প্রায় ২৫৫৬৭১ একর কর্ষণযোগ্য এবং ৩৮,৩৭৪ একর পতিত জমি আছে। রপ্তানির খরচ সুলভ হইলে, এই সমুদয় জমির আবাদ হইতে পারে; কিন্তু কোন সাধারণ কৃষিজাত ফসল দ্বারা বহির্ব্বাণিজ্যে কাশ্মীর যে কোন সময়ে লাভবান হইতে পারিবে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র ও উদ্যানজাত ফসলের পক্ষে কাশ্মীরের বিশেষ-বিশেষ মৃত্তিকা ও জলবায়ু অত্যন্ত উপযোগী; যদি সেইরূপ ফসল নির্ব্বাচিত হইয়া উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য লাভের সম্ভাবনা আছে।

এবম্বিধ বিশেষ উদ্ভিদের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই ফল চাষের বিষয় বলিতে হয়। ব্যোম-রেলপথে ফল-ব্যবসায়ের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যবসায়ের মূলীভূত ফল প্রথমে উৎপাদিত হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ কাশ্মীর হইতে কতক পরিমাণ ফল রপ্তানি হয়; কিন্তু সেগুলি অযত্ন-সঞ্জাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বতন কাল অপেক্ষা বাগানের সংখ্যা এখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, এবং পূর্ব্বে

যে প্রথায় চাষ হইত, এখনও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। বরং ২।৪টি ভাল-ভাল বাগান অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার কালিফর্ণিয়ায়, ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের স্থানে-স্থানে, ইতালী ও দক্ষিণ-ফ্রান্সে বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় বিশাল ফলক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যেরূপ উন্নত প্রণালীতে চাষ ও ব্যবসায় চলিতেছে, দেশ, কাল পাত্র বিবেচনায় সেইরূপ কতিপয় প্রথা কাশ্মীরে অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বৃহত্তর ফল-ব্যবসায়ে কোন আশা নাই। কাশ্মীরের অনেক স্থানে আদর্শ ফলক্ষেত্র হইতে পারে। ফলের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কাশ্মীর এখনও অগ্রগণ্য। সেও, নাসপাতি, বিহিদানা, আড়ু, খোবাণি, বাদাম, দাড়িম্ব, তুঁত, আখরোট, খরমুজা, ফুটি, আঙ্গুর এবং ইংরাজ-প্রিয়, Plum, Hazlenut, Strawberry, Raspberry, Currant. Cherry, Gooseberry প্রভৃতি ফলের কর্ষণজাত ও অর্দ্ধবন্য বৃক্ষ কাশ্মীরের অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ফল-চাষে যে নির্ব্বাচন ও সুপ্রজনন অত্যন্ত আবশ্যক, এবং তাদ্ভন্ন বিভিন্ন, জাতির অবাধ সঙ্কর উৎপাদনে যে ফসলমাত্রেই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অনেকেই বুঝেন না। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে এখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাশ্মীর-দরবার ফল-চাষের উন্নতির জন্য সামান্যই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় যে ভবিষ্যতে অর্থ-বৃদ্ধির অন্যতম উপায়, তাহা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

আর এক শ্রেণীর উদ্ভিদের চাষ কাশ্মীরবাসীর পক্ষে লাভজক হওয়া সম্ভব। অনেকেই অবগত আছেন যে, আমরা আজকাল যে সমুদয় আলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই বিদেশে বিদেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। কিন্তু সেই সমুদয় উদ্ভিজ্জ উপাদান অথবা তাহাদের সহিত ঘনিষ্ট-সম্পর্কিত সমগুণ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ কাশ্মীর উপত্যকায় এবং চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। যে সকল ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদ্ এখন জন্মায় না, তৎসমুদায়ও কাশ্মীরের ন্যায় জলবায়ু ও প্রাকৃতিক গুণবিশিষ্ট দেশে সহজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় Materia Medica Farmiug অর্থাৎ ভেষজ উদ্ভিদের চাষ কাশ্মীরবাসীর পক্ষে লাভজনক ব্যবসায়। স্বকীয় অনুসন্ধানের ফলে আমরা অবগত আছি যে, আপাততঃ কাশ্মীরে মিঠা তেলিয়া (Aconite), রেষাখিতমি (Althae), বেলাডোনা (Belladona), সুরিঞ্জন (Colchicum) পঞ্জাবী ধুতুরা (Datura Stramonium)' খোরাসানি আযোয়ান (Hyoscyamus), সালেপ মিছরি (Salep) পোডোফাইলাম (Podophyllum) রেউচিনি (Rhubarb) মুস্ফবালা (Valerian), প্রভৃতি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের অত্যাবশ্যক উপাদান এক্ষণে বন্য অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এইগুলি লইয়াই ব্যবসায় আরম্ভ হইতে পারে। পরে চাষ দ্বারা উক্ত উদ্ভিদ্ সমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করাইয়া এবং ডিজিট্যালিস (Digitalis), ইপিকাক (Ipecacuahna) জ্যালাপ (Jalap)

প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করিয়া ভেষজ উদ্ভিদ্-ব্যবসায় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে। কেশর, কুট, বিহিদানা, সা-জিরা, ধূপ প্রভৃতি দ্রব্য ঠিক ভেষজ উদ্ভিদ্ না হইলেও, এইগুলি এবং কতকগুলি মশলা ও গন্ধদ্রব্য এই ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। তাহাতে ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। এতদ্দেশে এখনও ঔষধার্থ লতাগুল্মাদির চাষ হয় নাই। এক সময় বন্য বৃক্ষাদিই প্রতুল ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই; এবং ক্রমশঃ বিবেচনাহীন সংগ্রহের দোষে থাকিবে না। এরূপ স্থলে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ অপরাপর ফসল চাষের ন্যায় লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই।

অধুনা কাগজের যে কত অভাব, তাহা সকলেই জানেন। যে মসলা হইতে কাগজ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ Wood-pulp (কাষ্ঠপিণ্ড) তাহা হইতেই আবার নানা রকম দ্রব্য হইতেছে। কাশ্মীরের পর্ব্বতাদির বৃক্ষাবলী কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া নিম্নদেশে আনিতে অনেক খরচ হয় ও লোকসানও হইয়া থাকে। তৎপরিবর্ত্তে দেশ-মধ্যে কোন উপযুক্ত স্থানে যদি কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত হয়, এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুতই কাশ্মীরের অল্প মূল্যের কাষ্ঠের সদ্ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণনা করিতে হইবে। আর ইহাও সম্ভব যে, অচিরে ভারতে কাষ্ঠপিণ্ড হইতে কাগজাদি প্রস্তুতের জন্য কল স্থাপিত হইবে।

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির যেরূপ সদ্ব্যবহার হইতে পারে,তাহার দুই-একটী উদাহরণ আমরা এ স্থলে দিলাম। প্রাণীজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। চর্ম্ম, রেশম, পশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি এখন কাশ্মীরে অল্প-বিস্তর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। রেশম চাষের ব্যবস্থা কাশ্মীর দরবার কতক পরিমাণে করিয়াছেন; বলা দরকার যে রেশমসূত্র প্রস্তুতের যে কারখানা অগ্নিতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহা জগতের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারখানা ছিল। তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু কাশ্মীরের যে পশম বিশ্ব-বিখ্যাত, তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ পর্য্যন্ত সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এইরূপ চেষ্টা করিতে হইলে, প্রথমেই মেষ জননের উপর মনঃসযোগ করা আবশ্যক। আপাততঃ ছাগ, মেষ ও গবাদি পশুর জনন ও ব্যবসায় অর্দ্ধসভ্য গুজরগণের হস্তে ন্যস্ত। কাশ্মীর উপত্যকার এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতরাজির ক্রোড়ে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা পশু-প্রজনন ও পালনের আদর্শ ক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেরূপ প্রথায় বিশেষ-বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ জাতীয় পশু পালিত হইয়া থাকে এতদ্দেশেও সেইরূপ প্রথা অবলম্বিত হওয়া উচিত—অর্থাৎ পশম, দুগ্ধ মাংস ও ভারবহনের জন্য বিভিন্ন জাতীয় পশু। তাহাদের কৌলিন্য পরিরক্ষিত হওয়াও বিশেষভাবে আবশ্যক। এখনকার যথেচ্ছ প্রতিপালন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বর্ণ, ধর্ম্ম, ও গঠন নির্ব্বাচনে বিশেষ-বিশেষ

কার্য্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর পশুপাল প্রজনন করিলে, ভবিষ্যতে একটি সুমহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কাশ্মীরের হ্রদ ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদীসমূহ মৎস্য জনন ও পালনের যেরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্র সেরূপ ভারতের আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। দুই-এক শ্রেণীর বিলাতী মৎস্য উৎপাদনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেই হইয়া থাকিলেও অদ্যাবধি নানা জাতীয় দেশীয় মৎস্যকুলের বংশ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এইরূপ মৎস্য-জনন ও নানা প্রকারে সংরক্ষিত মৎস্যের কারবার ভবিষ্যতে অর্থাগমের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কি পশু-জনন, কি মৎস্য-জনন—উভয়েরই আনুসঙ্গিক ব্যবসায়াদির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, সংরক্ষিত মাংস, পশম, ক্ষুর, শিং, চামড়া ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গ্লিসরিন, সংরক্ষিত মৎস্য, মৎস্যের তৈল, জিলাটিন, শিরিস এবং পশুজ ও মৎস্যজ সার—এ সমস্তই পশু ও মৎস্য-জননকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইতে পারে।

কাশ্মীরে খনিজ দ্রব্যাদির অপ্রতুল নাই। তবে দুর্গম রাস্তা, দক্ষ ও যথেষ্ট মজুরের অভাব, এবং স্বল্প উদ্যম ও অধ্যবসায়—এই সমুদায়ই ব্যবসায়ের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। পাদুর নামক স্থানে মূল্যবান নীলকান্তমণি, কুটিহার ও জস্কর পর্ব্বতশৃঙ্গে তাম্র, পীরপঞ্জল মেরুবর্দ্ধন ও জম্মুর কতিপয় স্থানে সীসক, গুলমার্গের নিকটবর্ত্তী সিন্ধো ও ঝিলম নদীর গর্ভে স্বর্ণরেণু, এবং দেশের নানা স্থানে নিকৃষ্ট জাতীয় পাথুরে কয়লা ও লৌহ—এই সমুদয় খনিজ পদার্থের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন আরও নানা রকম ব্যাবহারিক খনিজ পদার্থ এতদ্দেশে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীর মিনারল্ কোম্পানি নামে একটি বিলাতী কারবার বনিয়ার, দ্রাসনদী ও পাদুর কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-দরবারের সহিত কোন কারণে গোলযোগ হইয়া কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা আশা করি যে, অচিরে দেশীয় জনগণই দেশের খনিজ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কাশ্মীরে স্বভাবজ দ্রব্যের অভাব নাই। কিন্তু স্বভাবজ দ্রব্য থাকা এক কথা, আর তাহা বাণিজ্যোপযুক্ত পণ্যে পরিণত হওয়া আর কথা। আরও একটা বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, অধিক ধনাগম করিতে হইলে, দেশে এমন শ্রেণীর শিল্প উৎপাদন হওয়া উচিত, যাহা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য, যাহা সখের জিনিষ নয়, নিত্য আবশ্যক। আপাততঃ কাশ্মীরে যে দুই-চারিটী সুপরিচিত শিল্প আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর তৎসমুদায়ের উন্নতি সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইলে, ইহাও ভাবিতে হইবে যে, কাশ্মীরে গমনাগমনের পথ এ সময়ে সুগম হইতেছে, এবং আকাশ-রেল হইলে আরও সুগম হইবে। যে দেশের অধিকাংশ

ধন সম্পত্তি কেবল স্বভাবজ দ্রব্য এবং শিল্পাদি সামান্য, সেরূপ দেশে বিদেশীয় বণিকের পথ অবাধ হইলে দেশ যে ক্রমশঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে এবং জীবন-ধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়া উঠিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পাশ্চত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া এবং কৃত্তিম উপায়ে অভাব সমূহের সৃষ্টি করিয়া, ভারতের অনেক স্থল, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ যে কিরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাশ্মীরবাসীর প্রণিধান-যোগ্য। দেশীয়গণ স্বগৃহে বিদেশী ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগীতায় শিল্পাদি উৎপাদনে অক্ষম; কিন্তু বিদেশী সওদাগরগণ চাকচিক্যশালী পণ্যভার লইয়া প্রতিক্ষণ দ্বারে করাঘাত করিতেছে—এরূপ অবস্থায় চাষ আবাদ অথবা স্বভাবজ দ্রব্য বিক্রয়ে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইতেছে, তাহার প্রায় সমস্তই ভিন্ন দেশীয় কারখানাওয়ালাদের উদর পুরণার্থ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

সেইজন্য আমরা বলি যে, যদি বর্ত্তমান যুগে বাণিজ্য ক্ষেত্র গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে গণ্ডী খুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আত্ম-সংরক্ষণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের পক্ষে এই বিষয়ে জাপানের মহত্তম দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। দূরদর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাপানীগণ বিদেশীয়কে দেশমধ্যে অবাধ-প্রবেশাধিকার প্রদানের সমকালেই শুধুই যে তৎকালীয় দেশজাত শিল্পাদির সংস্কার করিয়া দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; সেই সময় হইতেই তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন যে, বিদেশীয় বণিকেরা যে সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দেশে বিক্রয় করিবে, তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় সেই সকল দ্রব্য স্বদেশেই প্রস্তুত করিবেন। ফলে, বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, জাপান বিদেশীয় বণিকের লীলাক্ষেত্র হওয়া দূরে থাকুক, জাপানী বণিকই ক্রমশঃ তাঁহার বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইতেছেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে, জাপানী শ্রম-সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। কাশ্মীরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি জননায়কের অভাব নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলে, কাশ্মীরের বাণিজ্যশ্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। ভারতের নিম্নদেশে যে নব উদ্দীপনা প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহা কাশ্মীরে যাইতে বিলম্ব হইবে না; এবং আমরা আশা করি যে, বৃহত্তর ভারত অগ্রসর হইলে কাশ্মীরও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না (প্রাপ্ত)

———

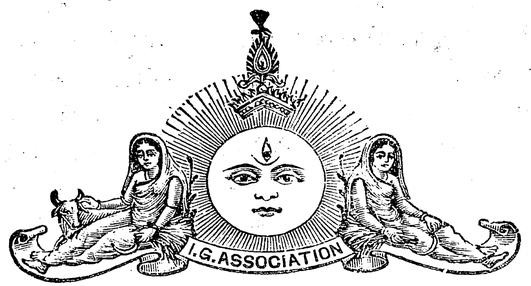

কৃষক—অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সাল।

শুল্ক বোর্ড ও কৃষি।

বর্ত্তমাণ শুল্ক বোর্ডের যে নানাস্থানে অধিবেশন হইতেছে তাহাতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। কৃষির সহিত শুল্ক বোর্ডের সম্বন্ধ নিতান্ত কম নয়। তাহা নিম্নলিখিত বোর্ডের অভিমত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। বোর্ড বলেন ঃ— "উন্নতিশীল কৃষি ব্যতিরেকে ভারতীয় শিল্প সমূহ পরিপুষ্ট হইতে পারেনা ; কাঁচামাল সরবরাহ করার কৃষিই একমাত্র উপায় এবং অনেক শিল্পের উন্নতি কৃষির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।" সুতরাং কোনপ্রকার রক্ষণনীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে কৃষির স্বার্থ দেখা দরকার।

ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ চাষী। ক্ষান্তরে শিল্পজীবিদিগের অনুপাত শতকরা ১ ভাগের অধিক নয়। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কৃষির উন্নতি কতদূর আবশ্যক। কলিকাতা বন্দর হইতে যে সমুদয় দ্রব্য বিদেশে চালান যায় তন্মধ্যে চট. থলে প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য বাদ দিলে আর সমস্ত বেশী বেশী টাকার জিনিষই কৃষিজাত।

কিন্তু যে কৃষকই এই সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া দেশের ধন-সংস্থান করিতেছে তাহাদেরই অবস্থা অতি শোচনীয়। একটি সাধারণ কৃষকের আয় বাৎসরিক আয় ৩০-৬০৲ এর অধিক নয়। যদি কোনপ্রকারে দৈব দুর্ব্বিপাক না হয় তাহা হইলে এই পরিমাণ অর্থে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে। কিন্তু সচরাচর ইহাতে তাহার চলে না ; প্রায়ই ঋণ করিতে হয়। যে পরিমাণ করভারে বর্ত্তমান সময়ে সে প্রপীড়িত যদি তাহা

আয় না বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফসলের উৎপাদনের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলেই তাহার মঙ্গল। শুল্ক বোর্ড রক্ষণনীতি অবলম্বন করিলে কৃষকের অনেক নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোন কোন দ্রব্যের, যেমন লৌহ নির্ম্মিত কৃষি যন্ত্রাদি, সেরূপ হওয়া সম্ভবপর। সেই জন্য আমরা আশা করি যে বোর্ড শুধু বড় বড় manufacturer গণের স্বার্থ দেখিবেন না ; কৃষকের স্বার্থও যেন তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়। দেশে বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিলাতী পণ্যের আমদানি কম হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু রক্ষণনীতি প্রয়োগ করিতে হইলে দেশকে প্রথমতঃ কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দেশ কতদূর পর্য্যন্ত তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সেটা দেখিয়া শুল্ক বোর্ড কার্য্য করিলেই ভাল হয়।

জল সেচনের ব্যবস্থা ঃ—কৃষি-প্রধান-দেশ হিসাবে ভারতের স্থান জগতের অন্য কোন দেশের নীচে না হইলেও, বর্গফলের অনুপাতে বোধ হয় ভারতের ন্যায় অন্য কোন দেশকেই ফসল উৎপাদনের জন্য এতটা বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় না। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে ৫৫০০০ মাইল খাল খোদিত হইয়াছে। যে সমুদয় খাল খননের কার্য্য এখনও চলিতেছে অথবা অবিলম্বে আরম্ভ হইবে তাহাদের মোট দৈর্ঘ প্রায় ৪০ লক্ষ মাইল হইবে। কিন্তু কর্ষিত ভূমির পরিমাণ হিসাব করিলে কৃত্রিম জল সেচন প্রণালীর স্বল্পতা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ চাষের জমির চারি ভাগের একভাগ মাত্র খালের কিম্বা কূপের জল পাইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশের নির্ভর মরসুমী বৃষ্টির উপর।

বাংলার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৎসরের পর বৎসর জলাভাবে অনেক আয়কর ফসলের চাষ লোকে ত্যাগ করিতেছে। পূর্ব্ব অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ইহা প্রধানতঃ দৃষ্টি গোচর হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা বেন্টলি সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ব্বকার জল প্রণালী সমূহ সংস্কারের অভাবে প্রায় শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় লোকের আহার্য্য-ফসল উৎপাদন করিবার অসুবিধা হইতেছে। তাহাতে খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্য হানি হইতেছে এবং স্বাস্থ্য হানির অনিবার্য্য ফলে ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর প্রভৃতি ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় ক্ষীণ-জীবি ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিতেছে। ইহা কাল্পনিক কথা নয়। অঙ্কাদি ও প্রকৃত তথ্য দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের ধনশালী ব্যক্তিগণও এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তাঁহা দিগের চোখের সামনে যে না দেখিতেছেন তাহা নয়। লোকের স্বাস্থ্য হানির জন্য জমির ফসল কমিয়া গিয়া জমিদার গণের আয়ের যে হ্রাস হইতেছে তাহাও সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু কি মোহ মন্ত্রে যে আমরা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া আছি, আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি একবারেই নাই।

কোন গ্রামের পানীয় অথবা চাষ করিবার জলের জন্য মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকিতে

হয় না। বর্ষাকালে যে বৃষ্টি সংরক্ষণের অভাবে অকারণ বহিয়া গিয়া নদীতে বন্যা উৎপাদন করে তাহা পুকুর, ঝিল অথবা বাঁধ দ্বারা আটকাইয়া রাখিতে পারিলে যথেষ্ট পরিমাণে চাষের জল পাওয়া যাইতে পারে। গ্রামবাসীগণের সমবেত চেষ্টায় তাহা করাও অসম্ভব নয়; এবং এরূপ ভাবে জল সংস্থান ২।৪ গ্রামে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। সেরূপ স্থানে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই একত্রিত হইয়া কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ফলে শুধু কৃষি নয়, গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও যথেষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত কিন্তু বিরল। যতক্ষণ না এইরূপে দেশ বাসীগণ নিজ নিজ উন্নতির জন্য নিজেই বদ্ধ পরিকর না হন ততদিন কোন দেশ-মঙ্গলের আশা নাই। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জল-সংস্থানে একমাত্র কৃষকেরই স্বার্থ নাই; পানীয় ও চাষের জলের অভাবই সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ ভাবে সকলেই অল্প বিস্তর ভাবে বুঝিতে পারিবেন ও ইহা দ্বারা সকলেরই অসুবিধা হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষকের জাগরণ গীতি।

জাগরে কৃষককুল জাগ বিশ্ব ডাকে।
মগ্ন ধরা আলোক বন্যায়।
এখনো কি ডুবি' রবি মোহ ঘূর্ণীপাকে,
ত্যজি আয় অলস তন্দ্রায়॥
বাজিছে বিষাণ ভেরী
তোরা যে রেয়ণ করী
উন্মাদনা বক্ষে নিয়ে আয় ছুটে আয়
পাবি স্থান জয়পত্র ছায়া॥
মানুষের রক্ত নিয়ে
ফেরু সম রবি শুয়ে
ক্লীবতা জড়তা মাখি পঙ্কিল গুহায়
চেয়ে দেখ কেরুদলো রণরঙ্গে ধায়
করী কিরে রবে সুপ্ত হায়॥
ভারত শ্মশান ক্ষেত্র শবদেহ তোরা
সাধনার পূতাসনে বসি
কাপালি উলসচিত্তে সেবে সিদ্ধি সুরা
বক্ষ অস্থি সদা দেয় ঘসি।
তাণ্ডব নর্ত্তন ভরে
পঞ্জর গিয়াছে ছিঁড়ে
পদতলে কাপালীর পড়ি রবি তবু
উদ্দাম হৃদয়ে বহ্নি জ্বালিবি না কভু?
কামধেনু মত তোরা
বিতরিস্ ক্ষীর ধারা
বড় সবে তোর রক্ত করিয়া শোষণ
বিলাস বীথিকাকুঞ্জে স্বপনে মগন।

শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম, এ।

কাঁঠাল প্রসঙ্গী।

ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রকার ফল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে কাঁঠালের ন্যায় বৃহদাকারের ফল আর নাই। এই জন্য ইহার এক নাম—"অতি বৃহৎ ফল।"

"পনসঃ কণ্টকি ফলঃ পনশোতি বৃহৎ ফলঃ।"

পণস, পবশ, কণ্টকি ফল, অতি-বৃহৎ ফল এই কয়টীই কাঁঠালের সংস্কৃত পর্য্যায়। ফলের বহিরাবরণ কণ্টকাবৃত বলিয়াই ইহার নাম কণ্টকী ফল হইয়াছে। কণ্টকী ফলের অপভ্রংশেই বাঙ্গালায় কাঁঠাল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহা "কটহর বা কটহল" নামে পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে কাঁঠালের নিম্নলিখিত গুণ গুলি বর্ণিত আছে :—

পাকা কাঁঠাল শীতবীর্য্য, মধুর রস, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিকর, মাংসবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, দুর্জ্জর, রুচিকর, মলরোধক, বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও কফবর্দ্ধক, ইহা বায়ু পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ-নাশক এবং দাহ, শ্রম, শোষরোগে উপকারক। অপক্ক কাঁঠাল বা ইচড় মধুর কষায় রস-যুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক, গুরু পাক, শীতল, বলকর, দাহজনক, রুচিকর; ইহা কফ ও মেদ ও ধাতু বৃদ্ধিকর। কাঁঠাল বীজ শুক্রবর্দ্ধক, মধুর রস, গুরুপাক, মল-রোধক, ঈষৎ কষায়, বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পাকা কাঁঠাল ভোজন জনিত অজীর্ণাদির নিবারক। কাঁঠাল বীজের তরকারী অতি উৎকৃষ্ট, গোল আলু অপেক্ষাও পুষ্টিকর। কেহ কেহ ভাতের মধ্যে সিদ্ধ করিয়া এবং দাইলের সহ পাক করিয়া ভক্ষণ করেন; ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আগুণে পোড়াইয়া খায়, তাহাতেও বেশ মুখ রোচক হয়। কাঁঠালের মজ্জা শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। মাংসগ্রন্থি-শোথে কাঁঠালের কাথ, অণ্ড বৃদ্ধিতে কাঁঠালের ভোতা (মজ্জা) এবং চর্ম্মরোগে কাঁঠালের কোমল পল্লব বিশেষ উপকারক। কাঁঠালের পাতার রস পান করিলে, সিদ্ধি সেবন জনিত মত্ততা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বহুগুণ সম্পন্ন ফল পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয়না। আকার ও গুণে ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ফল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না।

কাঁঠালের জন্ম স্থান ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র কাঁঠাল জন্মেনা। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতের কোন কোন স্থানের লোকের নিকট ইহার নাম পর্য্যন্তও অজ্ঞাত। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে কাঁঠাল জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল জন্মে, এবং ইহার গাছ জঙ্গলা গাছের মধ্যে পরিগণিত হয়।

হিন্দু শাস্ত্রে কাঁঠালকে "মহাফল" নামে অভিহিত করা হইয়াছে; বাস্তবিকই ইহা মহাফল। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী সকল প্রাণীই কাঁঠাল খাইতে ভাল বাসে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালেই কাঁঠাল পরিপক্ক হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ধান্য, চাউল মহার্ঘ্য হয় বলিয়া, এসময়ে বঙ্গের অনেক দুস্থ পরিবারের লোক অত্যল্প পরিমাণ ভাতের সহিত অত্যধিক পরিমাণ কাঁঠাল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। বর্ষাকালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু লোক কেবল কাঁঠাল খাইয়াও জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। অন্যান্য ফলের তুলনায় কাঁঠালের মূল্য কিছু সুলভ। বিশেষতঃ ইহার একটী ফলেই তিন চারি বা ততোধিক ব্যক্তিরও উদর পূর্ত্তি হইতে পারে। এই জন্যই এদেশের গরিব লোকে কাঁঠালকে জীবনরক্ষক মহাফল বলিয়াই মনে করে। এক একটী কাঁঠালের ওজন উহার আয়তন অনুসারে দুই তিন সের হইতে পনর বিশ সের বা একমণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তবে যে গাছে বেশী ফল রাখা হয় তাহাতে আকার ক্ষুদ্র, এবং অল্প ফল থাকিলে আকার বৃহৎ হয়। আমার উদ্যানস্থ একটী গাছে মাত্র দশটী কাঁঠাল রাখিয়া দেখিয়াছি প্রত্যেকটী ২৫।২৬ সের পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বোধ হয় আরও কম রাখিলে এবং যথোপযুক্ত সার ও রস বৃক্ষ প্রাপ্ত হইলে, একমণও হইতে পারিত। ফলে পঞ্চাশ হইতে চারি পাঁচ শত বা ততোধিক কোষ জন্মে। সাধারণতঃ কাঁঠালের কোষ হরিদ্রাভ শ্বেত বর্ণের হইয়া থাকে। তবে কোন কোন জাতীয় কাঁঠালের কোষ শ্বেত বর্ণ বা লাল আভাযুক্ত শ্বেত বর্ণের হয়। কাঁঠাল পরিপক্ক হইলেও উহার সকল গুলি কোষই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়না। প্রত্যেক কাঁঠালের মধ্যেই দুই চারিটী বা ততোধিক কোষ চেপ্টা আকার ধারণ করে। সুপুষ্ট কোয়া অপেক্ষা এই সকল চেপ্টা কোয়াই অপেক্ষাকৃত অধিক মিষ্ট হয়। কোন কোন গাছের ফল পূর্ণরূপে উৎপাদিকা শক্তি লাভ করেনা। কোনও নৈসর্গিক কারণে পুষ্পপরাগ বিতরিত হইবার ব্যাঘাত ঘটিলেই উহা রীতিমত গর্ভ ধারণ করিতে পারেনা, সুতরাং উহার ফল কোষ উৎপন্ন করিবার শক্তিও হ্রাস হইয়া পড়ে। তদবস্থায় কাঁঠালে যথোপযুক্ত পরিমাণে কোষ জন্মেনা। অনেক স্থলেই কোষ শূন্য হয়। এইরূপ কোষ হীন কাঁঠালকে "বোন্দা" কাঁঠাল কহে।

ফল পুষ্ট হইলে উহার বহির্ভাগ কঠিনতা লাভ করিয়া থাকে। এবং ফলের উপরিস্থ কণ্টক সকলের উচ্চতা খর্ব্ব হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কণ্টকের মূল দেশের বিস্তৃতি ঘটে। কোন কোন জাতীয় কাঁঠালের বহিরাবরণের কণ্টক গুলি প্রায় সমান হইয়া যায়। এই অবস্থা ঘটিলেই উহা সুপুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কাঁঠাল সুপুষ্ট হইয়াছে কিনা, তাহা অন্যরূপেও স্থির করা যাইতে পারে। কাঁঠালের উপরে নখের পিট দ্বারা টোকা দিলে, যদি উহা হইতে ধপ্ ধপ্ বা ঢপ্ ঢপ্ শব্দ বাহির হয়, তবে উহা সুপুষ্ট হয় নাই বুঝিতে হইবে। সুপুষ্ট কাঁঠালের উপর টোকা দিলে ঠন্ ঠন্ শব্দ হইয়া থাকে। গাছে

কাঁঠাল পাকিলে কাক শালিক প্রভৃতি পক্ষী উহা হইতেই কোষ বাহির করিয়া আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। বাঁদর, শৃগাল, ভল্লুক, বাদুড় প্রভৃতি জন্তুগণও পাকা কাঁঠাল খাইতে ভাল বাসে। গাছ-পাকা কাঁঠালের অনেক শত্রু আছে বলিয়াই, উহা সুপুষ্ট হইবা মাত্রই গাছ হইতে কাটিয়া আনা হয়। তবে অধিকসংখ্যক কাঁঠাল গাছে থাকিলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কাঁঠালের কোষ মধুর, সুগন্ধ বিশিষ্ট ও সুস্বাদু। কিন্তু তন্মধ্যস্থ আঁশ গুরুপাক বলিয়া সহজে জীর্ণ হয়না। এই জন্যই কাঁঠালের কোষের আঁশ ত্যাগ করিয়া কেবল রস খাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু খাজা বা শক্ত কোষ ঐরূপে খাওয়া যায়না। গলা কাঁঠালের রস দুগ্ধ সহযোগে রসনার তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। কাঁঠালের কোষের রস দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া তাহা ঘনীভূত করিয়া লইলে উহা ফুটীর আস্বাদ যুক্ত ও সুখাদ্য হয়। কাঁচা কাঁঠাল বা ইচড় ও কাঁঠালের বীজ সুখাদ্য তরকারী। কাঁঠালের বীজ বালিতে রক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায়। ইহা ভাজিয়াও খাওয়া যায়। কাঁঠাল বীজের ময়দাও মন্দ নহে। এই বীজ বালির খোলায় ভাজিয়া তাহা ভাজা চিড়া, লবণ, তৈল ও লঙ্কা মরিচের সহিত একত্র চূর্ণ করিয়া লইলে একরূপ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা সুস্বাদু ও মুখরোচক। কাঁঠাল ফলের কোন অংশই অব্যবহার্য্য নহে। ফলের বল্কল ও তদভ্যন্তরস্থ কোষাবরণ গবাদি গৃহ পালিত পশুর বিশেষ প্রীতিকর খাদ্য। উহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত কাঁটালের পরিত্যক্ত অংশ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ফলের মজ্জাকে স্থান বিশেষ ভোদ্দা কহে। উহা ফল বৃন্তের সহিত সংলগ্ন থাকে এবং উহাই মেরুদণ্ড স্বরূপ ফলবৃন্ত ফলের বাহিরে ও মজ্জা স্বরূপ ভিতরে থাকে। এই মজ্জার চতুষ্পার্শে কোষ গুলি সংলগ্ন থাকে। কাঁটালের মজ্জা চিরিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত রাখিয়া দিলে আবশ্যক মত ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শীত ঋতুর অবসানে কাঠাল গাছ পুষ্পিত হয়। ইহার পুষ্পে একটু সামান্য সুগন্ধ আছে; দুই তিন মাসের মধ্যেই ফল পরিবর্দ্ধিত ও সুপুষ্ট হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতেই পাকিতে আরম্ভ করে। কাঁঠাল গাছ তিন প্রকারের হয়। (১) জলদি, (২) নাবি, (৩) বার মেসে। কিন্তু কখন কখন প্রথমোক্ত দুই জাতীয় দুএকটী গাছে ক্বচিৎ দুই চারটী কাঁটাল অসময়েও দেখা যায়। আমার একটী নাবি গাছে ২।৩ বৎসর গত হইল দুইটী প্রায় ৩।৪ সের ওজনের কাঁঠাল মাঘ মাসে বেশ সুপক্কাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল; তৎপূর্ব্বে কখনই এরূপ হয় নাই, এবং এখনও আর হয় না। বারমেসে কাঁঠাল ক্বচিৎ কোন স্থানে দেখা যায়। কোষগুলিও তিন প্রকারের হয় (১) খাজা (শক্ত)। (২) গলা (বেশ নরম), (৩) দোরপা (অর্দ্ধ খাজা অর্দ্ধ গলা)। নাবি জাতীয় কোন কোন গাছের ফলের কোষই খাজা হয়, তবে সকল গাছের হয় না। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই কাঁঠাল পরিপক্ক হইয়া থাকে।

কিন্তু নাবি জাতীয় গাছের ফল আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ও থাকে। কাঁঠাল গাছের পাদদেশ হইতে স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত কাণ্ডের গাত্রে ও উহার শাখা প্রশাখাতেও কাঁঠাল জন্মে। কিন্তু কাণ্ডের গাত্রেই অধিক ও বৃহৎ ফল হয়। স্থূল শাখায় ক্ষুদ্র প্রশাখা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কাঁঠাল জন্মে। কাণ্ডের গাত্রে থোকে থোকে ফল ধরিয়া থাকে। এক একটি থোকে ৩.৪ বা ততোধিক ফলও হয়। গাছের গোড়ার ফল কখন কখন এত নিম্নে জন্মে যে উহার পরিবর্দ্ধনের জন্য মৃত্তিকায় গর্ত্ত খনন করিয়া দেওয়ার আবশ্যক হইয়া পড়ে। নচেৎ উহা পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেনা। কাঁঠাল গাছ মুকুলিত হইলে, প্রথমতঃ উহার মুকুল গাঢ় সবুজবর্ণ দেখায়। তৎপর ক্রমশঃ ফল বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিলে পুষ্পাবরক পত্র শ্বেতাভ জরদবর্ণ ধারণ করে। ক্ষুদ্র ফলকে কাঁঠালের "মুচি" বলে। প্রথমাবস্থায় মুচিগুলি পুষ্পাবরক পত্র বেষ্টিত থাকে। গাছের সকল মুচিই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেনা; কতকগুলি শুষ্ক হইয়া পড়ে ও পচিয়া যায়। এই শুষ্ক মুচি গুলিতে সোডা বা সাজি মাটীর কাজ হইতে পারে। গাছের শুষ্ক পত্রে উত্তম ঠোঙ্গা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁঠাল গাছ ২৫।৩০ হাত বা ততোধিক উচ্চ হয়। উহার কাণ্ডের ব্যাস ৭।৮ হাতের ও বেশী হইয়া থাকে। কাণ্ডের বল্কল ধুসর বা শ্বেতাভ ধুসরবর্ণ হয়। প্রাচীন গাছের বাকল লালাভ শ্বেত বা পাটকিলে রং-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বট পত্রের সহিত কাঁঠাল পত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার পাতা ডিম্বাকার হয়। কচি পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং পুরাতন পাতা জরদা ও সবুজ বর্ণের হইয়া থাকে। পাতা পাকিলে লালের আভাযুক্ত কমলা রং এর হয়। কাঁঠাল পাতা পাকিলেই পড়িয়া যায়।

কাঁঠাল চারা রোপণের পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই গাছে ফল ধরে। দোআঁশ, বালি, লাল মৃত্তিকা, ও কঙ্করময় ভূমিতেই কাঁঠাল গাছ বেশ জন্মে। কিন্তু দোঁয়াশ ও লাল মাটীতেই গাছ গুলি বেশ স্ফূর্ত্তি লাভ করে, ও সতেজে বর্দ্ধিত হয়। উচ্চ শুষ্ক ভূমিই কাঁঠাল চারা রোপণের বিশেষ উপযোগী; সমুদ্রোপকুল হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চস্থানে ও কাঁটালের চাষ হইতে পারে। কিন্তু শীত প্রধান স্থান ইহার চাষের উপযোগী নহে। অর্দ্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে গাছগুলি সত্বরে ও সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাঁঠাল গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায়। এই জন্যই নিম্ন জমীতে কাঁঠালের চাষ হইতে পারে না। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের গাছ গুলি অধিক স্ফূর্ত্তি শীল হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থানে গাছ পালার পাতা পচিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতার হ্রাস ঘটিতে দেয়না বলিয়াই গাছের খাদ্যাভাব হয় না। ফলে গাছগুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া বহুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। পাতার সার কাঁঠালগাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। পত্রসারে ধাতব পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকায় পত্র সার ব্যবহৃত মৃত্তিকাজাত কাঁঠাল অধিক মিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে

ইহাতে কাষ্ঠের বর্ণের উজ্জ্বলতা ও গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পাতাসারের অভাবে গোময় সার ব্যবহার করা যাইতে পারে পারে।

কাঁঠাল বীজের উৎপাদিকা শক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না; কখন কখন ফলের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে; ফল অধিক পরিপক্ক হইলে তন্মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে কাঁঠালের কোষ বিস্বাদ হয় ও উহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। অধিক পরিপক্ক ফলের কোষে একরূপ হরিদ্রা বর্ণের গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ জন্মে। এই গুঁড়া যুক্ত কোষ ভক্ষণ করিবার সময় গুঁড়াগুলি জিহ্বায় কিড় কিড় করিয়া লাগে; ইহাতে স্বাদ গ্রহণে ব্যাঘাত জন্মে। সুপক্ক কাঁঠালের বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হয়। স্থূল শাখার পরিপক্ক কাঁঠালের বীজের গাছই উৎকৃষ্ট। ২০।২৫ হাত অন্তর গাছ রোপণ করা প্রশস্ত। প্রথমে হাপোরে চারা উৎপাদন করিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বীজ রোপণ করাই সঙ্গত। যে স্থানে চারা বীজ রোপণ করিতে হইবে, ঐ স্থানে একহাত গভীর ও দৈর্ঘে প্রস্থে ও একহাত একটী গর্ত্ত খনন করিয়া গর্ত্তটী সারমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। বীজ বা চারা রোপণের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এই কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। আষাঢ় মাসে প্রত্যেক গর্ত্তে ২।৩টী করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজ রোপণের ৮।১০দিন পরেই উহা অঙ্কুরিত হয়। বর্ষাকালই কাঁঠাল বীজ রোপণের প্রশস্ত সময়। বর্ষাকালে বীজ রোপণ করিলে জল সেচনের আবশ্যক হয় না। পাকা কাঁঠাল মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া রাখিলেও উহার বীজ হইতে চারা গাছ জন্মে। ইহা ৫।৬ ইঞ্চ উচ্চ হইলে তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপন করা যাইতে পারে। খনার বচনে আছে,—"গো নারিকেল নেড়ে রো। আম টেটুরে কাঁঠাল ভো॥" অর্থাৎ সুপারি ও নারিকেল চারা নাড়িয়া পুতিলে গাছ ভাল হয়, আমচারা নাড়িয়া পুতিলে ফলের আকার ছোট ও কাঁঠাল চারা নাড়িয়া পুতিলে কোষ শুষ্ক হইয়া থাকে। এই প্রবাদের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে বলা যায় না। বস্তুতঃ চারা প্রায়ই নাড়িয়া রোপণ করা হয় এবং তাহাতে ফল বেশ হইতেছে। একটী সুপক্ক কাঁঠাল মৃত্তিকায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহা হইতে বহুসংখ্যক চারা উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যে নিস্তেজ চারাগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সতেজ চারাগুলি ২।৩ ইঞ্চ বড় হইলে প্রত্যেকটী চারা বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে রাখিবে। দেড়হাত কি দুইহাত বাঁশ দুইভাগে চিরিয়া তন্মধ্যস্থ গিরাগুলি ফেলিয়া দিয়া, সুতা বা দড়ি দ্বারা বান্ধিলেই একটী চোঙ্গা প্রস্তুত হইল। তৎপরে তন্মধ্যে একটী গাছ এরূপভাবে রাখিবে যেন উহা ঠিক মধ্যস্থলে থাকে। গাছটী বড় হইয়া চোঙ্গের উপর উঠিলেই চোঙ্গটী খুলিয়া ফেলিবে ও গাছের সমগ্র কাণ্ডটী দড়ি দ্বারা পেচাইয়া বান্ধিবে। তাহা হইলে গাছগুলি শীঘ্র বড় বড় হইয়া ৫।৭ বৎসরেই ফল ধরিবে এবং কাণ্ডটী ও খুব সরল হইয়া উঠিবে।

রোপণের পর চারাগাছগুলি মৃত্তিকার বসিয়া গেলে সময় সময় গোড়ার মৃত্তিকা খোচাইয়া দিতে ও তৃণাদি নিড়াইয়া ফেলিতে হয়। গো, মহিষ, ছাগলাদির অত্যাচার হইতে চারাগাছগুলি রক্ষা করিতে হইবে। আর অন্য কোন যত্ন অনাবশ্যক। কাঁঠাল-গাছের কলম হয় না, আমি একবার জোড় কলম ও দ্বিতীয় বার গুল কলম করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছি। যদি কোন গ্রাহক মহোদয় কাঁটালের কলম করা সম্বন্ধে জানেন ও তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক "কৃষকে" লিখিলে বহু উপকৃত হইব। কাঁঠালগাছ ছাঁটিতে হয় না। ছাঁটিলে বরং অনিষ্টই হয়। ইহার ফল প্রথমে গাছের স্কন্ধে ও সরুডালে, মধ্য সময়ে স্থূল ডালে ও কাণ্ডে এবং গাছ প্রাচীন হইলে কাণ্ডে, স্কন্ধে ও গোড়াতেই অধিক জন্মে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছ অধিক ফলপ্রসূ হয়। প্রথম বৎসর ২।৪টী, তৎপর প্রতিবৎসরই ফলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক গাছে একশত হইতে ৫।৭শত ফল ধরিতে পারে। কাঁঠালগাছে মৃত্তিকার নিম্নে শিকড়েও ফল ধরিতে দেখিয়াছি। আমি দিনাজপুর জেলার অধীনে সিংভোর গ্রামে থাকা কালীন, একটী গাছে শ্রাবণ মাসে ফল নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর, হঠাৎ একদিন ঐ গাছের তল দিয়া যাইতে সুপক্ক কাঁঠালের সুগন্ধ পাওয়া গেল; অনন্তর গাছে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া কোথাও ফল দেখা গেল না, তখন গাছের মূল দেশে দৃষ্টিপাত করিতেই তৎস্থানের মৃত্তিকা ফাটিয়া গিয়াছে দেখাগেল, এবং তন্মধ্য হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতেছে। তখন আমি গৃহস্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া উক্ত স্থান খনন করাতে একটী ৩।৪ সের ওজনের ফল বাহির হইল। উহা একটী মোটা শিকড়ে জন্মিয়াছে, এবং ফলটীও ফাটিয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী বলিল পূর্ব্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। এবং আমিও পূর্ব্বে দেখি নাই।

কাঁঠালগাছের কাষ্ঠ অত্যুৎকৃষ্ট। ভারতজাত সর্ব্ব প্রকার কাষ্ঠ অপেক্ষা ইহাই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহাতে বাক্স, সিন্দুক, ডেস্ক, আলমারী, চৌকী, বেঞ্চ, টেবিল, টুল, খাট, কপাট, চৌকাট—ইত্যাদি নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। এই কাষ্ঠের বর্ণের চাকচিক্যের সহিত কোন কাষ্ঠেরই তুলনা হইতে পারে না। অধুনা ইউরোপের নানা স্থানে ইহার বিশেষ আদর হইয়াছে। প্রতি বৎসর সিংহল দ্বীপ হইতে কাঁঠাল কাষ্ঠ নির্ম্মিত বহুতর আসবাব ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে। কাঁঠাল কাষ্ঠ উজ্জ্বল পীতবর্ণের হয়। ইহা মেহগ্নী কাষ্ঠের ন্যায় পালিশ করা যায়। অধিক পুরাতন গাছের কাষ্ঠ ক্রমে ক্ষয় পাইয়া নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ কাষ্ঠের সারাংশ পচিয়া ক্ষয় পায়। তদবস্থায় গাছের অভ্যন্তরদেশ সার শূন্য হইয়া গহ্বরাকারে পরিণত হয়। কাণ্ডের উপরিস্থ বল্কল ও তন্নিম্নস্থ অসার কাষ্ঠই গাছের অবলম্বন হয়। মধ্য প্রদেশ গহ্বরে পরিণত হইলেও গাছ মরিয়া যায় না। কাঁঠালগাছ শতাধিক বর্ষও বাঁচিয়া থাকে। গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায়; তদ্ভিন্ন কোন অবস্থাতেই মরেনা। ইহার তক্তা তৈয়ারী করিতে হইলে ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের গাছ কর্ত্তন করিতে হয়। ৩০ হইতে ৫০ বৎসর

পর্য্যন্ত কাষ্ঠের সার বেশ তাহা থাকে। কোন অংশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে কীট প্রবিষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে, গাছের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সজীব গাছ কাটিলে তাহার গোড়া হইতে কখন কখন নূতন ফেকরি বহির্গত হইয়াও বর্দ্ধিত এবং ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। এইরূপ গাছ হইতে ২।৩ বৎসরেও ফল ধরে। কাণ্ডের গোড়ায় এক বা দেড় হাত রাখিয়া তির্য্যগ ভাবে গাছ কাটিলেই গোড়া হইতে নূতন গাছ বাহির হয়। ঘরে থাকিলে কাঁঠাল কাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু রৌদ্রে বক্র হইয়া ফাটিয়া যায় ও জলে বা মৃত্তিকার নিম্নে পচিয়া যায়। এই গাছের বল্কল ও ফলের বৃন্ত হইতে যে একরূপ ক্ষীর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা নিকৃষ্ট রবার প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ আঠা নেকড়াতে মাখিয়া বাঁশের কি কাঠের শলাকায় পেচাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে একরূপ মশাল প্রস্তুত হয়, এবং জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলো বাহির হয়।

কাঁঠালের চাষ বিশেষ লাভজনক। এক বিঘাতে ২০।২৫টী গাছ রোপণ করিলে ৫।৭ বৎসর পরেই ফলিতে থাকে। সপ্তম বর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি গাছে এক বা দেড় টাকা আয় হইতে পারে। এই সময় পর্য্যন্ত বাগানে আদা, হলুদ, কলা প্রভৃতি চাষ করিয়া আয়ের পথ বাড়ান যায়। ১২ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি গাছে গড়ে ৪০টী কাঁঠাল ধরিলে ও উহা গড়ে ৵০ এক আনা হিসাবে বিক্রী করিলেও প্রতি বিঘায় ৫০।৬০৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২০ বৎসরের পর প্রচুর ফলিতে আরম্ভ হইলে প্রতি গাছ হইতে ৪।৫ টাকার কম আয় হয়না। সুতরাং ১০।১২ বিঘা কাঁঠাল বাগান করিতে পারিলে, তাহার আয় হইতেই একটী পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নিঃসন্দেহে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

সম-সাময়িক জগত।

মাংস-ভুক্ উদ্ভিদ্ঃ—উদ্ভিদ্ জগতে যে সমস্ত অত্যদ্ভুদ্ বস্তু আছে তন্মধ্যে এসিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলের নেপেন্থি গাছ অন্যতম। এই শ্রেণীর একটি বৃহদাকার গাছ কতিপয় দিবস পূর্ব্বে বিলাতের উদ্যাণজাত বৃক্ষের মেলায় দেখান হইয়াছিল। কলিকাতার সন্নিহিত শিবপুর বোটানিক উদ্যাণে এই প্রকারের গাছ সময় সময় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। নেপেন্থি গাছের বিশেষত্ব এই যে, ইহার পত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া কলসাকার ধারণ করে। কলস নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ইহাতে প্রায় তিন পোয়া জল ধরিতে পারে। এই কলসের প্রধান কার্য্য পোকা মাকড় ধরা এবং তাহার জন্য ইহা বিশেষরূপে গঠিত। ইহার উপরে এক প্রকার ঢাকনি আছে। প্রবেশদ্বার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, তদ্ভিন্ন কলসের মুখের কাছেই মধু সঞ্চিত আছে। রূপ, রস ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কীটবৃন্দ কলসে প্রবেশ করে, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলেই তাহাদের প্রাণান্তক ভ্রম বুঝিতে পারে। তখন আর পরিত্রাণের উপায় নাই। কারণ মধুবেষ্টনীর পরই কলসের গাত্র এত পিচ্ছিল যে কোন কীট অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই একবারেই পিছলাইয়া নিচে পড়িয়া যায়। কলসের নিম্নভাগে এরূপ একপ্রকার রস সঞ্চিত থাকে যে কীটপতঙ্গ উহাতে পড়িলেই পরিপাক হইয়া যায়। মাংসভুক্ উদ্ভিদের ইহাই প্রিয় আহার্য্য। অদ্যাবধি এই শ্রেণীর প্রায় ৫০০ উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঝুম চাষঃ—অনেক পাহাড়ী স্থানে জমির উপরের উদ্ভিদাদি পোড়াইয়া দিয়া চাষ হয়। ইহাকে আসাম ও তরাই অঞ্চলে ঝুম চাষ বলে। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তির অপচয় হয় বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু মার্কিণে এ সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে ঝুম চাষে জমি অনাবৃত হইয়া সূর্য্যোত্তাপে অধিকতর পরিমাণে দ্রবণীয় সার সংগ্রহ করিতে পারে। নিকৃষ্ট জমির প্রধান লক্ষণ এই যে উহাতে আগাছার মাত্রা অত্যধিক। কিন্তু পোড়ান জমিতে আগাছাও তেমন অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। চারি বৎসর সাধারণ ও পোড়ান জমির তুলনায় পরীক্ষায় পোড়ানোর তেমন অপকারজনক ফল দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে পোড়ান জমিতে বরং ফসল একটু জলদি হয়। অবশ্য স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে আরও অধিককালব্যাপী পরীক্ষা দরকার।

নারিকেল ছোবড়া হইতে কাগজঃ—নারিকেল ছোবড়া হইতে যে উৎকৃষ্ট দড়াদড়ি হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ইহা হইতে কাগজও প্রস্তুত হইতে পারে। ফিলিপাইনস্ দ্বীপে নারিকেলের কারবার বেশ বড়। সেখানে

বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ টন নারিকেল ছোবড়া পাওয়া যায়। ছোবড়া শুষ্ক করা, চাপদিয়া সোজাকরা ও গাঁট বাঁধার খরচ প্রভৃতি আজকাল কিছু বেশী পড়িতেছে, কিন্তু রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন খরচ কমা সম্ভব পর। কাষ্ঠ পিণ্ড (wood pulp) যে দরে উৎপাদন করা যায়, সেই দরে নারিকেল ছোবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কাল তাহাই সাধারণ বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আখরোট ব্যবসা। এতদ্দেশে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে ও হিমালয় প্রদেশে আখরোটের গাছ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়। প্রায় প্রত্যেক সমৃদ্ধ গৃহস্থেরই ২।১টি আখরোট গাছ আছে। বস্তুতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে আখরোট বঙ্গদেশে আমের স্থান অধিকার করে। কিন্তু আমের ন্যায়ই আখরোটের সব সময় সদ্ব্যবহার হয় না। চীনেরও অবস্থা আমাদের দেশের ন্যায়, তবে চীনে অনেকটা আখরোট সদ্ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। চীন হইতে খোসা ছাড়ান ও আস্ত, উভয় প্রকারের আখরোটই বিদেশে চালান যায়। ছাড়ান আখরোটের দুই প্রকারে চালান হয়—১ম প্রকার, খোসা ছাড়ানর পূর্ব্বে গরম জলে ডুবাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে শাঁষের ক্ষতি হয়। শুকান আখরোট ভাঙ্গিয়া শাঁষ বাহির করাই প্রশস্ত। তাহাতে স্বাদের ইতর বিশেষ হয় না এবং বিদেশীয় বণিকেরা তাহাই পছন্দ করেন। ছাড়ান আখরোট ৫০ হইতে ১০০ পাউণ্ডের বাক্সে চালান যায়। খোশা সমেত আখরোট ১০২ পাঃ—বস্তায় চালান যায়। উৎকৃষ্ট জাতীয় আখরোট কাশ্মীর ও সিমলা পার্ব্বত্য প্রদেশের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন নিম্নশ্রেণীর আখরোটের উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অভাব নাই। বলা বাহুল্য যে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিগণ যদি এই কাজে মনোনিবেশ করেন তবে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। ফল ব্যতীত আখরোটের গুঁড়ির কাঠের বিদেশে আদর আছে। সে কাজ কিন্তু আজকাল প্রধানতঃ সাহেবদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

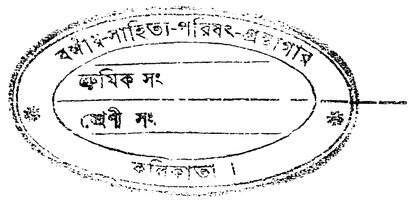

দেশের ও দশের কথা।

পুষার কৃষি-গবেষণাগার :—পুষার এই গবেষণাগারের ১৯২২-২৩ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে গত বৎসর জমিতে সোরাজান-ঘটিত পদার্থ চলাচলের পরীক্ষা অনেকটা সফল হইয়াছে। এতদ্বারা কোন শ্রেণীর জমিতে সোরাজানঘটিতলবণ কি প্রকারে ও প্রথায় সঞ্চারিত হয় তাহা জানিতে পারা যায়। সবুজ সার সম্বন্ধেও কতিপয় পরীক্ষা হইয়াছে। পুষায় যে উন্নত জাতীয় গোধুম প্রচলন করা হইয়াছিল তাহা নীলগিরি, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি প্রদেশে উৎপাদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিঘা প্রতি প্রায় তিন টাকা সাধারণ গোধুম অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়। গবেষণাগারের আয় ব্যয় যথাক্রমে ৪,৬০,০০০৲ ও ৮ লক্ষ টাকা।

গোপালন সম্বন্ধীয় উপাধি :—বাঙ্গালোরে Imperial Institute of Dairying and Animal Husbandry আছে। তাহাতে বিশেষ ভাবে গোপালন, প্রজনন, দুগ্ধ-উৎপাদন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিতেছেন যে এই ইনষ্টিটিউটের কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে বিলাতের National Diploma of Dairying র সমতুল্য একটি উপাধি প্রদান করিবেন। এই প্রকারের বিদ্যালয় একটি নয়, বহুল পরিমাণে স্থাপিত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়।

পাট পচান জল :—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে অবশেষে পাট পচান জলের অপকারিতার উপর গবর্ণমেণ্টের নজর পড়িয়াছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্যবিভাগের বড় কর্ত্তা Communique প্রকাশ করিয়াছেন যে অতঃপর ইউনিয়ন বোর্ড ইচ্ছা করিলে গ্রামের মধ্যে যে কোন পুষ্করণী অথবা জলাশয় সাধারণের পানার্থ অথবা রাঁধিবার জল পাইবার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবেন। সেইরূপে নির্দ্দিষ্ট জলাশয়ে পাট পচাইলে অথবা অন্য কোন-রূপে জল দূষিত করিলে অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। এতৎসম্বন্ধে সরকারী অনুসন্ধান কমিটি কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে পাট পচানর জন্য গ্রামে নানা প্রকার ব্যাধির ব্যাপ্তি হয়। এতদিন পরে হইলেও গবর্ণমেণ্টের যে এদিকে নজর পড়িয়াছে তাহা সুখের বিষয়। এখন ইউনিয়ন তৎপর হইয়া জলাশয়াদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে অনেক লোকই অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

ফলের চালান :—সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আপেল ফলের চালান সর্ব্বপ্রথম বিলাতে গিয়া পৌছিয়াছে। চালানের পরিমাণ তত অধিক নয়। মোটে ২

বাস্ক। বিলাতে কি দরে এই প্রকার আপেল বিক্রয় হয় তাহা দেখিবার জন্যই এই চালান হইয়াছিল। হিমালয় ক্রোড়ে ৭০০০ ফুট উচ্চ স্থানে বহু বিস্তৃত বাগিচায় ইহা উৎপাদিত হইতেছে এবং অচিরে বড় বড় চালান বিলাতে ও অন্যান্য বিদেশীয় বাজারে যাইবে। কাঁচা ও সংরক্ষিত ফল শিল্প ধনাগমের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ক্যালিফোর্ণিয়ায় এতদ্বারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জিত হইতেছে। সুখের বিষয় যে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের দেশের কতিপয় সাহেব ও দেশীয় ব্যক্তি বেষ্টিত আছেন। **ভারতের উদ্ভিদ্।**—ভারতের কোন স্থানে কি উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। উহার নাম Botanical Survey of India। ১৯২২-২৩ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে উক্ত বিভাগের জন্য মোট ২৭,১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। খরচ বাদে ১০,২৭,৭৯১৲ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরে যে ব্যবহারিক বিভাগ (Industial Section) আছে তাহা এই বিভাগের অন্তর্গত। তাহাতে ও Suovey তে খরচ পড়িয়াছে ৫৩,০০০৲ টাকা। কিন্তু সর্ব্বাধিক খরচ সিঙ্কোনা চাষ ও কুইলিন্ প্রস্তুতের জন্য। এই খাতে ব্যয় হইয়াছে ১৬,৮৬,২০৮৲ টাকা। Botanical বিভাগের উল্লেখ যোগ্য কার্য্য, সিঙ্কোনা চাষ। ম্যালেরিয়ার প্রভাবের জন্য ইহার প্রচুর উৎপাদন অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। সিঙ্কোনা পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং অঞ্চলে উৎপাদিত হইত। এখন ব্রহ্মদেশে চাষ বাড়াবার চেষ্টা চলিতেছে। ব্রহ্মের মারগুই জেলায় যে চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা তেমন সফল হয় নাই। সেইজন্য টাভয় জেলায় নূতন বাগিচা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এস্থলে সিঙ্কোনা চাষের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হইতেছে। এখানে কচি গাছের ছালেই বাংলায় উৎপাদিত গাছ অপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় কুইনাইন্ পাওয়া যাইতেছে। কুইনাইনের আবশ্যকতা যে কতদূর তাহা এইমাত্র বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে গত বৎসর ববদ্বীপ হইতে ৪ লক্ষ পাউণ্ডের উপরও সিঙ্কোনা ছাল ক্রয় করিতে হইয়াছিল। সিঙ্কোনা চাষ ব্যতীত নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও সম্পাদিত হইয়াছিল—আর্টিমিশিয়া জাতীয় গাছ হইতে স্যাণ্টোনিন উৎপাদন ও বিশুদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা।

কৃষি বোর্ডের বাৎসরিক অধিবেশন ঃ—আগামী ২১শে হইতে ২৬শে জানুয়ারী বাঙ্গালোর সহরে এবার কৃষি বোর্ডের অধিবেশন হইবে। সমালোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত গুলির বিশেষ উল্লেখ করিতে পারা যায় ঃ—সমবায় সমিতি সমূহ দ্বারা কৃষির উন্নতি; পশু প্রজনন ও দুগ্ধ উৎপাদন শিক্ষার বিদ্যালয়ের সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির সহযোগীতা; পুষা, কর্ণূল, বাঙ্গালোর ও ওয়েলিংটণে অবস্থিত পশু প্রজনন ও দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষেত্র গুলির বর্ত্তমান অবস্থা; তুলা চাষ ও ব্যবসায়; শর্করা উৎপাদন এবং উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদির বহুল প্রচার।

পত্রাদি।

(জিজ্ঞাসার উত্তর)

জনৈক গ্রাহক মহোদয় কলা গাছের জাতি ও পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ— তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে সাধারণতঃ কাঁটালি, কালিবউ, চাঁপা, চাটিম্ বা মর্ত্তমান, ডেউরে ও কাঁচকলা এই কয় জাতিরই চাষ হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও বাগানে কানাইবাঁশী এবং কাবেল কলা ও সখ্ করিয়া বসান হইয়া থাকে। এ গুলি ছাড়া কয়েক জাতীয় বিদেশী কলাও এদেশে আসিয়াছে। ভারতীয় কৃষি সমিতির নিকট তাহাদের সন্ধান পাইবেন; তবে উহাদের এদেশে বহুল ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই।

গাছ দেখিয়া কলার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁটালি এবং কালিবউ উভয়ে প্রায় একজাতীয়। গাছের ডাঁটা ও পাতা অন্যান্য জাতীয় গাছের ডাঁটা ও পাতা হইতে অপেক্ষাকৃত কাল, তবে কালিবউ একটু তেজাল গাছ হয় এবং কাঁটালি একটু সরু গাছ হইয়া থাকে। কালিবউর কলা বড়, কাঁটালির কলা ছোট, এবং কালিবউ অপেক্ষা কাঁটালি কলায় বিচির পরিমাণে বেশী হয়।

চাঁপাকলার পাতা ও ডাঁটা অনেকটা লাল হয়, এবং কলাতে একটু টক্‌রস আছে। নূতন পাতা বাহির হইবার সময় ইহার বর্ণ বেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চাটিম্ বা মর্ত্তমান কলার পাতার ডাঁটার দুই দিকে দুইটী লাল রেখা থাকে; এবং কলাও বেশ সুমিষ্ট। চাঁপা কলার একটী বিশিষ্ট গন্ধ আছে, উহা দ্বারা কলা পাকিলেই দূর হইতে জানাইয়া দেয়। ডেউরে কলার গাছ খুব তেজাল ও মোটা হয় এবং পাতা পুরু ও কালিবউ হইতেও অপেক্ষাকৃত কাল হয়। মোচাগুলি খর্ব্বাকার এবং কলায় বিচি-ভরা। কাঁচকলার গাছ প্রায় কালিবউ বা কাঁটালির মত, তবে অপেক্ষাকৃত সরু এবং পাতার বর্ণও অনেকটা ফরসা। কলার আয়তন সকল কলা হইতে বড়। কানাইবাঁসী ও কাবেল কলার গাছ খর্ব্বাকার, পাতার দৈর্ঘ্যও বেশী হয়না।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষক-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,—

আমার নিজের ক্ষেত্রে কিছু কপির চারা বসাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, কতকগুলি করিয়া চারা প্রাতেই ঝিমাইয়া পড়ে। গোড়া খুড়িয়া দেখিলাম, লাল পিপড়া গাছের গোড়ায় চারিদিকে ঘিরিয়া, গাছের গায় মুখ লাগাইয়া রস খাইতেছে। যে গাছটির এইরূপে পিপড়ায় রস খায়, সেই গাছটীই প্রথমে ঝিমাইয়া পড়ে, পরে ক্ষত স্থানটী একেবারে কাটিয়া গিয়া গাছটী দুই টুকরা হইয়া যায়। অনেকচেষ্টা করিয়াও ক্ষেত্র হইতে পিপড়া দূর করিতে পারিতেছি না। এমন কোনও দ্রব্য কি নাই, যাহা প্রত্যেক গাছের গোড়ায় মাটী খুড়িয়া ভিতরে দিয়া দিলে, গাছেরও অপকার হইবেনা অথচ পিপড়া গুলি পালাইবে। যদি আপনাদের নিকট কোনও preparation থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন।

(ভারতীয় কৃষি সমিতির Insect killer নাতক ঔষধে উপকার দর্শিতে পারে। সমিতির আফিসে লিখিলে উক্ত ঔষধ পাইতে পারেন।—কৃঃ সঃ)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্ সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারসলি (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূল জ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুগাছে মাটী দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে, ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলুক্ষেত্রে এ মাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সংখ্যা
শ্রেণী সংখ্যা

কৃষক

২৪ খণ্ড | কৃষক—পৌষ, ১৩৩০ সাল। | ৯ম সংখ্যা

'কৃষকে'র নিবেদন।

—:*:—

যে দেশের প্রায় চারি-পঞ্চমাংশ ভাগ অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে চায় এবং বাঁচিয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কৃষকেরই দেশ। শিক্ষার বিস্তারের অভাবে, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষকেরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার মত আপনাদের কৃষিপ্রণালী জানিবার এবং বুঝিবার অবকাশ ও শক্তি পায় নাই, তাই আজিকালিকার প্রতিযোগিতার বাজারে তাহারা দুর্ব্বল ও পশ্চাৎপদ। অন্যে আসিয়া তাহাদের ধনে ধনী হইতেছে, তাহারা বিস্মিত নেত্রে শুধু দেখিতেছে মাত্র। কেহই তাহাদের দুঃখে দুঃখিত নয়, কেহই তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হয় না, কেহই তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়না,—যে পথে চলিলে প্রতিকার করা যায়। তাহারা প্রথমে ভূস্বামীগণের উপর নির্ভর করিয়াছিল, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া তাঁহাদের অনেকেই এই দুর্ব্বল জীবগণের বিনাশের পথই খুলিয়া দিয়াছেন।

আমাদের 'কৃষক' এই সকল বুঝিয়া আজ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসরাধিকাল দেশের লোকের চক্ষু ফুটাইবার জন্য, প্রকৃত সমস্যা কোথায় তাহা দেখাইবার জন্য, ওই পথ ধরিয়া দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের এই পঁচিশবৎসরের চেষ্টায় যে কিছু ফল হয় নাই এমন কথা বলা যায়না। আমরা দেশবাসীর সহানুভূতি পাইয়াছি, এবং

আজও তাই আমাদের 'কৃষক' তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইবার শক্তি সামর্থ্য রাখে; নতুবা আপাতঃতৃপ্তিকর গল্প উপন্যাস বা নায়ক-নায়িকার প্রণয় সম্ভাষণের বার্ত্তাবহন না করিয়া, শুধু মাটি, সার, ফসল, চাষ, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নীরস বিষয় সকলের আলোচনা করিয়া এতদিন 'কৃষক' বাঁচিত কি না, সন্দেহ। সেজন্য আমরা সকলেরই কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে চাহিয়া, যখন বিদেশীয় বণিকগণ 'আর কর্ম্ম নাই' বলিয়া পূর্ব্বে আদরে গৃহীত কর্ম্মচারীগণকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে বিদায় করিতেছেন, যখন তাহাতেও অনেকের 'চাকরী'র মোহ কাটিতেছে না,—ঘরের টাকা পরের ঘরে জমা দিয়াও এখনও 'চাকরী' সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত,—কেহ বা উপায়ন্তর দেখিতে না পাইয়া ওইপ্রকার ছুটাছুটি করিতেছেন,—তখন আমরা বেশ বুঝিতেছি, আমাদের 'কৃষক'কে এখনও অনেক কাজ করিতে হইবে। তাহাকে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের দুয়ারে ছুটিতে হইবে, প্রণয়কাহিনীর চেয়েও মিষ্ট ক্ষুধার অন্নেরকাহিনী, যাহা সে এতকাল কহিয়া আসিতেছে, আজ তাহা প্রতি দ্বারে দ্বারে গাহিতে হইবে, তাহাকে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত করিতে হইবে। দেশকে দেখাইতে হইবে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ কোন দিকে। কিসে সত্য সত্যই দারিদ্র্য ঘুচে,—ক্ষুধার অন্ন জুঠে, লজ্জা ও শীত নিবারণের বস্ত্র মিলে।

শুধু কৃষি, কি শুধু শিল্প, অথবা শুধু বাণিজ্য,—পৃথক্‌ভাবে কেহই দুর্দ্দশা মোচন করিতে পারে না। সকলের সহিত সকলের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা চাই। তাইত ওলন্দাজেরা বহুব্যয়সাধ্য বাঁধের দ্বারা সমুদ্রস্রোত প্রতিহত করিয়া জলের উপরিতল অপেক্ষা নিম্ন তীরভূমিতে চাষ আবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কৃষিকে প্রসারিত করিয়াছে, যাবাদ্বীপ প্রভৃতি উপনিবেশেও নূতন নূতন চাষ আবাদের সৃষ্টি করিয়া বাণিজ্যকে প্রবল এবং দেশকে ধনী ও অন্নপূর্ণা করিয়াছে। তাইত ইংরাজেরা দেশে প্রচুর চাষযোগ্য জমি না পাইয়া উত্তরবঙ্গে, আসামে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্যোপযোগী নানাবিধ চাষের ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের দেশের জন্য ধনার্জ্জন করিতেছেন। তাইত ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিসকল চাষআবাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপনে এত সচেষ্ট। অষ্টেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড সমগ্র আমেরিকা সকলইত চাষআবাদের জন্য, শিল্পের নিমিত্ত, পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের জন্য সৃষ্ট উপনিবেশ। আমাদের 'কৃষক' তাই একাধারে চাষী, শিল্পি এবং বণিক,—সকলেরই কথা কহে; তবে শিল্পই বল আর বাণিজ্যই বল, সকলেই উৎপাদনের—কাঁচামালের দিকে চাহিয়া আছে, তাই তাহার প্রধান কথা 'কৃষি' এবং সে 'কৃষক'। আমাদের দেশের কৃষকের জাতি নাই,—আমরা দেখিয়াছি ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জাতির মধ্যেই চাষী আছে,—তাই আমাদের 'কৃষকে'র ও জাতি নাই—সে চাষী, শিল্পি এবং বণিক। প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত নীতিশিক্ষার কথাও সে কহে এবং কহিবেও।

'কৃষক' এখন তাই সকলের দুয়ারে পঁহুছিতে চায়, সকলের পাশে দাঁড়াইতে চায়। আরও বিস্তৃতভাবে দেশের সেবা করিবার প্রয়োজন তাহার আসিয়াছে। কিন্তু সহায়তা এবং সহযোগিতা ভিন্ন তাহা সম্ভব হইবে কি? দেশের কাছে তাই তাহার সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য এই আবেদন। দেশবাসী তাহাকে সুযোগ দিন,—পথ দিন,—সে যেন প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক মণ্ডলীতে যাইতে পায়। যদিও দেশে লিখনপঠন বিদ্যার বিস্তৃতি খুব নাই, যদিও উহা একটী আমাদের বিশেষ অন্তরায়, তবুও একজনে পড়িয়া দশজনকে শুনাইয়াও শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে।

কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত কোনও দেশের অন্নসমস্যার সমাধান হয় নাই, এবং হইতে পারেও না। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে, ইউরোপে যে এই প্রকার 'বেকার' সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, অনেক দেশেই নব নব কর্ম্মক্ষেত্রের,—কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের এবং সেই সঙ্গে নূতন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহাদের মিমাংসা হইতেছে, একথা সংবাদপত্রের সাহায্যে সকলেই জানিয়াছেন। কর্ম্মের প্রসারণই তথাকথিত সমস্যার মিমাংসা। কর্ম্ম বলিতে অবশ্য ভিক্ষা কে বুঝাইবেনা।

যে এক বিঘা জমিতে আজ চারি কি পাঁচ কুড়ি ধান ফলে, উন্নতপ্রথায় চাষ করিয়া সেখানে অনেক বেশী ফলাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল মাঠ, জঙ্গল, বিল ও পুষ্করিণী আজ পতিত ও অব্যবহৃত, তাহাদিগকে কেমন করিয়া ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে অন্নমুষ্টি সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এংলোইণ্ডিয়ানগণের মধ্যে 'বেকার'-সমস্যার মিমাংসার জন্য যে চেষ্টা দেখিতেছি,—ভারতগবর্ণমেণ্টের কাছে 'ডেপুটেশন' পাঠান, আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপন ও কৃষি-শিল্পের এবং বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিতেছি, আমাদের দেশের মধ্যবিত্তগণের জন্য ত সে চেষ্টা দেখিতেছিনা? সুন্দরবন জমা লইয়া অনেক জমিদার ত প্রজার অভাব বোধ করিতেছেন, তাঁহারা কেন এতদনুরূপ একটু চেষ্টা করুন না। দেশের উন্নতির জন্য প্রাণ পণ করিয়া যাঁহারা চিৎকারে গগন ফাটাইতেছেন, কাউন্সিলে ঢুকিবার চেষ্টায় যাঁহারা অনেক অর্থব্যয় করিলেন, কেহ বা বৃথা ও ব্যয় করিলেন, তাঁহারা কি চেষ্টা করিয়া এই প্রকার বা অন্য কোনও প্রকার অনুষ্ঠান করিতে পারেন না? দেশের ব্যথা প্রাণে যদি সত্য সত্যই বাজিয়া থাকে তবে তাঁহাদের কার্য্যেই তাহা ব্যক্ত হইয়া উঠিবে। দেশের শ্রমিক-সমিতি গুলিকেও আমরা এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যালয় গুলি হইতে সদ্য নিষ্ক্রান্ত এবং কঠোর প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিঘ্নসঙ্কুল জীবিকার্জ্জনের পথ দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত কোমলপ্রাণ বাংলার যুবকবৃন্দ! আজ তোমরা প্রণয়কাহিনীর আলোচনা করিবে কি ক্ষুধার অন্নের কথায় মনোনিবেশ করিবে? দশ টাকার কি পনের টাকার চাকরীতে বসিয়া গল্প-উপন্যাসের মধ্যে সুখ খুঁজিবে, অথবা

মণ্ডী-সার-ফসল, উৎপাদন-বাহন-বিনিময়ের আলোচনা করিতে করিতে একত্রিত হইয়া আবাদে, জঙ্গলে, খালে, বিলে, বাজারে ও কর্ম্মশালে অন্নমুষ্টি সংগ্রহের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িবে? 'কৃষক' তোমাদিগকে আপনার বলিয়া আহ্বান করিতেছে।

আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও শ্রোতৃবর্গ সকলেরই সহানুভূতি এবং সাহায্য আমাদের আরব্ধ ব্রতের উজ্জাপনের জন্য—গৃহীত কর্ম্মের সাফল্যের জন্য—উপযুক্ত সময়ে প্রকৃত দেশ সেবার জন্য প্রার্থনা করি।

* * * * * *

বড়ই দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, পূর্ব্বে সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র মহলে যে একটা পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা ছিল, বর্ত্তমানে কোন অজ্ঞাত কারণে উহাতে শৈথিল্য দেখিতে পাইতেছি। সঙ্ঘ একটি হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সহযোগিতার প্রকাশ দেখিতে পাই না। কেহ কেহ—বোধ করি 'কৃষকে'র সঙ্গ দোষে ভদ্রতার হানি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া—অদ্যাপি তাঁহাদের সহযোগিতা হইতে 'কৃষক' কে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আশা করি এ শৈথিল্য শীঘ্রই বিদূরিত হইবে. আমরা সকলের সহযোগিতা লাভ করিয়া সুখী হইব।

* * * * * *

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অনেক সময়ে অনেক দেশীয় সংস্কার ও প্রাচীন অভিজ্ঞতার উদ্ধার সাধন এবং প্রচার হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা সকলকে সেই সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের সুযোগ দেয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক এবং শোতৃবৃন্দ কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন এবং উহার উত্তর পাঠাইলে অতঃপর তাহা নিয়মিত ভাবে 'কৃষকে' প্রকাশিত হইবে। প্রশ্ন গুলি সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত হইবে, সুতরাং উত্তরগুলিও সেই ক্রমানুসারে পাঠান দরকার। প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়ই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* * * * *

কৃষক—পৌষ, ১৩৩০ সাল।

ঘরের ও বাহিরের কারবারের কথা।

এদেশে যে পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে, তাহাতে উহার উন্নতি বিধান যথেষ্ট সময় এবং শ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ। ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্রই কৃষির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছেও। সেখানে কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন ও সেচন প্রভৃতি শস্যোৎপাদনের যাবতীয় কর্ম্ম উন্নততর প্রণালীতে এবং অনেক পরিমাণ জমিতে একসঙ্গে সাধিত হইয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও তদনুপাতে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশের দরিদ্র কৃষক এক বন্দে অনেক জমি চষে না, বা চষিবার সামর্থ্য ও তাহার নাই। সুতরাং উন্নত প্রণালীতে চাষ করিতে তাহাদের বেশী খরচ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, অতএব তাহাদিগকে নূতন পথ ধরাইবার চেষ্টা যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে তাহা আশা করিতে পারি না। তবে যদি দেশের ধনী ও জমিদারগণ এবিষয়ে একটু সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত উন্নতি সাধন অনেকটা সহজ হইতে পারে; অথবা কৃষক ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীগণ যদি সমবায় প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ও এপক্ষে যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

অল্পব্যয়ে অধিক উৎপাদন করিতে হইলে যে সকল উন্নত উপায় অবলম্বন করা

একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার সাফল্য কিছু অধিক মূলধন লইয়া একবন্দে অনেক পরিমাণ জমি চাষ করিবার উপর নির্ভর করে। উন্নত প্রণালীর যন্ত্র ও অস্ত্রাদির মূল্য যেমন অধিক, তেমনি একবন্দের অনেক জমি একসঙ্গে শীঘ্র চাষ করিয়া দিয়া উহারা উৎপন্ন ফসলের অনুপাতে আপনাদিগের মূল্য হ্রাস করিয়া থাকে। সুতরাং সমবায় প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন উল্লিখিত উৎকর্ষ সাধন প্রায় অসম্ভব। তবে যদি কোন ধনী ব্যক্তির একবন্দে অনেক জমি থাকে এবং তিনি উৎকৃষ্টতর হলাদির সংগ্রহ জন্য ব্যয় করিতে সচেষ্ট থাকেন, ও উৎপন্ন ফসল হইতে নানাবিধ জিনিস প্রস্তুতের শিল্পপ্রতিষ্ঠায়ও পশ্চাৎপদ না হন, তবে তিনি একাকী ও কিছু উৎকর্ষ সাধন করিতে এবং সেই সঙ্গে সাফল্য লাভ করিতে পারেন।

এপর্য্যন্ত কতকগুলি কৃষি-শিল্প সমবায়ও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মনে হয় তাঁহাদের পরিচালনযোগ্যতার অথবা উপযুক্ত অর্থের অভাবই তাঁহাদের এপর্য্যন্ত কোন বিশেষ কার্য্য না করার কারণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিৎ, সম্ভবতঃ অনেক পরিচালক তদ্বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। সুতরাং উহাদের বিশেষ আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

এদেশে বর্ত্তমানে অনেকগুলি জমিদারী কোম্পানী ও আছেন, এবং তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকালে যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া নামিয়া ছিলেন, পরে তাহাদের কোনটীরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু প্রজাবিলি এবং খাজনা সংগ্রহ মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিতেছেন। জমির বাস্তবিক কোন উৎকর্ষ সাধন করেন নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, ভারতের বাহিরে কি কি উপায়ে কৃষির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বিষয়টীর উদ্দেশ্য বিবৃতি পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিবে।

বৃষের পরিবর্ত্তে হল বাহনাদি কার্য্যে ঘোড়ার ব্যবহার সকল দেশেই প্রভূত কার্য্যকর হইয়াছে। ঘোড়া বৃষের অপেক্ষা দ্রুত কর্ম্মশীল, অথচ বৃষের মত অল্প শ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়ে না। উৎকৃষ্ট প্রণালীর ভারী লাঙ্গল টানিতে বৃষ অপেক্ষা ঘোড়াই অধিক কার্য্যকর এবং তদ্বারা একসঙ্গে অল্প সময়ে অনেক পরিমাণ জমি ভালরূপ কর্ষিত হইয়া থাকে। গোমহিষাদির মলমূত্র অপেক্ষা ঘোড়ার মলমূত্র যথেষ্ট সারবান পদার্থ, এবং উহার ব্যবহারে গোময় সার অপেক্ষা জমির উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া থাকে।

তবে জলমগ্ন জমিতে চাষ দিতে বৃষই অধিক কার্য্যকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চেষ্টা করিলে ঘোড়ার দ্বারা ও ঐ কার্য্যে ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে।

চাষযোগ্য জমির জন্য জল সেচের ব্যবস্থা অন্যান্য দেশে এদেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আবশ্যক মত ক্ষেত্রে 'পম্প' প্রভৃতির ও 'টিউবওয়েল' বা নল কূপের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তাহাতে অল্পশ্রমে—সুতরাং অল্পব্যয়ে অনেক পরিমাণ জমির সেচন কার্য্য একসঙ্গে শীঘ্র সাধিত হয়।

অন্যান্য দেশে শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রমিকগণের দৈনিক কার্য্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং আবশ্যক হইলে উহাদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া মৌখিক শিক্ষায় তাহাদিগকে উন্নত প্রণালীর শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশে পরিচালকগণ প্রায়ই আলস্যপরায়ণ; 'সুপারভিশন্' বা সকলের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য পরিচালনা ও যথা সময়ে কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা তাঁহারা প্রায়ই করেন না। অনেকে হয়ত দূরবর্ত্তী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাত্যহিক পরিদর্শন ত দূরের কথা, বৎসরে দুই তিনবার পরিদর্শনে যাইবার ও অবকাশ পান না। আমি নিজে অনেক দেশীয় ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়া দেখিয়াছি, পরিচালকগণের আলস্য, ঔদাসীন্য বা অজ্ঞতাই তাহাদিগের অসাফল্যের কারণ হইয়াছে।

কর্ম্মক্ষেত্রের কোন জিনিসেরই অপচয় হওয়া উচিৎ নহে। ভিন্ন দেশীয় 'ফার্ম্মার' বা ব্যবসায়ীগণ এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীগণের এই বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য থাকে বলিয়া মনে হয় না। বরং অনেক সময়ে উৎপন্ন দ্রব্যের ও যথোচিত যত্ন না লওয়ার জন্য অপচয় হইতে দেখা গিয়াছে।

বাজারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের উৎপাদকগণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। এখানে উহার সম্পূর্ণ অভাব আছে। উৎপন্ন বস্তুর রপ্তানী এবং আবশ্যকীয় বস্তুর আমদানীর জন্য অন্যান্য দেশে যানবাহনাদিও উন্নত প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া থাকে। রেলপথ বা জলপথ প্রায় সকল ক্ষেত্রেরই সহিত সংযুক্ত। ক্ষুদ্র খাল বা শাখারেলপথ গুলি কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত বড়নদী বা বিস্তৃত রেলপথের সংযোগ সাধনে সহায়তা করে। ভারতের বাহিরে অনেক দেশে কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য অল্পব্যয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীর শাখারেল-পথের প্রতিষ্ঠা ও ব্যবহারদেখা যায়।

সমান্তরাল ভাবে এবং বরাবর নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে হাল্কা লৌহের রেল পাতিয়া পথ প্রস্তুত করা হয়। দুইটী রেলের মধ্যবর্ত্তী স্থান ঘোড়া চলিবার মত প্রস্তুত করা হয়। ঐ রেলের উপর দিয়া চলিবার জন্য রেলগাড়ীর চাকার মত অপেক্ষাকৃত হাল্কা চাকার উপর আবশ্যকমত এক হইতে পাঁচ টন পর্য্যন্ত ভারবাহী লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত গাড়ী বসাইয়া তাহার সাহায্যে দূর দুরান্তরে মালপত্র বাহিত হইয়া থাকে। উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ অনুসারে, কোথাও গাড়ীগুলি ঘোড়ার দ্বারা চালিত হয়, কোথাও বা ক্ষুদ্র 'অয়েল এঞ্জিন' কি 'ষ্টীম এঞ্জিন' বা 'ট্রাক্টার' দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকারের রেলপথ নির্ম্মাণে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন হয় না; অথচ এইরূপ একটী ২০।২৫ মাইল দীর্ঘ রেলপথ অনেক 'ফার্ম্মের' বা কর্ম্মক্ষেত্রের সহায়তা করিয়া অনায়াসে পরিচালিত হইতে পারে। যে সকল জেলায় অধিবাসীসংখ্যার বা উৎপন্ন বস্তুর প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া বহুমূল্য রেলওয়ে পরিচালিত হইতে পারে না, তথায় এই প্রকারের শাখা রেলপথের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিৎ। ইহারা ক্ষুদ্র পল্লী ও কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত বৃহত্তর রেল-

ওয়ের বা পোতাশ্রয় বিশিষ্ট নদীর সংযোগ সাধন করিয়া ব্যবসায়ের প্রসারণে সহায় হইবে, এবং অল্পব্যয়ের ও অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিবে। সময়ের সদ্ব্যবহার না করিতে পারিলে আশানুরূপ উন্নতি লাভ হয় না বলিয়া সর্ব্বত্রই সত্তর গমনাগমনের নানাবিধ উপায় আছে; শুধু নাই আমাদের মত এই নিদ্রিত মানুষের দেশে।

জলপথেও সত্তর যাতায়াঁতের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু মনুষ্যচালিত নৌকাতেই সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। তজ্জন্য 'ষ্টীম' বা 'অয়েল এঞ্জিন' চালিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ নৌকার ব্যবস্থা রাখা উচিৎ।

অল্প সংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে শীঘ্র অনেক কর্ম্ম করাইবার জন্য অন্যান্য দেশের কৃষি কর্ম্মে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকলের ব্যবহার ও সময়ের সদ্ব্যবহারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং উহাদের যথা সম্ভব প্রচলন ও বাঞ্ছনীয়।

অনেকে হয়ত বলিবেন, আমরা যে সকল যন্ত্র দেশে প্রস্তুত করিতে পারি নাই, উহাদের ব্যবহার আমাদের পক্ষে ব্যয়সাধ্য হইবে, সুতরাং সে চেষ্টা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কিন্তু এপক্ষে আমার বক্তব্য এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহাদের ব্যবহার আমাদের আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত না হইবে, ততক্ষণ ঐ সকল যন্ত্রের এদেশে নির্ম্মাণ চেষ্টা হইতেই পারে না। অভাববোধ না জন্মিলে অভাব-মোচনের চেষ্টা জাগে না।

উৎকৃষ্টতর লাঙ্গল, আঁচ্ড়া, বীজ-বপনাদির যন্ত্র, আখ্মাড়াই যন্ত্র, ময়দা প্রস্তুতের যন্ত্র, ঘাস ও খড় কাটিবার যন্ত্র, এবং জলোত্তলন যন্ত্র প্রভৃতি প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে, অনেক সময়ের এবং অনেক উৎপন্ন বস্তুর অপচয় দূর করিবে। তৈলবীজের চাষ হইলে তৈল নিষ্কাষণ যন্ত্রেরও ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কারণ অনেক সময় তৈলবীজের আমদানীর সহিত মূল্যের হ্রাস হইলে, আবশ্যকমত বীজ তৈলোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া বাজারের আমদানীর উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভব হইবে, এবং তাহাতে লোকসানের আদৌ সম্ভাবনা থাকিবে না। বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে মালবহনের জন্য আবশ্যকমত গাড়ীর ব্যবহার থাকা উচিৎ।

সংবাদের আদান প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। দূরবর্ত্তী কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্রস্থ প্রতিনিধির ব্যবসায়সম্পর্কিত সম্বাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থার জন্য শাখা রেলপথের মত একটী টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন লাইন অনায়াসে পরিচালিত হইতে পারে।

প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে আবশ্যকমত পশুশালা, জলাশয়, শস্যভাণ্ডার এবং হিসাব-নিকাশাদি লিখন পঠন কার্য্যের 'আফিস্' প্রভৃতি থাকা উচিৎ। যেখানে স্থানীয় শ্রমিক মিলেনা, তথায় শ্রমিকাবাস ও যোগাইতে হয়। যদি প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দুই তিনটি কর্ম্মক্ষেত্রের সমবায়ে দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

কর্ম্মক্ষেত্র গুলির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বা মজবুত বেড়ার বেষ্টনী থাকা একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, পশুশালা ও কৃষি বা শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে ও বেড়ার বেষ্টনী রাখিতে হইবে। পশুশালার মলমূত্রাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। ইহারা কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগে। আবার ফসলের গাছ পাতা যাহাতে নষ্ট না হইয়া গবাদি পালিত পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার ও ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বোপরি সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত হিসাব রীতিমত ভাবে রক্ষা করা এবং সময়ে সময়ে পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীগন এবিষয়ে অনেক পশ্চাতে। তাঁহাদের এই বিষয়ে ঔদাসীন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের অসাফল্যের বা পতনের কারণ হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেশে কৃষি ও শিল্প এবং উহার ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মগুলি ভিন্ন ভিন্ন সমবেত প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠান রেলপথ প্রস্তুত করিয়া আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে সহায়তা করে; কোন সমবায় উৎপাদন কার্য্যের সাহায্যে নিযুক্ত, কেহ পশুপালন, লোমসংগ্রহ, দুগ্ধ-ক্ষীর-মাখন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা এক একটী বিশিষ্ট শিল্পে,—কর্ম্মকারের, চর্ম্মকারের, কুমারের, বা তৈলীর বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। প্রভেদ,—এখানে ব্যক্তিগত ভাবে স্বল্প উৎপাদন, অন্যত্র সমবেত ভাবে প্রচুর উৎপাদন। সমবেত ভাবে প্রচুর উৎপাদনের অনুপাতে হিসাব করিয়া দেখা যায়, ব্যক্তিগত উৎপাদনের অপেক্ষা সমবেত উৎপাদনের হার অনেক বেশী; অর্থাৎ একজন চাষা ব্যক্তিগত ভাবে চাষ করিয়া বিঘা প্রতি যে খরচে যে ফসল উৎপাদন করে, একটী প্রতিষ্ঠিত সমবায়ের সমবেত চেষ্টায় তদনুরূপ খরচে উহার দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক দেশের উৎপন্ন শস্যের হার এ দেশের উৎপন্ন শস্যের তিন চারি গুণ বেশী। বলা বাহুল্য ইহাই উন্নত প্রণালীতে চাষের ফল।

সরকারী বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও আমাদের নিজের অভাব মোচনার্থ বিদেশ হইতে সুপারী, চিনি, তুলা, গম, গুড়, তামাক, রেশম ও পশম এবং নানাবিধ রঙ্ প্রভৃতির আমদানী করিতে হয়। এগুলি ছাড়া বহু প্রকার বিলাসের দ্রব্য, 'পটারি' ও দেশালাই এর এবং লজ্জা নিবারক বস্ত্রের আমদানীও অনেকেই জানেন। ইহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখা যায় সুপারী, চিনি ও তুলার আমদানী ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কেন? পতিত জমিত যথেষ্টই আছে। দেশের জন্য প্রয়োজন মত সুপারী ও ইক্ষু চাষের পরিমাণ বাড়ান যায় না কি? উন্নততর প্রণালী অবলম্বনে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না কি?

যবদ্বীপে ইক্ষুর চাষ করিয়া তথাকার ব্যবসায়ীরা তাহার রস হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত

করিয়া জাহাজে করিয়া এই দেশে আনিয়া আমাদের দেশের প্রস্তুত চিনি অপেক্ষা কেমন করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারগ হয়? উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এরূপ করিতে পারিয়াছে।

চেষ্টা করিলে যে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়, বিদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, এক ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশের উৎপন্ন ফসলের হার দেখাইলে, আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন আশা করি। যেখানেই একটু চেষ্টার উৎকর্ষ হইয়াছে, সেইখানেই উৎপন্ন শস্যের পরিমান বাড়িয়াছে।

(ক) ধান্য উৎপাদনে,—

বাঙ্গালায়, এক একর জমিতে ১১৭৯ পাউণ্ড।
মান্দ্রাজ, „ „ ১১৯৩ „ ।
বোম্বাইয়ে „ „ ১২৩০ „ ।

(খ) গম উৎপাদনে,—

বাঙ্গালায়, এক একর জমিতে ৬৯৮ পাউণ্ড ।
পাঞ্জাবে, „ „ ৯৬৪ „ ।
যুক্তপ্রদেশ, এবং বোম্বাইয়ে, „ „ ১২৫০ „ ।
সিন্ধু প্রদেশে, „ „ ১৩৬৬ „ ।

(গ) ছোলাদি উৎপাদনে,—

বাঙ্গালায়, এক একর জমিতে ৮৬৭ পাউণ্ড ।
যুক্ত প্রদেশে, „ „ ৯৫০ „ ।
বোম্বাইয়ে, „ „ ১২০০ „ ।

(ঘ) ইক্ষু উৎপাদনে,—

বাঙ্গালায়, এক একর জমিতে ২৯৬৩ পাউণ্ড ।
মান্দ্রাজে, „ „ ৫০৪০ „ ।
বোম্বাইয়ে „ „ ৬৯৫০ „ ।
সিন্ধু প্রদেশে, „ „ ৮১৪২ „ ।

বলা বাহুল্য, বোম্বাই প্রদেশের অনেক ক্ষেত্রেই সমবেত ভাবে উন্নত প্রণালীতে চাষ করা হইতেছে। কৃষককে অর্থ সরবরাহকারকের অধীনে এবং উপদেশমত চাষ করিতে হয়। উভয়েই উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ হিসাবে পাইয়া থাকেন, কাহার ও লোকসান হয় না। আমাদের বাঙ্গালা কিন্তু সকলেরই পশ্চাতে।

জমিতে রীতিমত সার দেওয়া, সময় মত কর্ষণাদি করা, অল্প সময়ে

এবং অল্প শ্রমিকের সাহায্যে একসঙ্গে অনেক জমি চাষ করা ও উৎপাদনের রীতিমত পরিদর্শন করাই উন্নত উপায়ে চাষ করার মূল সূত্র।

আমরা সকল বিষয়েই সরকারের মুখাপেক্ষী, এবং তাঁহাদের শৈথিল্য দেখিলেই চিৎকার করিতে পারি। কিন্তু আমাদের যদি চেষ্টা না থাকে, কোনও গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকার করিতে পারিবেন না। তবে ইহা অবশ্যই সত্য যে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা চাই। আমার মনে হয়, আমাদের চেষ্টা দেখিলে গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব সহযোগিতা করিতে কৃপণতা করিবেন না।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য যে প্রকার আগ্রহ, অর্থব্যয় ও পরিশ্রম দেশের সুসন্তানগণ করিলেন, ইহার কিয়দংশও যদি এই অন্নসমস্যা এবং জীবনসমস্যার মিমাংসায় ব্যয়িত হইত, তবে আজ দেশের চিত্র অন্যরূপ দেখিতাম। আমি মনে করি, এইদিক দিয়াই দেশের নেতৃবৃন্দের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিৎ, এবং দেশবাসী ভবিষ্যতে কে কতখানী কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টায় দেশের সেবা করিয়াছেন দেখিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। দেশের ধনী সন্তানগণ কে কতগুলি 'ব্যাঙ্কে'র প্রতিষ্ঠা দ্বারা কতগুলি সমবায় প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, কোন কোন জমিদার জমিদারীতে কৃষি ও শিল্প সমবায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রজা সাধারণের তদনুরূপ চেষ্টার সহায়তায় কত খানী স্বার্থত্যাগাদি করিয়াছেন, এখন হইতে সকলে ইহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে থাকুন। চারিদিকেই নানা নামে নানাদলের বা 'পার্টি'র অভ্যুত্থানের কথা শুনিতেছি, এই সকল দলেরও কার্য্যাবলী দেশবাসীর লক্ষের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা প্রকৃত জীবনসমস্যার সমাধানে কে কতটুকু অগ্রসর, তাহার ইতিহাস সংগৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর কেমন করিয়া সমবায় গঠন করিতে হয়, তদ্বিষয়ক আইনকানুনাদি এবং এতদ্দেশে উহার দ্বারা কিপ্রকার কার্য্য হইতে পারে এইসকল প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিই অর্থ বা ধন।

(প্রাপ্ত)

আজকাল যেমন মাত্র রূপার চাকৃতি বা তন্মূল্যের কাগজই ধন বা অর্থ সংজ্ঞাবাচক হইয়াছে, চিরকাল আমাদের দেশে তাহা ছিল না। পূর্ব্বে ঋষিদের সময়ে শিক্ষা, ভূমি, স্বর্ণ এবং গৃহপালিত পশুই ধনপর্য্যায়ভুক্ত ছিল। আজকালকার ধনী যথেষ্ট শিক্ষিত

না হইতে পারেন, বা তাঁহার যথেষ্ট ভূমি ও গৃহপালিত পশু না থাকিতে পারে, অথবা তাঁহার গৃহে প্রচুর স্বর্ণও না থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট টাকা, কি 'প্রমিসারি নোট' থাকা চাই, নতুবা তিনি ধনী পদবাচ্য হইবেন না।

টাকা ধন নহে, কিন্তু ধনের মূল্যজ্ঞাপক নির্দ্দিষ্ট বস্তু বিশেষ বটে; কেননা ইহাই বিনিময়ের নির্দ্দিষ্ট হার বা অঙ্ক, এবং রাজবিধি দ্বারা ইহা গৌরবান্বিত। কোন এক বস্তুর সহিত অন্য এক বস্তুর বিনিময়ে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, বা বিনিময়ের নির্দ্দিষ্ট হার না থাকায় মূল্যহীন বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু টাকায় সকল বস্তুর বিনিময় সম্ভব, তাই ইহার এত মান। তবে একথাও ঠিক যে আমাদের দেশের টাকার বিদেশে কোন মূল্য নাই। স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত বিদেশে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট হয় না, অথচ এই দুর্ভাগ্য দেশে স্বর্ণ মুদ্রার আদৌ প্রচলন নাই। পূর্ব্বে এদেশে মোহরের বা স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা না পাইলে আমাদের একদিনও চলিতে পারেনা, জীবনধারণের জন্য যে সকল বস্তুর একান্ত প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই ধনপদবাচ্য হওয়া উচিৎ। সেই হিসাবে, যাহার বিনিময়ে ঐ সকল বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে, তাহাও ধনপদবাচ্য। কাজে কাজেই ভূমি যে ধনপদবাচ্য হইবে, গৃহপালিত পশু বা শিক্ষা এবং স্বর্ণ ও যে ধনপদবাচ্য হইবে, তাহা শুধু সেকালের কথা বলিয়া নহে, এখনও অবিসংবাদে স্বীকার্য্য।

আমাদের দেশের ঐ সকল সম্পত্তি বর্ত্তমানে ক্রমশঃ বিদেশীয়গণের হস্তগত হইতেছে। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত হিসাবে কেহ কেহ থাকিলেও, এইদেশে অনেক অ-বাঙ্গালী জমিদারের এবং পশুপালকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমশঃই তাহাদের সংখ্যাও বাড়িতেছে। বাঙ্গালীর ঘরে অনেক সোণা ছিল, কিন্তু তাহার অনেকাংশ এখন অ-বাঙ্গালীর হস্তগত, তাহার পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যের অনেক কাগজ এখন বাঙ্গালীর ঘরে স্তূপীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সকল কাগজের মূল্যেরও উত্থানপতন এত অনিশ্চিত হইয়াছে যে, উহাদের বিনিময়ে প্রকৃত ধন সংগ্রহ করিতে গেলে প্রায়ই লোকসান দিতে হয় বলিয়া, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তথাকথিত ধনীগণ নিশ্চিন্ত আছেন।

ভূমি, জমীন্ বা মাটী যে ধন একথা বলিয়াছি, এবং এই প্রবন্ধে আমরা ধনের এই বিভাগটি সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। মাটী না হইলে আমাদের একদিন ও চলেনা। আমরা মাটীর উপর বেড়াই, মাটীর ঘরেই থাকি, মাটীর পাত্রে মাটী হইতেই উদ্ভূত শস্য—চাউল, তরকারী ও মসলাদি সিদ্ধ করিয়া লইয়া তদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ও শরীরপোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকি। মাটী হইতে উদ্ভূত কার্পাসের সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া তদ্বারা শরীরের তাপরক্ষা এবং লজ্জানিবারণ করি। সর্ব্বশেষেও মাটীতেই শয়ন করি। মুসলমান ও বৈষ্ণবগণের শব মাটীতে প্রোথিত হয় এবং বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য হিন্দুগণের শব দগ্ধ হইয়া মাটীতেই মিলিত হয়; অর্থাৎ শেষে আমরা মাটীই হই। কিন্তু

বর্ত্তমানে আমরা জন্মিবার পর হইতেই মাটীকে আমাদের ব্যবহারে না আনিয়া, নিজেরাই যে মাটী হইতে চলিয়াছি তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাই আজ মাটীর কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, বোধ করি ইহা খুব অপ্রীতিকর হইবে না।

আমাদের দেশের মাটী বা ভূমি যে কাহার, নিশ্চয় করিয়া সে কথা বলা যায় না। কৃষক বলিবেন 'জমি জমিদারের'; জমিদার বলিবেন 'জমি রাজার বা সরকারের'; এবং সরকার বলিবেন 'জমিতে ত তোমাদেরই চিরস্থায়ী সত্ত্ব, রাজা তোমাদের হইয়া উহা রক্ষা করেন এবং তজ্জন্য কর গ্রহণ করেন'। এই যে চিরস্থায়ী সত্ত্ব, ইহা কাহার? জমিদারের অথবা কৃষক প্রজার? প্রশ্নটি ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার সমাধানের উপরেই বাস্তবিক দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ইপ্সিত উন্নতি নির্ভর করে। কৃষকের যদি কোন সত্ত্ব না থাকে, তবে জমির উন্নতিবিধানে তাহার ঔদাসীন্য আসা অসম্ভব নহে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আমরা জমিদারকুলকেই দায়ী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর দেয় কৃষক প্রজা এবং কর গ্রহণ করেন রাজা। মধ্যবর্ত্তী এই জমিদারগণ মাত্র করসংগ্রাহক বা collector বিশেষ। সুতরাং জমিদারের দায়িত্ব শুধু খাজনা বা কর আদায়ের। অতএব জমির উন্নতিবিধানে যে জমিদারের কোনও লক্ষ্য থাকেনা, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের জমিগুলির ক্রমাবনতির দায়ীত্ব একজনের না একজনের আছেই। রাজাকে আমরা দায়ী করিতে পারিতাম, যদি তিনি সমস্ত সত্ত্ব নিজ অধিকারে রাখিতেন, যদি তিনি কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশের কৃষির অবস্থা সকলকে জানাইয়া তদ্বারা দেশবাসীর উৎপাদনচেষ্টাকে উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, কিম্বা যদি তিনি প্রজার সত্ত্ব অস্বীকার করিতেন। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তৎপূর্ব্বকালের প্রজাসত্ত্বের স্বীকার মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষক প্রজা অপেক্ষা এ বন্দোবস্তে জমিদারদিগেরই অধিক সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা আর collector মাত্র নহেন, জমির প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী, রাজার প্রজা। কৃষক প্রজা ত তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ বন্দোবস্তের অধীন মজুর বা শ্রমিক মাত্র। বাস্তবিক দেশের দুরাবস্থার জন্য দায়ী এই মধ্যবর্ত্তী জমিদার কুল। তাঁহারা জমির উন্নতির জন্য কোনও চেষ্টা করেন না, দরিদ্র কৃষকের ঘাড়ে এই দায়িত্ব চাপাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন।

এদেশের কৃষক প্রজা জমিদারকেই রাজার মত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিদানে তাহারা কি পায়? পীড়ন,—যাহাতে প্রজার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত হয়; এবং তাহারই ফলে দেশীয় জমিদার কুল ও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সেই সর্ব্বনাশের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। সর্ব্বনাশের নদী যদিও এ কুল ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু আর এককুল গড়িতেছে, উহা বিদেশী জমিদার। এইরূপে বাঙ্গালার সমূহ অবনতি ঘটিতেছে। জমিগুলির উর্ব্বরতা গিয়াছে, যে ফসল হয় তাহাতে সকলের কুলায় না, চাষার ছেলে তাই লাঙ্গল

কোদাল বিসর্জ্জন দিয়া অন্য উপার্জ্জনের পথ ধরিতে ছুটিতেছে। গ্রামগুলি জঙ্গলাকীর্ণ ও পীড়াদির দুর্গ স্বরূপ হইতেছে, পতিত জমির পরিমাণ ও বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে সে সাচ্ছন্দ্য ও সরলতা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য ও অবিশ্বাস আসিয়া সকলকেই—কি জমিদার, কি প্রজা,—সকলকেই ধ্বংশের পথে আকর্ষণ করিতেছে।

প্রজার মঙ্গল না চাহিলে জমিদারেরও মঙ্গল নাই। এখনও যদি বাঙ্গালার জমিদারকুল প্রজাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা না করেন, তাহাকে জমির পূর্ণ সত্ব দিয়া উহার উন্নতিসাধনে সহায়তা না করেন, তবে এ স্রোত ফিরিবার আশা খুব কম।

টাকা বা তন্মূল্যের কাগজগুলি মাত্রই অর্থ নহে, ইহা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। দেশের সমৃদ্ধির জন্য চাই জমিগুলি দেশবাসীর অধিকারে, চাই উহা হইতে উৎপন্ন প্রচুর ফসল,—গোলাভরা ধান, গম, কড়াই, তিল, সরিষা, নারিকেল, লঙ্কা, মরিচ, হলুদ, তুলা, পাট, শণ ইত্যাদি; আর চাই গোয়ালভরা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি। মাছেভরা পুকুর বা বিল ও খাল চাই; তাঁতি, কামার, কোমর চাই; নাপিত, ধোপা, পূজারি ও উপদেষ্টা চাই। এইগুলি থাকিলেই দেশের সমৃদ্ধি থাকিল, আর এইগুলি পরহস্তগত হইলেই দেশ দরিদ্র হইল! টাকা খাইয়া লোকে বাঁচেনা; প্রয়োজনীয় বস্তুর তুলনায়—টাকার মূল্য কোথায়? কাল টাকায় একমন চাউল মিলিত,—টাকার মূল্য ছিল; আজ টাকায় ৫ সের কি ৬ সের মিলে, বুঝিতে হইবে উহার মূল্য কমিয়াছে। সুতরাং মূল্যবান কে? টাকার বিনিময়ে যেগুলি আহরণ করিতে হয়, তাহারাই। টাকার সংগ্রহ অপেক্ষা তাহাদিগেরই সংগ্রহ প্রার্থনীয় নহে কি?

বাণিজ্য সম্বন্ধে আমি পৃথক আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং সে কথার উল্লেখে এ প্রবন্ধের ভার বাড়াইব না।

যে বাঙ্গালার মাটীতে সোনা ফলিত,—অর্থাৎ এত প্রচুর ফসল মিলিত যাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিনিময়ে দেশের লোক যথেষ্ট সোনা সংগ্রহ করিতে পারিত, সেই বাঙ্গালার মাটী আজ কি দেয়? ম্যালেরিয়া, কলেরা, দারিদ্র্য ও অকালমৃত্যু। সেই নদীগুলিই ত আছে, যাহারা পূর্ব্বে পাহাড় ভাঙ্গিয়া অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়ম, লৌহ, চুণ, ম্যাগ্নেসিয়ম, সোডিয়ম, পোটাসিয়ম, নাইট্রোজেন, ফস্ফারস, মাঙ্গানিজ, অঙ্গার ও অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত মাটী আনিয়া উর্ব্বরা জমি গড়িত! তবে এখন এ দুর্দ্দশা কেন? তখন মাটী চিনিতাম, এখন চিনিনা বলিয়া, এখন মাটী হইতে চলিয়াছি বলিয়া। দূর-পল্লীসকল জনহীন অধিকারীশূন্য এবং জঙ্গলময় হইতেছে, আর কলিকাতার সহরে ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই চাকরীর উপর নির্ভর করিয়া কত পরিবার পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, সেখানে গেলে খাইতে পাইব না। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!

মাটীতে শুধুই চাষ হয়না, আমাদের প্রয়োজনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমরা মাটী থেকেই পাই। মাটীতেই ধান, কড়াই, মসলা ও তরকারী ফলে; সুতার গাছ কার্পাস এবং পাট জন্মায়; ঘর বাঁধিবার উপকরণ বাঁশ, শাল ও সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ, ইট ও টালি, এবং উলু, খড় ও গোলপাতা এ সকলই মাটী হইতেই পাওয়া যায়; এমন কি এদেশের বারআনা লোক মাটীর পাত্রেই রন্ধনাদি ও করিয়া থাকে। আমাদের পীড়ারওঔষধগুলিও প্রায় মাটী হইতেই মিলিয়া থাকে।

মাটীতে বালি, সিলিকন, ক্যালসিয়ম্, সোডিয়ম্, পোটাসিয়ম্, লৌহ, চুণ ইত্যাদি নানা প্রকার রূঢ় ও যৌগিক পদার্থ ও থাকে; এবং তাহাদের পরস্পর মিলনে ও পরিমানের তারতম্যে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকার মাটী, কোয়ার্টজ, নুটিং পাথর, খড়ি প্রভৃতি হইয়া থাকে। এইজন্য মাটীর প্রকৃতি অনুযায়ী উহাদের উর্ব্বরতা শক্তি ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন মাটীতে শস্যাদি জন্মেনা, কোথা ও কয়েকপ্রকার বিশিষ্ট ফসল মাত্র উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও বা নানা জাতীয় ফসল প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া উহার উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি করা যায়। এইজন্য যেসকল পদার্থ প্রয়োজন হয়, উহাদের সাধারণ নাম 'সার'।

দেশের কত ছেলে প্রতিবৎসর রসায়ন শাস্ত্র পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কেহ কি তাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা দেশের এই সকল কাজে লাগাইতে পারেননা? সে বিদ্যা কি পরজীবনের জন্য? তাহা যদি হয়, তবে সে পড়া পণ্ডশ্রম ও তদর্থে ব্যয় বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। কৃষককুল নিরক্ষর বলিয়া মূর্খ, কিন্তু সাক্ষর যুবকবৃন্দ কি আবশ্যকমত শিক্ষিত? আমরা তাহাদের কাছে ইহার প্রকৃত উত্তর চাই।

বারান্তরে আমরা মাটী সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করিব, এবং দেখাইব মাটী ভূমি বা জমীন্ সত্য সত্যই ধন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভূমি।

উষর নীরস চির-পিপাসিত ভূমি চাহে নভ-পানে,
সে চির-পিপাসা মিটাইবে কেবা আজো তাহা নাহি জানে।
সহসা গগনে ভাসিয়া চলিল অশেষ মেঘের সারি,
ভূমি চাহে সেই কাতর-নয়নে, ভয়ে সে যাচে না বারি !
দিঠির কামনা নেহারি কেহ বা হাসিল ধবল হাসি,
জনেক দিল যে কয় কণা বারি– কি জানি মনে কি বাসি !
অচেনা অজানা পাখী এল কোন পারাবার-পার হয়ে,
পাখায় বহিয়া বিবিধ বর্ণ, চঞ্চুতে ফল লয়ে।
করিল গ্রহণ ফলের শস্য বিদীর্ণ করি হিয়া—
অবহেলা-ভরে বুক-ভরা বীজ ভূমিতে ছড়ায়ে দিয়া।
নাহি তরু সেথা, নাহি লতা পাতা,—পাখী ধিক্কার দানি'
সে দেশ হইতে আর কোন দেশে উড়ে' গেল, নাহি জানি।
চলিতে এ পথে কহিল মানব, 'এ কি এ বন্ধ্যা দেশ !
নীরস-কঠিন, কাজে লাগিবার নাহিক যত্ন লেশ !'
বিরূপ লইয়া শীকারী মানব বর্শায় বারে বারে
হানিয়া চলিল সুগভীর খোঁচা সে পথের দুই ধারে।
হেলা নিল ভূমি সবার নিকটে, মেঘ হতে নিল বারি,
পাখীর ত্যক্ত বীজ নিল ক'টি, খোঁচাও দিল না ছাড়ি।
আপন বক্ষে সেই ক্ষত জুড়ি' অঙ্কুর দিল তুলি।
তরুণ তরু ও বিকচ পাতায় পবনে উঠিল দুলি'।
বিশাল তরুও শাখা-পল্লবে নিবিড় হইয়া এসে
ছেয়ে গেল তার সুনিবিড় ছায়া সুশীতল করি' দেশে।
বারে বারে তার ফুটিল মুকুল মধুর গন্ধ সাথে,
বারে বারে তার ধরিল রে ফল মধু লয়ে আপনাতে।
মেঘেরা আসিয়া বিটপীর শিরে ক্ষণেক দাঁড়াল থামি,
সুবাস লইয়া বিভোর হইল—ধরায় আসিল নামি।
পাখী সে আসিয়া ভুঞ্জিল ফল, নীড় বাঁধিল সে শাখে।
নীড়ে বসে সে যে আজ হতে গানে নীল আকাশেরে ডাকে।
ভূমি বলে নরে, তোমা তরে মোর বন্ধ্যা এ দশা ঘোচা।
আমারে দিতেছি। কিবা দিবে আর ? তুমি যে দিয়েছ খোঁচা !

শ্রীরামকানাই সামন্ত।

বেকার-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারোপায়।

(শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।)

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক গণের মধ্যে যে বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, চাকরীর অভাবই উহার প্রধান কারণ। ইংরাজী শিক্ষায় এদেশের যত লোক শিক্ষিত হইতেছে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বজাতীয় অশিক্ষিত জনসমাজ হইতে আপনাদিগকে—কি জানি কেন—পৃথক করিয়া ফেলিতেছে, অনাবশ্যক বিলাসে অভ্যস্ত হইয়া আপনাদিগের নূতন অভাবের সৃষ্টি করিতেছে, এবং অশিক্ষিত জনগণের হাতে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম আছে, তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, শিক্ষিতগণের হাতের কাজ ভাগ করিয়া লইতে চাহিতেছে। ইহার ফলে দেশের অতি প্রয়োজনীয় উৎপাদন, বাহন এবং বিনিময়ের কর্ম্মে লোকাভাব, আর চাকরী, ডাক্তারী, মোক্তারী এবং প্লিডারী বা ওকলাতীর কর্ম্মে লোকবাহুল্য ঘটিয়াছে।

চাষআবাদ, হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি গড়া, বঁটি কাটারি কাস্তে লাঙ্গল প্রভৃতি গড়া বা লোহার কাজ, অন্যান্য ধাতুর কাজ বা কাঁসারি স্যাক্‌রা প্রভৃতির কাজ, গোমহিষাদি পালন ও ঘৃত দধি দুগ্ধের ব্যবসায়, মৎস্য পালন ও বিক্রয়, বস্ত্রাদি বয়ন, তৈলাদি প্রস্তুত করণ, গৃহোপকরণ নির্ম্মাণ বা সূত্রধরের কাজ, নৌকাচালন, অশ্ব ও গোযান চালন, আড়তদারী ও দোকানদারী প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্মই অশিক্ষিত গণের হাতে। আমাদের শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা অশিক্ষিতের সহিত তাহাদের হাতের কাজগুলিও ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, ফলে জীবনধারণোপযোগী সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই লোকাভাবে পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইতে না পারায় ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতেছে। অনেক কর্ম্ম আমাদের দেশের লোকের হাত হইতে—বাঙ্গালীর হাত হইতে বিভিন্ন প্রদেশবাসীর হাতে চলিয়া যাইতেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর চেয়ে মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতির সংখ্যা অনেক বেশী। এই সূত্রে আমাদের বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বর্ত্তমানে প্রায় ১৯ লক্ষ ২ হাজার ৮ শতাধিক বিভিন্ন প্রদেশবাসী অ-বাঙ্গালী তাহাদের অন্নসংস্থান এবং ধনসঞ্চয় করিতেছে, আর বাঙ্গালীর ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার। আমরা নিম্নে শ্রমিক এবং

ব্যবসায়ী রূপে কত অ-বাঙ্গালী বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালীর কাজ কাড়িয়া লইতেছে তাহার একটা মোটামুটি তালিকা দিলাম।—

(ক)	বিহার ও উড়িষ্যাবাসী—	১২, ২৭, ৫৭৯ জন।
(খ)	অযোধ্যা ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুস্থানী—	৩, ৪৩, ০৯৫ ,, ।
(গ)	নেপালী—	৮৭, ২৮৫ ,, ।
(ঘ)	আসামবাসী—	৬৮, ৮০২ ,, ।
(ঙ)	মধ্যভারত ও বেরারবাসী	৫৪, ৮১০ ।,,
(চ)	রাজপুতানাবাসী	৪৭, ৮৬৫ ,, ।
(ছ)	মান্দ্রাজী ও তৈলঙ্গী	৩২, ০২৪ ,, ।
(জ)	অন্যান্য প্রদেশবাসী	২৪, ১৩৩ ,, ।
(ঝ)	ইউরোপীয়ান	১৩, ৩৫৬ ,, ।
(ঞ)	চৈনীক বা চীনদেশবাসী	৩; ৮৫৬ ,, ।

ইহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশে চাকরী ছাড়া কর্ম্ম আছে কি না, এবং কেমন করিয়া আমরা আপন ধনে বঞ্চিত হইতেছি। ইহাদের সকলেরই বাঙ্গালায় অন্ন সংস্থান হইতেছে,—হইতেছে না শুধু বাঙ্গালী শ্রমিকের। শিক্ষার দোষে শ্রমবিমুখ হইয়া আমাদের আজ কি অবস্থা হইয়াছে তাহা দেশবাসীকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

পক্ষান্তরে চাকুরী, ডাক্তারী, মোক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী ও প্লিডারীতে লোকবাহুল্য ঘটিয়া এমন প্রতিযোগিতা আনিয়া ফেলিয়াছে, যে বাধ্য হইয়া ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মীই এখন অসদুপায় অবলম্বন করিয়া উপার্জ্জনচেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তারেরা নিজেদের উদরান্নের জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেশের স্বাস্থাহীনতাই কামনা করিয়া থাকেন। মোক্তার ও প্লিডার বা উকীলেরা নূতন মোকদ্দমার সৃষ্টি করিবার জন্য আইনের কুট অর্থ বাহির করিয়া সাধারণ লোকের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও কুঅভিপ্রায়ের বীজ ছড়াইতেছেন। চাকরী ও ইঞ্জিয়ারীতে ঘুষ লওয়া ব্যাপারটা এখন যেন একটা বিধির আকারে দাঁড়াইয়াছে। অভাবের চাপে অসততা সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিতেছে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটা এই প্রকার। কর্ম্ম যথেষ্ট আছে,—কিন্তু কর্ম্মীর অভাব। বিলাসিতাজর্জ্জরিত অকর্ম্মণ্য শিক্ষিত লোকগুলি কেমন করিয়া অল্প পরিশ্রমে অসদুপায়ে উপার্জ্জন হইতে পারে, তাহাই খুঁজেন। তাঁহারা জাতির জন্য—সমাজের জন্য আবশ্যকীয় কর্ম্মগুলিকে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু সেই সেই কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারেন না।

দেশের এই স্রোত ফিরাইতে হইবে। শিক্ষিত ভদ্রলোককে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য উৎপাদন, বাহন ও বিনিময়ের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, নতুবা উপায়

নাই। বিলাসিতা ছাড়িয়া,—প্রয়োজনাতিরিক্ত জামা, জুতা, মোজা, সাবান, সিগারেট্, এসেন্স, রুমাল, ছড়ি, ঘড়ি প্রভৃতির ব্যবহার ছাড়িয়া সাদাসিদে কর্ম্মীর সাজ, শ্রমিকের সাজ লইতে হইবে। এখন হইতেই ভদ্রঘরের সাধারণ মেধাবীর ছেলেদের কিছু প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া,—পরে ব্যবহারিক কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও বানিজ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তদনুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যদিও কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিখিবার প্রচুর শিক্ষালয় নাই, কিন্তু ওই সকল শিক্ষা ও তথ্য পূর্ণ পুস্তক ও পত্রিকাদির সাহায্যে জ্ঞানলাভ এবং অধ্যবসায়ের সহিত হাতে কাজ করিয়া ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অনায়াসেই হইতে পারে, এবং আমাদের মতে এই প্রকারে শিক্ষা গ্রহণই বর্ত্তমানে অধিক কার্য্যকারী হইবে।

এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে গেলে অবশ্য অর্থের প্রয়োজন। সমবেত ভাবে সকলে সচেষ্ট হইলে, সে অভাব দূর করিতে পারা যায়। সমবায়-প্রথায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করুন, মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী হউন, শীঘ্রই এ বাধা দূর হইয়া যাইবে। চাই অসদভিপ্রায় এবং বিলাসিতা বর্জ্জন, আর চাই পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জ্জন। গ্রামে গ্রামে,—পল্লীতে পল্লীতে সমবায়-সমিতি সকল প্রতিষ্ঠিত হউক। যে সকল কর্ম্ম আমাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, শিক্ষিতগণের সমবেত চেষ্টায় ঐ সকল কর্ম্ম আবার আমাদের হাতে আনিবার চেষ্টা করুন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতগণের মধ্যে যে ভেদের প্রাচীর তোলা হইয়াছে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। উহা দ্বারা আমরা নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছি। যে দেশের শতকরা দশজন মাত্র লোক শিক্ষিত, সেখানে অশিক্ষিতেরাই প্রবল এবং শিক্ষিতেরাই দুর্ব্বল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারণ দ্বারা অশিক্ষিতগণকে মার্জ্জিত এবং ভদ্র করিয়া লউন। সমবায়-প্রথায় এই শিক্ষার প্রসারণ হইতে পারে।

আমাদের চাই কি? প্রথমেই অন্ন ও বস্ত্র। অন্ন দেশে হয় বটে, কিন্তু বস্ত্র হয় না। অথচ বস্ত্র দেশে প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে। শুধু প্রতিযোগিতায় আমরা ইহাকে সুলভ করিতে পারি নাই বলিয়াই ইহা আমাদের হাতছাড়া। কিন্তু সুলভ করা যায় না কি? যদি প্রত্যেক গৃহস্থ আগেকার মত নিজেদের অবসর সময়ে চরকা চালাইয়া সেই সংসারের আবশ্যকীয় বস্ত্রের সুতা কাটিতে পারেন, তবে শুধু তুলার মূল্য এবং তাঁতীর মজুরী দিয়াই কাপড় পাইবেন। অবসর সময় গুলির, এ দুর্দ্দশার দিনে, অপব্যবহার করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে; বরং উহার এই প্রকার ব্যবহারে সুতাকাটার মজুরি রূপে ঐ সময়ের মূল্য আদায় করাই উচিৎ। তারপর তুলার মূল্যও, বাড়ীর আশেপাশে লাউ কুমড়ার গাছের মত প্রয়োজনীয় কয়েকটী করিয়া তুলা গাছ বসাইয়া, তাহা হইতে সংগৃহীত হইতে পারিবে। তখন সকলেই দেখিবেন, শুধু তাঁতির মজুরী দিয়া বোনাইয়া লইয়া, কত সুলভে আমরা কেমন মজবুত বস্ত্র পাইতে পারি।

অন্ন দেশে হয় বটে, কিন্তু মহার্ঘ। ইহার কারণ আমাদের উৎপন্ন অন্ন হইতে আমাদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের লোককে ভাগ দিতে হয়, অর্থাৎ আমরা আমাদের উৎপন্ন চাউলের কিয়দংশ বিদেশীয়গণকে বিক্রয় করি। এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের উৎপাদনের হার বাড়াইতে পারিলে, এই মহার্ঘতা ঘুচাইতে পারিব। সমবায়-প্রথায় উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া উৎপাদনের হার বাড়ান চলে। সমবায়-প্রথায় বিনিময়ের কাজটিও নিজেদের হাতে রাখিতে পারিলে, বিদেশীয়গণকে কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াও আমাদের দেশের জন্য আবশ্যক চাউল সুলভে সকলে পাইতে পারিব।

অন্ন ও বস্ত্রের পরই শিক্ষাপ্রচার। এ কার্য্যটিও সমবায়-প্রথায় অনায়াসে হইতে পারে। আমরা ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েরই বিশদ্ আলোচনা করিব, এ প্রবন্ধে শুধু দিক্‌দর্শন মাত্র করিতেছি। অন্ন ও বস্ত্র উৎপাদন এবং শিক্ষাপ্রচারের আনুসঙ্গিক অনেক কর্ম্ম আছে; যথা, পশুপালন, মৎস্যপালন, যন্ত্রনির্ব্বাণ, পাত্রনির্ম্মাণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি; এবং ইহাদের আনুসঙ্গিক আরও বহুপ্রকার কর্ম্ম আছে। উৎপন্ন বস্তুর আদান প্রদানের জন্য বাহন এবং ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবসায় ও সমাজের জন্য প্রয়োজন।

অন্ন বলিতে শুধু চাউল বুঝিলেই হইবে না। ধান্য, নানাপ্রকার কড়াই, তৈলশস্য, এবং তরকারীগুলি সকলেই অন্নপর্য্যায় ভুক্ত। বস্ত্র বলিতে শুধুই তুলা নহে; চরকা নির্ম্মানোপকরণ ও তাঁত নির্ম্মাণোপকরণগুলি, এবং রেশম ও পশমগুলিও বস্ত্র পর্য্যায়ের অন্তর্গত। ধান্যোৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ এবং অন্ন প্রস্তুতের জন্য পাত্রাদি নির্ম্মাণও অন্নপর্য্যায়েরই সহিত সংশ্লিষ্ট। এমনকি কৃষিসহায়পশুরপালন, দুগ্ধ ও ঘৃতাদি প্রস্তুত, মৎস্যপালন প্রভৃতিও অন্নেরই জন্য—খাদ্যেরই জন্য।

এই সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্মের প্রতি ঘৃণা করিয়া আমরা করিতেছি কি? যাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির উৎপাদন, বাহন এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় করিতেছেন, আমরা শুধু তাঁহাদের আদেশপালক ভৃত্য মাত্র হইয়া অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে চাহিতেছি। এখন আমাদের মত দরিদ্রগণের রাজনীতি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা নিজেদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহারই উৎপাদন, বাহন এবং বিনিময়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সমবেত ভাবে সমবায়-প্রথায় কাজ করিয়া ক্ষুধাক্লিষ্ট রোগশীর্ণ দুর্ব্বল দেহকে সবল করিতে হইবে, উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কৃষিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

এরোরুট ও শঠীরপালো প্রস্তুতের যন্ত্র।

গত কার্ত্তিক মাসে কলার সঙ্গে এরোরুট চাষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে উহার বিস্তৃত ভাবে চাষ নাই। ভারতের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে (Travancore) অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এরোরুটের চাষ হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বাঞ্চলে তদ্রূপ যথেষ্ট পরিমাণে শঠির চাষ হইয়া থাকে। ইহার পালো ও পুষ্টিকর এবং সুপাচ্য বলিয়া শিশু ও রোগীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

উভয়েরই মূল হইতে পালো প্রস্তুত হয়। এদেশে ঢেঁকিতে কুটিয়া জলে গুলিয়া শঠির পালো বাহিরে করা হয়; আর ত্রিবাঙ্কুরে জলে সিদ্ধ করিয়া পরে যাঁতায় পিশিয়া লইয়া এরোরুটের পালো বাহির করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুরের কৃষিবিভাগ কলের সাহায্যে পালো বাহির করিবার প্রণালী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—

মূলগুলি বাহকযন্ত্র দ্বারা একটী চৌবাচ্ছায় পড়িয়া ধৌত হয়; পরে উহারা আর একটি পাত্রে নীত হইয়া ঘৃষ্ট বা পেষিত হইয়া থাকে। তদনন্তর জল মিশ্রিত পালো কয়েকটি চালুনীর মধ্যদিয়া গিয়া আর একটী চৌবাচ্ছায় পড়ে। তথা হইতে ক্রমশঃ ধৌত ও বিভিন্ন চৌবাচ্ছায় নীত হইতে হইতে বেশ পরিষ্কার ও শাদা হইলে পর উপরকার জল ফেলিয়া দিয়া তলায় সঞ্চিত কর্দ্দম প্রায় পালো উঠাইয়া লইয়া যন্ত্র সাহায্যে পিশিয়া উহার জলাংশ বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তদনন্তর উহা শুকাইয়া লইলেই উত্তম পালো প্রস্তুত হইল। এই প্রক্রিয়ায় পালো অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

এদেশে শঠির-পালো ও এইভাবে প্রস্তুত করিয়া লইলে পরিমাণে অধিক পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা শুধু প্রণালীর কথাই বলিলাম, যন্ত্রের বিশেষ পরিচয় দিলাম না; কারণ যন্ত্র মূল্যবান, সকলে উহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তবে সমবায় প্রথায় প্রচুর চাষের ব্যবস্থা হইলে, যন্ত্র সাহায্যে পালো প্রস্তুত করাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ ইহাতে অল্প পরিশ্রমে এবং শীঘ্র যথেষ্ট পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক একটী যন্ত্রের মূল্য চালাইবার এঞ্জিন সমেত দশ হইতে বিশ হাজার টাকা।

জল-হাওয়া ও ফসল।

কার্পাস ফসল ঃ—বঙ্গদেশে 'জলদী' ও 'নাবি' দুই প্রকারের কার্পাস ফসল দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলদি ও বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে 'নাবি' কার্পাস উৎপাদিত হয়। এবারে বাঁকুড়া ও চট্টগ্রামে প্রথমে ফসলের পক্ষে অবস্থা অনুকূল ছিল। নাবি ফসলেয় জমির পরিমাণ এবার ১৮৩৭ একর। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা অনেক অধিক। জলদি ফসলের জমির পরিমাণ প্রায় ঠিকই আছে। বিগত বৎসরের ৭০,১৮৬ একরের তুলনায় এবার ৬৯,০০০ একরে চাষ হইতেছে। অবশ্য ফসল না উঠা পর্য্যন্ত ঠিক জমির পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ভারতের তুলনায় শতকরা ১ ভাগ তুলার জমিও বঙ্গদেশে নাই।

ইক্ষু ফসল ঃ—এই ফসলের ও এখন মাঝামাঝি অবস্থা। রোপণ করিবার সময় অবস্থা অনুকুল ছিল। মধ্যে জলাভাব হইলে ও বর্ত্তমান অবস্থা মোটের উপর ভাল বলিয়া সকল জেলা হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ২০০০৬ একরে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। এবার ২০৯,৯০০ একরে আখ্ বসান হইয়াছে। সমস্ত ভারতে যে পরিমাণ জমিতে আখ্-চাষ হয় তাহার অনুপাতে বাংলার আখ্ চাষের জমি শতকরা ৮.২ ভাগ।

সার-সংগ্রহ।

রক্ষিত ফলের ব্যবসায়।

আনারস। ফলের আয়তন বৃদ্ধি করিতে এবং প্রচুর ফল জন্মাইতে হইলে নিয়মমত চাষের দরকার। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে তাহার কোন বন্দোবস্তই নাই। আনারসের চাষ করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। সকলেই জানেন, এদেশে যেখানে-সেখানে আনারস জন্মে। এখানকার জমি ইহার পক্ষে খুবই উপযোগী। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যশোহর প্রভৃতি স্থান আনারসের জন্য অতি প্রশস্ত। সেখানে জমিরও অভাব নাই। কর্ম্মিষ্ঠ উৎসাহী ও কষ্টসহিষ্ণু যুবকেরা সেখানে গিয়া সামান্য মূলধনে স্থানীয় কৃষকের সাহায্যে অনায়াসেই আনারসের চাষ আরম্ভ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন। হাওয়াই দ্বীপে আমেরিকানরা যে প্রণালীতে আনারসের চাষ করে তাহাতে দেখিতে পাই যে প্রতি-বিঘায় তিন হাজার করিয়া আনারস উৎপন্ন হয়। যদি সু-জাতের আনারস লাগান যায় এবং নিয়মিত জল দিবার বন্দোবস্ত করা হয় তবে অনায়াসেই খুব বড় ফল উৎপাদন করা যাইতে পারে; বড় ফলের মূল্য শতকরা কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত আশা করা যাইতে পারে। গড়পড়্তা যদি আমরা পনর টাকা দরেও হিসাব করি, তাহাতে দেখিতে পাই যে প্রতি-বিঘায় শুধু আনারসেই চারিশত টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আনারসের পাতা দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে আরও একটা অতিরিক্ত আয়ের বন্দোবস্ত হয়। অথচ খরচ হয়ত প্রতি-বিঘায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশী পড়িবে না। দুইজন যুবক একশত বিঘা জমির পরিদর্শনকার্য্য অনায়াসেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন।

জমি ও সার।—মাটি-মিশ্রিত বালি-জমিই আনারসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাহার পরেই বালি-জমি বা পাথর-কুচির জমি প্রশস্ত। আঠালে মাটির জমি আনারসের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। জমিতে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত থাকা বিশেষরূপে দরকার। ছায়ার মধ্যে যে সকল আনারস জন্মে তাহার স্বাদ ও গন্ধ তত ভাল হয় না। পচা পাতা ও খুব পচা গোবরের সারে প্রস্তুত জমিতে খুব বড় অত্যুৎকৃষ্ট আনারস জন্মে।

আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি, অর্থ ও সময় ফলরক্ষণ-কার্য্যে ও তাহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেই আবদ্ধ, তাই আমাদের চাষের দিকে যাওয়ার উপায় নাই, তবে পরামর্শ দিয়া অন্যান্য যে-কোনও প্রকারে উৎসাহী যুবকদিগকে সাহায্য করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আমরা আমাদের কোম্পানীর তরফ হইতে এরূপ কনট্রাক্ট বা চুক্তি

করিতে পারি যে তাঁহারা যত আনারস উৎপাদন করিতে পারিবেন আমরা তাহা সমস্তই খরিদ করিতে বাধ্য থাকিব। আনারসের চাষ আরম্ভ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নূতন-নূতন রক্ষিত ফলের কারখানা যে খোলা সহজ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আমি দুই তিনটা ইংরেজী দৈনিক পত্রে গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কিছু বিশেষ ফল পাইব এরূপ ভরসা পাইতেছি না। তাই আমার দেশের লোকের নিকট বিশেষ নিবেদন যেন এমন একটা সুযোগকে তাঁহারা উপেক্ষা না করেন।

(প্রবাসী) শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার।

খাদ্য ও জীবী শক্তি।

স্বাস্থ্য ও সুখকর খাদ্য।—ডাক্তার জেমিয়া ওল্‌ডফিল্ড 'লেডী থারগারেট' হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সভায় সভাপতির আসন হইতে বলিয়াছেন যে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সেই হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইতে অদ্যাবধি সেখানে কোনরূপ মাছ মাংস রোগীদিগের কিম্বা কর্ম্মচারীদিগের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার ফলে রোগীগণের অতিশয় মন্দ অবস্থা হইতে দ্রুত আরোগ্য লাভ, আমাদের সফলতা জ্ঞাপন করিতেছে। সর্ব্ব প্রকার উদরাময়ের পীড়ায় যে সফলতা লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে অন্যান্য হাঁসপাতাল সকলের এবম্প্রকার রোগীগণকে অল্প পরিমাণে মাছ মাংস ও প্রচুর পরিমাণে ফল মূল ও শাকশব্জী খাইতে দেওয়া উচিত।

ডাক্তার ওলডফিল্ড ইংরাজ জাতির জনন-শক্তি হ্রাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে অল্প সংখ্যক শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে ইহা তত ভাবিবার বিষয় নয় বটে কিন্তু জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাস যে তাহার কারণ, তাহাই অধিক চিন্তার বিষয়। দেশের লোক যত অধিক পরিমাণে মাছ মাংস খাইতেছে তত জনন-শক্তি হ্রাস পাইতেছে।

যে সকল ইংরাজ সৈনিক বলকান প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল তাহারা সকলেই সেই প্রদেশের পুরুষগণের সহিষ্ণুতা ও নারীদিগের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে শিশুজন্ম যখন কেবল মাত্র ২০, সাইবেরিয়া রুমেনিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে তখন ৩০ হইতে ৪০। কারণ তাহারা দুগ্ধ, পনীর, শুষ্ক ফল, শাকশব্জী প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে।

কিরূপে জীবনীশক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় এই সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ইংলণ্ডের শিশুজন্মের হ্রাসের সহিত শিশুমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের চিকিৎসা ও ধাত্রী-বিদ্যায় দক্ষতার বিষয় ভাবিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করি তথাপি আমাদের দেশের

নারীগণ প্রাচীনকালের রমণীগণ অপেক্ষা দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত; ইহার কারণ আমরা খাদ্য সম্বন্ধে অতিশয় নির্ব্বোধ। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর হাজার মৃত্যুর মধ্যে মধুর মাতৃত্বের জন্য চারিটী করিয়া মৃত্যু হয়, কিন্তু হলাণ্ডে মাত্র তিন এবং যে সকল দেশে অধিক শাক শব্জি খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয় তথায় ঐরূপ মৃত্যু সংখ্যা আরও কম। যেমন ইটালিতে ২॥০; সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ও জাপান প্রভৃতিতে তদপেক্ষা ও কম। ইংরাজ জাতিকে সুখ, জননশক্তি ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য ফল, মূল ও শাকশব্জী অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে।

ইংরাজ ও বাঙ্গালীর আহারের তুলনা।

খাদ্য হইতেই যে কার্য্যকরী শক্তির সরবরাহ হইয়া থাকে সে কথা সকলেই জানেন। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর আহার যে পূর্ণ বয়স্ক সবল ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকারীতা গুণের হিসাবে হীন ইহা ইংরাজের বা অন্য কোন স্বাধীন জাতির আহারের সহিত তুলনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি, ইহা 'টিবিট্‌স' নামক বিলাতী পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। উহাতে পাঠক একজন পূর্ণ বয়স্ক ইংরাজ, বৎসরে কোন খাদ্য কি পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা দেখিতে পাইবেন। ইহার সহিত তুলনা করিবার জন্য আমরা একটী ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, উহাতে একজন পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালীর এক বৎসরে কি কি খাদ্য কত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা ও লিপিবদ্ধ হইল। আমরা অনেকগুলি মধ্যবিত্ত অবস্থার পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালীর বাৎসরিক খাদ্যের হিসাব হইতে উহা স্থির করিয়াছি।

উভয় তালিকায় পূর্ণ বয়স্ক স্বাস্থ্যবান লোকের বৎসরে কত পরিমাণ কি কি খাদ্য লাগে তাহা দেখান হইয়াছে।

ইংরাজের আহার—

পাউরুটি—	৩৯৭ পাউণ্ড
মাখন—	১৭ ,,
পনির—	২০ ,,
আলু—	২৩০ ,,
অন্যান্য শব্জী—	২০ ,,
মাংস—	১১৭ ,,
মৎস্য—	৫১ ,,
চিনি—	৯০ ,,
চাউল—	১২ ,,
শ্বেতসার—	৩ ,,
ফল—	২০ ,,
দুধ—	১০০ ,,
চা—	৬ ,,
ডিম—	৯২ টী

বাঙ্গালীর আহার—

চাউল—	১৭৫ সের
ডাল—	১৯৸০ ”
আলু—	৩২৷৷০ ”
অন্যান্য শব্জী—	৯৫ ”
দুধ—	৬০ ”
ঘৃত—	৫০৷৷০ ”
তৈল—	১২ ”
মৎস্য—	৩০ ”
গুড়, চিনি—	২২৷৷০ ”
শ্বেতসার—	৪৷৷০ ”
দধি—	১০ ”
মাংস—(সকলে খান না)	৪ ”
ফল, মূল—	৮৷৷০ ”
আটা, ময়দা, সুজি—	৭৷৷০ ”

ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে পুষ্টিকর হিসাবে ইংরাজের খাদ্য আমাদের খাদ্য হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, কাজেই তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা কর্ম্মঠ হইবে সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ? (প্রাচী)

কাঁচাতরকারী ও ফল।

বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিস্ অনেক শক্তিমান ব্যক্তিরা খাইয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে ব্যায়াম তাঁহাদের শরীরকে শক্তিশালী করিবার যত সাহায্য করিয়াছে ঐরূপ বাদামাদি খাদ্যও সেইরূপ সাহায্যকারী। তাঁহারা ফল ও কাঁচা তরিতরকারী খাইয়া থাকেন, কিন্তু বাদাম ইত্যাদি তাঁদের প্রধান খাদ্য, তাঁহারা জল অধিক পরিমাণ পান করেন। ঐরূপ খাইবার কিছু আগে গরম জলপান করিলে শীঘ্র হজম হয়। আমাদের মনে হয় কাঁচা তরকারী ও ফল সকলের অপেক্ষা পরিষ্কার খাদ্য। ইহাতে শরীরের কার্য্যকারী শক্তি বাড়াইবার ও ওজন ইত্যাদি রক্ষা করিবার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুলিই আছে। জন্তুদের মধ্যে যাহারা মানুষের নিকট আমীষ বলিয়া গণ্য—অর্থাৎ বনমানুষ বা বাঁদরেরা ঐরূপ খাদ্যই ভালবাসে ইহাও একটু ভাবিবার কথা। ফল সুপক্ক হওয়া প্রয়োজন ; সেইজন্য শুধু ফল খাইয়া থাকা সব স্থানে সম্ভব নয়,—ডাঁসা পাড়া ফল, যাহা বাজারে বেশী আমদানি হয়, তাহাতে অপকার করা সম্ভব। ——— স্বাস্থ্য।

দেশের ও দশের কথা।

পঞ্চনদের বন বিভাগ ঃ—গত বৎসরের বিবরণীতে দেখা যায় যে বন বিভাগ পরিচালনায় ১৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ইহা পৃথিবীব্যাপি বাণিজ্যের দুরাবস্থার ফল। কিন্তু তাহা হইলেও অরণ্যজাত দ্রব্যাদি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা যে একবারেই বিফল হইয়াছ তাহা নয়। জাল্লোর তার্পিণ ও রঞ্জণ কারখানার উন্নতিই দেখা যায়। ব্যবসায়ের অবস্থা অনুকুল হইলে রেল পাতিবার স্লিপার; দেশালাইর কাঠ, কাষ্ঠপিণ্ড, পাট, কার্পাস প্রভৃতি কলের সাজ সরঞ্জাম ও বক্র কাষ্ঠের আসবাবু—এ সমুদায়ের শিল্প সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বস্তুতঃ বিয়স্ নদীতীরে একটি দেশালাইয়ের কারখানাও অন্যত্র একটি কাগজের কল বসাবার প্রস্তাব ইতি মধ্যেই হইয়াছে।

সার হিসাবে বরবটির চাষ ঃ—আমাদের দেশের কৃষকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে সে সারের জন্য বিশেষ কিছু ব্যয় করিতে পারে না। কোন কোন ফসলের চাষ সার প্রয়োগের মতই এবং এমনকি তদপেক্ষা অধিক কাজও হয়। বরবটি সেই প্রকারের ফসল। জমিতে নাইট্রোজেন সংস্থান করার ক্ষমতা ইহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে। জোয়ার অথবা ভুট্টা চাষের সহিত পর্য্যায় ক্রমে বরবটি চাষ করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। বরবটি প্রধানতঃ দুই জাতীয় লতানে ও ঝোপ গাছ। পার্ব্বত্য অঞ্চলের পক্ষে ঝোপ গাছই ভাল। তুষারপাতে ইহাদের তেমন ক্ষতি হয় না। তিন মাস, সাড়ে তিন মাসেই ইহার ফসল পরিপক্ক হইয়া যায়। লতানে জাতি নিম্নদেশের পক্ষে উপযুক্ত। ইহার ফসল পরিপক্ক হইতে দেরী হয়। বলা বাহুল্য যে বরবটি উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য এবং ডাইলরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ফসল কাটিয়া লওয়ার পর মাঠে ছাগ ভেড়া প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। উহারা আগ্রহের সহিত গোড়াগুলি খাইয়া থাকে। বরবটি গাছের মূলে যথেষ্ট পরিমাণে গুটি (nodules) জন্মিয়া থাকে। ঐগুলিই জমিতে নাইট্রোজেন সংস্থানের সহায়তা করে। অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় শুকাইয়া রাখিলে পশু খাদ্যরূপে বরবটি অনেক দিন ব্যবহার করিতে পারা যায়। সবুজ সাররূপে প্রয়োগ করিতে হইলে পক্ক অবস্থায়ই গাছ চষিয়া দেওয়া ভাল। সব্জী হিসাবে বরবটির অল্প বিস্তর চাষ আছে। ক্ষেত্রজ ফসল হিসাবে ইহার প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গের ধাতুশিল্প। বাংলা দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান গুলি তামা, কাঁসা এবং অন্যান্য ধাতুর তৈজসপত্র প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত।

বর্দ্ধমান—বনপাশ, দাঁইহাট, পূর্ব্বস্থলী, কালনা ও মাটিয়ারিতে বড় বড় ধাতুর পাত্র এবং পেটা-হাঁড়ি প্রস্তুত হয়।

বীরভূম ও বাঁকুড়া—দুবরাজপুর, নলহাটি, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও পাত্রসায়র প্রভৃতি স্থানের বাসন বিখ্যাত। বাঁকুড়া বড় বড় জলের ঘাড়ার জন্য ও প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ক্ষরার ও ঘাটালের নাম প্রসিদ্ধ। ক্ষরার থালা এবং ঘাটালের গাড়ুর কথা অনেকেই জানেন।

মুর্শিদাবাদ—খাগড়ার বাসন সর্ব্বজনপ্রসীদ্ধ। জঙ্গীপুর ও বেশ উন্নতি করিয়াছে।

ঢাকা—লৌহজং পিতলের চাদরের জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়া আরও কোন কোন স্থানে কাঁসার কাজ হইয়া থাকে।

মৈমনসিংহ—ইসলামপুরের থালা প্রসিদ্ধ। বাগমারীর নাম ও অনেকে জানেন।
ফরিদপুর—পালঙ্গ ও রাজবাড়ী প্রসিদ্ধ।
নদীয়া—নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট এবং মেহেরপুর প্রভৃতির নাম বিখ্যাত।
হুগলী—বালী, বাঁশবেড়ে ও খামারপাড়াতে উন্নত ধরণের বাসন প্রস্তুত হয়।
রাজসাহী—নাটোরান্তর্গত কলম ও বুধপাড়া প্রসিদ্ধ।
মালদহ—ইংলিশবাজারের পিতলের লোটা সুন্দর। নবাবগঞ্জ ও প্রসিদ্ধ।
ত্রিপুরার বিটঘরে এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিলফামারীর গোমনতীতে পিতল ও কাঁসার জিনিস প্রস্তুত হয়।

(প্রাচী)

চরকা প্রচারের উপকারীতা। রাজসাহীর অন্তর্গত কামারগাঁও কেন্দ্রে চরকার কাজ বেশ চলিতেছে। অনেক বৃদ্ধা রমণী তাঁহাদের পূর্ব্ব শিক্ষানুযায়ী ১২ নম্বরের ৬০ তোলা সূতা সপ্তাহে কাটিয়া ১৲ উপার্জ্জন করিতেছেন। বগুড়ার তলোরাতে সূতাকাটা বেশ চলিতেছে। এখানে বালিকারা ও সূতা কাটিয়া দৈনিক এক আনা উপার্জ্জন করে। বঙ্গের প্রতি জেলার প্রতি পল্লীতে প্রতিগৃহে অবসর মত চরকা চলিলে অনেক ব্যর্থ শ্রমের মূল্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে এই নষ্ট শিল্পটি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, আমাদের বস্ত্রাভাব দূরীকরণের ইহাই একমাত্র উপায়। প্রতি গৃহস্থের তুলার গাছ ও চরকা রাখা মঙ্গলের চিহ্ন।

নারিকেল গাছকে অনিষ্টকারী পোকার কবল হইতে রক্ষার উপায়। গাছের গোড়ায় এবং মাথায় মিষ্টদ্রব্য মাখাইয়া দিলে গাছে পিপীলিকার সমাগম হয়; এবং ঐ পিপীলিকাই পোকা নষ্ট করে। ইহা পরীক্ষিত।

গাছের গোড়ায় একটা হাঁড়িতে করিয়া জল ও গোবর মিশাইয়া রাখিয়া দিলে শিরবাসী পোকা উহাতে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাও পরীক্ষিত।

গাছ রোপণ করিবার সময় স্থানটিতে গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে অনুমান /৩ কি /৩৷৷ সের লবণ মাটীতে মিশাইয়া তাহাতে গাছ রোপণ করিবে। অথবা গাছ ২।৩ হাত লম্বা হইবার পর কিছুকাল প্রত্যহ গাছের উপর লবণ মিশ্রিত জল দিবে। ইহাতে গাছ খুব তেজস্কর হয়, পোকা লাগেনা, কিন্তু নারিকেলের জল একটু লোনা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ রোপণ কালে ছাই ও লবণ চারালাগাইবার গর্ত্তে দিয়া রোপণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে ও গাছ শীঘ্র বাড়ে এবং পোকা ধরে না। ইহাও পরীক্ষিত।

কেহ কেহ গাছকে পোকার কবল হইতে রক্ষা করিবার এবং গাছকে সতেজ করিবার জন্য গাছের গোড়ার চারিদিকে গোলাকার গর্ত্ত কাটিয়া মাঝে মাঝে গরুর চোনা বা মূত্র ঢালিয়া দেন। কেহ বা গাছের গোড়ায় ধানের ভুষ ও পানা দিয়া থাকেন।

মোটের উপর নারিকেল গাছের মাথায় সাধারণতঃ আবর্জ্জনা জমে, বৃষ্টির জলে ঐ গুলি পচিয়া পোকার সৃষ্টি করে। এজন্য মাঝে মাঝে গাছের মাথা পরিষ্কার,—অন্ততঃ বৎসরে দুইবার পরিষ্কার করা দরকার; একবার ভাদ্রমাসে ও একবার চৈত্রমাসে। এদেশে ভাদ্র বা আশ্বিনমাসে একবার মাত্র ঐকার্য্য করা হয়,—উহার নাম'গাছ ছাড়ান'। গাছের গোড়ায় চোনা দেওয়া এবং পানা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়ায় গাছের তেজ হয় এবং ফল ভাল ও বেশী হয়।

অদ্ভুত নারিকেল গাছ। নারিকেল গাছ সাধারণতঃ সোজা হইয়া থাকে। ধানুকুড়িয়াতে কিন্তু এমন একটী নারিকেল গাছ আছে যাহার কাণ্ড সাপের মত আঁকা বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে। একটী স্থানে এত বেশী বাঁকা যে একজন মানুষ সেখানে ঘোড়ায় চড়ার মত করিয়া বসিতে পারে। এরূপ গাছের কথা আর শোনা যায় নাই।

চীনা-বাদামের চাষ—মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্ম দেশে চীনাবাদামের চাষ হয়। মোট ১৯৪৬ হাজার একর জমিতে এই ফসল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৯২০ হাজার টন। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজে ১৪১২ হাজার, ব্রহ্মদেশে ২৪৯ হাজার, বোম্বাই প্রদেশে ২৭২ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। বাংলাদেশে কোন কোন জেলায় চীনা-বাদামের আবাদ হয় বাঁকুড়া জেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ১০০ বিঘা। অতি অল্পায়াসে এ-জেলায় ডাঙ্গা জমিতে চীনা-বাদামের চাষ হইতে পারে। ফসল বিঘা প্রতি ৫ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত হয়। এই চীনাবাদাম ফ্রান্স্, বেলজিয়ম্ অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী জার্ম্মানি ইটালি গ্রেট্ বৃটেন ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। চীনাবাদাম ও চীনাবাদামের তৈল এবং খৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ৩ কোটী টাকার চীনাবাদাম বিদেশে রপ্তানি হয় এবং একা গ্রেট্ বৃটেন প্রতিবৎসর নানা দেশ হইতে প্রায় ৫।০ কোটী টাকার চীনাবাদাম খরিদ করে। মান্দ্রাজ হইতে বাংলায় চীনাবাদামের তৈল আমদানী হয়। এই চীনাবাদামের তৈলের সহিত চর্ব্বি ও সামান্য বিশুদ্ধ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বাজারে ঘৃত বলিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়।

(প্রবাসী) শ্রীরামানুজ কর।

পেয়ারা বাগিচা—পেয়ারা একটি উৎকৃষ্ট ফল। বঙ্গদেশের সাধারণ পেয়ারা অতি অপকৃষ্ট। বঙ্গদেশের লোকেরা দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করে না। অযত্নসম্ভূত গাছে আর কি ভাল ফল হইবে? পশ্চিমে এলাহাবাদ বেনারস প্রভৃতি বহু জেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা জন্মে। ঐ সকল স্থানে দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করা হয়। কলিকাতায় সেই সকল পেয়ারা রাশি রাশি আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতায় কাফ্রি পেয়ারা নামক এক জাতীয় বৃহৎ পেয়ারা ও আছে। কলিকাতা হইতে ১৫।২০ মাইল দূরে—রেল ষ্টেশনের নিকটে যদি কেহ পেয়ারা বাগান করেন, আর এলাহাবাদ, কাশী বা অন্য-স্থানের বৃহজ্জাতীয় পেয়ারার চারা বা কলম রোপণ করেন, তবে বেশ লাভবান্ হইতে পারেন। ১০ হাত তফাৎ কলম বসাইলে ৮×৮=৬৪টা গাছ হইতে পারে। ২।৩ বৎসরের মধ্যেই ফলন আরম্ভ হয়। ৪।৫ বৎসর পরে বেশ ফলে। তখন গাছ প্রতি গড়ে ১০০ পেয়ারা হইলে ২৲ শ' হিসাবে ১২৮৲ টাকার পেয়ারা এক বিঘা জমিতে হইতে পারিবে। ডাল ছাঁটা মাটি কোপাইয়া দেওয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করা প্রভৃতি প্রধান কাজ। সুতরাং ২৮৲ খরচ পড়িলে ও ১০০৲ টাকা লাভের আশা করা যাইতে পারে। ঐসকল স্থানে প্রতি বিঘা জমি ২০০৲ মূল্যে খরিদ করিলেও ২ বৎসরে জমির মূল্য উঠিয়া যাইবে। কলম না কিনিয়া পাকা পেয়ারার চারা করিলেও চলিতে পারে। একবার গাছ জন্মিলে আর কলম করিবার অসুবিধা থাকিবে না। কেহ অন্ততঃ ৫ বিঘা জমিতে পেয়ারার বাগান করিলে বৎসরে ৫।৬ শত টাকা আয়ের উপায় হইবে। পেয়ারা বাগানের ভিতর হলুদ এবং আদার চাষ করিলে আর একটি আয়ের পথ হইতে পারে। কবে আমাদের যুবকগণ কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিবে, বুঝিতে পারি না।

—ছোল্‌তান।

সম সাময়িক জগত।

উদ্ভিদের উপর চন্দ্রের প্রভাব ঃ—প্রাচ্যে চন্দ্রের সহিত পৃথিবীর জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির সম্বন্ধ বহু পূরাকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকেরাও কতকগুলি বিষয়ে চন্দ্রের প্রভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। মার্কিণের কলম্বিয়া অঞ্চলে দেখা গিয়াছে যে পূর্ণিমার দিনে যে গাছ কাটা যায় তাহার কাঠ অতি শীঘ্র কীট দষ্ট হয় এবং এমন কি এক বৎসরের মধ্যেই কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। জঙ্গলের অধিকারীগণ এই বিষয় এত ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন যে তাঁহারা মজুরদিগকে অবৈধ সময় কাঠ কাটিলে জরিমানা করেন। চতুর্থীর দিন পর্য্যন্ত কাঠকাটা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কখন বৃক্ষ চ্ছেদন করিবার ঠিক উপযুক্ত সময় হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃক্ষলতাদির গাত্রে একটি দাগ দিয়া কত রস বাহির হইতেছে তাহার উপর দৃষ্টি রাখা হয়। যখন রসের পরিমাণ খুব কমিয়া যায় তখনই কাঠ কাটিবার প্রশস্ত সময়।

ট্রিনিদাদ দেশেও এইরূপ বিশ্বাস আছে। আমাদের এতদ্দেশে স্থানে স্থানে পূর্ণিমার পর কয়েকদিন (চতুর্থী, পঞ্চমী) পর্য্যন্ত বাঁশ কাটা হয়। একাদশী সময় হইতে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার মধ্যে বাঁশ কাটিলে অবিলম্বে তাহা ঘুন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

ইউরোপের Riviera অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে অলিভ্ জন্মিয়া থাকে। অপর গাছের সহিত কলম বাঁধিয়া অলিভ গাছ উৎপাদিত হয়। সেখানেও কৃষকেরা অবগত আছে যে পূর্ণিমার সময়ই বৃক্ষে রস প্রবাহের গতি ও মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই জন্য তাহারা উক্ত সময়ে কলম বাঁধে।

নকল তুলা ঃ—বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জর্ম্মনিতে নকল তুলা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। শণ, পাট প্রভৃতির তন্তু অথবা ফেঁসোর সহিত সামান্য পরিমাণে তুলা মিশাইয়া যে তন্তু প্রস্তুত হয় তাহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করা চলে। যেখানে শণ পাট প্রভৃতি হইতে দড়িদড়া চট, ক্যাম্বিস প্রভৃতি প্রস্তুত হয় সেখানে অনেক ফেঁসো অপচয় হয়। উহার সহিত তুলা মিশাইয়া যদি সূক্ষ্ম সূত্র উৎপাদিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে একদিকে যেমন অপচয়ের সদ্ব্যবহার হয়, অন্যদিকে তেমনই খুব সস্তাদরেই কার্পাসের সমতুল্য দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে Emperor William nstitute এর বিশেষজ্ঞগণ যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষা করিতেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে নকল তুলা হয়ত ব্যবসায়ের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

(পৌষ ও মাঘ)

সব্জী-ক্ষেত্র—কপি প্রভৃতি বিলাতী সব্জী শেষ হইতে চলিল; সুতরাং উহাদের যে পরিমাণ ফসল এখনও ক্ষেত্র হইতে উঠে নাই, মাঝে মাঝে তাহাতে জল দেওয়া ছাড়া আর সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কার্য্য নাই। ঐগুলি উঠিয়াগেলেই, সেই ক্ষেত্রে চৈত্রের বা 'চৈতে' বেগুন এবং দেশী লঙ্কার গাছ বসাইবে।

শীতের সব্জী,—গাজর, শালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি ও মুলা যদি ইতিপূর্ব্বে না বসান হইয়া থাকে, তবে 'নাবী' জাতীয়, অর্থাৎ বিলম্বে ফলিবার ফসলের বীজ এখনও লাগান যাইতে পারে।

'তেতো' বা তাতের সময়ের, অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখে যাহাদের ফসল উঠে, এমন লাউ ও কুমড়ার ('মিঠে' বা 'মেঠো' কুমড়ার) বীজ এই সময়েই রোপন করিবে। 'ভুঁইয়ে' বা 'ভুঁয়ে' শশা, করলা, তরমুজ প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি প্রস্তুত এবং ক্রমশঃ বীজ বপনাদি আরম্ভ করিবে। অবশ্য তরমুজ মাঘ এবং ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

শস্য ক্ষেত্র—রবিশস্য কড়াই প্রভৃতির চাস ইতিপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যদি কাহারও না হইয়া থাকে, পৌষেও লাগাইতে পারেন, কিন্তু ফসল আশানুরূপ হইবে না। কারণ, এতদিনে জমিগুলির 'জো' আর নূতন বীজবপনের উপযুক্ত নাই। যদি কোনখানে থাকে তবে সেইখানেই লাগান চলিবে।

ইক্ষু কাটিবার সময় আসিল। আখ্ বা ইক্ষু কাটার পর ছোলাই ও মাড়াই প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হইবে। পুরাতন ইক্ষু ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ পড়ি জাতীয় ইক্ষুর ক্ষেত্রে অনেকে ফসল উঠাইয়া আগুণ দিয়া ক্ষেত্র পোড়াইয়া লয়েন।

চীনের বাদাম বা 'মাঠ-কড়াই' ও এই সময়ে উঠাইবে। হলুদ ও আদা মাঘ মাসেই উঠান হয়। ক্ষেত্র কোপাইয়া ইহাদের মূল উঠান হয়। এদেশে হলুদ উঠাইবার পর মূলগুলি ধৌত করিয়া একটু শুকাইবে। মুখ বা 'মুখী' গুলি বীজের জন্য ধৌত করিবার পূর্ব্বেই পৃথক করিয়া শীতল জায়গায় রাখিয়া দিবে। ধৌত মূলগুলি গোবর জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া শুকাইতে দিবে। শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে দলিয়া দিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে।

মাঘমাসে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষার ফসলের জমিতে এই সময়ে

চাষ দিয়া ও সার মিশাইয়া উহা প্রস্তুত করা উচিৎ। পরবৎসর আলু ও কপি চাষ করিবার জন্য এই সময়েই পলিমাটী দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।

মাঘমাসে এদেশে মূলা খায় না। পৌষের মূলার মধ্যে যাহা বীজের জন্য রাখিবে তাহা বাদে বাকী মুলা পৌষের মধ্যে উঠাইয়া ফেলিবে। উঠান মুলা হইতে ও বীজ জন্মান যায়। গাছ সমেত চারি অঙ্গুলি পরিমাণ মুলা সহ কাটিয়া লইয়া উহার ভিতর গর্ত্ত করিয়া জল দিয়া ভরিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে এবং প্রত্যহ ঐ গর্ত্তে জল দিবে। এইরূপ করিলে শীষ বাহির হইয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিবে এবং তাহাতে উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। গাছসহ মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটীতে বসাইয়াও বীজ উৎপাদন করা যায়।

ফুল বাগান।—মরসুমী ও গোলাপের এখন ফুল ফুটিতেছে। গোলাপ বাগানে এখন রীতিমত জল দেওয়া কর্ত্তব্য। বেল, মল্লিকা, যুঁই ইত্যাদির এই সময়ে পুরাতন ডাল ছাঁটিয়া দিবে, এবং গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিবে। কারণ বসন্তেই ইহাদের ফুলের সময়। জল্‌দি ফুটাইতে পারিলে, বিক্রেয় ফুলের দর ভাল পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য শীত প্রধান দেশে এখন এষ্‌টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্‌, ক্রকস্‌, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপনের সময়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট্‌, পীচ্‌, গোলাপজাম, জামরুল ও ও লেবু প্রভৃতি ফলের মুকুল এই সময়ে বাহির হয়। সুতরাং গাছের গোড়ায় এখন রীতিমত জল দিতে পারিলে ফুল ঝরিয়া পড়িবে না এবং ফলও বেশী হইবে। ফলের গাছে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে ধোঁয়া লাগান হয়; ইহাতে ফলে পোকা লাগা নিবারিত হয় এবং ফলও ভাল হয়। কিন্তু সাবধান, যেন ধোঁয়া লাগাইবার চেষ্টায় গাছে উত্তাপ না লাগে, কারণ তাহা অনিষ্টকর হইবে। ধোঁয়ার জন্য অগ্নিকুণ্ড একটু দূরে করা বিধেয় এবং আগুন যেন খুব প্রজ্জলিত না হয়।

আনারসের গাছের গোড়া এই সময়ে সার মাটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। গোবর, ছাই ও পাঁক মাটীই তৎপক্ষে উৎকৃষ্ট। যাঁহারা আনারসের ক্ষেত্র করিয়াছেন, গাছের সারির পরবর্ত্তী নালীতে এখন জল দিবেন। যদি আঙ্গুর গাছের গোড়া এখনও না খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তবে আর বিলম্ব করা অনুচিত।

বর্ষাকালে যেখানে নুতন ফলের গাছ রোপন করিবে, সেইখানে এখন দুইহাত পরিমিত গর্ত্ত করিয়া কিছুদিন পরে উত্তোলিত মাটীর সঙ্গে উপযুক্ত সার মিশাইয়া পুনর্ব্বার উহা গর্ত্তে ভরিয়া রাখিয়া দিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

২৪ খণ্ড } মাঘ, ১৩৩০ সাল। { ১০ম সংখ্যা

তুলার চাষ,—কার্পাস।

আমাদের দেশে প্রয়োজন হিসাবে অনেক রকমে অনেক প্রকার তুলার ব্যবহার হইয়া থাকে। কাপড়ের জন্য এবং শেলাই প্রভৃতির কাজ ও জাল ইত্যাদি বুননের জন্য যে সুতার ব্যবহার হয়, উহা কার্পাস তুলা হইতেই প্রস্তুত হয়। ঐগুলি ছাড়া আরও অনেক প্রকারে কার্পাস তুলা ব্যবহৃত হয়, যথা—লেপ, তোষক, বালাপোস, তুলার জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করণে। গদি, বালিস, কুসন প্রভৃতিতে শিমুল তুলার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আকন্দ গাছের ফল হইতেও তুলা পাওয়া যায়, উহাতেও বালিস প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, এবং আকন্দতুলার বালিস ব্যবহার করিলে কানের যাবতীয় রোগ,—কানে পূয হওয়া, যন্ত্রণা হওয়া ইত্যাদি,—উপশমিত হইয়া থাকে। কেশে এবং বেনা নামক দুই জাতীয় ঘাসের তুলাও গদি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কার্পাসের তুলায় বালিস, গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় না; ইহার আঁশ লম্বা; ইহা সূত্র নির্ম্মাণেরই একমাত্র যোগ। প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া দেখিলে কার্পাস সকলেরই শীর্ষস্থানীয়, এত আবশ্যকতা অন্য কোন তুলার নাই, কারণ বস্ত্র নির্ম্মাণে আর কোন তুলার ব্যবহার নাই। আমরা অদ্য কার্পাস সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

এমন একদিন ছিল, যখন শুধু ভারতের কার্পাস সমগ্র জগতের বস্ত্রাভাব দূর করিত; আবার এমন দিন আসিয়াছে, যখন ভারত আপনার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাভাব দূর করিবার মত কার্পাস যোগাইতে পারিতেছে না। অবশ্য ইহাও নিশ্চয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল

তুলার বস্ত্র অধিক ব্যবহৃত হয়, এবং সেই হিসাবে তুলার চাহিদাও বাড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের জন্য এখন যে তুলার প্রয়োজন,—আগেকার সমগ্র জগতের প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিশ্চয়ই বাড়ে নাই; সুতরাং ইহাও নিশ্চয় যে ভারতে কার্পাসের চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাংলায় ত কার্পাসের চাষ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বাংলায় যে কার্পাসের চাষ অসম্ভব এমন কথা বলা যায় না।

কার্পাস চাষের জমি। যে জমীতে জল দাঁড়ায় না, এমন সকল প্রকার জমিতেই কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে। তবে দোয়াঁস মাটীতেই ইহা ভাল জন্মে। জল নিকাশের পথ থাকিলে লাল মাটীতেও কার্পাস ভাল হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত ৩১-৫০ ইঞ্চি তথায় ভাল জন্মিবে, এবং যথায় ৬০-৭০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত সেখানে মধ্যম প্রকার জন্মিবে। রাঢ় প্রদেশের লালমাটী, উত্তরবঙ্গের খিয়ার মাটী এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভিটা বা ডাঙ্গাজমী আর সকল স্থানেরই পলিমাটীর জমী কার্পাস চাষে প্রশস্ত।

পতিত জমীতে অন্ততঃ তিনটা চাষ বর্ষার পর হইতেই দিয়া জমী প্রস্তুত করিতে হয়। চাষকরা জমীতে দুইটা চাষ দিয়াই জমী প্রস্তুত হইতে পারে। কার্পাসের জমীর চাষ অন্ততঃ চারি ইঞ্চি গভীর হওয়া চাই।

সার। নাইট্রোজেন, পটাস এবং ফস্‌ফার এই তিনটিই প্রয়োজনীয়। এক একর জমীর জন্য নিম্নলিখিত মাত্রা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; তবে ক্ষেত্রস্বামী জমী পরীক্ষা করিয়া এই মাত্রার ঠিক করিলেই ভাল হয়, কারণ জমীতে স্বাভাবিক সারের পরিমাণ স্থির করিয়া তবেই ক্ষেত্রের উপযুক্ত সারের মাত্রা স্থির করা কর্ত্তব্য।

নাইট্রোজেন—	১২ পাউণ্ড।
পটাস—	১৬ „ ।
গ্রহণযোগ্য ফস্ফরিক্ এসিড্	২০ „ ।

অর্থাৎ,—সোরা ২০০ পাউণ্ড ও হাড়ের গুঁড়া ২৫০ পাউণ্ড; কিম্বা খইল ২০০ পাউণ্ড, ভস্মসার ৫০০ পাউণ্ড, এবং হাড়ের গুঁড়া ২০০ পাউণ্ড; অথবা পচা গোবর সার ২০০০ পাউণ্ড এবং হাড়ের গুঁড়া ১০০ পাউণ্ড। বেলে-মাটীতে সারের পরিমাণ অধিক আবশ্যক।

হাড়ের গুঁড়া, ভস্মসার, খইল প্রভৃতি জমী চষিবার সময়েই দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য ব্যবসায়িক সার গাছের আবশ্যক মত দুইতিন বারেই দেওয়া উচিৎ। সার দিবার পর বেশী বর্ষা হইয়া গেলে অনেক সার পদার্থ বৃষ্টির সঙ্গে ধুইয়া যায়। খইল, সোরা প্রভৃতি নাইট্রোজেনপ্রধান সার কখনই ফুল ফুটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সেই সময়ে দিবে না; তাহাতে ফুল ফলের পরিবর্ত্তে গাছের ডাল পালাই বাড়ে। অধিক গোবর সার কিম্বা উদ্ভিজ্জ বা সব্জী-সার কার্পাসের পক্ষে সুফলদায়ক নহে। সোরা মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া গাছের গোড়ায় ছড়াইয়া দিতে হয়।

বীজ বপন। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র হইতে পৌষ পর্য্যন্ত কার্পাসবীজ বপণের সময়। প্রথমটি আশু কার্পাস এবং শেষোক্তটি শামন কার্পাস বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য জ্যৈষ্ঠের মধ্যে উপ্ত কার্পাসের ফলন বেশী হইয়া থাকে।

কার্পাসবীজ শ্রেণীবদ্ধভাবেই বপন করা উচিৎ। লাঙ্গল দিয়া ৩।৪ ফিট্ অন্তর এবং ২ ইঞ্চ গভীর রেখা বা সারি করিয়া উহার মধ্যে ১॥ ফুট অন্তর তিনচারিটি করিয়া বীজ রোপন করিবে। তদনন্তর মই দিয়া মাটী চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; নতুবা বীজ অঙ্কুরিত না হইতে পারে। যদি শীঘ্র বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এক ফুট উচ্চ ভাঁটি বা পিলি করিয়া উহার মধ্যে বীজ বপন করিবে; নতুবা বর্ষায় চারাগাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বীজ মনোনয়ন। বীজ বপনের পূর্ব্বেই বীজ মনোনয়ন বা রোপনোপযোগী বলিয়া স্থির করিবার জন্য আবশ্যকমত বিবেচনা দরকার। এ পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। জমী হিসাবে কার্পাসের রোপনোপযোগী জাতি নির্ণয় করা কর্ত্তব্য; তারপর ভাল গাছের ভাল বীজই রোপণ করা উচিৎ; নতুবা ফসল ভাল হয় না।

কার্পাসের জাতিনির্ণয়। কার্পাসের অনেক জাতি আছে। দেশীয় গণের মধ্যে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও জলপাইগুড়ি জেলায় গারো কার্পাসের চাষ কিছু কিছু হয়। ইহার ফলন ভাল বটে, কিন্তু তন্তু মোটা এবং বেশী লম্বা হয় না। বীজকার্পাসের শতকরা ৪০।৪৫ ভাগ সুত্র; ইহার বীজ ছাড়ান কিছু কঠিন। ইহা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে রোপিত হয়, এবং আশ্বিন-কার্ত্তিকে গোটা ফুটিয়া থাকে।

বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই দুই একটি করিয়া ঢাকা কার্পাস ও দেবকার্পাসের গাছ দেখা যায়। দেবকার্পাসের আবার কতকগুলি বিভিন্ন নামও শোনা যায়,—যথা, বড় কার্পাস, বোম্বাই কার্পাস এবং রাম কার্পাস।

ঢাকা কার্পাসের গাছ ৫।৬ বৎসর তুলা দেয়; তন্তু কোমল, সুক্ষ্ম ও চিক্কণ। কেহ কেহ ইহাকে ছোট-কার্পাস বা পেচিকার্পাসও বলে। ইহা হইতেই জগদ্বিখ্যাত মসলীন্ কাপড় প্রস্তুত হইত। দেশী-চরকায় ইহা হইতে খুব সুক্ষ্ম সুত্র বাহির হইতে পারে। তন্তুগুলি কিন্তু আধ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ নহে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ঢাকাকার্পাসের রোপনের কাল; ভাদ্র-আশ্বিনেও রোপন করা চলে। আশুরোপনের আশ্বিন মাসে ফুল ধরে, এবং আমনরোপনের মাঘ-ফাল্গুনে ফুল ধরে। বীজ-কার্পাসের ⅓ ভাগ সুত্র। দেবকার্পাসের সুত্র অপেক্ষাকৃত মোটা; বীজকার্পাসের ⅓ ভাগ সুত্র। ইহার গাছও ঢাকা-কার্পাসের গাছের চেয়ে লম্বা হইয়া থাকে।

কাছাড় জেলায় খাস্যা-কার্পাস জন্মিয়া থাকে; ইহার সুত্র গারো-কার্পাসের সুত্র অপেক্ষা কিছু ভাল। বেহারে ভেটুয়া-কার্পাস এবং ভোগলা-কার্পাসের চাষ হয়; ইহাদের তন্তুও বিশেষ দীর্ঘ নহে। ছোটনাগপুরে আতিয়া-কার্পাস, থেরিয়া-কার্পাস

ও বঢ়িয়া-কার্পাসের চাষ হয়। বঢ়িয়া-কার্পাসের সুত্র পৌনে এক ইঞ্চি দীর্ঘ; বীজ-কার্পাসের ½ ভাগ সুত্র। ইহা ইংরাজী জুন মাসে রোপিত হয়, এবং ডিসেম্বর মাসে গোটা ফুটিয়া থাকে। ইহা উত্তম জাতীয় সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় আচনা-কার্পাস ও হলদিয়া কার্পাসের চাষ হয়। ইহারা নিকৃষ্ট জাতীয়।

বোম্বাই প্রদেশে ব্রোচ-কার্পাসের চাষ হয়। ইহা ভারতীয় কার্পাসের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তত্রত্য রেণ্ডর নামক কাল মাটীতেই ইহারা ভাল জন্মে। ইহার তন্তু বা সুত্র প্রায় ১ইঞ্চি লম্বা, সুক্ষ্ম, কোমল ও চিক্কণ। বীজকার্পাসের শতকরা প্রায় ৩০.৩৫ ভাগ মাত্র সুত্র। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠই রোপনের কাল, কার্ত্তিকে প্রথম ফুল ফুটে, এবং মাঘ-ফাল্গুনে গোটা ফুটিয়া থাকে। মধ্য প্রদেশের বাণী-কার্পাস গুণে প্রায় ব্রোচ-কার্পাসের তুল্য। বীজ-কার্পাসের ½ অংশ সুত্র।

(বাণী-কার্পাসের গাছ।)

আমেরিকান্ কার্পাসের বীজ হইতে ধারোয়ারে এক জাতীয় কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে, উহাকে ধারোয়ার-কার্পাস বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস।

চট্টগ্রামে ইহার চাষের প্রচলন হইয়াছে। ইহার বীজ-কার্পাসের শতকরা ২৮ ভাগ সুত্র।

(কানপুরক্ষেত্রে উৎপাদিত মার্কিণ দেশীয় বীজের কার্পাস গাছ।)

গাছের পরিচর্য্যা। দশ হইতে পনর দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কার্পাসের চারা বাহির হইয়া থাকে। চারা একটু বড় হইলে সমগ্র ক্ষেত্রটি একবার খুসিয়া দেওয়া দরকার। এই খননের উদ্দেশ্য আগাছা নষ্ট করা এবং জমীর রস রক্ষা করা। গাছ ৯।১০ ইঞ্চি বা এক ফুট উচ্চ হইলে, দেড় ফুট অন্তর এক একটি সবল গাছ রাখিয়া বাকীগুলি কাটিয়া ফেলাই ভাল। বর্ষাপ্রধান স্থানে, যদি ভাঁটি বা পিলিতে গাছ রোপিত না হইয়া থাকে, তবে উহার গোড়ায় ভাঁটি তুলিয়া দেওয়া দরকার।

সাধারণ কার্পাসের গাছ ৫।৬ ফিট বড় হয়; ঢাকা-কার্পাস ৮।৯ ফিট বড় হয়; এবং দেব-কার্পাস ১৪।১৫ ফিট বড় হয়। বেশী বড় গাছের তুলা সংগ্রহ করা একটু কঠিন হইয়া থাকে। তুলা সংগ্রহের পর গাছের ২।৩ ফিট্ রাখিয়া কাটিয়া ফেলা ভাল।

কার্পাস-সংগ্রহ। সাধারণতঃ ২।৩ বারে তুলা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। গোটা বেশী ফুটিয়া ক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িলে তুলার ক্ষতি হয়, সুতরাং গাছ হইতেই

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

মাটির কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাহাড় ভাঙ্গিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণীগণের দেহাদি এবং মলমূত্র পচিয়া মাটী বা জমীন্ তৈয়ারী হইয়া থাকে। উপাদান যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন জমী ও যে বিভিন্ন প্রকারের হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন স্থান কঙ্করময়, কোনও স্থান বালুময়, কোনও স্থান মেটেল বা আটল অর্থাৎ অধিক কর্দ্দমযুক্ত, আবার কোন ও স্থানে একাধিক বস্তুর সমাবেশও আছে।

এদেশে আটল, এঁটেল বা মেটেল, দোয়াঁশ, বেলে দোয়াঁশ বেলে, পাথুরে প্রভৃতি নানা পর্য্যায়ের ক্ষেত্র বা ভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে আবার নানা প্রকার রূঢ় এবং যৌগিক পদার্থের বিদ্যমানতা আছে, এবং সেই গুলির ও তারতম্যে ক্ষেত্র নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কৃষিতত্ত্ববিদ্ কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন না, যে কোন জমীতে ফসল হইবেই, অথবা কোনখানে হইবে না। তাঁহারা বড় জোর কৃষিবিজ্ঞান সম্মত কয়েকটি প্রথার উপদেশ মাত্র দিতে পারেন। যে জমী যে ব্যবহার করিয়াছে, সে সেই জমীর সকল তথ্যই জানিতে পারে, অপরের পক্ষে তাহা জানা সম্পূর্ণ সম্ভব নহে। সুতরাং স্বভাব যে জমীকে যেমন উপাদানে যে প্রকারে গঠিয়াছে, ক্ষেত্রস্বামী উহা ব্যবহার করিয়া সে সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন।

তবে কৃষিনিরত বা কৃষিউৎসাহীজন জানিয়া রাখিবেন, জমীন বা ভূমিই সকল ফসলের আশ্রয় এবং সেই জন্যই শস্যের মত জমীন ও ধন বা অর্থরূপে গণ্য। ফসল লাগাইয়া সফলতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন,—

(ক) গাছকে তাহার প্রয়োজনীয় আহার দিতে হইবে।

(খ) ফসলের গাছে বায়ুর অবাধগতি রাখিতে হইবে, কারণ উহাদেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস লইতে হয়।

(গ) ফসলের গাছের জন্য রসের আবশ্যক, অতএব মাটীর রস থাকা চাই।

(ঘ) গাছকে সুস্থ রাখিবার জন্য রৌদ্রাদির ও আবশ্যক আছে।

ক্ষেত্রস্বামীকে নিজ ক্ষেত্রে ঐ সকলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, তবেই তিনি আশানুরূপ সফলতা লাভ করিবেন। ঐ সকলের ব্যবস্থা করিতে হইলে ক্ষেত্রকে—মাটীকে চেনা দরকার।

বালী মাটি বা বেলেমাটি। যে জমীতে শতকরা ৭৫।৮০ ভাগ বালী আছে ও ৮।১০ ভাগ কর্দ্দম এবং বাকী অন্যান্য পদার্থ থাকে, উহার নাম বেলে মাটী।

ইহা শীঘ্র কর্ষিত হয় এবং সার মিশাইলে উহার উপযুক্ত পরিমাণ ফল দিয়া থাকে। তবে বেলে মাটীতে জল বা রস বেশী থাকেনা, এবং ইহাতে উৎপন্ন গাছ ইহার রস সত্তর গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং যে গাছের বেশী বাড়ের প্রয়োজন, বেলে মাটীর ক্ষেত্রই তাহার পক্ষে যোগ্য।

দোয়াঁশ মাটি। সমপরিমাণের বালী ও কর্দ্দমময় ভূমিই দোয়াঁশক্ষেত্র। অধিকাংশ শস্যের পক্ষে ইহা যোগ্য। ইহার রস রাখিবার ক্ষমতা আছে।

এঁটেল, মেটেল বা আটল মাটি। যাহাতে কর্দ্দমের ভাগ অধিক বালির ভাগ কম, তাহাই আটল মাটী। ইহার রস রাখিবার ক্ষমতা অধিক, শীঘ্র শুকায় না এবং গুঁড় ও হয় না, ঢেলা বাঁধিয়া থাকে। একবার শুকাইলে খুব শক্ত হইয়া পড়ে। আটল মাটীতে কোন শস্যই ভাল জন্মে না। ইহাতে জল শীঘ্র প্রবেশ করেনা, কিন্তু যে জল একবার ইহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা শীঘ্র বাহির হয় না। আটল মাটী শুকাইবার কালে খুব ফাটিয়া যায়।

মোটের উপর মাটীর প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের ফসল ইহাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাটি খুব শক্ত হইলে চূণ মিশাইয়া উহাকে ফসল উৎপাদনোপযোগী করা যায়। রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাই মাটীকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ দিয়া থাকে। মাটীতে উৎপন্ন গাছ দেখিয়াই ব্যবহারিক জ্ঞান জন্মে, এবং ইহাই মাটীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মনে করুন, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক প্রণালীতে পরীক্ষা করা গেল। তাহাতে আমরা ঐস্থানের মৃত্তিকায় কোন জিনিস কত পরিমাণে আছে—শুধু তাহাই জানিতে পারিলাম। কিন্তু বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী কোন জিনিসের পরিমাণ কত তাহা রাসায়নিক বলিতে পারেন না, তাহা কেবলমাত্র উৎপন্ন ফসলের অবস্থা দৃষ্টেই জানা যায়। সুতরাং ক্ষেত্রস্বামীর নিয়মিত-ভাবে-ক্ষেত্র-পরিদর্শন-জাত অভিজ্ঞতাই ক্ষেত্রকে উন্নত করিবার যোগ্য পরামর্শ দিয়া থাকে।

মাটীতে 'সার' দিলেও, যে মাটীর উহাকে সত্তর পরিবর্ত্তিত করিয়া বৃক্ষের গ্রহণযোগ্য করিয়া লইবার ক্ষমতা অল্প, তাহা অপেক্ষা, যে মাটীর ঐরূপ করিবার ক্ষমতা অধিক, তাহা বেশী উর্ব্বর হইয়া থাকে। এই ক্ষমতা মাটীর প্রকৃতির একটী বিশেষত্ব। তারপর স্থানীয় জল, বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাবও মাটীর প্রকৃতিতে এক একটী বিশিষ্টতা আনিয়া দেয়। কর্ষণের ইতর বিশেষেও মাটীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং মাটীর উর্ব্বরতা স্থির করিতে হইলে উহার মধ্যস্থিত পদার্থ বিশেষের বিশিষ্ট পরিমান ও প্রকৃতি, স্থানীয় জল, বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাব এবং তদভিভূত মাটীর বিশেষ প্রকৃতি বা ক্ষমতা, এবং সেই সঙ্গে কর্ষণের ইতর বিশেষ জনিত ভাবান্তর এই সকল গুলিই জানিতে হইবে। শুধু রাসায়নিক পরীক্ষাই মাটী চিনিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। অতএব মাটী চেনা সময় সাপেক্ষ, অধ্যবসায় সাপেক্ষ এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। (প্রাপ্ত)

২ (ক্রমশঃ)

অর্থ সমস্যা।

(প্রাপ্ত)

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি-বিমুখ দেশের শিক্ষিত এবং ধনীগণ ঐগুলির অভাবে দেশের অবস্থা যে ক্রমশঃ শোচনীয়তর হইতে শোচনীয়তম হইতে চলিয়াছে, তাহা বোধ করি আদৌ চিন্তা করেন না। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট ; নিজ অর্থ কোথায় কাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া বা ধার দিয়া বিনা পরিশ্রমে বেশী পরিমাণ সুদ পাওয়া যাইবে, এইটুকু মাত্র চিন্তা করেন ; দেশীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সেই অর্থের নিয়োগ মূর্খের কার্য্য বলিয়াই গণনা করেন। এপক্ষে তাঁহাদের যুক্তি এই যে অনেক দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইপ্সিত সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, তদর্থে সংগৃহীত মূলধন নষ্ট হইয়া ক্ষতি সাধন করিয়াছে, সুতরাং সে বিষয়ে পুনরায় অর্থ নিয়োগ করা কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতে পারে না। আর তার উপর ইনকম্‌ট্যাক্স-শূন্য শতকরা আট টাকা সুদে গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিলে, সে টাকা মারা যায় না, বরং কৃষি-শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত অর্থ অপেক্ষা অধিক আয়কর হইয়া থাকে। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের কর্ম্ম, তাহাদের জন্যই ঐ গুলি ফেলিয়া রাখিয়া এখন শুধু সুদে নিজেদের ধনবৃদ্ধির চেষ্টায় তাঁহারা ব্যাপৃত। চাষা, কামার, কোমর, এবং বেনেরা তাহাদের দারিদ্র্যনিবন্ধন বিস্তৃত ভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে নাই। ইহাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চেষ্টা বর্ত্তমানকালের কল-কারখানা ও বৈজ্ঞানিক চাষের যুগে প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃই পশ্চাৎপদ হইতে হইতে এখন একেবারে সীমায় বা কূলে উপনীত। ইহার পরবর্ত্তী পশ্চাতে পদক্ষেপ তাহাদিগকে ধ্বংশসমুদ্রের অতল তলে আশ্রয় লইতে পাঠাইবে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের কৃষিসম্পদ কিছু কিছু থাকিলেও, শিল্প ও বাণিজ্য একেবারে নাই। কৃষিসম্পদ কিছু আছে বলিলাম, কারণ, এদেশের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ লোক কৃষি-জীবি, কিন্তু তথাপি তাহারা দরিদ্র, এবং পর্য্যাপ্ত আহারে বঞ্চিত। কেন? মূল্যহিসাবে যে কৃষিসম্পদ এখনও দেশের লোকের হাতে আছে, তাহা সম্পদ বিশেষণে বিশিষ্ট হইবার যোগ্য বলিতে পারি না। ধনী এবং অভিজাতগণের স্বার্থপরতাই এখন সকলকে ধ্বংশের পথে টানিতেছে।

অনেক দেশীয় প্রতিষ্ঠান ইপ্সিত সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, বা একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে, একথা সত্য। তাহার জন্য দায়ী কে? আর, কোন দেশেই বা অসাফল্য নাই? তুমি ধনী কারবার খুলিলে, অভাবগ্রস্ত তোষামোদপটু কর্ম্মচারী

নিয়োগ করিলে এবং উহাই যথেষ্ট কর্ত্তব্য হইল ভাবিয়া ঘুমাইয়া থাকিলে। অভাবে, মানুষের স্বভাব প্রথমেই নষ্ট করিয়া রাখে, তাহার উপর যদি সেই বিকৃতস্বভাব কর্ম্মচারী প্রচুর অর্থ সমষ্টির মাঝখানে পড়ে, এবং তাহার কার্য্য কলাপের কৈফিয়ৎ চাহিবার কেহ তাহার উপরে না থাকে, তাহা হইলে তাহার লোভ যে সেই কারবার নষ্ট করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কোন কোন স্থলে আবার, প্রয়োজনীয় অর্থের অসঙ্গতি, ও হঠাৎ অজ্ঞাত কিম্বা নৈসর্গিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও কারবার নষ্ট হইবার কারণ হইয়া থাকে। তাহা যে শুধু এদেশেই হয়, অন্য দেশে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু অন্য দেশের লোক এ সকল কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হয় না, কেননা, তাহারা জানে তাহাদের অর্থ বসিয়া থাকিবার জন্য নহে, বা পরের ব্যবসায়ে সুদে খাটাইবার জন্য নহে, উহা তাহাদিগেরই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া ধনী এবং শ্রমজীবি নির্ব্বিশেষে তাহাদের সমগ্র দেশবাসীর সেবার জন্য। তাহারা প্রায় সকল কার্য্যই সমবেত ভাবে করে, ব্যক্তিগত ভাবে নহে ; এবং একটি বা দুইটি মাত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠানে সমগ্র অর্থ নিযুক্ত না করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অর্থসম্পদ বহু প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করে। ইহাতে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পতনে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, সে ক্ষতি ধনীর পক্ষে অসহনীয় হয় না, তাহারা অন্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত অর্থ হইতে লভ্যাংশ পাইয়া আপনাকে আশান্বিত করিতে সমর্থ হয়। বিদেশীয় বণিকগণের এই বাণিজ্যনীতিই তাহাদের সাফল্যের কারণ। তাহারা কারবারের জন্য নিজেরা খুব খাটে, এবং দৈবাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিরাশ হয় না, বরং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাহারাও তাহাদের গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজন হইলে টাকা ধার দেয়, তবে নিজেদের কারবার বন্ধ করিয়া দেয় না। তাহারা জানে, যে সুদ তাহারা তাহাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিবে, সেই সুদের টাকা তাহাদিগকেই যোগাইতে হইবে, সুতরাং নিজেদের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, কোথা হইতে তাহারা এই টাকা যোগাইবে।

আমাদের দেশেই চাহিয়া দেখ, কত বিদেশীয় বণিকের অর্থ এই দেশেরই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে তাহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত আছে এবং উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহাদেরই আয়বৃদ্ধি করিতেছে। সুদূর কাট্‌ণী, রোটাস, বিস্‌রা অথবা ছাত্‌নার পাথরে চুণের অংশ আছে জানিয়া বা সিমেণ্ট হয় বুঝিয়া, উপযুক্ত মূলধন নিযুক্ত করিয়া তাহা প্রস্তুত করণ এবং প্রয়োজন মত তোমার আমার ঘরে আনিয়া দিয়া তদ্দ্বারা প্রচুর উপার্জ্জনের কথা ভাব দেখি! কোথায় পর্ব্বত ও জঙ্গল সমাকীর্ণ দুর্গম কোল্‌হান প্রদেশের স্বাভাবিক সম্পদ লৌহ, চুণ, চিনামাটি, রাঙ্গামাটি ও সুবর্ণ! আর কোথায় 'বার্ড' প্রমুখ বিদেশীয় বণিকবৃন্দের তদুদ্ধার করণে অর্থ নিয়োগ ও উহাদের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা! দুঃস্থ বঙ্গবাসী, তোমরা এই সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু নিজের দেশের মধ্যে অভাবমোচনোপযোগী অল্পব্যয়সাধ্য ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তুলিতে

পারিবেনা। কারণ, তোমাদের মস্তিষ্ক—দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, এবং তোমাদের বাহু ও মেরুদণ্ড—দেশের অভিজাত ও ধনীগণ, আজ তোমাদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়াছেন।

পর্য্যাপ্ত মূলধন যে শুধু অংশ বিক্রয় করিয়াই হয় না, অন্য উপায়েও মূলধন সংগৃহীত পারে, তাহা বিদেশীয় বণিকগণের বাণিজ্যনীতি হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত ইতিহাসটি গৃহীত হইতে পারে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্ণমেণ্ট সীতারামপুর হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত একটি রেলপথ প্রয়োজনীয় বোধে উহার নির্ম্মাণ মঞ্জুর করেন, এবং ঐ বৎসরের শীতকালেই নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। অকস্মাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সীমান্তে যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজনীয়তা হওয়ায় ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া এই আরব্ধ কার্য্য বন্ধ করিতে হয়। তখন সাধারণের অর্থে উক্ত আরব্ধ রেলপথ সম্পূর্ণ করণই গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য হয়; এবং তদর্থে একটী 'কোম্পানী' গঠনের জন্য প্রসিদ্ধ 'হোরমিলার কোম্পানী' বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহারই ফলে ইংলণ্ডে ভারতের 'সেক্রেটরী অফ্ ষ্টেট'এর সহিত লিখিত বন্দোবস্ত করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া 'বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ে কোম্পানী' গঠিত হয়; এবং স্থির হয় যে, আরব্ধ রেলপথটি সম্পূর্ণ করিতে ও নাগপুর—ছত্রিশগড় রেলপথটি বিস্তৃত আকারে পুনর্নির্ম্মাণ করিতে যে অধিক মূলধন প্রয়োজন হইবে, তাহা 'ডিবেঞ্চার' বা নির্দ্দিষ্ট সুদে কর্জ্জপত্র দ্বারা সংগৃহীত হইবে। আজ সেই 'বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী'র চেষ্টার ফলে বিলাতের কত কোটী কোটী টাকা এই দেশে খাটিতেছে, এবং ইংরাজ বণিকগণের বাণিজ্যব্যাপারে ও দেশের লোকের নানাবিধ উপায়ে সুবিধা করিয়া দিয়া কত অর্থ লভ্যাংশরূপে উপার্জ্জিত হইয়া অংশীদার ও কর্জ্জ-দাতা গণের অর্থনিয়োগ সফল করিতেছে। এই 'হোরমিলার কোম্পানী' কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর, এবং ইহাদেরই চেষ্টায় তারকেশ্বর শাখা-রেলপথ ও ময়ূরভঞ্জ রেলপথ প্রভৃতি অনেক রেলপথ এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এই বিদেশীয় বণিকগণের বহুমুখী চেষ্টা যে প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিদেশীয় বণিকগণের প্রতিভা ও বাণিজ্যনীতি আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। একটি বিশেষ ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থলাভ হইতেছে দেখিয়া, তাহারা অন্য সকল বিষয়ে অন্ধ হইয়া, সেই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই সকলে প্রভূত অর্থ নিয়োগ করিতে ছুটেনা। তাহারা জানে ওইরূপ করিলে সেই বিশিষ্ট ব্যবসায়টিও নষ্ট হয়, এবং অর্থাভাব উপস্থিত হইয়া অন্য ব্যবসায়ের চেষ্টায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াও আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনীগণ এই নীতিটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, ফলে, পদে পদে সফলতার পরিবর্ত্তে অসাফল্যই লাভ করিয়া থাকেন। ইহার জন্য দায়ী কে? তাঁহাদেরই একমুখী শিক্ষা, এবং পরিশ্রমকাতরতা; যাহার ফলে,

সম্মুখে থাকিয়াও বিদেশীয় বণিকগণের বাণিজ্যনীতি আজও তাঁহাদের নিকট দুরধিগম্য।

কিন্তু এই অর্থসমস্যারও মিমাংসা যে নাই এমন কথা বলা চলে না। একযোগে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই উপায় মিলিবে। স্মরণ রাখিবেন,—সিন্ধুর মূলে বিন্দুগণেরই একতা। হে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র দেশবাসীগণ, সকলে সম্মিলিত হউন, এবং আপনাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় উৎপন্ন কৃষি বা শিল্পজাত সামগ্রী যাহাতে উহাদিগের আবশ্যকতানুযায়ী মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহার জন্য আপনাদিগের মধ্যেই আলোচনা করুন, ও অনেকে একত্রে এক একটি লোক নিযুক্ত করিয়া দেশের সমগ্র বাজার হস্তগত করিবার চেষ্টা করুন। প্রয়োজন হইলে কোন কোন অনাবশ্যক বা মাত্র বিলাসের জন্য ব্যবহৃত কৃষি ও শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে, এবং উহার পরিবর্ত্তে আবশ্যকানুযায়ী নূতন নূতন কৃষি ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রত্যেক উৎপন্ন সামগ্রীর প্রচলিত ব্যবহার ব্যতীত আরও কি কি উপায়ে ব্যবহার চলিতে পারে তাহা স্থির করিয়া উহাদিগের ব্যবহারিক মূল্য বাড়াইতে হইবে, এবং বাজারে উৎপন্ন বস্তুর একই ভাবে আমদানী কমাইয়া, এক বস্তুকে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন আবশ্যকতার উপযোগী করিয়া উপস্থিত করিতে হইবে। সকল জিনিসকেই অনেক রকমে ব্যবহার করা যায়. এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাইলে, তাহা হইতে ক্ষতি নিবারণ ও নূতন আয়ের পথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কৃষকের উৎপাদিত বস্তুর মূল্য শুধুই খরিদ্দারের চাহিদা হইতে স্থিরীকৃত হইবে না; তাহাদের ভরণপোষণের জন্যই উহারা উৎপন্ন, সুতরাং উহার মূল্য নির্দ্ধারণে, সে হিসাবটি বাদ দিলে চলে না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। খরিদ্দার যে আমাদের উৎপন্ন ফসলের সর্ব্বদা সংবাদ রাখে, এবং তাহা হইতে তাহারা উৎপাদকের কর্তৃত্ব ঘুচাইয়া নিজেদের ইচ্ছামত সেই উৎপন্ন মালের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে, ইহার কারণ আমাদের অজ্ঞতা। পাটের বাজার হইতে এবিষয়ে সকলেরই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিৎ। কৃষক ও শিল্পিগণ একত্রিত হইলে, এবং বিবেচনা পূর্ব্বক উৎপাদন ও আমদানী করিলে, কেহই তাহা-দিগকে প্রতারিত করিতে পারিবেনা।

সাময়িক অর্থসাহায্যের নিমিত্ত মহাজনের মুখপানে না চাহিয়া, দুই, তিন বা তদধিক গ্রামের কৃষক ও শিল্পিগণ মিলিত হইয়া 'কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক' বা সম্মিলিত ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিলে, সাময়িক অসচ্ছলতা আর তাহাদিগকে প্রতারিত হইতে বাধ্য করিবেনা।

পূর্ব্বে বাজার বলিতে লোকে বুঝিত যেখানে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানী হয়। এখন তরিতরকারী প্রভৃতির বাজার ছাড়া অপরাপর উৎপন্ন মালের বাজারের সংজ্ঞা কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে মাত্র নমুনা দেখিয়া ক্রয় বিক্রয়

সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থিরীকৃত হয়, সেই স্থানই উহার বাজার। মাল আড়তে বা গুদামে থাকে, দালালেরা শুধু নমুনা লইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্যের হার ও বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির করিয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবস্থায় কৃষক ও শিল্পির সুবিধা হইবারই কথা, কেননা ইহাতে এক স্থান হইতে মাল অন্য স্থানে লইয়া গিয়া পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে বা অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু কথিত সুবিধা টুকু হইতে বর্ত্তমানের কৃষক ও শিল্পিগণ প্রতারিত হইয়া আছে, এবং অপেক্ষাকৃত ধনীগণ তাহাদের এই সুবিধা গুলি হস্তগত করিয়া আড়তদার বা মহাজন সাজিয়া বসিয়া আছেন। জিনিসের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি করা তাঁহাদেরই হাতে। দেশের অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষক এবং শিল্পিগণ বর্ত্তমান কালের বাণিজ্যনীতিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া প্রতারিত এবং যাঁহারা ঐ নীতির সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই উহাদ্বারা লাভবান হইতেছেন।

প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রে উৎপাদকগণের প্রতিনিধি থাকা দরকার; নতুবা বর্ত্তমানের বানিজ্যনীতির সুবিধা হইতে তাহাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। তজ্জন্য শ্রমিক বা উৎপাদকগণের এক একটি স্থানীয় সমিতি থাকা উচিৎ। এই সমিতি গুলিই তত্তৎ স্থানের উৎপন্ন মালের উপযুক্ত মূল্যে কাটতির জন্য যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা ও প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন।

উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইতে,—যাহা দেশের বর্ত্তমান দুরাবস্থা মোচনের জন্য একান্ত প্রয়োজন—তাহা করিতে সমবেত চেষ্টা চাই। ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা উৎপাদিত হয়, সকলের সেই প্রকারে উৎপাদিত বস্তুর উপযুক্ত মূল্যে বিনিময়, উহাদের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করণের জন্য ভিন্ন উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বন, আবশ্যকতানুসারে অতিরিক্ত ফসলের রূপান্তরিত আকারে ব্যবহার প্রচলন জন্য শিল্পি নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্য সমবেত ভাবে করিতে হইবে।

এই প্রকার সম্মিলন বা সমিতি প্রতিষ্ঠা অর্থ-সমস্যা মিমাংসার প্রথম সোপান। প্রত্যেকের উৎপন্ন ফসলের বা শিল্পের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র এই সমিতির প্রাপ্য হইবে, তাহা হইতে উহার যাবতীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহিত হইবে। ক্রমশঃ সম্মিলিত ধন-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিও করিতে হইবে। ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। তারপর ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা এই গ্রাম্য সমিতিগুলির, ও সেই সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীগণের উন্নতি সাধন হইতে থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়ক সাময়িক পত্রাদি ও পুস্তকাবলীর আলোচনা সমিতিগুলির যথেষ্ট সহায়ক হইবে, এবং বিভিন্ন সমিতির আলোচনা ফল ও ভাবের আদান প্রদানে ক্রমশঃ দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনীতে
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ।

গত ২৫শে ডিসেম্বর কোকনদে নিখিল-ভারত-খদ্দর-প্রদর্শনীর উদ্বোধনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন পাঠকগণের জন্য আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"বন্ধুগণ, এই অন্ধ্রদেশের কেন্দ্রস্থলে নিখিল-ভারত-খদ্দর-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবার জন্য আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যখন আমাকে আহ্বান করেন, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম, নানা প্রদেশের যে সকল প্রতিনিধি এই স্থানে সমবেত হইবেন, আমি তাহাদিগের নিকট চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশের সুযোগ পাইব, তাই এ সুযোগ আমি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমে আমি বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে কয়েকটি কারণে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। খদ্দর-প্রীতি এখন আন্তরিকতাহীন কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে নানা কারণে চরকা প্রচারে আমাদের চেষ্টার খুব শৈথিল্য লক্ষিত হইতেছে। আমাদের যুগযুগান্তসঞ্চিত উৎসাহহীনতা ও জড়তা আবার আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, সমস্ত উৎসাহ সাময়িক উত্তেজনা ও তুচ্ছ কার্য্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে, ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। যদি দেশের জনগণের কল্যাণার্থ প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত দেশ সেবকের হৃদয়ে বেদনার কারণ হইয়া উঠে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখে আমাকে এই কথা বলিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে আমাদের গঠনকার্য্য স্তম্ভিত, আমরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের নানা দিক্ বিচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছি, চরকা, খদ্দর, জাতীয় বিদ্যালয়, অস্পৃশ্যতা, সালিশী বিচার, গ্রাম্য মণ্ডলী, এ সকল অবজ্ঞাত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, এই বিচারের জন্যই কি শিক্ষার্থীগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন? তীর্থস্থানে গমনের উৎসাহে কি পুরুষ ও নারী কারাগারে গমন করিয়াছিলেন? মনের ব্যথায় আমি অধীরভাবে এই সকল কথা বলিতেছি। বঙ্গদেশের গঠন-কার্য্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে। হয় ত অন্যান্য প্রদেশের—এমন কি এই অন্ধ্রের অবস্থা ততটা শোচনীয় নহে।

জাতির আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ব্বত্র চরকার প্রচলন সকলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আর কোন্ উপায়ে দীন দরিদ্র দুর্ব্বল নরনারী অনায়াসে আপনার

দৈনন্দিন আয় বাড়াইতে পারে? চরকা ব্যবহার সকলেরই সাধ্যায়ত্ত এবং ইহার দ্বারা সকলেরই অনিবার্য্য অভাব দূর হইতে পারে। অতি ক্ষীণ-স্বাস্থ্য নারীও চরকা ব্যবহার করিতে পারেন, অতি দরিদ্র ব্যক্তিও চরকা কিনিতে বা সংগ্রহ করিতে পারে, আর ইহার দ্বারা অতি সাধারণ লোকের দৈনিক আয় দ্বিগুণ করা যায় অর্থাৎ আবশ্যক বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াও লোকে হাতে কিছু লাভ রাখিতে পারে।

কৃষিকার্য্যেই কৃষকের সমস্ত সময় ও উৎসাহ ব্যয়িত হয় না। কৃষিকার্য্যে কৃষক বৎসরে ৮ মাস কাল বা তাহা অপেক্ষাও অল্প সময় ব্যয় করে, অবশিষ্ট সময় আলস্যে নষ্ট করে। পুরুষদিগের সম্বন্ধে এই কথা। স্ত্রীলোকেরা বৎসরে সর্ব্বসময়ে চরকায় সূতা কাটিয়া কতকটা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন এবং তাহাতেই সমগ্র পারিবারের বস্ত্রের অভাব দূর করা যায়। খুলনার দুর্ভিক্ষে ও পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনে বিপন্ন জনগণের মধ্যে চরকা প্রচলিত করিয়া আমি বুঝিয়াছি, চরকা ব্যবহার করিলে এক বৎসরের অজন্মায় কৃষককে অনাহারে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে চরকা প্রচলন করিয়া কৃষকেরা যে ফল পাইয়াছে, তাহাতে চরকাকে তাহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচনা করে।

কোন হিসাবেই ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে ৫ পয়সার অধিক হয় না। দৈনিক ৮ ঘণ্টা চরকা চালাইলে সূতা কাটিয়া ২ আনা উপার্জ্জন করা যায়। কেবল তাহাই নহে, ঘরে ঘরে চরকা প্রচলিত হইলে গ্রামের অন্যান্য শিল্পও উন্নতিলাভ করে। তন্তুবায়, রঞ্জক, সূত্রধর প্রভৃতির কাজের অভাব হয় না। সূতাকাটা গ্রামের সর্ব্বপ্রধান উদ্যমশিল্প বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং ইহার ফলে গ্রামের লোক উদ্যমশীল, উৎসাহী ও স্বাবলম্বী হইলে গ্রামের শ্রী ফিরিতে বিলম্ব হয় না।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যদি মোটামুটি ৩২ কোটি ধরা যায়, তবে লর্ড কর্জ্জনের হিসাবে তাহাদের বার্ষিক আয় ৯শত ৬০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। যদি এই লোকসংখ্যার এক চতুর্থাংশ প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করিয়া চরকা কাটে, তবে জাতির আয় বৎসরে ৯০ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়। ইহা ব্যতীত তন্তুবায় প্রভৃতির বর্দ্ধিত আয় আছে। অধিকন্তু ইহাতে বৎসরে ৩০।৭০ কোটি টাকা বিদেশে না যাইয়া দেশে থাকিয়া যাইবে। আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা কি কম লাভ?

অর্থের বিভাগটিও নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার নহে। এ দেশে বড় বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে হয় ত বিদেশে টাকা রপ্তানী বন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গুটিকয়েক কলকারখানার লাভ হইলেও দেশের জনগণের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না, চরকার প্রচলন হইলে ধনবিভাগের কার্য্য আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে। বৃষ্টিতে যেমন ভাবে জলের বিভাগ হয় চরকার দ্বারায় তেমনই ভাবে অতি সহজে কোটি কোটি গৃহে ধনবিভাগের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

চরকা ভারতে নূতন নহে, পরন্তু কৃষির পরই ইহাকে অতি পুরাতন শিল্প বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ভারতের ঘরে ঘরে চরকা চলিত ছিল। ডাক্তার বুকাননের মতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, পাটনা ও বেহার জিলায় ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪ শত ২০ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৪শত ২৬ জন চরকায় সূতা কাটিত। অনেকেই অপরাহ্নে কয় ঘণ্টামাত্র চরকা চালাইত। সাহাবাদ জিলায় সূতাকাটা সর্ব্বপ্রধান শিল্প ছিল, তথায় ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫ শত স্ত্রীলোক যে সূতা কাটিত, বৎসরে তাহাতে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লাভ হইতে পারিত। বর্ত্তমান হিসাবে তাহার মূল্য ১ কোটী টাকা বলা যাইতে পারে। ভাগলপুর জিলায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্ত্রীলোক সূতা কাটিত এবং ইহাতে সমগ্র পরিবারের আয় বৃদ্ধি হইত। গোরক্ষপুর জিলায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত স্ত্রীলোক সূতা কাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। দিনাজপুর জিলায় সর্ব্বশ্রেণীর, এমন কি, ব্রাহ্মণপরিবারেও স্ত্রীলোকেরা অপরাহ্নে সূতা কাটিত। পূর্ণিয়া জিলায় কোন জাতিই চরকায় সূতা কাটা অপমানজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। মহীশূরের পূর্ব্বভাগে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণের স্ত্রীলোকেরা প্রতি সপ্তাহে হাটে তুলা ও পশম কিনিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন এবং সেই সূতা তন্তুবায়েরা কিনিয়া লইত।

তখন দেশে তন্তুবায়দিগের সংখ্যাও অল্প ছিল না। পাটনা সহরে ও বিহারের জিলাসমূহে ৭ শত ৫০ খানি তাঁতে যে চাদর বোনা হইত, তাহার মূল্য ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। সূতার মূল্য বাদ দিলে মোট লাভ ৮১ হাজার ৪ শত টাকা থাকিত। সাহাবাদে সাত হাজার ২৫ ঘর তন্তুবায় ছিল। ভগলপুর জিলায় ৩ হাজার ২ শত ৭৫ খানি তাঁতে তসর বুনানি হইত। গোরক্ষপুর জিলায় ৫ হাজার ৪ শত ৩৪টি তন্তুবায় পরিবারের ৬ হাজার ১ শত ৭৪ খানি তাঁত চলিত।

এইরূপে সূতা কাটিয়া ও তন্তুবায়ের কাজ করিয়া দেশের লোক কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিত এবং ইহাতে আমাদের নানারূপ সুবিধা হইত। এখনও চেষ্টা করিলে আমরা অনায়াসে চরকার প্রচলন দ্বারা বস্ত্রবিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারি। কাপড়ের কলকারখানার সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। ভারতবর্ষে একজন লোকের পক্ষে বৎসরে ১৩ গজ কাপড় হইলেই চলে। বর্ত্তমানে দেশে ইহার অর্দ্ধাংশ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে বস্ত্রের জন্য যে পরিমাণ তুলার প্রয়োজন তাহা দেশেই উৎপন্ন হয়। তাহার কতকাংশ আমরা জাপানে ও বিলাতে রপ্তানি করিয়া আবার সেই সকল দেশ হইতে কাপড় আমদানী করি। কিন্তু চরকা ও তাঁত চালাইলে আমরা অনায়াসে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপন্ন করিতে পারি। ভারতের কৃষকদিগেরও আর একটা কাজের প্রয়োজন। চরকায় তাহারা সে কাজ পাইতে পারে। শতবর্ষ পূর্ব্বেও দেশের লোক চরকা কাটিত। অর্থনীতিক কারণে এবং বর্ত্তমান কলকব্জার প্রতিযোগিতায় এ দেশের

সূতা-কাটা ও বস্ত্রবয়ন শিল্প নষ্ট হইয়াছে, এ কথা ঠিক নহে। এখনও চেষ্টা করিলে কাপড়ের কলের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া এই শিল্পের পুনর্গঠন হইতে পারে। তাহা হইলে বৎসরে কোটী কোটী টাকা বিদেশে না যাইয়া দেশেই থাকিবে এবং লক্ষ লক্ষ দরিদ্র স্ত্রীলোক আপনাদের কুটীরে বসিয়াই এই অর্থের অংশ লাভ করিবে।

এই উপায় অতি সহজ ও সুন্দর হইলেও কেহ কেহ ইহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন, অন্যান্য দেশেও যেমন, ভারতেও সেইরূপ কলকব্জার প্রতি-যোগিতাহেতু চরকার ধ্বংস অনিবার্য্য। গঙ্গার প্রবাহকে গঙ্গোত্রীতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, আবার চরকার চলন করাও সেইরূপ অসম্ভব। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমানকালে আত্মস্থ ও আপনার সর্ব্ববিধ অভাব দূর করিতে সমর্থ শান্তি-স্নিগ্ধ পল্লীগ্রাম থাকিতেই পারে না। কিন্তু আমি এই সকল নব্য মতাবলম্বীর সহিত একমত হইতে পারি না। য়ুরোপীয় সভ্যতার সহিত আমার পরিচয় আছে। আমি কলকব্জার প্রচলনের বিরোধীও নহি। তথাপি আমার বিশ্বাস চরকা ও তাঁতের দ্বারা আমাদের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যে ভাবে সাধারণ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়, খদ্দরের ব্যবসা সে ভাবে চালাইলে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না। পারিবারিক শিল্প হিসাবে খদ্দর বয়ন করিতে হইবে। গৃহপ্রাঙ্গণজাত গাছের তুলা লইয়া বাড়ীতে চরকায় সূতা কাটিতে হইবে এবং বাড়ীর পুরুষেরা বা গ্রামের তন্তুবায় সেই সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিবে। যে ভাবে আমরা হোটেল হইতে খাবার না কিনিয়া বাড়ীর রন্ধনশালায় পরিবারবর্গের সাহায্যে আহার্য্য প্রস্তুত করি, সেইরূপ গৃহে গৃহে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে প্রতিযোগিতার কথাই উঠিতে পারে না। অবশ্য উদ্বৃত্ত সূতা বাজারে বিক্রয় করা হইবে, এবং যাহারা সূতা কাটিবার সময় পায় না, তাহারা সেই সূতা ক্রয় করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করাইবে।"

আচার্য্য রায় পরে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে জার্ম্মাণী যন্ত্রের উন্নতি ও শক্তি লইয়া একদিন উন্মত্ত হইয়াছিল, দেশের বস্ত্র এবং অর্থ সমস্যার সমাধানকল্পে তাহারাই এখন যন্ত্র হইতে—কল কারখানা হইতে—মানুষের দিকে—গৃহশিল্পের দিকে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে একমাত্র ব্যাভেরিয়া প্রদেশেই পাঁচলক্ষ চরকা চলিতেছে। 'ইন্‌ডিয়ান্ টেক্‌স্‌টাইল জর্ণাল' পত্রিকায় এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা দেখুন।—কৃঃ সঃ।

মৎস্যোৎপাদন।

(প্রাপ্ত)

মানবের জীবনধারণোপযোগী উপাদানগুলির আবশ্যকতার দিক্ দিয়া খাদ্য মধ্যে মৎস্য একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রয়োজনমত প্রোটিড্, তৈল ও ভস্ম পাওয়া যায় এবং উহা আমাদের শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক। ভারতের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে মৎস্য প্রাত্যহিক ভোজনের একটি অঙ্গ, অথচ এই মাছই ক্রমশঃ দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেও ইহার প্রতিকারের জন্য দেশবাসীর বিশেষ চেষ্টা দেখিতে পাইনা।

'কৃষকে' ইতিপূর্ব্বে মৎস্য সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু এমন একটি প্রয়োজনীয় জিনিসের আলোচনা আরও হওয়া উচিৎ মনে করিয়া আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। বিশেষতঃ আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যে যে স্থানে মৎস্যের যত অভাব বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও সেই সেই স্থানগুলিকে তত বেশী করিয়া অধিকার করিতেছে। ইহার দুইটি কারণ স্থির করা যাইতে পারে। (১) প্রথমতঃ কথিত স্থানগুলিতে মৎস্যের অভাব হওয়ায় স্থানীয় লোকেরা প্রাত্যহিক আহারে প্রয়োজনমত পর্য্যাপ্ত মাছ লইতে পারেনা, এবং উহার পরিবর্ত্তে ঐ প্রকার কোন নূতন খাদ্যও গ্রহণ করেনা, ফলে উপযুক্ত খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। (২) দ্বিতীয়তঃ ঐসকল স্থানের পুকুর-খানা-ডোবা প্রভৃতিতে বর্ষার জল আবদ্ধ হইয়া যে ম্যালেরিয়াবাহক মশককুলের বিস্তৃতিতে সহায়তা করে, প্রচুর মৎস্য থাকিলে মশককীড়াগুলি জলে অবস্থান কালেই মৎস্যের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া পূর্ব্বে ওই বিস্তৃতির বাধাস্বরূপ হইয়া রোগের ব্যাপকতার প্রতিকার করিত, কিন্তু এখন মৎস্যাভাবে মশককুলের বিস্তৃতিতে আর কোনও বাধা না থাকায় রোগও উত্তরোত্তর ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সহজেই স্থানীয় অধিবাসীগণের দুর্ব্বল দেহগুলি আক্রমণ করিয়া মৃত্যুর হারও বাড়াইতেছে।

আর একদিক দিয়া আমি আমার যুক্তিকে পরিস্ফুট করিতে পারি। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সরকারী লোক গণনাতেও দেখা গিয়াছে, যে বাংলার হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা কমিতেছে, এবং মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে। এদেশের হিন্দুরা মাছের অভাবে অন্য কোনও মাংস উহার পরিবর্ত্তে গ্রহণ না করিয়া শারীরিক দুর্ব্বল এবং রোগের দুর্গ হইতেছেন, আর মুসলমানেরা মৎস্যাভাব ঘটিলেও মুর্গী এবং ডিম্ব প্রভৃতির দ্বারা সে অভাব কতক পরিমাণে পূরণ করিয়া লইয়া ততটা দুর্ব্বল এবং রুগ্ন নহেন, ফলে একের ক্রমাবসান এবং অপরের

বিস্তৃতি সংঘটিত হইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্যও মৎস্যাভাবের প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

মোট কথা আমাদের প্রধান খাদ্য মৎস্যের অভাব আমাদের সামাজিক জীবনে খুব ক্ষতিকর হইয়াছে, বোধ করি সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। মৎস্যের প্রাচুর্য্য না থাকায় পল্লীগুলির মৎস্যব্যবসায়ীগণ বা বাগ্দী-জেলেরাও কর্ম্মহীন হইয়াছে এবং দরিদ্রের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এসকলের প্রতিকারের জন্য একমাত্র মৎস্যোৎপাদনের বিস্তৃতিই বিবেচ্য।

আমি একে একে মৎস্যোৎপাদন এবং উহার কারবার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু আমার প্রথম বক্তব্য, দেশের শিক্ষিত লোকেরা যদি এদিকে মনোযোগ না দেন, তবে আমার কথাগুলি 'কৃষকের' কলেবর বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হইবে, সমাজের—পল্লীর বাস্তবিক কোন উপকার হইবে না। কেন তাহাও বলি, যে প্রথায় এতদিন মৎস্য সরবরাহ চলিতেছিল, কোনও কারণে মৎস্যাভাব ঘটিয়া সেই প্রথাটি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মাছের ব্যবসায়ী অশিক্ষিতেরা উহার প্রতিকার দেখিতে পায় নাই, করেও নাই। এখন নূতন কিছু করিতে গেলেই শিক্ষিত লোকের সাহায্য ব্যতীত হওয়া অসম্ভব।

আমি বুঝিতে পারিনা, কেন শিক্ষিত দেশবাসী এই প্রয়োজনীয় কর্ম্মটি অবহেলা করিয়া এখনও ইহার প্রতিকারে যত্নবান হইতেছেন না। ব্যবসায় হিসাবে মৎস্য যে শুধুই খাদ্য তাহা নহে, শুষ্ক মৎস্য কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় একটি প্রধান 'সার' ও বটে। মৎস্যব্যবসায় কখনও ঘৃণার কার্য্য নহে; শিক্ষিত দেশবাসীগণ যে বিদেশীয়গণের সহিত নিজেদের তুলনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যবসায়টি কিরূপ বিস্তৃত আমি নিম্নে তাহার একটু আভাষ দিতেছি।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 'সোর্ডফিশ'এর কারবার পরিচালনার জন্য প্রায় ৪০ খানী জাহাজ নিযুক্ত আছে, এবং উহা দ্বারা প্রতি বৎসর সমুদ্র হইতে ৮০০০০০ মণ মাছ উত্তোলিত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কানাডা দেশের 'কড'-মৎস্য-ব্যবসায়ীরা প্রতিবৎসর ২৮০০০ মণ শুষ্ক এবং রক্ষিত মাছ ইউরোপের অন্তর্গত 'মেডিটারেনিয়ান'-সাগরোপকুল প্রদেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। নিউফাউন্‌ল্যাণ্ডের মৎস্য ব্যবসায়ীরা সীল, হোরং ও সামন প্রভৃতি মাছের কারবার করিয়া বৎসরে ২৫।৩০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। ইউরোপের বৃটিশ দ্বীপ পুঞ্জের মৎস্যব্যবসায়ীগণকে তত্রত্য অভিজাতগণ এমন কি স্বয়ং রাজাও সম্মানিত করিয়াছেন, শুনা যায়।

আজিকালিকার বেকার-সমস্যার দিনে আমি দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের কিয়দংশকে এই দিকে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও যথেষ্ট 'জাওলা' মাছ পাওয়া যায়, এবং উহা অনেক পরিমাণে নৌকাযোগে কলিকাতার বাজারেও আসিয়া থাকে; কিন্তু শুধু একটু পর্য্যবেক্ষণের—একটু সুশৃঙ্খলিত কারবারের

অভাবে মাছগুলি অত্যন্ত শীর্ণভাবে বাজারে আনীত এবং বিক্রীত হইয়া থাকে। পথে যে আট দশ দিন ধরিয়া মাছগুলি নৌকায় থাকে, তাহাতে প্রচুর জলের এবং আবশ্যকমত খাদ্যের অভাবে উহারা মৃতপ্রায় অবস্থায় কলিকাতার বাজারে পৌছায়। এই ব্যবস্থাটির একটু প্রয়োজনমত উন্নতি বাঞ্ছনীয়, যাহাতে ক্রেতাগণকে সুপুষ্ট মাছ বিক্রয় করিতে পারা যায়। কলিকাতা হইতে অল্পদূরবর্ত্তী পল্লীগুলিতে ছোট ছোট পুকুরে অনায়াসে কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি 'জাওলা' বা 'জিওল' মাছের উৎপাদন চলিতে পারে, তাহাতে পল্লীর ম্যালেরিয়া দূর, একটি নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা, এবং সহরের মাছের অভাবও কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা চলে। কাজে নামিতে হইবে, নিজে নিজেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; শিক্ষার অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নদ, নদী, খাল, বিল, পুকুর, জলা প্রভৃতিতে সামান্য সামান্য মৎস্যের চাষ হইতে দেখা যায়। পুকুর বা বড় বড় বিলে সাধারণতঃ মিঠেজলের মাছের চাষ হয়; লবনাক্ত নদী বা তৎসন্নিহিত খালে বা জলায় লোণা জলের মাছের আবাদ হয়। লোনাজলের মাছ মিঠেজলে বাঁচেনা, এবং মিঠেজলের মাছও লোণাজলে বাঁচেনা। সুতরাং ব্যবসায়ীর পক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন মাছের উৎপাদনে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পল্লী অঞ্চলে মিঠাজলের পুকুরে পোনামাছ, বাটামাছ, চেলা, মৌরলা, পুঁটী, কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মাছের এবং মোচাচিংড়ির উৎপাদন বেশ চলে। আবাদ অঞ্চলের লোণা জায়গায় ভেট্‌কী, ভাঙ্গন, টেংরা, চিংড়ি, পার্‌সে প্রভৃতির উৎপাদন এবং কারবার চলিতে পারে।

বলা বাহুল্য উৎপাদনের জন্য মাছের ডিম্ব কিম্বা পোনা সংগ্রহ করিতে হইবে। পুকুরগুলি মাছ হিসাবে পৃথক পৃথক হওয়াই দরকার। রোহিত, মৃগেল, কাৎলা, কালবোশ প্রভৃতি মাছের পুকুর বড় বড় এবং লম্বা হওয়া আবশ্যক।

(ক্রমশঃ) আলোচক।

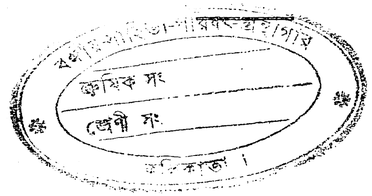

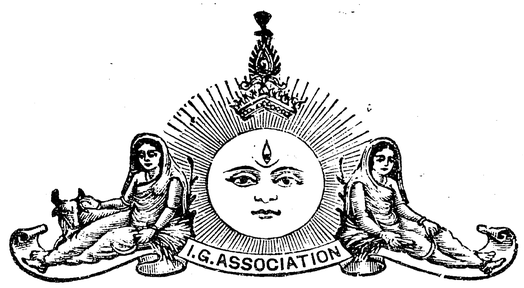

কৃষক, মাঘ, ১৩৩০।

গো-রক্ষা ও গো-হত্যা।

—:*:—

বর্ত্তমানে গো-রক্ষা ও গো-হত্যা লইয়া দেশে যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ধর্ম্মান্ধতাপ্রযুক্ত হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যে প্রকার উন্মত্তভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, এতদুভয় সম্প্রদায়ের মিলনাকাঙ্খায় রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র—জাতীয় সভাগুলিতেও পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে প্রকার আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কৃষিসহায় এই গোজাতির রক্ষা বা নিধন সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার প্রকাশ করা সমযোচিত বলিয়া মনে করিতেছি। আমরা প্রথমেই হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সমগ্র দেশবাসীকে জিজ্ঞাসা করি গোজাতির মূল্য কি ভাবে তাঁহারা স্থির করেন? শুধু ধর্ম্মের দিক্ দিয়া? শুধু মাংসভক্ষণের উপকারিতার দিক্ দিয়া? অথবা ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি সার্ব্বজনীন খাদ্যের উৎপাদন এবং সকলেরই প্রয়োজনীয় কৃষির সহায়তার দিক দিয়া? কোন দিক্ দিয়া তাঁহারা এই রক্ষণ এবং নিধনের মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাক নিরীহ প্রাণীগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন? আমাদের মনে হয় এই প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গেই এই রক্ষণ-নিধন সমস্যার মিমাংসা জড়িত।

যদি কেহ বলেন, ধর্ম্মের দিক দিয়াই গরুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, আমরা তখনি বলিব, ধর্ম্ম যখন পরস্পরের বিভিন্ন তখন ইহার মিমাংসা সুদূর পরাহত। হিন্দুর গো বধে পাপ হয়, হিন্দু গোবধ করিবেন না; কিন্তু মুসলমান যদি বলেন আমাদের ধর্ম্মে গোবধ বিধি, তাঁহারা তাহা করিবেন, তাহাতে বাধা দিলে ধর্ম্মে বাধা দেওয়া হইবে; সুতরাং এ বিবাদের মিমাংসা সহজে হইবে না।

যদি কেহ মাংসভক্ষণের উপকারিতার দিক্ দিয়া গোবধ সমর্থন করেন, আমরা তদুত্তরে বলিব, গোমাংস ব্যতীত আরও যথেষ্ট খাদ্য-মাংস আছেত, সুতরাং একটা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ বিবাদ কখনই সমর্থন করা কর্ত্তব্য নহে; সেক্ষেত্রেও কিন্তু রক্ষকগণের বিনা যুক্তিতে পরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান—ভক্ষকগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানও কেহ সমীচিন বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। এদিক্ দিয়া গোবধের নিষেধ বা প্রচলন কোনটিই সমর্থনযোগ্য নহে। হিন্দু বলিবেন, 'মুসলমান ভাই! তুমি মাংসের জন্য মাছ খাও, মুর্গী খাও, হাঁস খাও, ছাগল খাও, ভেড়া খাও,—গোরুটি বাদ দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাও!' মুসলমান বলিবেন, 'হিন্দু ভাই! আমার গরু খাওয়াতে তোমার এত রাগ কেন? বারণ কর কেন? কই সাহেবদের গরু খাওয়াত বারণ কর না? শুধু আমার বেলা এ নিষেধবিধি কেন?' প্রত্যুত্তরে—যদি গরুর পূজা করা ছাড়া হিন্দুর কাছে উহার আর কোন মূল্য না থাকে,—হিন্দুকে চুপ্ করিতে হইবে।

উল্লিখিত দুই ভাবে গরুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে, নিরপেক্ষ ভাবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এ বিবাদ ভিত্তিহীন এবং বৃথা। হিন্দুর পক্ষে রক্ষণের যেমন অধিকার, মুসলমানের বা খৃষ্টানের পক্ষে ভক্ষণের ঠিক তেমনি অধিকার। এ বিবাদের কোন মিমাংসা নাই। কিন্তু আমরা মনে করি এই দিক্ দিয়া গোজাতির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না।

গোজাতির মূল্য নির্দ্ধারণের তৃতীয় ক্ষেত্র—গোজাতির দান। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, মাখন, পনির ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান—সকলেই গোজাতির নিকট হইতে পাই, সেইগুলি আমাদের সকলেরই নিকট কত প্রয়োজনীয়! কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল শিশুকেই গোদুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে হয়। আজ যে গোদুগ্ধ এত মহার্ঘ, তবুও কেহ কি উহা পরিত্যাগ করিয়া শিশুদিগের জন্য অন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন? বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ মিলেনা,—জল মিশান দুগ্ধ অপকারক, তবু কি আমরা অন্য একটা ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি? ঘৃত, মাখন এবং ছানার প্রয়োজন কাহার না হয়? আমরা সকলেই কি ঐ গুলির সুলভ হওয়া ইচ্ছা করিনা? গরুর অভাবে আজকাল বিশুদ্ধ ঘৃতের যে অভাব উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ অভাব পুরণার্থে নানা অনিষ্টকর বস্তু ভেজাল দিয়া বিকৃত ঘৃতে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, আমাদিগকে সেই বিকৃত ঘৃত খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে, আমরা সকলকেই সেই কথা গুলি চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। বাজারের মাখন পর্য্যন্তও বিশুদ্ধ নহে, উহার ভিতরেও,—উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া, অভাব মোচনার্থে ভেজাল চালান হইতেছে। গরুর অভাবে ঐ জিনিসগুলির অভাব, এবং উহাদের অভাবেই উহাদের স্বভাবের ও পরিবর্ত্তন,—অন্যবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া উহারা অবিশুদ্ধ। গোজাতির অভাবই কি এই স্বভাব নষ্ট হওয়ার কারণ নহে?

তারপর আমাদের দেশে বর্ত্তমানে একমাত্র গোজাতিই কৃষিসহায় পশু। এই বাংলা দেশেরই শতকরা ৮০ জন লোক কৃষি-বৃত্তি-নিরত। শুধু কি হিন্দুই কৃষক? আমরাত সরকারী বিবরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান কৃষকের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া খৃষ্টান কৃষকও অনেক আছেন। সকলেরই কি এই কৃষিসহায় পশুটির রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া উচিৎ নহে? গরুর অভাবে ভূমি ভালরূপ কর্ষিত হয় না; সকল কৃষকের গরু নাই, একজন হেলো কৃষককে আজকাল নিজের ছাড়া অন্যেরও অনেক জমি চষিয়া দিতে হয়, সুতরাং সময়াভাবে জমি গুলির ভাল করিয়া চাষ দেওয়া হয় না। দেশে ভাল বলিষ্ঠ বৃষের খুব অভাব, এবং তাই গোজননও খুব নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য উপযুক্তমত বলিষ্ঠ বৃষ মিলেনা। গাভী গুলির প্রসবের পর অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ব্বল বৎস গুলি অকালে আপনা আপনি মরিয়া যায়। তারপর পর্য্যাপ্ত সংখ্যক গাভীর অভাবে দুগ্ধও পর্য্যাপ্ত হয় না বলিয়া গোয়ালারা বৎসকে উপবাস করাইয়া তাহাদের মুখের দুধ টুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়। অভাবের চাপে স্বভাবের কেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সকলেরই তাহা লক্ষ্য এবং চিন্তা করিবার বিষয়। ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক দেশে আইনের দ্বারা দুগ্ধবতী গাভী এবং গোবৎস হত্যা নিষিদ্ধ, অথচ সেই সকল দেশেরই লোকেরা গোমাংস খাইয়া থাকে। ওই সকল দেশে বিভিন্ন দেশ হইতে বৃষ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গোজাতির অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইতেছে। মনে রাখিবেন, ওই সকল দেশে কৃষিকর্ম্মে এদেশের মত একা গরুই সহায় নহে, ঘোড়াও সেখানে কৃষিসহায় পশু।

শুধু মুসলমান এবং খৃষ্টানেরা মাংসের জন্য গোহত্যা করিয়া কথিত অভাবটি সম্পূর্ণ সৃজন করিয়াছেন, এমন কথা আমরা বলিতে পারিনা; তবে বর্ত্তমানে মাংসের জন্য গোহত্যা উক্ত অভাব সৃজনের একটি প্রধান কারণ তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। গোচারণের মাঠের অভাবে পল্লীগ্রামেও গরুগুলি প্রচুর কাঁচা ঘাস খাইতে পায় না। মনোমত প্রচুর আহারের অভাবে যাহাতে তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়া তাহারা দিন দিন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে এবং গোমড়কের বাহুল্য ঘটিতেছে। আগে যে সকল গোচারণের জন্য পতিত জমি ছিল, এখনকার চতুর জমীদারগণ ওই নির্ব্বাক্ নিরীহ বোকা পশু গুলার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিয়া অতিরিক্ত আয়ের পথ বন্ধ করিতে অনিচ্ছুক! অতএব স্বার্থান্ধ এই জমীদার গুলিও কি উল্লিখিত অভাব সৃজনের জন্য সামান্য মাত্রও দায়ী নহেন? দরিদ্র পশুপালক গোয়ালারা অভাবে নষ্টস্বভাব হইয়া উক্ত অভাব বাড়াইতে কিছু কিছু যে চেষ্টা করিতেছে না, এমন কথা বলিনা।

আমাদের মতে বর্ত্তমানে দেশের গোজাতির এই অবনতির দিনে একটি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গাভী ও বৎসহত্যা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া উচিৎ। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের ইহাও কর্ত্তব্য যে বিশবৎসর পূর্ব্বকাল হইতে তৎপূর্ব্বের ৩০ বৎসর কালের

মধ্যে দেশে যে সকল গোচারণ পতিত জমী ছিল, উহা যে সকল জমীদার এখন ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সরকারী গোচারণের মাঠ স্বরূপ রক্ষা করা। বাস্তবিক পক্ষে ঐ জমী গুলির জন্য জমীদারেরা সরকারের নিকট নূতন খাজনার জন্য দায়ী হয়েন নাই ত। সুতরাং তাঁহাদের ঐ জমী গুলির উপর লোভ থাকা উচিৎ নহে। উহারা সাধারণের ব্যবহারের জন্য।

* * * * *

এই প্রসঙ্গে আমরা দেশের 'বেকার' শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণকে দুই চারিটি কথা বলিতে চাহি। তাঁহারা যদি উৎসাহী হইয়া 'ডেয়ারি ফার্ম্মিং'এর বা দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-ছানা-মাখন-ইত্যাদির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে শুধু যে তাঁহারা একটি বিশেষ লাভজনক কর্ম্ম পাইবেন তাহা নহে, এরূপ কার্য্য দ্বারা দেশের দুইটি মহৎ উপকার করা হইবে। প্রথম তাঁহাদের ইদৃশ চেষ্টায় গোকুলের রক্ষা এবং উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা; এবং দ্বিতীয় তাঁহাদের এই ব্যবসায়ে দেশের লোকের পয়সা দিয়াও অবিশুদ্ধ দুগ্ধ-ঘৃত মাখন-সংগ্রহের একটা প্রতিকারও হইবে। বলা বাহুল্য সৎপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া উচিৎ। অতঃপর আমরা কৃষকে গোপালন সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সকলের নিয়মিত ভাবে আলোচনার বন্দোবস্ত করিব।

* * * *

আমারা জার্ম্মানির 'বার্লিন-হালেন্‌সি' হইতে প্রকাশিত 'ইন্‌ডষ্ট্রিয়াল্ রিভিউ ফর্ ইণ্ডিয়া' নাম মাসিক পত্রের গত অক্টোবর এবং নবেম্বরের মিলিত সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। পত্রিকাখানি ভারতের শিল্পোৎকর্ষ এবং বিদেশীয় বাণিজ্যসম্বন্ধের উন্নতি-কামী। যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী স্বদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহারা এই পত্রিকাখানি হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ইহার বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা বা ৮ শিলিং। ঠিকানা—Business Manager, Berlin-Halensee, Georg-Withelmstrasse 7-11.

* * * *

সমগ্র জগতে একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে ভাষার বিভিন্নতার জন্য যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকারার্থ সকল জাতিই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ভাষার অভাব উপলব্ধি করিতেছিলেন। গত এপ্রিল মাসে ভিনিসে যে সমগ্রজগতের আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যসম্মিলন বসিয়াছিল, তাহাতে সার্ব্বজনীন ব্যবসায়ের এবং পর্য্যটকগণের সুবিধার জন্য সকল দেশেই 'এস্‌পারেণ্টো (Esparanto) নামক ভাষাকে এতদুদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত সম্মিলন সকল

দেশের ব্যবসায়িক শিক্ষালয় গুলিকেও এই ভাষা শিক্ষণীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং শিক্ষার প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রথম যখন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Dr. Zamenhof এই কৃত্রিম ভাষার প্রনয়ন এবং প্রচার করেন, তখন ইহা সকলের নিকট একটি উপহাসের বস্তু হইয়াছিল। আজ এই ছত্রিশ বৎসরের মধ্যে কিন্তু এই ভাষার উপকারিতা প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়া সমস্ত পৃথিবীই উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ১২০০ সহরে কর্ম্মচারী-গণকে এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অনেক স্থলে এস্পারেণ্টো ভাষা প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূতও হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশে অনেকে হয়ত এখনও এই ভাষার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। কেন? আমাদের নিকট কি ইহার কোন মূল্য নাই? আমরা কি পৃথিবীর উন্নতিশীল সভ্য জাতিগণের মধ্যে গননীয় হইবার ইচ্ছা রাখিনা? আমাদেরও শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি করিবার জন্য কি পৃথিবীর সকল উন্নতিশীল জাতির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই? আমরা আশা করি কলিকাতার 'কমার্সিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্' বা ব্যবসায়িক শিক্ষালয় গুলিতে অতঃপর Esperanto শিখিবার ব্যবস্থা থাকিবে, এবং দেশের মঙ্গল-কামী যুবকগণ ইহা শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহার প্রচলন জন্য দেশীয় ব্যবসায়ীগণকেও আমরা সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি। ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই ভাষারই আদর আমরা দেখিতে চাই। এ ভাষা পৃথিবীস্থ সকল জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে সহায়তা করিবে, সেই হিসাবে সকল বিদেশীয় ভাষা হইতে ইহার অধিক আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* * * *

সরকারী চাকরী। স্বরাজ্যদলের চুক্তিপত্র লইয়া দেশময় একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। উহার সকল দিক আমাদের আলোচ্য নহে। তবে সরকারী-চাকরীর হার লইয়া যে মতভেদ, সে সম্বন্ধে আমরাও দুই একটা কথা বলিতে চাই। লোকসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিক চাকরী পাওয়ার দাবীটা আমাদিগকে মনে করাইতেছে যেন দেশের সকল লোকই—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই সরকারী চাকরীর যোগ্য এবং তাহা যোগাযোগ্য নির্ব্বিচারে পাইলেই দেশের উন্নতি হইবে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহার অযৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তবে আমরা ইহাও বলি, শিক্ষিত হিন্দুগণের ইহাতে দ্বেষের যেন কোন কারণ না থাকে। সরকারী চাকরীই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া কেহই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিবেন না; বরং তাহার পরিবর্ত্তে শিক্ষিত হিন্দুগণ স্বাধীন জীবিকার পথই অধিক পরিমাণে গ্রহণ করুন, আমরা দেশবাসীকে এই পরামর্শ দিই। বাস্তবিক দেশের উন্নতি যদি চাহিতে হয়, বাস্তবিক দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য যদি কাহারও

বাসনা থাকে, তবে তাহা স্বাধীনজীবিকার দিক দিয়াই—উৎপাদন-বাহন-বিনিময়ের দিক দিয়াই সম্ভব হইবে, অন্য দিক দিয়া নহে। শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুগণ এতকাল ঐ চাকরীর মোহেই নিজেদের জীবনের সমস্ত শক্তি অপচয় করিয়াছেন, তাঁহারা চাকরী ছাড়া সকল কর্ম্মেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা 'কৃষকে' বহুবার আলোচনা করিয়াছি যে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ কোন দিকে। তাই এখন আমরা বলিতে চাই মুসলমান সম্প্রদায়ের ওই দাবী দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া যদি শিক্ষিত জনসমাজের চিন্তাস্রোত ফিরে তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলেরই হইবে।

* * * *

শিক্ষার বিস্তৃতি। যে দেশের একদশমাংশ মাত্র অধিবাসী লিখন-পঠনক্ষম, সেখানে শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে আজ সমৃদ্ধ তাহার কারণ তাহারা অধিক শিক্ষিত এবং শিক্ষার ভিতর দিয়া সর্ব্বদেশের উন্নতি-অবনতির সংবাদ গ্রহণ করিয়া আপনাদের উন্নতির জন্য চিন্তা করিতে পারে। প্রাথমিক-শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তৃতি এদেশে হয় নাই। এজন্য বেসরকারী ভাবে যে চেষ্টা হইয়াছে, উহা পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা আশাকরি এজন্য দেশের প্রকৃত হিতকামীগণ আরও সচেষ্ট হইবেন। তারপর প্রাথমিক-শিক্ষার ভিতর দিয়াই কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞানের শিক্ষার ক্রমবিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে। তবেই দেশ প্রথম হইতেই স্বাবলম্বনের জন্য চিন্তা এবং চেষ্টা করিতে শিখিবে। এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে কৃষি ও শিল্প বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান বিস্তারের কোন ব্যবস্থা নাই; শীঘ্রই কিন্তু ইহা হওয়া উচিৎ। কর্ত্তৃপক্ষ, জেলা এবং ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ও মিউনিসি-প্যালিটি গুলি এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে ইহার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নহে। অনেকে এ সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাবের কথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ওই প্রকার ব্যবস্থা হইলে, সে অভাব থাকিবে না। শিক্ষার অন্যান্য বিভাগের মত প্রয়োজন হইলেই কৃষি ও শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা পুস্তকের বর্ত্তমান অভাব ঘুচিয়া যাইবে। এখনই কতকগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। আমরা শীঘ্রই কৃষি ও শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বা অনুবাদিত হইয়াছে, তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিব। আশাকরি লেখক এবং অনুবাদ-কগণ এবিষয়ে তাঁহাদিগের সহায়তা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।

* * * *

বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা। সম্প্রতি আমরা এই সভার একটি সম্মেলনে উপস্থিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের 'কৃষকের' উদ্দেশ্যের সহিত এই সভার উদ্দেশ্যের বিশেষ পার্থক্য নাই। এই সভার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। বারান্তরে আমরা এই সভার উদ্দেশ্য এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

———

দেশের ও দশের কথা।

—:*:—

মলমূত্রসার। 'অষ্ট্রেলিয়ান্ এগ্রিকল্‌চারল্ বুরো'তে তত্রস্থ 'ব্যানডন গ্রোভে'র ক্ষেত্রস্বামী মিষ্টার আলেকজাণ্ডার স্মিথ ব্যবসায়িকসার এবং মলমূত্রজাত সারের পরীক্ষা করিয়া তল্লব্ধ ফল প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায়, গত ১৯২২ সালের বসন্তকালে একটি ক্ষেত্রে গোশালার আবর্জ্জনাসার দেওয়া হইয়াছিল। পরে গ্রীষ্মের প্রথমে ঐ ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া উহা মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে ঐ ক্ষেত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া পুনরায় সার দিয়া বীজ বপন করা হয়। প্রথম ভাগে কোনও সার দেয়া হয় নাই, দ্বিতীয় ভাগে ব্যবসায়িক সার—বাজারের ক্রীত সার দেওয়া হইয়াছিল এবং তৃতীয় ভাগে গোশালার মলমূত্রময় আবর্জ্জনা মিশান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই তৃতীয় খণ্ডে বাজারের ক্রীত সারও ছিল। বাজারের ক্রীত সার প্রতি একরে দুই হন্দর হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। জুলাই মাসের মাঝামাঝি তরকারী ফসল উঠান হয়। দেখা গেল,—

(ক) ১ম খণ্ডের ফসল উল্লেখযোগ্য রূপে বর্দ্ধিত হয় নাই।

(খ) ২য় খণ্ডের ফসল প্রতি একরে ৮ টন ৭ হন্দর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে।

(গ) ৩য় খণ্ডের ফসল প্রতি একরে ১১ টন ১৬ হন্দর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই পরীক্ষাফলে দেখা যাইতেছে যে বাজার হইতে সংগৃহীত রাসায়নিক সার গোশালার সঞ্চিত মলমূত্রময় সারের সহযোগে অধিক উর্ব্বরতা আনয়ন করে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন, যে সারের পরিমাণবৃদ্ধির দ্বারা এই সুফল দৃষ্ট হইয়াছিল, কেননা রাসায়নিক সার আবশ্যকমতই মিশান হইয়াছিল।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ান ফলের ব্যবসায়। অষ্ট্রেলিয়ার ট্রেড্ কমিশনার মিষ্টার সিয়েফ্ ভারতে অষ্ট্রেলিয়াজাত ফলের কাট্‌তি হইতে পারে কিনা অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে ভারত অষ্ট্রেলিয়ার ফলের একটী উত্তম ব্যবসায়ের স্থান। গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানগুলি, বোম্বাই প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গ্রীষ্মকালে ফলের চাহিদা হওয়ার খুব সম্ভাবনা, কারণ স্থানীয় ফল প্রচুর ভাবে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ইহাকেই ব্যবসায় বলে। কোথায় প্রশান্তমহাসাগর মধ্যস্থ অষ্ট্রেলিয়া দেশ, আর কোথায় ভারত! জাহাজে ঠাণ্ডাঘর করিয়া ফল আনিয়া ভারতে বিক্রীত হইবে! জাহাজের ভাড়া আছে, রেল এবং ষ্টীমারের ভাড়াও আছে, এ ছাড়া আরও অনেক পাথেয় খরচ আছে,—সমস্ত দিয়াও উৎপাদকের বা ক্ষেত্র-স্বামীর লাভ রাখিয়া উহা এদেশের বাজার হস্তগত করিবে! আর ভারতবাসী ফল

ব্যবসায়ীগণ? তাঁহারা পৃথকভাবে পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া ক্রমশঃ আপনাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবেন! দেশীয় টাট্‌কা ফল অপেক্ষা রক্ষিত বিদেশীয় ফলের গুণ বেশী বলিয়া লোকে বুঝিবে,—শুধু দালালীর জোরে। বঙ্গের রক্ষিত-ফল-ব্যবসায়ীগণ এবার কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান, প্রচারের দিক্‌টায় একটু অধিক মনোযোগ দিয়া আপনাদিগের বাজার পরহস্তগত হওয়া হইতে রক্ষা করুন। ইহাতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ফলকৃষকগণেরও মঙ্গল হইবে।

'টিউব ওয়েলে'র উপকারিতা। জনৈক ভদ্রলোক জানাইয়াছেন, এদেশে জলসেচনের যথেষ্ট উপায় নাই বলিয়া আমরা যে আক্ষেপ করি, এবং কৃষি-কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিতে পারিনা, উহা যুক্তিযুক্ত নহে। সম্প্রতি গোরক্ষপুর মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা সহর প্রান্তে একটি 'টিউবওয়েল' স্থাপিত হইয়াছে। একটি ১০ ব্রেক হর্স পাওয়ারের অয়েল-এঞ্জিন ও ৫ ইঞ্চির 'সেণ্ট্রিফিউগ্যাল পম্প' দ্বারা উহার জলোত্তলন কার্য্য সাধিত হয়। উহাতে ঘণ্টায় ২৫০০০ হাজার গ্যালন জল উঠে। এই জলে যে জমির সেচন কার্য্য হইতেছে, উহার আয় পূর্ব্বে বার্ষিক ১৩০০ টাকা ছিল। যথেষ্ট সেচনের ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া পরে উহার আয় বার্ষিক ২৯০০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য এঞ্জিন প্রভৃতির খরচ বাদ দিয়াও বার্ষিক ১৬০০ টাকা আয় বৃদ্ধিতে উন্নত প্রণালীতে চাষের সাফল্যই পরিলক্ষিত হইতেছে।

পাখীর কাজ।—কত বিভিন্ন-রকমের পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়া থাকি। অনেকে হয়ত মনে করেন যে কেবল পাখী আমাদের কত সুন্দর সুরে গান শুনায় ও তাহাদের মনোহর নৃত্যাদির দ্বারা আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু পাখীর প্রধান কাজ অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ হইতে আমাদের শস্যাদি রক্ষা করা। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে কোন ক্ষেতে পঙ্গপাল, ফড়িং প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ফসল নষ্ট করিতেছে, এমন সময়ে কোন পাখী তাহার সন্ধান পাইল, এবং অচিরে অনেকগুলি পাখী আসিয়া জুটিল; দুই একদিনের মধ্যেই ক্ষেতের কীটপতঙ্গ নাশ করিল। এইরূপে পাখীর জন্য অনেক ফসল রক্ষা পায়।

যে-সকল পাখী এই কাজ করে তাহাদের নাম বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের পরিচিত কাক বক চড়াই হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামা দোয়েল কিম্বা বুলবুল প্রভৃতি সকল পাখীই অল্পবিস্তর কীটভোজী। আবার পাখীরা একরকম খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকে না, যখন যে খাদ্য প্রচুর পায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; শরৎকালে যখন দেওয়ালী-পোকা প্রচুর জন্মে, তখন অনেক পাখী তাহাই খাইয়া থাকে, পরে তাহারা আবার শস্য পাকিলে তাহাই খায়।

আমাদের চড়ুই প্রায় সর্ব্বভুক। সহরে তাহাদের অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন। একবার মাটীর টবে ফুলের বীজ রোপণ করিয়া একটিও গাছ তৈয়ারি করিতে পারিলাম

না, কত উপায় স্থির করিয়া চড়ুইয়ের অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল। ছোট ছোট চারা জন্মিলেই তাহারা খাইয়া ফেলিবে; কিছুতেই নিস্তার নাই। আবার ইহারাই গাছের পোকা-মাকড় নির্মূল করিতে সিদ্ধহস্ত। কানাডা দেশে একবার ফসলে একরূপ পোকা লাগিল, কিছুতেই তাহাদের উচ্ছেদ করা যায় না দেখিয়া শেষে এই চড়ুই সেখানে লইয়া যাওয়া হইল এবং এইরূপে ফসল রক্ষা হইল। সেদিন হইতে চড়ুই কানাডা দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইল।

সকলেই জানেন যে ম্যালেরিয়াজ্বর মশা দ্বারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং মশা বদ্ধ জলে—ডোবা খাল প্রভৃতিতে ডিম পাড়ে। যদি তথায় কয়েকটা হাঁস রাখা যায়, তবে আর মশাবংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ মশার ছানা হাঁসের প্রিয় খাদ্য।

ক্ষেতে নূতন লাঙ্গল দেওয়া হইলেই দেখা যায় যে, কতকগুলি বক তথায় চরিতেছে ও মৃত্তিকার কীটগুলিকে খাইতেছে। আবার পাখীরা যে কেবল কীট-পতঙ্গ খায় তাহা নহে, ইন্দুর আদি ছোট ছোট জন্তুও খাইয়া থাকে।

পেঁচককে লক্ষ্মীর বাহন বলে, কারণ গোলাবাড়ীতে, যেখানে ধান থাকে, তথায় ইন্দুরে বড় উৎপাত করে। পেচক ইন্দুরের শত্রু। ইন্দুর মারিয়া পেচক গৃহস্থের লক্ষ্মীলাভের, অর্থাৎ অপচয়-নিবারণের সুবিধা করিয়া দেয়।

* * * *

—(প্রবাসী)

কার্পাসের চাষ। কাল্‌নার নিকটস্থ মীরের বাগানে শ্রীকালীকৃষ্ণপাল মহাশয় ২ বিঘা জমীতে, শ্রীপাঁচকড়ি দাস মহাশয় ৫ কাঠা জমীতে এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস মহাশয় ২ কাঠা জমীতে কার্পাসের চাষ করিয়াছিলেন। খুব আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। গতবৎসর শ্রীকালীকৃষ্ণ পাল মহাশয় জমীতে কচু লাগাইবার সময় ভেলিতে গর্ত্ত করিয়া ঐ সঙ্গে কার্পাস বীজ লাগাইয়াছিলেন। এ বৎসর ঐ স্থানে তিনজন কার্পাসের চাষ করিয়াছেন। এবৎসরও কচু লাগাইবার সময় উঁহারা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্পাস লাগাইয়াছেন। উঁহারা বলেন বিঘা প্রতি আন্দাজ ৫০।৬০ টাকা আয় দেখা যাইতেছে। বীজগুলি লাগাইবার সময় ঐ সঙ্গে সামান্য পরিমাণে গুঁড়া খৈল দিলে গাছগুলি খুব সতেজ হইয়া থাকে।

—আনন্দবাজার।

পাতি ও কাগজী লেবুর বাগান। বাংলাদেশে নানা জেলায় পাতি ও কাগজীলেবু বিস্তর জন্মে। ইহার দস্তুরমত বাগান করিলে প্রচুর লাভের আশা করা যাইতে পারে। কলিকাতায় এই উভয় প্রকার লেবুই উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া

থাকে। কিন্তু অতি অল্পস্থানেই নিয়মিতরূপে ইহার বাগান করা হইয়া থাকে। শোনা যায়, মালদহ জেলায় পাতিলেবুর বিস্তর বাগান আছে। পশ্চিম-প্রদেশ হইতেও কলিকাতায় বিস্তর লেবুর আমদানী হয়। ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুর মহকুমার অধীন চরমান্দারী, চরপাতা, রঘুনাথপুর ও কাউনিয়া প্রভৃতি স্থানে এবং উহার নিকটবর্ত্তী নোয়াখালী জেলার কতকগুলি গ্রামে বিস্তর কাগজীলেবু ও কমলালেবু জন্মে। ব্যাপারী এবং ফড়িয়াগণ তাহা ক্রয় করিয়া নানাদিকে চালান দিয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলাতেও বিস্তর কাগজীলেবুর বাগান আছে। * * বাংলার প্রায় সকল জেলাতেই পাতি ও কাগজী লেবুর বাগান হইতে পারে। —ছোলতান।

বঙ্গে যৌথ কারবার। বিগত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যে ১৪টি যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সমবেত মূলধন ২৯ লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে ১টা রাসায়নিক ব্যবসায়, ২টা ব্যাঙ্কের ব্যবসায়, ১টা সোডা-লিমনেড ও বরফের কারবার, ১টা চা-কোম্পানী, ১টা ইমারত ইত্যাদির ব্যবসায়, ১টা মহাজনী কারবার, ৩টা ঋণদানের ব্যবসায় ও ৪টা বিবিধ কারবারের জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

—ছোলতান।

জলহাওয়া ও ফসল।

তিল ফসল। শ্রাবণ-ভাদ্রে বৃষ্টি অনুকূল থাকিয়া আশ্বিনে একটু প্রতিকূল ভাব ধারণ করায় পশ্চিম এবং উত্তর বঙ্গে তিলের চাষে ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সন্তোষজনক ফসল আশা করা যায়। মোটের উপর ফল নিন্দনীয় নহে। এবার গত বৎসরাপেক্ষা অনুমান ১৩০০ একর কম জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে। সকল জেলা হইতে যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় এবৎসর গত বৎসরাপেক্ষা প্রায় শতকরা ১০ টন কম শস্য উঠিবে। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১০০০ একর, ত্রিপুরায় প্রায় ৫০০ একর এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলায় মোটের উপর ৬০০ একর কম জমীতে চাষ হইয়াছে। জমীর পরিমাণ অনুসারে সারা বাংলায় গতদশ বৎসরের সহিত তুলনায় শতকরা ১৫·৭ একর কম জমীতে চাষ হইয়াছে, কিন্তু শস্যের পরিমাণ শতকরা ১৪·৯ টন অধিক আশা করা যায়। সমগ্র ভারতের তুলনায় বাংলার চাষ প্রায় শতকরা ৪·৮ ভাগ মাত্র।

আমন ধান্য। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৃষ্টিপাত বিশেষ অনুকূল না থাকায় সমগ্র বঙ্গে গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ১১৫৯৭০০ একর কম জমিতে আমনধান্যের আবাদ হইয়াছে। যশোহর, মেদিনীপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলাগুলি ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই হ্রাসের হার পরিদৃষ্ট হইতেছে। আশাকরা যায়, পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা অনুমান ৯৯৫৯০০ টন কম শস্য পাওয়া যাইবে। পাবনায় চাষের পরিমান না কমিলেও ফসলের পরিমান আশানুরূপ মনে করা যায় না। নদীয়া,

বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও বগুড়া জেলার শস্যের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। সময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়াই ইহার কারণ বলা যায়। সমগ্র বঙ্গে গত দশবৎসরের তুলনায় শতকরা প্রায় ২·৮ ভাগ কম জমীতে চাষ হইয়াছে, এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও প্রায় ১·৮ ভাগ কম।

ভাদ্‌ই বা আউস ফসল। বৃষ্টির অবস্থা বিশেষ অনুকূল না হইলেও মোটের উপর ইহার ফল কথঞ্চিৎ সন্তোষজনক। গত দশ বৎসরের তুলনায় উৎপন্ন শস্যের হার শতকরা ২·৮ ভাগ মাত্র কম, এবং গত বৎসরের তুলনায় ৪·৬ ভাগ মাত্র কম। বলা বাহুল্য ধান্য এবং অন্যান্য আউস বা ভাদুই শস্যেরও উৎপন্ন ফসল এক সঙ্গেই গৃহীত হইয়াছে। পতঙ্গ এবং বন্যাও কোন কোন স্থানে এই ফসলের ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

(ফাল্গুন মাস।)

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিন ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র চষিয়া ভবিষ্যতে পাট ধান, প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের বাগানে গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল ফুটিবে না পয়সাও হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল নাফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতা এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

কৃষক

২৪ খণ্ড } ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল। { ১১শ সংখ্যা

গোপালন ও দুগ্ধ ব্যবসায়।

(Dairy Farming).

—০—

এদেশে গোপালন ও দুগ্ধব্যবসায় লাভজনক হইবে কিনা, এবিষয়ের মিমাংসা করিতে হইতে হইলে, আমাদিগকে ইহার প্রধান দুইটি দিক বিবেচনা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দরকার। (১) গোদুগ্ধ ও তজ্জাত সামগ্রী গুলি, অর্থাৎ দধি, ঘৃত, ছানা, মাখন, ক্ষীর প্রভৃতির চাহিদার পরিমাণ স্থির করা (২) সুলভে গোপালন সম্ভবপর হইবে কিনা, অর্থাৎ গবাদির খাদ্য সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা হইবে কিনা স্থির করা। প্রথম দিক্‌টির কথায় আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি এদেশে গোদুগ্ধ এবং গোদুগ্ধজাত সামগ্রগুলির চাহিদার পরিমাণ যথেষ্ট আছে, প্রয়োজনের অনুরূপ সংগ্রহই হয় না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় গোয়ালারা ব্যতীত অনেক শ্রেণীর লোকে আজকাল গোপালন করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তথাপি দিন দিন দুগ্ধ এবং তজ্জাত সামগ্রীগুলি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, অথচ বিশুদ্ধ দুগ্ধাদি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় দিক্‌টির কথায় বলা যায়, গোপালন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সুলভে গোপালন অসম্ভব হইবে না। গবাদির খাদ্যের জন্য শুধুই খড় বা খইলের ব্যবস্থা করিতে যাওয়া ভুল হইবে। উহাদের প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি যতপ্রকার খাদ্যে পাওয়া যায়, সকল গুলির প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা থাকিলে, একটির সাময়িক অভাবে গোপালন অসম্ভব হইবে না। অভাবের মধ্যে, দেখিতে পাই দেশে বলিষ্ঠ

উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়ের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু সকল দিক লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ও অভাবটি ও থাকিবে না।

এই ব্যবসায়ে নামিতে হইলে প্রথমেই নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়া রাখা উচিৎ। (ক) দুগ্ধ বিক্রয়ের স্থান সমূহ। (খ) দুগ্ধ রক্ষার উপায় গুলি। (গ) দুগ্ধ হইতে কি কি উপায়ে কত প্রকার জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে। (ঘ) গোজাতির উৎকর্ষাপকর্ষ, অর্থাৎ কোন কোন জাতীয় গাভী অধিক দুগ্ধবতী তাহা স্থির করা, এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষের সহায়তায় উৎকৃষ্টতর গাভীর প্রজনন। (ঙ) গোচারণের এবং গবাদির খাদ্যের ব্যবস্থা স্থির করা। (চ) গোচিকিৎসা। (ছ) কোন উপায়ে দুগ্ধের মাত্রা বাড়ান যায় কি না?

অতঃপর আমরা একে একে উক্ত বিষয় গুলির আলোচনা করিতেছি।

(ক) দুগ্ধ বিক্রয়ের স্থান সমূহ।

প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম বা সহরে এবং নগরেই দুগ্ধ অল্প বিস্তর বিক্রীত হইয়া থাকে। অধিবাসীর সংখ্যার সহিত বিক্রেয় দুগ্ধের পরিমাণের হার নিরূপিত হইয়া থাকে। দুগ্ধ অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দূরবর্ত্তী সহর বা নগরেও ইহার বিক্রয় ব্যবস্থা হইতে পারে। কলিকাতার প্রত্যেক বাজারেই প্রচুর দুগ্ধের কাট্‌তি হইয়া থাকে।

তা' ছাড়া 'কনট্রাক্ট' বা বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া প্রতি গৃহে, মেসে, হোটেলে, বা 'চা' এর দোকান প্রভৃতিতে নিয়মিত ভাবে দুগ্ধ বিক্রয় করা যায়। দধির বা ক্ষীরের ব্যবসায়ীরাও নিয়মিত ভাবে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে 'কলিকাতা কর্পোরেশন' সহরের দুগ্ধাভাব মোচনের জন্য Dairy Farm প্রতিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের জন্য এখনই কয়েকটী Dairy Farm থাকিলেও বিশুদ্ধ দুগ্ধের প্রয়োজন মত সরবরাহ হইতেছে না। এসম্বন্ধে গত ২৭শে পৌষ সংখ্যার বঙ্গবাসী বলিতেছেন,—

এই বিরাট কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ পাওয়া ক্রমেই অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। সহরে প্রাতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,—বিস্তর পশ্চিমা লোক দুগ্ধের টিনের আধার বাঁকে করিয়া দুগ্ধ ফিরি করিয়া বা গৃহস্থের বাড়ী যোগান দিয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী গোয়ালা প্রভৃতিও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে দুগ্ধ আনিয়া সহরে যোগান দিয়া থাকে। তথাপি সুবিশুদ্ধ দুগ্ধলাভ অনেকেরই পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যাঁহাদের প্রচুর পয়সা আছে, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য ইহা তত কঠিন নহে,—কেননা, তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ বাটীতে গোপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা করা অবশ্য কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে; সুতরাং বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রাপ্তি তাঁহাদের অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটে না। অনেকে মোতাত রক্ষার জন্য দুগ্ধ বলিয়া যাহা পান করেন,

তাহা সাদা জল মাত্র। খাঁটি গো-দুগ্ধ সহরে টাকায় দুই সেরও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। যে সকল পশ্চিমা বা বাঙ্গালী দুধ্‌ওয়ালা সহরে দুধ্‌ সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহাদের দুধই সহরের বিস্তর লোকের প্রধান ভরসা। ইহাদের দুধ অনেক সময়ে নানা কারনে নির্ভরযোগ্য নহে। এই দুধ স্থল বিশেষে বাসী ও টাট্‌কা একত্রে মিশ্রিত, গরু ও মহিষের দুধ একত্রে মিশ্রিত বা নানা রকম জল মিশ্রিত,—সুতরাং দুষিত। অনেককেই দেখিয়াছেন, দুগ্ধপাত্রের দুধ যেমন কমিতে থাকে—অথচ যোগানের খুব টান থাকে, তেমনি জল মিশাইয়া উহার পরিমাণ বাড়ান হইয়া থাকে। এই সাদা জলবৎ দুগ্ধই ৫।৬ আনা সের দরে বিক্রীত হয়। * * সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের সরবরাহ যাহাতে সুলভ ও প্রচুর হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য চিন্তা এবং চেষ্টা প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্খীর কর্ত্তব্য। 'চা' এর জন্য ত বিলাতী জমাট দুধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লণ্ডনের দুগ্ধ সরবরাহকারক ডেয়ারি কোম্পানী দুই হাজার 'ফার্ম্ম' বা গো-শালা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রতি বৎসরে ১০ কোটী গ্যালন (এক গ্যালন = ৪ সের) দুধ্‌ যোগান দেয়। ১২০০০ লোক ওই কোম্পানীতে খাটে, ৪০০ খানা মোটরে দুগ্ধ বহনের কার্য্য হইয়া থাকে। সহরে আসিবার ৮ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত দুধ্‌ সহরে বিলি হইয়া যায়।

(খ) দুগ্ধ রক্ষার উপায়।

এই বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই দুগ্ধে কি কি উপাদান আছে, কেন দুগ্ধ বিকৃত হয়, এই সকল কারণ-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ দুগ্ধের—

একশত ভাগে	জল	৮৩	হইতে	৯০ অংশ;
মাখম বা ননী	২	,,	৭॥	,, ;
কেশীন্	২·৮০	,,	৩·৩০	,, ;
শর্করা	৪	,,	৪·৪০	,, ;
ধাতব পদার্থ	·৬০	,,	·৭০	,, ;
অন্যান্য কঠিন পদার্থ	৯·৩০	,,	১৩·১০	,, ।

দুগ্ধে স্বাভাবিক ভাবে যে শর্করা বা চিনি থাকে, বায়ুর তাপে উষ্ম হইলে ঐ চিনি মাতিয়া উঠে এবং ল্যাক্‌টিক্‌ এসিডে বা অম্লে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাতে দুগ্ধের মধ্যস্থিত কেশীন্ জমিয়া যায়, এবং দুগ্ধ বিকৃত হইয়া থাকে। দুগ্ধের মধ্যে বায়ু হইতে বীজাণু সংগৃহীত হইয়াও ঐপ্রকার বিকারের সহায়তা করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই বিকার বন্ধ করা যায়।

সদ্য দোহিত দুগ্ধ স্বভাবতঃই উষ্ম থাকে। উহাকে উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে পারিলে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত উহা অবিকৃত থাকিতে পারে। কিন্তু উত্তাপ ৫০ ডিগ্রির বেশী হইলে বিকৃত হইবার কারণ ঘটে। এইজন্য প্রথমে ১৪০।১৬০ ডিগ্রি (ফারেন্‌-

হিট্) উত্তাপে উঠাইয়া সহসা ৪০ ডিগ্রি তাপে নামাইলে দুগ্ধের মধ্যস্থিত স্বাভাবিক বীজাণু গুলি নষ্ট হয়। কিন্তু আবার উত্তাপ বাড়িলেই বিকৃত হইবার কারণ ঘটে; সুতরাং আর উত্তাপ বাড়িতে না দিয়া রক্ষা করিতে পারিলে, উহা বহুকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিতে পারে। বিলাতী দুগ্ধ এই প্রকারেই রক্ষিত হইয়া এদেশে আসে।

দুগ্ধকে টাট্‌কা রাখিতে হইলে, অনুমান ৩।৪ সের পরিমাণ দুধে এক চামচ মিশ্রিত 'সল্‌ফেট্ অফ্ সোডা' মিশাইয়া রাখিলে উহা বহুক্ষণ সমভাবেই থাকে। অথবা সামান্য জল মিশাইয়া একটু উত্তাপে রাখিলে ও উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। কাঁচা দুধে বিচালি দিয়া রাখিলেও উহা বহুক্ষণ অবিকৃত থাকিবে, কারণ বিচালিতেও সোডার অংশ আছে।

দোহণের পর দুধে যতক্ষণ গাঁজ্‌লা বা ফেনা থাকে,ততক্ষণই উহা স্বাভাবিক ভাবে উষ্ম থাকে। ঐ উত্তাপ নির্গত হইয়া যাইবার পর, উহার মধ্যস্থিত বীজাণু গুলির বিকারকারী ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইজন্য ১৬০।১৭০ ডিগ্রি তাপে উত্তপ্ত করিয়া সহসা ৪০ ডিগ্রি তাপে নামাইয়া রাখিলে উহার মধ্যস্থিত বীজাণু নষ্ট হয় বলিয়া বিকার ঘটিতে দেয় না। এই তাপ নামান Cooler দ্বারা হইয়া থাকে। তারপর বরফের সাহায্যে ঐ নামান তাপে রাখিয়া উহাকে বাজারে পাঠান যায়। পাশ্চাত্য দেশে এইজন্য Refriegerator এর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসায়ের প্রচার-বিভাগ।

(শ্রী"দালাল"-লিখিত)

বিদেশীয় বাণিজ্যের সাফল্যের একটী কারণ উহাদের উৎপন্ন মালগুলির প্রভূত প্রচার। বাস্তবিক এই প্রচার বিভাগের দ্বারাই উহারা জগতের সমস্ত বাজার হস্তগত করিবার সুযোগ পায়; এবং উৎপন্ন বস্তু বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইবার সুযোগ পাইলে, উহাদের মূল্য হিসাবে অধিক অর্থাগম হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেক সভ্য এবং বাণিজ্যপ্রধান দেশেই এই প্রচার কার্য্য লইয়া কত লোক খাটিতেছে। তাহারা শুধুই প্রচার করেনা, অনেক স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের বন্দোবস্তও করিয়া দেয়।

মনে করুণ, সুদূর মফঃসলে কোন বস্তু প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্থানীয় ক্ষুদ্র একটি কি দুইটি বাজারে উহাদের চাহিদা কম। সেক্ষেত্রে দূরবর্ত্তী বড় বড় বিভিন্ন

বাজার হস্তগত করিতে না পারিলে, উপযুক্ত মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির বিক্রয় সম্ভাবনা হয়না, এবং উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে না পারিলে, উৎপাদনেরও কোন সার্থকতা থাকে না, উৎপাদন চেষ্টা কমিয়া যায়,—ফলে স্থানীয় বিশেষ বিশেষ কৃষি ও শিল্পগুলি নষ্ট হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে উহাদের উৎপাদকগণও বৃত্তিহীন হইয়া দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়াইয়া থাকে। আবার উৎপাদকেরা নিজেদের উৎপাদনকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন দূরবর্ত্তীস্থানের বাজারগুলিতে নিজেরাই ঘুরিতে ফিরিতে পারেনা, তাহাতেও তাহাদের উৎপাদনে বাধা উপস্থিত হইয়া কথিত কৃষি ও শিল্পগুলির অধঃপতনের সহায়তা করে। অতএব স্বতন্ত্রভাবে প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া দরকার; বিদেশীয় কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ীগণ ইহা বুঝেন, এবং সেইজন্য প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য বিভিন্নস্থানে তাঁহাদের এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকে। এই এজেণ্ট বা প্রতিনিধিগণই সেই সেই স্থানে প্রচার এবং ক্রয়-বিক্রয়ে সাহায্য করিয়া বাজার হস্তগত করাইয়া দেয়।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই প্রচার কার্য্যটির খুব অভাব। বিদেশীয় ব্যবসায়ীর এজেণ্টরূপে কতকগুলি দেশীয় ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান আছে বটে, তাহাতে দেশের কৃষিশিল্পোন্নতির কোন সাহায্য হয় না। বর্ত্তমানে এই দিকে কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও খুব কম; কারণ ইহার প্রয়োজনীয়তা উভয়েই—উৎপাদক কৃষি ও শিল্পিগণ এবং এজেণ্টগণ—সম্যক্‌রূপে না বুঝিলে, এ কার্য্যের সমধিক প্রসারণ হইতে পারেনা, তাই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা।

এই প্রচারক এবং ক্রয়-বিক্রয়-বন্দোবস্তকারী এজেণ্টগণের অনেকগুলি দায়িত্ব আছে। প্রচারের দ্বারাই কোন বিশেষ বস্তুর গুণাবলী এবং ব্যবহার প্রণালী সাধারণের জানিবার সুযোগ হয়, আর সাধারণে উহা না জানিলে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারেনা। মনে করুন, আপনার উৎপন্ন গুড় উৎপাদনস্থান হইতে দূরবর্ত্তী বিক্রয়ের বাজারে আনিতে একশত মনে ৬৲ খরচ পড়ে, এবং আপনার উৎপাদনখরচা প্রতি বিশমনে চাষের এবং গুড় প্রস্তুত করার খরচা সমেত প্রায় ২০০৲ টাকা। এখন দেখা গেল ঐ গুড় বিক্রয়-স্থানে আসিতে মন করা ১০৲ খরচ পড়িল। সুতরাং এজেণ্টকে মাল আনাইবার আগে খরচ গুলির হিসাব করিয়া পড়্‌তা ধরিয়া বাজারে যদি ঐ পড়্‌তার চেয়ে কিছু বেশী দরে বিক্রয়ের দর পান, তবেই সেই বাজারে মাল আনান ভাল, নতুবা উৎপাদক এবং এজেণ্ট উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আবার, আপনি একটি ধান ভানিবার কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন; উহার নির্ম্মাণ খরচ প্রত্যেকটির গড়ে ৪০৲ টাকা, কিন্তু উহার কাজ প্রতিদিন ২ মন করিয়া ধান ভানা এবং তদর্থে দৈনিক একটাকা করিয়া খরচ হয়। এখন যে বাজারে উহা আসিল, সেখানে অন্য প্রকারের কলও বিক্রয় আছে। এজেণ্টকে উভয় কলের ঐ প্রকার যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক

কার্য্যদ্বারা কোন কলটী ক্রেতাকে কত সুবিধা দিতে পারে দেখাইয়া উহার সুলভতা প্রচার করিতে পারিলে তবেই উহার আশানুরূপ কাট্‌তি হইবে। উপরের হিসাবগুলি শুধু দৃষ্টান্তের জন্যই লিখিত হইল, কেহ যেন উহাই প্রকৃত বাজার হিসাব মনে না করেন।

আমাদের দেশের যে সকল স্কুল-কলেজ-নিষ্ক্রান্ত ছেলেরা চাকরীর অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইতেছেন, তাঁহারা কেন কোন একটি বা একাধিক বিশেষ উৎপন্ন বস্তুর সহিত প্রথমে পরিচয় লাভ করিয়া পরে রেল-ষ্টিমার-নৌকাদির ভাড়ার ও যানাদির বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিভিন্ন বাজারে উৎপন্নমালের বিক্রয় ব্যবস্থায় একটু ঘোরা ফেরা করুন না! কাজে নামিয়াই প্রকৃত কার্য্যশিক্ষা হইবে। আমরা মোটামুটি একটা ধারণার মত জ্ঞানলাভের সাহায্য করিতে পারি, কর্ম্মে নামিয়াই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হয়।

'ক্যানভ্যাসার' 'ব্রোকার' বা দালাল এবং 'এজেণ্ট' বা প্রতিনিধি,—এসকল গুলির মূল কার্য্য প্রায়ই এক; কেবল ব্যবসায় প্রসারণের জন্য এক কার্য্যকে বিভাগ করিয়া বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে এক এজেণ্টই সকল কর্ম্ম করিতে পারেন, বৃহৎ-ব্যাপারে অবশ্য কর্ম্মবিভাগ এবং সহকারীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের এই সকল নীতিগুলি সকলেরই জানা উচিৎ, তবেত ব্যবসায়ে উন্নতি হইবে, ক্রমশঃ দেশে এবং বাহিরে বিদেশের বাজারেও পঁহুছিতে সাহস এবং প্রয়াস আসিবে, আর দেশের উৎপন্ন বস্তুগুলির আবশ্যকমত কাট্‌তি হইবে। কর্ম্মের প্রসারণ হইয়া কর্ম্মহীনতা-সমস্যার মিমাংসা করিয়া দিবে।

বিদেশে কি হয় জানেন? সেখানে ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষালাভ এবং সেই সঙ্গে কোন বিশেষ কৃষি বা শিল্প সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া সেই সেই কারবারে অবৈতনিক কর্ম্মী বা শিক্ষানবীশ হইয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করে। পরে তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বা বাজারে কৃষক ও শিল্পি অথবা তাহাদের এজেণ্টরূপে বাহির হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করে। সে সকল দেশের প্রত্যেক উৎপাদক প্রচার ও ক্রয়বিক্রয়ের দিক্‌টার প্রয়োজনীয়তা তাহাদের উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার সমান করিয়াই ভাবে, একই ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক্ বলিয়া মনে করে। উপযুক্ত মত প্রচার না হইলে জিনিসের মূল্য যথাযথ নির্দ্ধারিত হয় না। সকল জিনিসেরই মূল্য উহার প্রয়োজনীয়তার উপরেই নির্ভর করে; সেই প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আবার প্রচারের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং প্রচার প্রত্যেক ব্যবসায়েরই একটা প্রধান বিভাগ।

যে বস্তুর প্রচার করিতে বা করাইতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ,—যথা বস্তুটির পরিচয়, উহার দ্বারা অন্য কি কি জিনিস উৎপন্ন হইতে পারে তাহার পরিচয়, উহার উৎপাদনে কি কি ব্যয় হইয়া থাকে তাহাদের বিবরণ, কেমন করিয়া কত খরচে

উহা বিভিন্ন বাজারে বাহিত বা নীত হইতে পারে তাহার বিবরণ, সেই সেই বাজারে উহাদের কাটতির নির্দ্দিষ্ট সময়, স্থান এবং খরিদ্দারগণের বিবরণ, ইত্যাদি সকল সংবাদই সংগৃহীত হওয়া এবং জ্ঞাত হওয়া উৎপাদক ও প্রচারকগণের আবশ্যক।

আমরা আশাকরি ভারতীয় কৃষিসমিতি একটি প্রচার বিভাগ খুলিয়া তদ্দ্বারা দেশের কৃষি ও শিল্পজাত সামগ্রীগণের বহুল প্রচার ও ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করিবেন এবং দেশের এই অভাবটির একটা প্রতিকার করিবেন।

অবশ্য প্রচারবিভাগের কার্য্যের জন্য ব্যয়াদি আছে এবং তাহার জন্য বিদেশীয় বণিকগণের মত নির্দ্দিষ্ট কমিশনের ব্যবস্থা আমাদের বিক্রেতা এবং ক্রেতাগণও করিতে পারেন। তবেইহাও নিশ্চয় যে এই দালালীর হার অত্যুচ্চ হইলে উহা ব্যবসায়ের ক্ষতি-কারক হইয়া থাকে। সুতরাং দালাল, প্রচারক বা এজেণ্টের সৎ ও বিশ্বাসভাজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য এবং সম্ভব মত অল্পহারে কার্য্য করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের লাভ চুরি বা ডাকাতীর অর্থ নহে, উহাও কর্ম্মের মূল্যস্বরূপ একথা সকলেরই চিন্তা করা উচিৎ।

আপাততঃ আমাদের দেশের যুবকগণ পরহস্তগত দেশের ব্যবসায় গুলি ফিরাইয়া আনিবার জন্য এক এক জনে এক একটি বিশেষ বস্তু লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া প্রচার ও বিক্রয়, এবং ক্রেতাগণের বিশ্বাস সংগ্রহ করিতে থাকুন। কাজটি অপমান জনক মনে করিবেন না। আজ যে মাড়োয়ারীকে লক্ষপতি দেখিতেছেন, কাল সেই ওই প্রকারে নিজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এ দৃশ্য আমাদের দেশে অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু কারণ চিন্তা করেন নাই বলিয়া উহার—ওই প্রকার প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। কোন নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে—'লজ্জা, মান, ভয়,—তিন থাকৃতে নয়'। এখানে লজ্জা উক্ত কার্য্য করিতে লজ্জা এই অর্থে, মান উক্ত কর্ম্মকে মানহানীকর মনে করা এই অর্থে এবং ভয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই কিছু না জানিয়া লোকসানের বা তদনুরূপ কোন ভয় এই অর্থে ব্যবহৃত।

দেশীয় কৃষি ও শিল্পব্যবসায়ের প্রসারণের জন্য—উন্নতির জন্য প্রচার চাই। লোককে আপনার উৎপাদন সংবাদ জানিতে দেওয়া দরকার, তবেত সে আপনার কাছে প্রয়োজনের জন্য উপস্থিত হইবে। প্রচার বিভাগটির দিকে আমি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মাটীর কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেন মাটীকে চষিতে হয় ?

এখন আমি ভূমিকর্ষণের প্রয়োজনীয়তার দিক্‌টাই আলোচনা করিব। সকলেই জানেন, ফসল জন্মাইবার জন্য মাটীকে কর্ষণ করিতে বা চষিতে হয়, ইহা একান্ত আবশ্যক, তাই ফসল উৎপাদনের নাম চাষ এবং উৎপাদকের নাম চাষা বা কৃষক। সুতরাং চাষা বা কৃষক একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিশেষ নহে ; যিনিই উৎপাদক, তিনিই চাষা বা কৃষক।

মাটীর বা ভূমির ভিতর নানা রূঢ় ও যৌগিক পদার্থ থাকে, একথা আগে বলিয়াছি। রৌদ্র বা আলোক এবং বায়ু সহযোগে ঐ সকল পদার্থই বীজ হইতে বৃক্ষাদি উৎপাদন এবং পোষণ করে। উহাই মাটীর উৎপাদিকাশক্তি বা উর্ব্বরতা। মাটী কর্ষিত না হইলে, চষা না হইলে, উপরকার কঠিনতা ভাঙ্গিয়া আলোক এবং বায়ুর সহিত ভিতরের জিনিসগুলির সংযোগ সম্ভব হয় না ; তাই ওই সংযোগসাধন বা উর্ব্বরতা জাগানই কর্ষণের বা চাষের উদ্দেশ্য। আগে মানুষ কাঠের বা পাথরের ফলক দিয়া ছোট ছোট গর্ত্ত খুলিয়া বীজ পুতিয়া দিত এবং গাছ হইত। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সেই আগেকার আদিম লোকেরা ক্রমে কৃষির মর্ম্ম বুঝিল, এবং ভূমি অধিকতর ভাবে কর্ষণ আরম্ভ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে চাষেরও উন্নতি এবং শস্যোৎপাদনের বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল।

আমাদের দেশের লোকেরা চাষে মন দিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত, যেখানে শিক্ষিত লোকে চাষের কাজ করিয়া থাকে এবং উহাতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহাদের মত আমাদের দেশেও চাষের খুব উন্নতি হইতে পারিত। ইউরোপ ও আমেরিকায় সামান্য সামান্য উপায় অবলম্বন দ্বারা চাষের কাজে—উৎপাদনের কাজে যুগান্তর আনিয়া ফেলিয়াছে।

চাষের—কর্ষণের নিম্নোক্ত কয়েকটী উদ্দেশ্য আছে। (১) মাটী চূর্ণ করা,—বায়ু এবং আলোক প্রবেশের পথ প্রস্তুত করা ; (২) মাটীর রস সংরক্ষণ এবং আর্দ্র বা অধিক রসযুক্ত মাটীকে শুষ্ক করা ; (৩) ক্ষেত্রস্থিত আগাছা এবং কীটাদি নষ্ট করা ; আর (৪) মাটীর মধ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলিকে তুলিয়া রৌদ্রজলবায়ুযোগে তাহাদিগকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করা।

আমাদের দেশে অতিপূর্ব্বকালে যে প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল, এখনও অপরিবর্ত্তিতভাবে সেই প্রণালীই চলিতেছে। ক্ষেত্রগুলি কোথাও ৪।৫ ইঞ্চির অধিক

কর্ষিত হয় বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে অবশ্য ঐরূপ অল্প কর্ষণে বা চাষে ফসল ভাল হইয়াছে, শোনা যায় ; কিন্তু এখন আর তাহা হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ভূমির বা মাটীর স্বাভাবিক উচ্চতার যতটা অংশ উপরের স্তরে—৪।৫ ইঞ্চির মধ্যে ছিল, ক্রমাগত কর্ষিত হইয়া এবং ফসল উৎপাদন করিয়া উহার সেই উর্ব্বরতার হ্রাস হইয়াছে, এই জন্য বর্ত্তমানে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও হ্রাস হইতেছে। ডাক্তার ভয়েল্‌কারের মতে বহুকালাবধি কর্ষিত হইতে হইতে এবং শস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভারতবর্ষের মাটী এখন এত অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে যে আর সারসংযুক্ত না করিলে তাহা হইতে সুফল প্রাপ্তির আশা নাই। ব্যারন্ ভন্ লেইবিগ্ সাহেব বলেন, মাটীর মধ্যস্থিত অজৈব পদার্থগুলি যে প্রতিবার চাষে ফসলের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতেছে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখ, এবং কৃত্রিম উপায়ে সার দিয়া মাটীর ওই ক্ষতি পূরণ কর। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন, মাটীর মধ্যে উর্ব্বরতা শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, যদি চাষ করিয়া উপরের স্তর নিস্তেজ হইয়া থাকে, গভীর কর্ষণ বা চাষ দ্বারা তন্নিম্নের স্তর আলোড়িত কর, সেখানে যে শক্তি নিদ্রিত রহিয়াছে, উহাকে জাগাও এবং উপরে উত্তোলন কর। আমরা এতকাল যদি ৪।৫ ইঞ্চি স্তর আলোড়িত করিয়া,—চাষ করিয়া আসিয়া থাকি, এখন এক ফুট পর্য্যন্ত যে স্তর আছে উহাকে কর্ষণ করা বা চষা প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং এখন গভীর চাষের আবশ্যক।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গভীর চাষ দিবার মত দেশীয় লাঙ্গল নাই ; প্রাচীন লাঙ্গলেরও প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। এ সকলের কারণ আমাদের দেশের চাষারা ততটা সুশিক্ষিত নহে, আবশ্যকতাই বুঝেনা, কেমন করিয়া তদনুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করিবে ? দেশের শিক্ষিত লোকেরা আজ পর্য্যন্ত এসকল বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নাই, দেশীয় লাঙ্গলেরও কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই, কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়া দেখিলে এখনই উহা চাই।

চাষের দ্বারা ভূমির বা মাটীর আয়তন বাড়ে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে গেলে—প্রথমেই বলিতে হয় কৃষি-ক্ষেত্রের মাপ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং চাষের ঘনত্ব লইয়াই হওয়া উচিৎ। ওই ঘনত্ব বা চষা মাটীর উচ্চতা বা কর্ষণের গভীরতাটি বাদ দিয়া যদি মাটীর পরিমাণ স্থির হয়, তবে এই আয়তনের বৃদ্ধি বুঝান যাইবে না। বাস্তবিক চষা মাটীই ক্ষেত্র, সুতরাং উহার ঘনত্বটি বাদ দিয়া পরিমাণ স্থির করা ভুল। জমীর খাজনা নির্দ্ধারণের জন্য শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কালী লইলেই চলিতে পারে ; কিন্তু চাষের মাটীর পরিমাণ স্থির করিতে চাষের ঘণত্বটি বাদ দেওয়া উচিৎ নহে। কর্ষণের বা চাষের দ্বারা মাটী চূর্ণ ও আল্‌গা হইয়া যায় এবং উহার ঘনত্ব বাড়ে ; সুতরাং ক্ষেত্রের ও আয়তন বাড়িয়া থাকে। ঘণত্ব বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনেরও হার বাড়ে। এই প্রকার ঘণত্ব বাড়াইয়া ক্রমশঃ এক বিঘা জমী হইতে চারিবিঘা জমীর ফসল লাভ হইতে পারে, ইহা পাশ্চাত্য

কৃষিনীতি। বলা বাহুল্য, এই ঘণত্ব চুর্ণকরা মাটীর দ্বারাই বাড়ে, উহার মধ্যে ঢেলা থাকিলে বাড়েনা। সুকর্ষণ বা ভালরূপ চাষদ্বারাই এই ঘণত্ব বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। মাটী চূর্ণ হইলেই উহাতে বায়ু এবং আলোক প্রবেশের পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং তাহা দ্বারা ভিতরের অজৈব পদার্থ-গুলির সহিত উহাদের সংমিশ্রণে উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয়।

ইহা সকলেই জানেন, মাটীচূর্ণ হইলে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার কারণ বায়ু উহার রস গ্রহণ করিয়া লয়। তাহাতে আর্দ্র মাটী চাষযোগ্য বা উৎপাদনযোগ্য হইয়া থাকে। আবার নীরস মাটী সুকর্ষিত হইলে নিম্নের সঞ্চিত রস উপরে উঠিয়া ক্ষেত্রকে সরস করে, ইহারই নাম রস-সংরক্ষণ। অনেকেই সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন যখন কোন পুকুর কাটা বা কুয়া খনন করা হয়, তখন মাটীর ক্রমশঃ নিম্নের স্তরগুলি অধিক হইতে অধিকতর রসময় দেখা যায়। সুকর্ষিত চুর্ণীকৃত মাটীর ভিতর দিয়া বায়ু যখন এই রস টানিতে থাকে, তখন উহার কিয়দংশ চুর্ণীকৃত মাটীতে শোষিত বা রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং সুকর্ষিত ক্ষেত্রে বৃষ্টির অভাব হইলেও ফসল একেবারে নষ্ট হয় না।

মাটীর চূর্ণীকৃত অবস্থায় উহা বৃষ্টির জল অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়। আকর্ষিত ক্ষেত্রের জল গড়াইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সুকর্ষিত ক্ষেত্রে জল মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উহার তলদেশের স্তর গুলিতে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত উৎপন্ন উদ্ভিদেরা শিকড়াদি দ্বারা উহা সংগ্রহ করে। মাটীকে ঢেলা শূন্য ভাবে চুর্ণ করিবার জন্য harrow বা বিদের প্রয়োজন। আমাদের দেশের বিদে একসারি শলাকাযুক্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশে ৩,৪ সারি দীর্ঘ শলাকার বিদে ব্যবহৃত হয়। উহাদ্বারা সহজে এবং সুন্দররূপে মাটী চূর্ণীকৃত বা গুঁড়া হইয়া যায়।

মাটী ভালরূপ চুর্ণ না হইলে রোপিত গাছের শিকড় ইচ্ছামত প্রসারিত হইতে পায় না। তাহাতে উহাদের খাদ্য সংগ্রহে বাধা উপস্থিত হইয়া গাছগুলিকে সতেজ হইতে দেয় না, সুতরাং ফসলও আশানুরূপ হয় না। ভালরূপ চাষের জন্য তাই গভীর কর্ষণ এবং মাটীর পাট বা চুর্ণন একান্ত প্রয়োজন। এই গুলি করিবার জন্য লাঙ্গলাদির ও আবশ্যকমত উন্নতি হওয়া দরকার।

কৃষি অবহেলার এবং অশিক্ষিতের কর্ম্ম নহে। ইহার সম্বন্ধে জানিবার অনেক জিনিস আছে। যাহারা মাটীর সকল তথ্যই জানেনা, তাহারা কৃষিতে কেমন করিয়া উন্নতি আনয়ন করিবে তাহা বুঝিতে পারি না।—"চাষা"।

(ক্রমশঃ)

কৃষিক সং
রেজি সং

অশ্বগন্ধার চাষ।

—:*:—

আমরা ব্যবসায়ের মূলনীতি গুলি জানিনা এবং বুঝিনা, তাই আমাদের সকল বিষয়েই অবনতি। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া 'চা'এর চাষ লাগাইল, 'চা'এর প্রচলন স্থাপন করিল, এবং বহুবিস্তৃত 'চা'এর ব্যবসায়ে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্বাপর কিছু বিবেচনা না করিয়া আমরা অমনি অনুকরণ করিয়া ফেলিলাম। দেশের ধনীরা অনেক অর্থ 'চা'এর চাষে নিযুক্ত করিলেন; সকলেই একদিকে ছুটিলাম। আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু একটিও নূতন জিনিস আমরা আবিষ্কার করিয়া সেই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ দ্বারা নূতন আয়ের পথ স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। ইহা কি কম পরিতাপের—কম লজ্জার কথা? আমাদের শিক্ষাকে ধিক্,—আমাদের বুদ্ধিমত্তাকেও ধিক্।

উপকারিতার দিক্ দিয়া 'চা'এর চেয়ে অনেক আবশ্যকীয় এবং বেশী উপকারী জিনিস আছে; কিন্তু প্রচারাভাবে তাহারা 'চা'এর মত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এত অধিকার বিস্তার করিয়া নিজেকে প্রসারিত করিতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজ আমরা একটি জিনিসের উল্লেখ করিতেছি,—ইহা অশ্বগন্ধা। 'চা'এর মত ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইতে পারি। যথেষ্ট প্রচার হইলে ইহা 'চা'এর চেয়েও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অধিক অধিকার বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। দেশের ধনীগণ ও দেশের শিক্ষিত: 'বেকার'গণ যদি ইহার জন্য একটু চিন্তা করেন, তবে ইহার চাষের দ্বারা একটি নূতন আয়ের পথ খোলা যাইতে পারে।

অশ্বগন্ধা 'ভৈষজ্য-পরিচয়' পুস্তকের মতে বলকারক, রসায়ন এবং শুক্রবৃদ্ধিকর। ইহাতে পরিপাক শক্তি বাড়ায়, মেধা বৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের দৌর্ব্বল্য নাশ করে, শরীরের মধ্যে উত্তাপ আনয়ন করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উদ্ভিদশাস্ত্র বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে ইহার মাদকতা গুণেরও বর্ণনা দেখিতে পাই। কবিরাজেরা অশ্বগন্ধার শিকড় এবং অভাবে শাখা প্রশাখা হইতে নানাবিধ ঘৃত ও রসায়ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সে গুলিও খুব মূল্যবান ঔষধ। 'চা'এর মত ইহারও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াকে দ্রুততর করিবার, আলস্য ও ক্লান্তি দূর করিয়া নবোদ্যম আনিয়া দিবার ক্ষমতা আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে মহাশয় ইহার পাতা 'চা'এর মত শুকাইয়া পরীক্ষার্থ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের

কেমিকেল এক্‌জামিনার' বা রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার Major C. H. Bomford, D Sc., M. D., I. M. S., সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পরীক্ষান্তে তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আমরা প্রবোধ বাবুর পুস্তিকা হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

Result of Analysis.

	অশ্বগন্ধা। (Physalis flexuosa)	'চা'। (Indian tea)
Moisture ...	8.34 ...	5.83 to 6.32
Extract ...	35.96 ...	37.80 to 40.30
Ash ...	8.66 ...	5.05 to 6.02
Theine and Camellin ...	1.18 Theine (only)	1.88 to 3.24

The above comparison with the average of Iudian teas shows that the Physalis flexuosa resembles ordinary tea in composition and general properties very closely.

Sd।- C.H. Bomford.

উক্ত পরীক্ষা ফলে দেখা যায় 'চা' এবং অশ্বগন্ধার মধ্যে উপাদানগুলি একই, অধিকন্তু অশ্বগন্ধায় 'ক্যামেলিন্' উপাদানটিও আছে, কিন্তু 'চা'এ উহা নাই।

প্রবোধ বাবু নিজে 'চা' এর মত অশ্বগন্ধার পাতা-সিদ্ধ-জল নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন, 'চা' পান করিয়া ক্ষুধামান্দ্য হয়, আহারে রুচি থাকেনা, পরিপাক শক্তির অভাব হেতু শীঘ্র ভুক্ত সামগ্রী হজম হয় না, এবং ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অশ্বগন্ধা 'চা'এর মত পান করিলে এ সকল দোষ ঘটে না, বরং এতদ্বারা শরীর ও মনের দুর্ব্বলতা নষ্ট হয়, এবং শরীর বলিষ্ঠ ও নীরোগ করে। 'চা' এর মত ইহাও শরীরের মধ্যে উত্তাপ আনয়ন করিয়া কার্য্যে উৎসাহ জন্মায়। আমি পূর্ব্বে একজন বিষম 'চা'-পায়ী ছিলাম, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা-পায়ী হইয়া প্রভূত উপকার পাইয়াছি। ইহাতে আমার ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি বাড়িয়াছে।

প্রবোধ বাবু তাঁহার পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি ইহাতে 'চা' এর সমস্ত গুণই পাইয়াছেন, দোষগুলি পান নাই, আর অশ্বগন্ধার অনেকগুণও বেশী করিয়া পাইয়াছেন। অশ্বগন্ধার গন্ধ ও 'চা' এর গন্ধ হইতে অধিক রুচিকর। যথা-রীতি 'চা'এর মত দুগ্ধসহ ইহার ব্যবহার চলে। ইহার আস্বাদ 'চা' এর চেয়ে মিষ্ট, সুতরাং সুস্বাদুও বটে। তিনি নিজে ব্যবহার করিবার পর ইহার ফলাফল সম্বন্ধে "আয়র্ব্বেদীয় চা" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

অশ্বগন্ধার উপকারিতা আমাদের দেশের কবিরাজেরা ভালই জানেন। প্রচুর পাওয়া যায় না বলিয়া অশ্বগন্ধাঘটিত ঔষধাদির মূল্যও বেশী। 'বেঙ্গল কেমিকেলওয়ার্কসে'র অশ্বান অশ্বগন্ধা ঘটিত ঔষধ এবং সাধারণ টনিকের মত বল বাড়াইতে ও স্বাস্থের উন্নতি করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অশ্বগন্ধার প্রচুর উৎপাদন হইলে এতদ্‌ঘটিত আবশ্যকীয় ঔষধগুলিও সুলভ হইতে পারে, এবং তাহা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এই ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত দেশে অশ্বগন্ধা কিরূপ হিতকর এবং প্রাত্যহিক ব্যবহারেই বা কত উপকার ইহা হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে অধিক চিন্তা করিতে হইবে না।

'বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে'র কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং দেশের সুবিজ্ঞ রসায়নবিদ্‌গণ চেষ্টা করিলে, আরও কত রকমে অশ্বগন্ধার ব্যবহার হইতে পারে, তাহা দেশবাসীকে জানাইয়া ইহার উৎপাদন চেষ্টাকে উৎসাহিত করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগকে ইহা করিতে অনুরোধ করি এবং দেশে একটি নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে আশা করি। প্রবোধ বাবু বলেন ইহার পাকা ফল হইতে সুন্দর কমলালেবুর রঙের ন্যায় রঙ প্রস্তুত হইতে পারে, এবং ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে তৈলের অংশও আছে।

অশ্বগন্ধা টেপারি ও গুড়কামানি জাতীয় গাছ, ৩।৪ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে, ফলগুলি গুড়কামানির মত ক্ষুদ্র, কিন্তু টেপারির মত একটি খোসার বা আবরণের মধ্যে থাকে। শিকড় যত পুরাতন হয় ততই মোটা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গন্ধেরও তীব্রতা বাড়ে। ইহার বীজ হইতেও চারা জন্মে, এবং গাছের ডগা কাটিয়া কলমও করা চলে।

জ্যৈষ্ঠের শেষেই হাপরে বেগুণের মত ইহার চারা করিতে হয়। বীজ বপনের পর ৮।১০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। চারা একটু বড় হইলে—ছয় সাতটি পত্রযুক্ত হইলে ক্ষেত্রে রোপনযোগ্য হইয়া থাকে। গাছ খুব ঘন বসান উচিৎ নহে, অন্ততঃ ২।৩ হাত অন্তর এক একটি চারা বসিবে। রোপণকালে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু গোবর সার দেওয়া ভাল। প্রথম বৎসর এই ভাবেই ক্ষেত্রে গাছ রাখিবে, পরে দ্বিতীয় বৎসরে, পাতা সংগ্রহের জন্য হইলে, একটি অন্তর একটি করিয়া গাছ তুলিয়া ফেলিবে। বলা বাহুল্য, এই উৎপাটিত গাছের শিকড় ও ডাঁটা ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

আষাঢ়ের প্রথমে চারা ক্ষেত্রে রোপিত হইলে দুইমাস পরেই পাতা সংগ্রহের যোগ্য হইয়া থাকে। পৌষে জমিটিকে একবার কোপাইয়া এবং মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, লক্ষ্য রাখিবে যেন কোপানর সময় গাছের কোন ক্ষতি না হয়। এই সময়ে গাছগুলি একটু ছাটিয়া দেওয়া এবং প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু সার

দেওয়া ভাল। মাঘ মাসে ক্ষেত্রে একবার সেচ্ দিলে ভাল হয়। ভাদ্র হইতেই ইহার গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। পাতা সংগ্রহের জন্য গাছে ফল রাখা উচিৎ নহে, উহাতে পাতার গুণ কমিয়া যায়। বীজ সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রপ্রান্তস্থ কয়েকটিমাত্র গাছে ফল রাখিলেই চলে, অন্যগুলির ফল ভাঙ্গিয়া দিলে পাতা সংগ্রহ ভাল হইবে। তবে যদি কেহ রঙ্ এবং তৈল নিস্কাসন করিতে চাহেন, তিনি অবশ্য ফল রক্ষা করিবেন। কিন্তু পাতার সংগ্রহ এবং ব্যবসায় যাঁহার লক্ষ্য হইবে তিনি ফল রাখিবেন না।

পাতাসংগ্রহ। 'চা' এর গাছ বীজ বপনের পর অন্যূন তিন বৎসরের মধ্যে পাতা ভাঙ্গিবার উপযোগী হয় না, কিন্তু অশ্বগন্ধার গাছ বীজ বপনের পর তিন চারিমাসের মধ্যে পাতা ভাঙ্গিবার যোগ্য হইয়া থাকে। শ্রাবণের শেষ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর এক একবার পাতা ভাঙ্গা চলিবে; তারপর বেশী শীতের সময় গাছকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার হয়। পুনরায় মাঘের শেষ বা ফাল্গুন হইতে আবার পাতা সংগ্রহ চলিতে পারে। তবে এই সময় একটু বেশীদিন অন্তর পাতাভাঙ্গা কর্ত্তব্য, এবং মাঝে মাঝে সেচ্ দিলে ভাল হয়; কারণ এ সময়ে মাটীর রস কম থাকে বলিয়া বড় এবং বেশী পাতা বাহির হয় না। দ্বিতীয় বৎসরে গাছগুলি একটু বড় হইয়া থাকে বলিয়া প্রথম বৎসরাপেক্ষা অধিক পাতা দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বর্ষাকালটিই পাতা সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময়, ইহাকেই পাতা সংগ্রহের Season বা কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে।

জনসাধারণ নানা ব্যাধির জন্য অথবা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অল্পব্যয়ে এই পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজন মত চাষ করিলে অল্পব্যয়ে এই পত্র ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারেন, খরচ 'চা'এর চেয়ে অনেক কম হইবে। কচি পাতা হইতেই ব্যবহারোপযোগী শুষ্কপত্র বা পেয় অশ্বগন্ধা ভাল উৎপন্ন হয় পাকা পাতা মোটা এবং অধিক ছিব্ড়াযুক্ত হইয়া থাকে। পাকাপাতার রসাংশ শিরাতে চলিয়া যায়, এবং উহাতে ash বা ভস্মের অংশ বাড়িয়া থাকে। গরম-জলে 'চা'এর মত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে হইলে, শিরাগুলি শীঘ্র সিদ্ধ হয় না বলিয়া, পাকাপাতা হইতে বেশী গুণ পাওয়া যায় না। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে অধিক পরিমাণে কোমল এবং অল্প শিরযুক্ত পাতা সংগৃহীত হইতে পারে।

গাছের আগার দিকের ডগা সমেত ৩টি করিয়া পাতা ভাঙ্গিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহা হইতে উত্তম পেয়-অশ্বগন্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে।তন্নিম্নের পাতা হইতে মধ্যম প্রকার পেয়-অশ্বগন্ধা জন্মে। সংগ্রহকালে ভাঙ্গা পাতায় রৌদ্র না লাগে, তজ্জন্য সংগ্রহকারী একটা কাপড়ের ঝোলার মধ্যে ভাঙ্গাপাতা সংগৃহীত করিবেন। তারপর ঘরের মধ্যে কাপড়ের বা পরিষ্কৃত মেজের উপর, যেখানে রৌদ্র নাই অথচ বেশ বায়ু আছে, এমন স্থানে পাতাগুলি বিছাইয়া একটু আমলাইয়া লইতে হয়—পাতাগুলির কচ্‌কচে ভাব

দূর করিয়া লইতে হয়—একটু নরম করিয়া লইতে হয়। এই সময়ে কাঁচি দ্বারা প্রত্যেক পাতা ২।৩ টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইলে শীঘ্র আম্‌লান হয়। আম্‌লান হইল কি'না পরীক্ষার জন্য কয়েকটি পত্রখণ্ড মুঠার মধ্যে পুরিয়া দেখিবে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কি না, যদি না ভাঙ্গে অথচ পাতাগুলি একটু বিবর্ণ বোধ হয়, জানিবে উহা ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে।

এইবার পাতাগুলি ডলিতে হইবে। অ-মসৃণ তক্তার উপর ডলাই কার্য্য ভাল হয়। লক্ষ্য রাখিবে যেন অধিক চাপ দিয়া রস বাহির না হয়। রস টানিয়া যাইবার পরই ডলাইএর কাজ হইয়া থাকে। ডলিয়া পাতাগুলিকে সঙ্কুচিত—দেখিতে শাক ভাজার মত করিবে। তারপর উহাদিগকে স্তূপাকারে সাজাইয়া একখানী ভিজা কাপড় চাপা দিয়া রাখিবে। ইহাতে উহার মধ্যে উত্তাপ জন্মিয়া পাতাগুলিকে ভাব্‌নাইয়া দেয়—বর্ণ একটু কাল হইয়া যায়। বর্ষাকালে ভিজা কাপড় ঢাকা না দিয়া কম্বল দিয়া ঢাকা ভাল, তাহাতে শীঘ্র ভাব্‌নের কাজ হয়। সমস্ত পাতাগুলি ভাব্‌নাইয়া গেলে স্তূপ ভাঙ্গিয়া উহাদিগকে আবার বিছাইয়া দিবে ও বাতাস লাগিতে দিবে। এই সময়ে একটি সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়, পাতাগুলিও একটু বেশী কাল হয়।

পরে পাতাগুলি ছায়ায় শুকাইয়া—রস মরিয়া একটু ঝুরা ঝুরা হইলে, উহাকে ভাজিয়া লইতে হয়। অল্প আগুণের তাপে ঘন ঘন নাড়িয়া পাতাগুলি ভাজিয়া লইলে পর, কয়েকদিন ছায়াতে এবং শিশিরে বিছাইয়া রাখিয়া, পরে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। এখন ইহা গরমজলে 'চা'এর মত সিদ্ধ করিয়া পান করা চলিবে। ভাজার পর পাতা-গুলির বর্ণ কৃষ্ণাভাযুক্ত—প্রায় 'চা'এর মত দেখিতে হয়। বলা বাহুল্য, 'চা' প্রস্তুতের প্রণালীতেই অশ্বগন্ধার পাতাও প্রস্তুত করা হয়।

যদি কেহ এইরূপে পাতা প্রস্তুত করিয়া পুনরায় কোন রাসায়নিকের নিকটে পরীক্ষা করাইয়া ব্যবহার করেন, আমরা আশাকরি তিনি তাঁহার ফলাফল পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া ইহার উৎপাদন চেষ্টাকে আরও উৎসাহিত এবং এই নূতন আবিষ্কারের সমর্থন করিবেন। এই প্রকারেই আমাদের এই নূতন ব্যবসায়টির প্রতিষ্ঠা হইবে।

প্রবোধ বাবুর মতে এক আনা খরচে একসের অশ্বগন্ধা পাতা প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু ওই পরিমাণ 'চা'এর মূল্য ২।৩ টাকা। আমরা বলি, প্রায় ২।৩ আনা খরচে ২।৩ টাকার 'চা'এর সমান পাতা প্রস্তুত হইবে। আশাকরি দেশের লোকের এদিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইবে।

গুড় ও চিনি।

—:০:—

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গুড় ও চিনি এদেশে যেরূপ সুলভ ছিল, সে কথা এখন স্বপ্নের মত অলীক বলিয়াই অনেকের নিকট প্রতীত হইবে। পূর্ব্বে যখন দুই আনা গুড়ের সের বা পাঁচ টাকা গুড়ের মণ ছিল, তখন অনেক লোকই অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করিতে সমর্থ না হইলেও ইচ্ছামত গুড় ব্যবহার করিতে পারিত। গুড় সুলভ ছিল বলিয়া মিছরি, চিনি এবং পাটালি প্রভৃতিও সুলভ ছিল। এখন গুড়ের দর অত্যন্ত অধিক হওয়ায় চিনি, মিছরি, বাতাসা এবং মুড়কি প্রভৃতিরও দর অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। তখনকার কালে এক পয়সার মুড়কি কিনিয়া খাইলে একটা লোকের পেট ভরিয়া যাইত। এখন এক পয়সার মুড়কি এক মুঠা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। চিনি মিছরি প্রভৃতির দর ও তদ্রূপ অত্যন্ত অধিক। পনর কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও চারি আনা করিয়া মিছরির সের এবং তিন আনা করিয়া চিনির সের ছিল। ক্রমে মিছরি ও চিনির সের এক টাকা এবং এক টাকার অধিকও হইয়াছিল। গুড়ের সের প্রায় আট আনায় চড়িয়াছিল। এখনও গুড়ের সের অনেক স্থলে খুচরা ছয় আনারও অধিক। কেন এমন হইল?

গুড় কি এদেশে এখন অত্যন্ত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে? অথবা, এদেশজাত গুড়ের বিদেশে রপ্তানী অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে? অথবা গুড়ের ব্যবহার এক্ষণে এদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে? সুগার-বুরোর সেক্রেটারী মিঃ উইনি সেয়ার এদেশজাত চিনির বাণিজ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা-সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন,—তাহাতে প্রকাশ ১৯২১-২২ সালের প্রথমাংশে ভারতে ইক্ষু এবং তাল বা খর্জ্জুর গুড় ব্যবহারোপযোগী রূপে পাওয়া গিয়াছিল পঁচিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচ শত টন। এক টন প্রায় ২৭ মণ। ইহার পূর্ব্ব বৎসর এই সময় পাওয়া গিয়াছিল ২৪,৪৮০০০ চব্বিশ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার টন। এই বৎসর গুড় মোট উৎপন্ন হইয়াছিল ২৮,৭৫-৩০০ আটাইশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিন শত টন। ইহার অধিকাংশই বর্ত্তমান বৎসরে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইতে পারিবে বলিয়াই উইনি সেয়ার সাহেবের ধারণা। আলোচ্য বৎসরে এদেশে উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ উপরি-উক্তরূপ হওয়ায় বিদেশ হইতে বিদেশীয় চিনির আমদানী এদেশে হ্রাস পাইবারও অনুমান তিনি করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুগত্যা এদেশে বৈদেশিক চিনি বা গুড় আমদানী যে কেবলমাত্র সমুদ্র পারবর্ত্তী সুদূর ইউরোপ প্রভৃতি হইতে হইয়া থাকে, তাহা নহে,—ভারতের প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশসমূহ

হইতেও এদেশে গুড় আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২১-২২ সালে ভারতের প্রান্তবর্ত্তী দেশ হইতে মোট ৫৪১ পাঁচ শত একচল্লিশ টন গুড় আমদানী হইয়াছিল; ইহার পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৫২৪ টন। এদেশের উৎপন্ন গুড় ত আছেই,—তাহার উপর বিদেশ হইতে গুড়ও এদেশে আমদানী হইয়া থাকে; তথাপি গুড়ের বা চিনি প্রভৃতির দর হ্রাস না পাইবার হেতু কি? ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, এদেশ হইতে বিদেশে গুড়ের রপ্তানীও প্রচুর হইয়া থাকে। সমুদ্র পথে ইউনাইটেডকিংডম, সিংহল এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে এ দেশীয় গুড়ের রপ্তানী আপাততঃ অল্প পরিমাণে হইলেও স্থল পথে ভারতজাত গুড়ের রপ্তানী প্রচুর হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে এইরূপে ৮৭৩০ টন গুড় এদেশ হইতে স্থলপথে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার মূল্য ২৮,২৬,৩১৯৲ টাকা; ইহার পূর্ব্ব বৎসর রপ্তানী হইয়াছিল ৮৮০৩ টন; ইহার মূল্য ৩০,৯৯,৬৬৯৲ টাকা। সুতরাং এ দেশে গুড়ের টান যে বারো মাসই লাগিয়া থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

উইনি সেয়ার সাহেবের হিসাবে ভারতের কারখানা সমূহে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টন মাৎ গুড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। তথাপি বিদেশ হইতেও এই গুড় এদেশে প্রচুর আমদানী হয়। ১৯২২-২৩ সালে ভারতে সমুদ্র পথে ৬০ হাজার ৮ শত ৭১ টন গুড় আমদানী হইয়াছিল; ১৯২১-২২ সালে আসিয়াছিল ৬৪ হাজার ৩ শত ৫৭ টন এবং ১৯২০-২১ সালে আসিয়াছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত ২৪ টন। ১৯২১-২২ সালে আমদানী গুড়ের মোট মূল্য ৪২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬ শত ৭২ টাকা; ১৯২১-২২ সালে আমদানী গুড়ের মূল্য ৪৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪ শত ৭৩ টাকা এবং ১৯২০-২১ সালে আমদানী গুড়ের মূল্য ১ কোটি ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৭ শত ৯০ টাকা। উইনি সাহেব বলিতেছেন,—এই সকল গুড়ের অধিকাংশই এদেশে মদ তৈয়ারি এবং তামাক মাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিনির মূল্য গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর কিছু অল্প ছিল বটে, কিন্তু মূল্য যে বিশেষ সস্তা নহে, তাহা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি। ১৯২১ সালে ভারতে মোট ৩১টী কারখানায় ৭৭ হাজার ৬ শত ২৮ টন চিনি কলে উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর সাড়ে চারি হাজার টন চিনি অধিক উৎপন্ন হইয়াছিল। এই চিনি ১৯২২-২৩ সালে ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়াছিল। দেশী প্রণালীতে আলোচ্য বৎসরে ৪০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে বলিয়াই উইনি সেয়ার সাহেবের ধারণা; কিন্তু ১৯১৯—১৯২০ সালে দেশীয় প্রণালীতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টন। সুতরাং উইনি সেয়ার সাহেবের মতে আলোচ্য বৎসরে এদেশে মোট চিনির পরিমাণ ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত টন। ইহার কতকাংশ এসিয়াটিক তুরস্কে—মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, আরব, সিংহল, কেনিয়া উপনিবেশ,

জাঞ্জিবার এবং পেম্বায় রপ্তানী হইয়াছিল। তবে আলোচ্য বৎসরে এই সকল দেশে রপ্তানী চিনির পরিমাণ ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক অল্প। ১৯২০-২১ সালে মোট ৩ হাজার ৬ শত ১৪ টন চিনি ঐ সকল দেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার মোট মূল্য ৩১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৮ টাকা। ১৯২১-২২ সালে রপ্তানী হইয়াছিল ১ হাজার ২ শত ৫০ টন; মূল্য ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭ শত ৩৯ টাকা; আর ১৯২২-২৩ সালে রপ্তানী হইয়াছিল মোট ৪ শত ৫৬ টন; মোট মূল্য ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫ শত ৫৬ টাকা। কিন্তু এইরূপ রপ্তানীর মাত্রা আলোচ্য বৎসরে এত কমিলেও এদেশে চিনির দর ত তেমন হ্রাস পায় নাই!

উইনি সেয়ার সাহেব বলিতেছেন, ভারতে যে পরিমাণ চিনি এক্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ভারতে ব্যবহারের পক্ষে সুপ্রচুর নহে, কাজেই বিদেশ হইতে ভারতকে প্রতি বৎসর প্রচুর চিনি আমদানী করিতে হইয়া থাকে। জাভা, মরিশস এবং ইউরোপ মহাদেশ হইতেই প্রচুর চিনির আমদানী হয়। ভারতে যে পরিমাণ চিনি আমদানী হইয়া থাকে, তাহার শতকরা ৮৪ ভাগ এক জাভাই সরবরাহ করে; মরিশস্ যোগায় শতকরা ৭ ভাগ আর অবশিষ্ট ৯ ভাগ সরবরাহ করে—ইউরোপ মহাদেশ, আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটস, চীন, মিশর, জাপান এবং অন্যান্য দেশ। জাভা—মায় ষ্ট্রেটস্‌সেটল্‌মেণ্ট হইতে ১৯২১-২২ সালে চিনি আমদানী হইয়াছিল মোট ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৪ শত টন; কিন্তু ১৯২২-২৩ সালে আমদানী হইয়াছিল মোট ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭ শত টন ইহার ভিতর আলোচ্য বৎসরে বঙ্গদেশে জাভা চিনির আমদানী হইয়াছিল মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৬ শত ৪২ টন; বোম্বাই পাইয়াছিল ১ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ১৪ টন; করাচী ৮৬ হাজার ২ শত টন; ব্রহ্মদেশ ২২ হাজার ৭ শত টন এবং মান্দ্রাজ ৮ হাজার ৭ শত টন। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশেই এ বৎসর জাভা চিনির আমদানী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। মরিশস্ হইতে আলোচ্য বৎসরে আমদানী চিনির পরিমাণ কিছু কম হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে এদেশে মরিশস চিনি মোট আসিয়াছিল ৩১ হাজার ৪ শত টন; ইহার পূর্ব্ব বৎসর আমদানী হইয়াছিল ৬১ হাজার ৬ শত টন। উইনি সাহেব বলেন,—মরিশস চিনির আদর ইউনাইটেড কিংডমে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ভারতে এই চিনির আমদানী কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে; ক্রমে ইংলণ্ডের দিকেই মরিশস চিনির রপ্তানী অধিকতর হইবারই সম্ভাবনা বলিয়া উইনি সাহেবের অনুমান। ভারতে আলোচ্য বৎসরে যে পরিমাণ মরিশস চিনির আমদানী হইয়াছিল, তাহার শতকরা ৭২ ভাগ বোম্বাই প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছে আর বঙ্গদেশ লইয়াছে মাত্র ২৭ ভাগ। ১৯২২-২৩ সালে জর্ম্মণী, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়ম এবং পোলাণ্ড হইতে মোট ১৬ হাজার ৬ শত টন বিট চিনি আমদানী হইয়াছিল; ১৯২১-২২ সালে আসিয়াছিল মোট ১৩ হাজার ৭ শত টন। আমেরিকায় ইউনাইটেডষ্টেটস্ হইতে এ

বৎসর মোট কিউবা চিনি আমদানী হইয়াছিল ১০ হাজার ৩ শত টন। বৎসরের প্রথম ভাগেই এই চিনির অধিকাংশ আমদানী হইয়াছিল; কেবলমাত্র ৩ শত টন আগষ্ট মাসে আসিয়াছিল। ইহা হইল সমুদ্রপারবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে ভারতে আমদানী চিনির মোটামুটি হিসাব। ইহার উপর ভারতের সীমান্তবর্ত্তি রাজ্যসমূহ হইতেও চিনি আমদানী হইয়া থাকে।

ভারতে আমদানী বৈদেশিক পরিশ্রুত চিনির কতকাংশ আবার ভারত হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানীও হইয়া থাকে। ১৯২২-২৩ সালে ইষ্টনাইটেড কিংডমে এইরূপ ভাবে ১৫ হাজার ৭ শত ৮ টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল। এসিয়াটিক তুরস্ক লইয়াছিল ১৩ হাজার ৩০ টন।

ইহা ব্যতীত কেনিয়া উপনিবেশ এবং এসিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশেও এই চিনির রপ্তানী হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে রপ্তানী চিনির পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে দাঁড়াইয়াছিল, মোট ৬২ হাজার ৯ শত ৮২০টন; মোট মূল্য ২ কোটী ৬২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩ শত ৪৮ টাকা; ১৯২১-২২ সালে রপ্তানী হইয়াছিল মোট ৩২ হাজার ৫ শত ৯৫ টন; মোট মূল্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৯৬ টাকা এবং ১৯২০-২১ সালে রপ্তানী হইয়াছিল মোট ৭৩ হাজার ৬ শত ৩১ টন; মূল্য ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৯ শত ৫৩ টাকা। ভারতে খাস উৎপন্ন চিনি ত আছেই, তাহার উপর রপ্তানী বৈদেশিক চিনিও আছে,—অথচ ভারতে চিনির সের সময়ে সময়ে এক টাকা আঠার আনায়ও উঠিয়াছিল। ভারতের অদৃষ্ট অধুনা এমনই বিরূপ।

১৯২২ সালের ১লা এপ্রেল তারিখে কলিকাতা, বোম্বাই এবং করাচী এই তিনটী প্রধান বন্দরে মোট ৯৪ হজোর টন চিনি মজুত ছিল; ১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই তিনটী বন্দরে মজুত চিনির পরিমাণ ছিল মোট প্রায় ৬৮ হাজার ৫ শত টন। আলোচ্য বৎসরে মোট ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ শত টন চিনি ব্যবহারের জন্য মজুত ছিল; যথা,—

১৯২২ সালের ১লা এপ্রেল মজুত	৯৪,০০৯	টন।
ভারতে উৎপন্ন চিনি	১,১৭,৬০০	”
সমুদ্রপথে আমদানী	৪,৪২,৪০০	”
স্থলপথে আমদানী	২	”
	মোট ৬,৫৪,০০২ টন।	
বাদ,—		
সমুদ্রপথে পুনঃ রপ্তানী		
বৈদেশিক চিনি	৬১,৯৬২	টন
ভারতজাত চিনি জলপথে রপ্তানী	৪৫৬	”
” ” স্থলপথে ”	৬,৬৬৮	”
১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ মজুত	৬৭,৫০০	”
	মোট ১,৩৮,৫৮৬ টন।	

সুতরাং ব্যবহারের উপযোগী মোট চিনি পাওয়া যাইতেছে পাঁচলক্ষ পনের হাজার চারি শত টন। যাহাতে ভারতে এক্ষণে ইক্ষুচাষ বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে, যাহাতে সাময়িক খর্জ্জুরসও এদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ যাহাতে এক্ষণে গুড় এবং চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য এদেশের হিতৈষী ব্যক্তিবর্গেরই বিশেষ করিয়া চিন্তা এবং পর্য্যালোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এদেশের যে সকল ব্যক্তির চাষের দিকে ঝোঁক আছে এবং চাষ করিবার মত অর্থসামর্থ্যও আছে, তাঁহাদের এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা খুব উচিত। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ইক্ষু চাষের উন্নতির দিকে দৃষ্টি আছে বটে, বিভিন্ন আদর্শ সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু চাষের পরীক্ষাদিও হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লীগ্রামের সাধারণ কৃষকগণের কার্য্যতঃ কিছু উপকার ঘটিতেছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। কৃষি বিভাগের জন্য রাশি রাশি টাকা অনর্থক ব্যয় না করিয়া যাহাতে এই বিভাগের ইক্ষু পরীক্ষাদির ফলে এদেশের লোকের প্রকৃত উপকার হয়, সেই চিন্তা এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করাই এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

—বঙ্গবাসী।

বিদেশে ভারতীয় কলার রপ্তানীর ব্যবসায়।

—:০:—

লৌহ ও অম্লের ভাগ থাকায় পরিপাকের সহায়তা ও পুষ্টিসাধন কল্পে কলা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এমন কি নাতিশীতোষ্ণপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশের লোকেরাও ইহার আদর করিয়া থাকেন। কলা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং সম্পূর্ণ পুষ্ট হইবার কিছু পূর্ব্ব অবস্থায় বিদেশে রপ্তানির জন্য ইহাদিগকে সংগ্রহ করা হয়, কারণ ইহা অধিক দিন তাজা অবস্থায় থাকিতে পারেনা। ইটালী, স্পেন এবং পর্টুগাল প্রভৃতি দেশ সকল হইতে মধ্য ইউরোপে এবং উত্তরস্থ নরওয়ে, সুইডেন ও ফীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহার রপ্তানি হয়, এবং তত্রস্থ লোকেরা ইহাকে দুষ্প্রাপ্য সুখাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ আমেরিকায় গ্রীষ্ম মণ্ডল প্রদেশ হইতে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল প্রদেশেও ইহার রপ্তানি হইয়া

থাকে। কিন্তু দক্ষিণ চায়না ও ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত ব্যবসায় হিসাবে বিদেশে ইহার রপ্তানি করিতে পারে নাই। ইহার প্রথম কারণ, এসিয়ার উত্তরস্থ দেশ সমূহে পাঠাইবার অসুবিধা এবং দ্বিতীয় কারণ অধিকদিন তাজা না থাকার জন্য সুদূর পূর্ব্ব এবং পশ্চিম প্রদেশে রপ্তানির অসুবিধা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এপর্য্যন্ত এই সকল অসুবিধার প্রতীকার কল্পে কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হয়েন নাই।

কলার খোসা বাদ দিয়া শুকাইয়া বিদেশে পাঠাইতে পারিলে ইহার ভারের অর্দ্ধেক লাঘব হয়, এবং বিদেশে পাঠাইতে খরচাও কম পড়ে। কিন্তু এই কার্য্যে একটী অসুবিধাও আছে। কলায় Iron ও অম্লের (acid) ভাগ থাকায় বায়ু সংযোগে বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত উহাদের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ইহার শুভ্রত্বের নাশ হইয়া ইহা এক প্রকার বিকৃত বর্ণ ধারণ করে। ইউরোপীয় মহিলাগণ খাদ্য বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া ইহা উপকারী খাদ্য হইলেও বর্ণ বিকৃত এবং মলিন হওয়ার জন্য তাহাদের রুচীকর পছন্দসই সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত এবং আদরণীয় হয় না। সুতরাং যাহাতে খোসা ছাড়াইয়া শুষ্ক করিবার সময় ইহার শুভ্রত্বের নাশ না হয়, এরূপ কোন সহজ ও অল্পব্যয় সাপেক্ষ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিলে ইহা যে একটী লাভজনক ব্যবসায় হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে ইহার একটী প্রণালী বিবৃত করিলাম।

যখন বুঝা গেল যে বায়ুর অক্সিজেন ইহার শুভ্রত্বনাশের কারণ, অথচ বায়ুর সাহায্য ব্যতিত ইহাকে শুকান কঠিন, তখন বায়ুকে এরূপ উপাদানের সহিত মিশ্রিত করা আবশ্যক যাহাতে ইহার অক্সিজেনের রাসায়নিক ভাবান্তর হয়। গন্ধক জ্বালান ধুমের সহিত বায়ুর সংমিশ্রণে রাসায়নিক সংযোগে বায়ুস্থ অক্সিজেন ও গন্ধকে সলফিউরস এসিড (Sulphurous acid) উৎপন্ন করে। এই সলফিউরস্ এসিড (Sulphuoroush acid) বিশুদ্ধ রোগের বীজ ও দুর্গন্ধ নাশক এবং সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ইহা খাদ্য দ্রব্যে অধিকক্ষণ স্থায়ী না হইয়া শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয়। বায়ুস্থ অক্সিজেন (Oxygen), সলফার (Sulphur) সংমিশ্রনে সলফিউরিক এসিড (Sulphuric acid)এ পরিণত হয়, বায়ুস্থ নাইট্রোজেন (Nitrogen) ও এই সলফিউরস এসিড (Sulphurous acid) একত্রে খোসা ছাড়ান কলার গায়ে লাগিলে আর Oxidation বা কলার লোহাভাগের সহিত বায়ুর অক্সিজেন(Oxygen)ভাগের রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে না, এবং ইহাকে শুভ্র রাখিয়া শীঘ্র শুকাইয়া দিবে। পক্ষান্তরে যদি এই বায়ুকে জলন্ত গন্ধকজাত ধুমের মধ্য দিয়া আসিবার পূর্ব্বে, (burnt lime) দগ্ধ চুণের মধ্য দিয়া আনা হয়, তবে সেই চুণ বায়ুর জলীয় অংশ গ্রহণ করিয়া উহাকে একেবারে শুষ্ক করিয়া দিবে। ইহাতে বায়ুর কলার রস টানিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

প্রণালী। একটী লৌহপাত নির্ম্মিত মুখখোলা লম্বা বাক্সকে কতিপয় লৌহবার নির্ম্মিত

এবং তলদেশে অল্পউত্তাপ বিশিষ্ট অগ্নি রক্ষিত পাত্রের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। ঐ বাক্সের উপরিভাগে সরু ২ কতিপয় তক্তা লম্বালম্বি রাখিয়া তাহার গায় পেরেক মারিয়া সেই পেরেকের সহিত ছাল ছাড়ান কলা সুতা দিয়া ঝুলাইবে। বলা বাহুল্য ছাল ছাড়ানর পর অবিলম্বে ইহার গায়ে বাতাস লাগিয়া উহার বর্ণকে বিকৃত করিবার পূর্ব্বেই কলাগুলি বাক্সের মধ্যে ঝুলান দরকার। বায়ু প্রথমে একটী দগ্ধ চুণের ঘরের ভিতর দিয়া শুষ্ক হইয়া আসিয়া পরে এমন একটী লম্বা ঘরের মধ্য দিয়া চালিত হইবে যাহার নীচে গন্ধক (Sulphur) জ্বালান হইতেছে। অনন্তর উত্তপ্ত সল্‌ফিউরস অ্যাসিড (Sulphurous acid) ও নাইট্রোজেনে বিভক্ত হইয়া একটী উপরের বাক্সের গায়ে লাগান নলের মধ্য দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে ও কলার গায়ে লাগিয়া উহাকে শুকাইয়া উপরের তক্তাগুলির ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। ইহাতে কলার স্বাভাবিক শ্বেত বর্ণের বৈলক্ষণ্য ঘটিবেনা বরং কথিত বায়ুর রোগবীজনাশক গুণ থাকায়, কলার স্বাস্থ্যকর গুণের বৃদ্ধি সাধন করিবে। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে ঐ কলা শুকাইবার বাক্সের মধ্যস্থিত উত্তাপ ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হইতে ৮০ ডিগ্রির মধ্যে থাকে, অধিক না হয়। ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে বাক্সের মধ্যস্থ বায়ুর Oxygen ভাগ সর্ব্বতোভাবে গন্ধক বাষ্পের সহিত মিলিয়া রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা (Sulphurous acid) এ পরিণত হয়। এইরূপে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ঐ বাক্সের কলাগুলি শুকাইয়া যাইবে। তখন উহা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত শর্করার সহিত মিশাইয়া উত্তম ও বিশুদ্ধ টিসু (tissue) কাগজে জড়াইয়া বাক্সে পূরিয়া বিদেশে রপ্তানি করিলে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় হইতে পারে।

শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

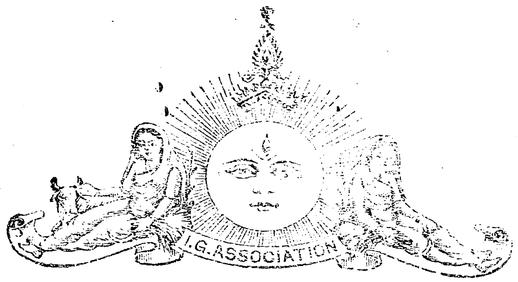

কৃষক, ফাল্গুন, ১৩৩০।

বঙ্গীয় কৃষক, কৃষি এবং পল্লীর উন্নতি।

—:※:—

কৃষকের এবং সেই সঙ্গে কৃষি ও পল্লীর উন্নতি সাধন আজকাল সমগ্র দেশের একটা আলোচনার জিনিস হইয়া পড়িয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে একটা সুসংবাদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় ২৮ বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতীয় কৃষি সমিতি' এই উদ্দেশ্য লইয়া দেশের মধ্যে প্রথমে কৃষক ও কৃষির উন্নতি সাধনে অগ্রসর হন। বর্ত্তমানের এই সম্বন্ধীয় যাবতীয় আন্দোলন উক্ত কৃষি সমিতির এই সুদীর্ঘ আটাইশ বৎসরের আলোচনার ফল, একথা মনে করা এখন নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। আমরা দেশব্যাপী এই প্রকার আলোচনার পক্ষপাতী, তাই আজ পঁচিশ বৎসর কাল ওই কথাই দেশকে শুনাইয়া আসিতেছি। দেশের মর্ম্মস্থলে যে আমাদের আহ্বান পৌঁছিয়াছে, দেশে যে একটা সাড়া পড়িয়াছে, জাতির জীবনে একটা স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, সকলেই এখন 'গ্রামে চল, মাঠে চল' 'Back to the lands' বলিতেছেন, সত্যই ইহা আমাদের নিকট সুসংবাদ। আমরা বরাবরই তাই বলিয়া আসিয়াছি যে ইহা ব্যতীত এদেশের অন্নসমস্যার মিমাংসা হইতে পারে না। সুতরাং এতদুদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে যতই কেন সভা সমিতি স্থাপিত হউক না, ভারতীয় কৃষি সমিতিই সকলের অগ্রনী।

গতবারে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে সম্প্রতি আমাদের 'বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা'র একটী সম্মিলনে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সভার সহিত কিছুকাল পূর্ব্বে

'ভারতীয় কৃষি সমিতি'র সহযোগিতা ছিল। মধ্যে কিছুকাল আমরা এই আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কথা শুনি নাই। বর্ত্তমানে এই আন্দোলনের সজীবতা দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই সভার উদ্দেশ্য 'বঙ্গীয় কৃষিজীবিদিগের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান এবং তাহাদের ও অন্যান্য পল্লীবাসীগণের পরস্পরের মধ্যে সহযোগীতা এবং 'প্রীতি বর্দ্ধন'। আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, সভার উদ্দেশ্য মহৎ এবং ইহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সভা যে ১৮টী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা আজ তাহার সম্যক আলোচনা করিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, উহার মধ্যে জমীদার ও প্রজার মধ্যস্থিত মনোমালিন্যের প্রতিকার এবং পল্লীপঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন, সমবায়ের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ও নীতিশিক্ষাদি প্রচার, অন্যান্য কৃষি এবং হিতকর প্রতিষ্ঠানাদির সহিত সহযোগিতা এবং এতদুদ্দেশ্যে একখানী নূতন বাংলা সংবাদপত্রপ্রচার ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি প্রস্তাব নির্দ্দিষ্ট আছে।

বঙ্গীয় রায়ত গণের উন্নতি বিধান কল্পে মাননীয় ব্যারিষ্টার এবং জমীদার সৈয়দ এরফান্ আলি সাহেব বহুদিন হইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহা জানি। এই উদ্দেশ্য তিনি "রায়ত বন্ধু" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার ও করিয়া থাকেন। এই পত্রখানী ছাপাখানার গোলমালে কিছুদিন বন্ধ থাকিলেও, আমরা শুনিলাম, শীঘ্রই কাগজ খানা পুনঃ প্রকাশিত হইবে। 'কৃষক'ও এদেশের কৃষি এবং শিল্পোন্নতি সম্বন্ধীয় নানা তথ্যের আলোচনা এবং প্রচার করিয়া থাকেন। 'ভাণ্ডারে'ও দেশের দারিদ্রসমস্যার যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, যখন মাননীয় সৈয়দ এরফান্ আলি সাহেবও এই সভার সম্পাদক গণের মধ্যে একজন, তখন সভার পক্ষ হইতে আর একখানী নূতন সংবাদপত্র প্রচারের চেষ্টা না করিয়া, সঙ্ঘের সমস্ত শক্তি কৃষি ও শিল্পোন্নতি এবং অন্যান্য পল্লীহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিলে অধিক ফলদায়ক হইবে। সভার পল্লীভাণ্ডার গঠন ও অন্যান্য কার্য্য পদ্ধতির মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলন ও একটি উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। এ কার্য্যে—ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন—বিশেষ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। আমরা এই প্রকার অনেক অনুষ্ঠানের আরম্ভ এবং অর্থাভাবে অচিরেই তাহাদের শেষও দেখিয়াছি। তাই বলিতে ছিলাম, আরও একখানী নূতন সংবাদপত্র প্রচারের চেষ্টা অপেক্ষা এই দিকেই অধিক শক্তি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার প্রচার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। শিক্ষার বিস্তৃতি প্রয়োজন মত না হইলে সংবাদপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং প্রথমে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসারণ সাধন করা হউক, পরে প্রয়োজন হইলে, সংবাদপত্রের প্রচার করিলে ফল ভালই হইবে। প্রত্যেক একশত অধিবাসী সম্পন্ন পল্লীতে একটি করিয়া উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা প্রয়োজন। ঐ

সকল বিদ্যালয়ে কৃষি ও শিল্প বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। শরীর পালনের সাধারণ নীতিগুলি এবং দেশের ভৌগোলিক জ্ঞান সকলেরই কিছু কিছু থাকা দরকার। এই গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার প্রসারণ হইলে, পল্লীর ছেলেরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীকে ভালবাসিতে, উহার অসুবিধা দূর করিয়া সুবিধা বাড়াইবার, চেষ্টা করিতে এবং কৃষি ও কুটীর-শিল্প সম্ভাবের বৃদ্ধি দ্বারা আপনাদের স্বচ্ছলতা বাড়াইতে শিখিবে।

আমাদের মনে হয় পল্লীগঠন কার্য্যে জমীদারদিগের সাহায্য প্রথমেই প্রয়োজন। তাঁহারা যদি আপাততঃ অত্যধিক সেলামী আদায়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, ম্যাট্রিকুলেশণ বা ইমটারমিডিয়েট্ পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সকল ছেলেরা চাকরীর চেষ্টায় পথে পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের সুদূর পল্লীঅঞ্চলে কিছু কিছু জমী দিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তাহাদেরই দ্বারা সুলভে শিক্ষাপ্রচারের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পল্লীগঠন কার্য্যটির কল্পনা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। আমরা এমন অনেক পল্লীর সংবাদ রাখি যেখানে আদৌ শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস নাই, মোটেই রাস্তাঘাট নাই, দূরবর্ত্তী নগরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা সহজে হয় না, ইত্যাদি। ঐ সকল অঞ্চলে জমীদারের সাহায্য না পাইলে, বা খৃষ্টান মিশনারীগণের মত ধনীসঙ্ঘের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যাইতে এবং স্থায়ি হইতে ইচ্ছা করেন না। কেননা, তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তি অপরের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে, নিজেদের অভাব মোচন এবং সাধারণ পল্লীবাসীর উপকার সাধন—এই দু'টী কাজ একসঙ্গে করিবার সামর্থ্য রাখে না। হয় জমীদারগণের সহায়তা, নতুবা কোন ধনীসঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা,—দুইটির একটি নিতান্তপক্ষে প্রয়োজন। খৃষ্টান মিশনারীগণের শিক্ষাপ্রচার কার্য্যটির দিকে আমর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ওই প্রকারের শিক্ষামিশন, স্বাস্থ্যমিশন, কৃষিমিশন, শিল্পমিশন, ব্যবসায়মিশন প্রভৃতি গঠন করিয়া উহাদের সাহায্যে পল্লীসংস্কার সাধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে জমীদারেরা ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, চাকরান প্রভৃতি দানের দ্বারা প্রত্যেক পল্লীগ্রামে যথেষ্ট শিক্ষিত লোক বসাইতেন এবং তাঁহাদেরই দ্বারা পল্লীগুলির উন্নতি সাধিত হইত। এখনকার জমীদারগণের সে চেষ্টা নাই,—শিক্ষাবিস্তারের জন্য এবং অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য প্রয়োজন মত বাহিরের লোক আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাই না। বর্ত্তমানে আগেকার মত নিষ্কর ভূমী দানের আশা আমরা করি না বটে, কিন্তু অল্প সেলামী ও খাজনায় শিক্ষিত লোককে প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং তাহাদেরই সাহায্যে পল্লীর উন্নতি বিধান করিবার প্রয়াস থাকিলে, আমাদের মনে হয় লোকের অভাব হইবে না।

পল্লীগঠন সম্বন্ধে আমরা সুচিকিৎসার অভাবের কথাটা সর্ব্বত্রই শুনিয়া থাকি। পূর্ব্বে

দেশীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আমলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে কবিরাজের অভাব ছিল না। এখন উহার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ডাক্তারী চিকিৎসার প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু আগেকার মত চিকিৎসকের প্রাচুর্য্য নাই, প্রত্যেক গ্রাম ত দূরের কথা, অনেক স্থানে ৫।৭ ক্রোশের মধ্যে একজনও চিকিৎসক মিলেনা। এর উপর আরও অনেক অসুবিধা আছে, যাহার জন্য পল্লীগ্রামে সুচিকিৎসা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারও একটি চিন্তা করিবার জিনিস।

মোটের উপর পল্লীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে না পারিলে পল্লীগঠন কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না। ইহার জন্য চাই প্রধানতঃ শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও পল্লীব্যবসায়ের উন্নতি। তজ্জন্য অশিক্ষিত ও ভদ্রলোক শূন্য গ্রামে শিক্ষিত ভদ্রলোকের আমদানী ও প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত আবশ্যক। রাস্তাঘাট চাই,—দূরবর্ত্তী গ্রাম ও নগরের সঙ্গে সংযোগসাধন চাই। আর চাই সদ্ভাব,—জমীদার ও প্রজায়, ধনী ও দরিদ্রে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে। ইহাদের সকলের মধ্যে পরস্পরের উন্নতির জন্য সহানুভূতি ও সহযোগিতা চাই।

* * * *

বঙ্গের কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী।

মাননীয় মিঃ এ, কে, আবু আমেদ্ খান্ গজনভী মহোদয় এবার বাংলার কৃষি, শিল্প এবং সমবায় বিভাগের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এদেশের একজন জমীদার, এদেশের এবং ইংলণ্ডের শিক্ষায় উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত, এবং ময়মনসিংহের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তিনি ইউরোপ খণ্ডের বহুদেশ ভ্রমন করিয়াছেন, এবং তত্তৎ স্থানীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি বিষয়ক বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞানের প্রচারের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে সমবায় প্রথাবলম্বনে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নিত সাধনে সরকারের সহায়তায় দেশবাসী উপযুক্তরূপে শিক্ষিত এবং তৎপর হয়, যাহাতে কৃষি সহায় পশুগুলির রক্ষা এবং উন্নতি সাধন হয়, এবং সর্ব্বোপরি পর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাব দূরীভূত হয়, আমরা তাঁহার নিকট এই সকল বিষয়ে প্রয়োজনমত সাহায্য আশা করি।

ইতিপূর্ব্বে দেশহিতৈষনা এবং কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া তিনি দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়া আছেন। এবার তিনি উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন, আশাকরি, উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার যশসৌরভ আরও বিস্তৃত হইবে। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

শিক্ষা মন্ত্রী।

মাননীয় মৌলবী এ, কে, ফজলল্ হক্, ব্যারিষ্টার-এট্-ল, মহোদয় এবার শিক্ষা বিভাগের ভার লইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই অনেক আশার কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। শিক্ষা, দেশহিতৈষণা এবং কার্য্যক্ষমতায়, তিনিও কৃতবিদ্য এবং দেশে সুপরিচিত। আমরা তাঁহাকেও আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহোদয়,—যিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন—এবার স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগের ভার লইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু মিঃ এস, এন, হালদারের যত্নে তাঁহার নির্ব্বাচন নাকচ হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

* * * *

প্রাপ্ত পত্র।

আমরা 'সনাতন' পত্রিকার মাঘের সংখ্যা পাইলাম। Declaration পাইতে বিলম্ব হওয়ায় এবং প্রেসের ঝঞ্ঝাটে পৌষের সংখ্যাই 'মাঘ' নামে প্রকাশিত। 'পল্লী-সংস্কার' প্রবন্ধে পল্লীর দু'চারটি অসুবিধার কথা মাত্র বলা হইয়াছে, প্রতিকারের প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। 'সেবকে' শিক্ষাপ্রচারের অসুবিধাটি বেশ চিত্রিত হয়েছে। 'ধনবিজ্ঞান পরিচয়' প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ, সুতরাং শেষ না হইলে কিছু বলা চলেনা।

শাশ্বত-সংবাদ—মাঘ—২য় পক্ষের সংখ্যায় দেখিলাম, "বাংলার পদ্মাতীরস্থ এক পল্লীগ্রামে "সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র নামে একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল তত্ত্বানুযায়ী নব প্রণালীতে গবেষণার্থ নগরের জন কোলাহল হইতে সুদূরে অবাধ প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যরাজি দ্বারা সর্ব্বথা সুবেষ্টিত থাকিয়া উহার কর্ম্মিগণ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সুক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে বায়ব-তড়িৎ আহরণার্থ পরীক্ষাদি জগতে সর্ব্বপ্রথম এই বঙ্গীয় পল্লী-বিজ্ঞান-কেন্দ্রেই কৃতকার্য্য হইয়াছে। বিমান তড়িৎ সংগ্রহ যন্ত্র ও বায়ু চালিত ডাইনামো অচিরে দরিদ্র ভারত-বাসীর দৈন্য দূর করিবে। ভারতীয় কৃষকেরা বিদেশস্থ সমবায়বদ্ধ ব্যবসায় প্রণালীর সহিত প্রাণান্তিক পরিশ্রমেও আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এই সুলভ তাড়িতে অদূর ভবিষ্যতে রাত্রি দিনের ন্যায় আলোকিত হইবে, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকগণ কেরোসিন

তৈল অপেক্ষাও অনেক কম দরে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালাইবে, এবং গরুর দামেই বৈদ্যুতিক হলযন্ত্র চালাইতে সক্ষম হইবে। ভারতের গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পাদি বর্দ্ধিত হইবে। এই বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে এমন সব অভিনব যন্ত্রাদি এখানে পরিকল্পিত হইতেছে যে তাহা বিজ্ঞানজগতে অচিরেই যুগান্তর আনয়ন করিবে।” আমরা এই দেশীয় বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাফল্য আশা করি। আরও আমরা এই কেন্দ্রের কর্ম্মিগণের আশ্বাসবাণী সত্য হইতে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

* * * *

বাজার দর।

পূর্ব্বে কৃষকে নিয়মিত ভাবে বাজার দর প্রকাশিত হইত। কিন্তু গ্রাহকগণ মাসিক পত্রিকায় ইহার প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করায়, কিছুকাল পূর্ব্বে হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক গত জানুয়ারী মাসের শেষে কলিকাতার বাজারে মশলাদির যে দর ছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিবেন যে হরিদ্রা বা হলুদ ও জিরার দর অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। লঙ্কা ও মরিচের দর ও নিতান্ত কম নহে। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের হ্রাসই ইহার প্রধান কারণ। দেশে কি এই জিনিসগুলির চাষের বিস্তৃতি সম্ভবপর নহে? অনেকে বলেন, জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ভাল, কেননা উহাতে দেশে উৎপাদকের ঘরে অধিক অর্থাগম হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু এ মত সমর্থন করিতে পারিনা। উহাতে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার মিমাংসা হয় না। আমাদের মতে সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রচুর উৎপাদনই দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান; উহারাই আমাদের সকলের ধন। দেশী ছোলার দর পাটনাই ছোলার দরের চেয়ে কম ইহা আশার কথা। কিন্তু দালালীর জোরে যদি পাটনাই ছোলারই আদর দাঁড়ায়, তবে তাহা মঙ্গলের হইবে না। দেশী অরহরের মূল্যও কানপুরী অরহরের মূল্যের চেয়ে কম। কিন্তু পাটনাই মসুর এবং মাষকলাইএর দর দেশীর চেয়ে কম। নারিকেল এবং রেড়ীর তৈলের দরও খুব বেশী,—২২ হইতে ২৫ টাকার মধ্যে।

চিনির দরটির প্রতি আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কাশীর চিনি—২৩॥০, দোবরা ২৫॥০, একবার ২৩॥০, মান্দ্রাজী ১৯॥০; আর জাভার চিনি সাদা—১৬৲—১৭৵০, এবং লাল ১৫।৵০—১৫॥০। দেশের খেজুর গাছগুলির যোগ্য ব্যবহার এবং আখের বা ইক্ষুর চাষের বিস্তৃতি সম্বন্ধে সকলেরই চিন্তা করা প্রয়োজন। অন্যত্র বর্ত্তমানে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গুড় ও চিনি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইল।

দেশের ও দশের কথা।

—:*:—

কুইনাইনের কথা—সিন্‌কোনা বৃক্ষের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয় সকলেই জানেন, কিন্তু ইহার উৎপত্তির ইতিহাস হয়ত অনেকেই জানেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্‌কোনের কাউণ্ট রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইয়া পেরুর লিমা নামক স্থানে গমন করেন। সেস্থানের অধিবাসীরা তথাকার একজাতীয় বৃক্ষের ছাল জ্বরের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করিত। কয়েক বৎসর পরে কাউণ্টপত্নী দুরারোগ্য জ্বরে আক্রান্ত হইলে কাউণ্ট তাঁহাকে সেই বৃক্ষছাল সেবন করাইয়া নিরাময় করেন।

কাউণ্টপত্নী স্পেনে ফিরিবার সময় সেই বৃক্ষের ছাল কিছু লইয়া আসেন এবং তাহার উপকারিতা প্রচার করেন। ক্রমে বহু লোক সেই বৃক্ষছাল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা দুষ্পাপ্য হইয়া উঠে। সিন্‌কোনের কাউণ্ট বৃক্ষটীর নাম দেন ‘সিনকোনা’।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সার ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম পেরুতে সিন্‌কোনা বৃক্ষের বীজ ও চারা সংগ্রহ করিবার জন্য এক অভিযান প্রেরণ করেন। প্রেরিত ব্যক্তিরা অনেক চারা ভারতে প্রেরণ করেন। সমুদ্রবক্ষে চারাগুলি মারা যায়, কিন্তু বীজগুলি বেশ ভাল ছিল দেখিয়া তাহা রোপণ করা হয়। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে তাহা হইতে এখন নিবিড় অরণ্যানী গঠিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিং প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশেও এখন ইহার আবাদ হইয়া থাকে। সম্প্রতি জামেকা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে সিন্‌কোনার চাষ হইতেছে।

ভারত-ব্রহ্ম রেলপথ—চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের আনুমানিক আয়ব্যয়ের খসড়া হিসাব আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী প্রস্তুত করিতেছেন। এই কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে উক্ত রেলপথটি নির্ম্মিত হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে ভারতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হইবে।

জলশোধন—পুকুরের জল অনেক সময় এমন নোংরা হয় যে তাহা স্নানের এবং পানের অযোগ্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি জনৈক আমেরিকান রাসায়নিক আবিষ্কার করেছেন যে এই প্রকার নোংরা জল ‘ক্লোরাইন’ বা হরিণক মিশাইয়া নির্ম্মল এবং ব্যবহার যোগ্য করিয়া লওয়া যায়। পুষ্করিণী তো দূরের কথা নদী প্রভৃতির জলরাশীও এই প্রকারে নির্ম্মল করা চলে। —বিজলী।

কচুরীপানা—যে আমেরিকা হইতে কচুরীপানার আমদানী, এবার সেই খানেই ইহাদের মারিবার উপায় আবিস্কৃত হইয়াছে। কচুরীপানায়পূর্ণ নদীর মধ্যে ষ্টীমার নিয়ে গিয়ে সেই ষ্টীমার থেকে রবারের নল দ্বারা তপ্ত বাষ্প প্রয়োগ করিয়া কচুরীপানা মারা হইতেছে। এদেশে পরীক্ষাটা করলে মন্দ কি? —বিজলী।

এলুমিনিয়ম—এলুমিনিয়মের বাসনে এক্ষণে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ইহা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে যে পিতল কাঁসার ব্যবহার একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। এলুমিনিয়ম একটী মূল ধাতু, পিতল কাঁসার ন্যায় মিশ্র ধাতু নহে। এই বিশুদ্ধ মূল ধাতু হইতেই এলুমিনিয়মের যাবতীয় বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এলুমিনিয়ম ধাতু পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তবে কম পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে বলিয়াই ইহার দাম এত বেশী বলিয়া মনে হয়। কর্দ্দম, অভ্র প্রভৃতি পদার্থের সহিত এলুমিনিয়ম মিশ্রিত ভাবে থাকে। এখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পরিচালিত করিয়া এলুমিনিয়ম নিষ্কাশনের এক অল্প ব্যায়সাধ্য উপায় বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে Banoxite নামক এক প্রকার লাল পাথুরে মাটি হইতে এলুমিনিয়ম প্রস্তুত হইতেছে। দক্ষিণভারতে ও ব্রহ্মদেশে এই মাটী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ চ্যাটার্টন মান্দ্রাজে এলুমিনিয়মের বাসনের শিল্প প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে এই ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং চেষ্টা করিলে ভারতে এই শিল্পটীর উন্নতি করিয়া দেশের ধনাগমের সুবিধা করা যাইতে পারে। এখন এলুমিনিয়ম জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

এলুমিনিয়মের ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল অনেক ব্যবসায়ী বেশী লাভের আশায় এলুমিনিয়মের সহিত সীসা মিশাইয়া বাসনাদি তৈয়ার করিতেছে। এই সীসা ভয়ানক বিষাক্ত দ্রব্য। এলুমিনিয়মের সহিত সীসা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হয় না; সেজন্য সীসামিশ্রিত এলুমিনিয়মের পাত্রে খাদ্যাদি সহজে বিষাক্ত হইতে পারে। একটী বাসনের গায়ে আঙ্গুল দিয়া জোরে মর্দ্দন করিলে যদি আঙ্গুলে কোন রকম দাগ না পড়ে ও বাসনের উজ্জ্বলতা ক্ষুণ্ণ না হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহা খাঁটী। কিন্তু যে বাসন খাঁটী এলুমিনিয়মে প্রস্তুত নহে, সে বাসনে আঙ্গুল ঘসিলে বাসনেও দাগ পড়িবে, আঙ্গুলেও দাগ পড়িবে। বিশুদ্ধ এলুমিনিয়মের বাসন খুব টেকসই ও উজ্জ্বল। অতএব সকলের দেখিয়া শুনিয়া এলুমিনিয়ম কেনা উচিত।

তবে এই প্রসঙ্গে ইহা বলা উচিত যে, এলুমিনিয়মের বাসনের স্থলে যদ্যপি পিতল কাঁসার বাসন ক্রয় করা সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাই কেনা ভাল।

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

বিলাতে ভারতীয় দ্রব্য প্রদর্শনী।—রায় যামিনী মোহন মিত্র বাহাদুর কলিকাতা প্রদর্শনীর পক্ষ হইতে বিলাতের বড় প্রদর্শনীতে যাইতেছেন—সঙ্গে যাইতে ছেকি

জানেন? থাগড়াই থালা, ঘটি, বাটি, গেলাস, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি। এই গুলির সাহায্যে বিদেশে বাঙলা দেশের শিল্পের জাহিরী করা হইবে। কিন্তু এমন জাহিরীর ফল কি হইবে জানেন? বিলাতের ব্যবসায়ীরা বুঝিবে, 'বাঙলার কাঁসারীরা হাতে পিটিয়া ঐ সব মাল তৈরী করে, আমরা যদি কলে তৈরী করিতে পারি—তাহা হইলে কম দরে আমরা ঐ সব মাল বাঙলা দেশে চালাইয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করিতে পারিব। এমন বেকার সমস্যার দিনে বিলাতের ব্যবসায়ীরা এ সুযোগ ছাড়িবে কি? এ কথা ঠিক যে, আমাদের গাড়ু, ঘটি, বাটি দেখিয়া বিলাতের লোকেরা তাহাদের কাপ, প্লেট, কাচ ও চীনা মাটির বাসন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে না। তারা সব চেয়ে বড় বুঝে পয়সা। সেই পয়সার জন্যই তাহারা আমাদের কাপড় বুনে—এমন মিহি কাপড়! আমরা তাঁত চালাইয়া দরের প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের তাঁতি জোলার ভাত মারিয়া নিজেদের ভাত যাহারা করিয়াছে, তাহারা আমাদের কাঁসারীদেরও ভাত মারিয়া নিজেদের ভাত করিবেই—ফল ইহাই হইবে। —হিন্দুস্থান।

চাষীর উপনিবেশ।

আজকাল দেশের কল্যাণের জন্য অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন, কাজও অনেকটা হইতেছে। সারা দেশ জুড়িয়া বিবিধ ভাবের একটা ঝড় উঠিয়াছে।

সমস্ত আন্দোলন ও অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা জিনিষ প্রকাশ পাইয়াও পাইতেছে না। এর বেশ প্রয়োজনীয়তা আছে, অনেকে বলিতেছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তেমন কিছু হইতেছে না।

* * * *

শুধু ব্যবসায়ে আমাদের দেশে টাকা আসিবে না এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে; বিশেষতঃ শিল্পের উপকরণ আমরা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সহজে পাইতে পারি। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাণ কৃষি; কাজেই শুধু বাণিজ্য বা শুধু শিল্প আমাদের অবলম্বন করিলে চলিবে কেন? প্রকৃতিও যখন আমাদের অনুকূল, তখন কৃষি আমরা ছাড়িব কেন? ছাড়িলে চলিবে না।

শুধু অর্থের দিক দিয়া ভাবিলেও এ জাতির পোষাইবে না। ভারতের সমস্যা বড় জটিল ও চমৎকার। পরমার্থ চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিলে সব মাটি হইবে।

Agricultural Colony স্থাপনের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। জানি না, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কবে এ সব কথা ভাবিবেন ও কবে কাজে নামিবেন!

আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকের অভাব শীঘ্রই ঘুচিয়া যাইবে।

শ্রীগিরিজাকান্ত চক্রবর্ত্তী —আনন্দবাজার।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

চৈত্র মাস

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেড়স, স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভূট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্রমাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদা ফলাইবার জন্য ইতি পূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিতে থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এ মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলাগাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাকমাটি ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়। চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবি ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালে বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের বাগানে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, পপি, ন্যাষ্টারসম, ফক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। প্রর্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

কৃষক

২৪ খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩০ সাল। | ১২শ সংখ্যা

কৃষিকার্য্য অবহেলার বা ঘৃণার কার্য্য নহে।

আর্য্য এই শব্দ 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঋ' ধাতুর অর্থ কর্ষণ। যে কৃষিকার্য্যের জন্য প্রাচীন আর্য্যজাতি 'আর্য্য' নামে অভিহিত হইয়াছেন, জগতের অন্যান্য অসভ্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া মানবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সে কৃষিকার্য্য আজ ভারতে নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং আমাদের দেশের মুর্খ ও অর্থহীন লোকের হাতে ইহার ভার অর্পণ করিয়া আধুনিক সভ্য, শিক্ষিত ও অর্থবান লোকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়া প্রায় অন্যান্য সমস্ত সভ্যজগতে ইহার আদর কি ধনবান, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ সকলের নিকট সর্ব্বতোভাবে দৃষ্ট হয়। আদর করেন বলিয়া তাঁহারা আজ নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই কৃষিকার্য্যের আশাতীত উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়া জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিতেছেন। আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় জায়গা জমী যথেষ্ট সল্পমূল্য ও স্বভাবতঃ উর্ব্বরা। প্রকৃতিদেবীও দ্বাদশ মাসে ছয়টী ঋতু বর্ত্তমান রাখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা করিয়া দিতেছেন। গ্রীষ্মমণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলদ্বয় ও শীতমণ্ডলদ্বয়, এই পঞ্চ মণ্ডলের (Zones) যত প্রকার জলবায়ু এক ভারত

বর্ষে সকল প্রকারই পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ভারতকে ভূমণ্ডলের Epitome বা 'ক্ষুদ্রাকারে সমষ্টি' বলে। বাঙ্গালা প্রবাদ বাক্যে একথারও প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে কথায় বলে "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে"। আজ যদি আমরা কৃষিকার্য্যের দিকে একটু মনোযোগী হই, তাহা হইলে আমাদের ঘরে মা লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন। আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়েরই মঙ্গল সাধন হয়। লেখাপড়া শিখিয়া সামান্য উদরান্নের জন্য অপরের দ্বারে দ্বারে 'হা চাকরী হা চাকরী' করিয়া মরিতে হয় না। আইন পাশ করিয়া উকীলগণকে মোকদ্দমার জন্য সেই মূর্খ চাষার আশাপথ চাহিয়া থাকিতে হয়না। দেখুন আজ ব্যবসাদার ও চাষার ঘরে বরং কিছু অর্থ-সাচ্ছল্য, কিন্তু হতভাগ্য শিক্ষিত মসিজীবী কেরাণীর দুঃখের সীমা নাই। কেন এত কষ্ট? না আমরা চাষাদের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া ঘরদোর ছাড়িয়া খাল গাঙ পার হইয়া সুদূর ব্যাঘ্র-কুম্ভির-সর্প-পূর্ণ-সুন্দরবনে গিয়া অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে চাষ করিতে পরাঙ্মুখ।

আজ যখন বাহিরের জঙ্গল কাটিয়া, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরূপ রীপুকে দমন করিয়া আবাদ করিতে নারাজ—তখন এই মানব-জীবন-রূপ-সুন্দরবনকে কামক্রোধাদি, রোগশোক ও অভাব রূপ জঙ্গল শত্রু মুক্ত করিয়া মানব জীবনের সাফল্য লাভে কতদূর সমর্থ হইব তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বড়ই দুঃখে ধর্ম্মপ্রাণ, জগৎজননীর আদুরে ছেলে মহাত্মা রামপ্রসাদ আপামর চণ্ডালের হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিয়া তাঁহার চির পরিচিত ও নিত্য নূতন সুরে গাহিয়াছেন "মন তুমি কৃষিকাজ জাননা ···"। আমরা প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির কোলে থাকিয়া যতদিন খেলা করিয়া আসিয়াছি, মা আমাদিগকে ততদিন ছাড়িতে পারেন নাই। আমাদের ঘরে বাঁধা ছিলেন। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ আজ সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া বিকৃত বা অপ্রকৃতিস্থ হইতে বসিয়াছি। কবে আমাদের সে দিন আসিবে যখন আমরা শিল্প ও বিজ্ঞানের আদরের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বিজ্ঞানের গর্ভধারিণী জগৎপ্রসবিনী সেই প্রকৃতি দেবীকে আরও আদরের চক্ষে দেখিতে শিখিব! মাগো আমরা তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় চক্ষে দেখিনা বলিয়া আজ সংসারের মাকেও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইতে বসিয়াছি। যে মার চরণতলে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে দেবগণ প্রণত, স্বয়ং ভগবান গীতাশাস্ত্রে যে অন্নকে ভূতগণের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (অন্নাদ্ভবতি ভূতানি—ইত্যাদি) সেই অন্ন ধান্যরূপে যে মায়ের চরণতল হইতে উদ্ভূত, আজ আমরা সেই অন্নকে পাইবার প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ভিখারীর মত ঘুরিয়া বেড়াই, অথচ মায়ের শরণাপন্ন হই না। ভাবি ইহা হীনতা ও নীচতার পরিচায়ক; আর চাকরীরূপ ভিক্ষাবৃত্তি সম্মান জ্ঞাপক।

যখন হিন্দুর পরমধন রামায়ণ মহাকাব্যে দেখি যে রাজর্ষি জনক যজ্ঞ-ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে জগৎজননীর ক্রোড় হইতে সীতাদেবীকে পাইয়া সেই কৃষিলব্ধ অমূল্য রত্ন প্রকৃতির কন্যা পরাপ্রকৃতিকে রামচন্দ্ররূপ পরম পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, যখন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও অন্যান্যজাতির একমাত্র আধার ধর্ম্মে দেখিতে পাই যে জীব স্বীয় শরীররূপ ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়া সৎ বৃত্তি রূপ ফল পুষ্পে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বভূতে ব্যষ্টি ভাবে পরিব্যাপ্ত সেই পরমাত্মার পূজা করিতে যে দিন সক্ষম হইবে সে দিন তাহার জীবন সার্থক, তাহার বন্ধন মুক্ত, তিনি জীবরূপে শিব, তখন আর কৃষিকার্য্যকে হীন কোন সাহসে বলিব? কৃষিই একমাত্র ইহকাল ও পরকালের পথ প্রদর্শক। যদি বলেন এই কৃষিকার্য্য আর সেই কৃষিকার্য্যে অনেক পার্থক্য। তদুত্তরে অধিক বলিবার প্রয়োজন মনে না করিয়া এইটুকু বলি যে উৎকর্ষতা লাভ করা যখন উভয়ের উদ্দেশ্য তখন আর ক্ষেত্রের পার্থক্যে বিশেষ কি প্রভেদ হইতে পারে। জলোত্তনযন্ত্র যদি পরীক্ষায় কূপের জল তুলিতে সক্ষম হয়, তবে সমুদ্রজল উত্তোলনে কেন অকৃতকার্য্য হইবে?

বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে ধর্ম্মসমস্যা অপেক্ষা অন্নসমস্যাটা বেশী ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথায় বলে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', "আত্মারেথে ধর্ম্ম", "Self Preservation is the farst law of nature" বা "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" এ গুলির সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার দরকার হয় না, কারণ ইহারা মহাজনবাক্য। সুতরাং আগেই অন্নসমস্যাটার উদ্ধার সাধনে আমাদের বিশেষভাবে উদ্যমশীল হওয়া একান্ত বিধেয়। পরে যখন এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব, তখন এই কৃষিকে ধর্ম্মসমুদ্রের ধারে বসাইয়া জলোত্তলন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইব। তখন এই সংসার রূপ শ্মশান ক্ষেত্রে শবসাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শবের অভাব জনিত বিকট মুখব্যদনেরমধ্যে আমাদের কৃষিলব্ধ খই বা কড়াইভাজা দিয়া সেই শবের মুখ বন্ধ করিবার অভাব হইবেনা, এবং তৎসঙ্গে মায়ের আরাধনায় বিঘ্ন না হইয়া বরং সুবিধা করিয়া দিবে। মহাশনি ঘোর অমানিশায় অন্ধকারের মধ্য হইতে কোটী চন্দ্র সমাভাসা জগৎমাতা প্রসন্না হইয়া ইহকাল ও পরকালের পথ দেখাইয়া আমাদিগকে সংসারপাশমুক্ত ও তাঁহার চির শান্তিনিকেতন চরণযুগল যুক্ত করিয়া রাখিবেন। হায়, আমাদের কবে সে চক্ষু ফুটিবে ও সে জ্ঞানের উদ্রেক হইবে যাহাতে আমরা—কি ব্যবহারিকজগতে—কি আধ্যাত্মিক জগতে—সর্ব্বত্রই প্রকৃত 'কৃষক' হইয়া 'আর্য্য' নামের পূর্ব্ব গৌরব লাভে সমর্থ হইব?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদেশিক পণ্যের আমদানী।

—:০:—

বৈদেশিক শিল্পবস্তুর প্রচুর আমদানী হওয়াতে ভারতীয় শিল্পির কুলের অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছেন। আমাদের অসংখ্য প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, আমরা অসংখ্য প্রকার বিদেশী বস্তু গ্রহণ করিতেছি। বিদেশ জাত কলাইকরা লৌহ নির্ম্মিত থালা, গেলাস, বাটী ইত্যাদি শত শত প্রকার পাত্রাদি ক্রয় করিয়া বৈদেশিক শিল্পীকুলের ধনবৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু পিতল কাঁসার থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি তৈজস পত্র স্বদেশেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান গণ যে সকল পিতল কাঁসার দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহা ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। অসংখ্য কাংস্যবনিক এখনও স্ব স্ব বৃত্তিতে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। জয়পুরের বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত সুদৃশ্য ভোজনপাত্র, পিতলের গেলাস, থালা, রেকাব প্রভৃতি এখনও ভারতবাসীর গৃহ শোভা সম্পাদন করিতেছে। মুরাদাবাদের কারুকার্য্য খচিত সুদৃশ্য ভোজনপাত্র, জলপাত্র প্রভৃতি এখনও ভারতবাসীর গৃহে আদরে ক্রীত হইয়া থাকে। খাগড়ার কাঁসার বাসন এখনও দেশবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে। উড়িষ্যার কাঁসার বাসন এখনও দেশীয় গণের আবশ্যক পূর্ণ করিতেছে। কিন্তু এদেশীয় কাংস্যবণিকগণের অন্ন বোধ হয় একেবারেই উঠিবার উপক্রম হইতেছে, যেমন দেশীয় তন্তুবায়গণ বিলাতী তাঁতি কুলের নিমিত্ত নিরন্ন হইয়াছে, দেশী কর্ম্মকারগণ সেফিল্‌ডের কামারগণের জন্য নির্ধন হইয়াছে। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণ বৈদেশিক শিল্পীও বাণিজ্যজীবির জন্য উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত। কয়েক বৎসর গত হইল বহুসংখ্যক কাঁসারীর দোকানে আমরা পিতলের চাদর নির্ম্মিত গেলাস বিক্রয় হইতে দেখিতেছিলাম, উহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং এরূপ উচ্চ পালীশ যুক্ত যে তদ্রূপ আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। যে কেহ ঐ উজ্জ্বল পালিশযুক্ত গেলাস দেখিয়াছেন বা ক্রয় করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন। ইদানীং এ সকল গেলাস এতদ্দেশের লোকেরা শ্রাদ্ধ ও ব্রতাদিতে দান করিবার জন্য ক্রয় করিতেছেন। ইহা বেশ হাল্‌কা এবং মূল্যেও সুলভ। তবে যদি কিছু ভারী ওজনের ও টেকসই মত আমদানী হয়, তবে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে উক্ত পিতলের চাদর নির্ম্মিত থালা, ঘটী, বাটী, গামলা প্রভৃতিও বহু দোকানে বিক্রয় হইতেছে দেখিতেছি। দেশীয় পিতল কাঁসার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপেক্ষা কিছু দরে বেশী বলিয়া অনেক লোকেই খরিদ করিতেছেনা বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে বিদেশী মাল লোকের বিশেষ রূপ

চিত্তাকর্ষণ করিলে ও দর কিছু নামিলে তাহাও আর ক্রয় করিতে বাকী থাকিবেনা। সুতরাং দেশীয় কাংস্যবনিকগণেরও জীবিকা নির্ব্বাহের পথ ক্রমশঃ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিল। এখনও কাঁসারী পল্লীর ঝন্ ঝনা শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কালে বোধ হয় তাহাও নীরব হইবে।

অস্মদ্দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকিয়া সেই সেই কাজ কর্ম্মের রীতি পদ্ধতি জ্ঞাত হইয়া, তাহারই শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতি করত বংশানুক্রমে এখনও কাজ চালাইয়া আসিতেছ। পূর্ব্বে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য বিভিন্ন জাতির হস্তে থাকায় তাহার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং অভ্যাস বশতঃ সেই সেই জাতি নিজ নিজ শিল্পের প্রাণপণে উন্নতি করিত। এখন আর সেদিন নাই। একালে সেই সীমা ছাড়াইয়া দিয়া সর্ব্ব বিষয়েই অবাধবাণিজ্যের পথ খুলিয়া গিয়া অতীব কঠোর প্রতিযোগীতার মুখে, যেন খোলা ময়দানে কাককে ভাত ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন যাহার গায়ে বেশী জোর আছে, সেই তাড়াতাড়ি শিল্প রূপ অন্ন খুঁটিয়া খাইয়া পেট ভরাইতেছে। আর যে দুর্ব্বল সে অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং একালে কাহারও ভাগ্যে মাহেন্দ্র যোগ, আর কাহারও ভাগ্যে দুর্নিবার দরিদ্র্য ঘটিয়াছে। ভারতবাসী নানা কারণে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্র কোন মতেই কাজে খাটাইতে পারিতেছেনা। ক্রমেই ক্ষিপ্র গতিতে হীন হইয়া আপন আপন ব্যবসায় ছাড়িতে বাধ্য হইয়া পাশ্চাত্য বণিক সমাজের পদলেহন জন্য দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর ধনকুবেরগণ প্রভূত আধিপত্যে সেই দিশেহারা ক্ষুধাতুরদিগকে কুলিরূপে পরিণত করত, হয় আসামে না হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, কোন একটী মিয়াদী কালের জন্য পাঠাইতেছেন।

আবার আমাদিগকে মহাযোগবলে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া অতি উজ্জ্বল চক্ষুঝলসিত কাচের বাসন, কাচের ফানস, কাচের বাটী, গেলাস, ছুরি, চাকু, কাঁচি, ক্ষুর, ব্রাস, জুতা, ফিতা ইত্যাদি সৌখিন দ্রব্যের বিনিময়ে মহামূল্য মণিমুক্তা চুনি পান্না হীরক সোনা রূপা লইয়া গিয়া বিদেশীরা নিজ দেশে বড় মানুষ হইয়াছেন ও হইতেছেন। সকলেই জানে ভারত চিরকাল রত্নগর্ভা বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু আর সে রত্ন কোথায়? সমুদ্র শুষ্ক হইয়া গেলে যেমন তথায় কেবল একটী চড়া পড়িয়া থাকে, ভারত কি এখন তাহাই নয়? আমরা কি এখন আর সেই আকবরী আমলের খাঁটী সোনার মোহর অথবা রূপার টাকা দেখিতে পাই? তাহার স্থলে দেখি কেবল গিনি সোণার মোহর, জার্ম্মাণ সিলভারের ঘড়ী, চুড়ী, বাটী, বাটা, কৌটা, ডিবা ইত্যাদি। আর সে সাবেক আমলের সুন্দর কর্ণভূষণ মাকড়ী, বলয় স্থলে কেবল গিল্টি করা সোনার ফুল, চুড়ি ইত্যাদি ও কতকগুলি অতিশয় সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কেমিক্যাল গোল্ডের অপদার্থ অলঙ্কার। অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, সে খাঁটী সোনার দুল, চীফ, মূল্যবান পাথরবসান পাঁচনহর, সাতনহর, দেশী মুক্তার মালাগুলি কোথায় গেল? অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাইতাম ইহার মধ্যে সেগুলি কি হইল?

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এখন কেবল কতকগুলি সুলভ মূল্যের বিদেশী দ্রব্যের জাঁকজমক বৃদ্ধি হইয়াছে। এইত গেল রত্নাদির কথা। আবার পিতল কাঁসা, তামা, লোহা, ইস্পাতের পর্য্যন্তও আর সেরূপ জিনিস নাই। আজকাল বহরমপুর খাগড়াই বাসনের আদর নাই, কাঞ্চননগরের বগীথালা অদৃশ্য প্রায়, নেপালী গাড়ুর আদর কম হইয়াছে, কাশীর নানাবিধ গৃহসজ্জা ও পূজার বাসনগুলি কোথায়? বোধহয় আর এখন অধিকাংশ ব্রহ্মণেরা নারায়ণ পূজা না করিয়া চাকরী পূজা ধরিয়াছে। তাই তামা ও পিতলের বাসনগুলি অভিমানে আর নারায়ণের আধার না হইয়া রেল, ষ্টীমার, কল কারখানার চিমনীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সহরের ও মফস্বলের যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই কেবল এনামেলের বাটী, গেলাস, রেকাব, থালা, ডেকচি, গাড়ু, বদনা ইত্যাদি। সুতরাং কাঁসারিরা আর পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারে দ্বারে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে বাসনের ঝাঁকা মাথায় লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় না হওয়ায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে ও বাসন প্রস্তুতে বিরত হইতেছে।

ফলতঃ এনামেলের বাসনের কলাইকরা রং টুকু উঠিয়া গেলে উহার কি পদার্থ থাকে, অর্দ্ধপয়সাও উহার মূল্য হয়না। আমরা স্থিতিশীল জাতি ও হিন্দু সুতরাং আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের দুই এক প্রস্থ পিত্তল কাঁসার বাসন গৃহসজ্জার জন্য রাখিতে হয়, আর ঐ জিনিস ৩০।৪০ বৎসর ব্যবহার করার পরেও উহার অর্দ্ধেক মূল্য বজায় থাকে। আর দুঃখের সময়েও উহার বিনিময়ে দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়। এনামেল ও টীনের বাসনে সে উপকার সাধিত হয়না, তবে আজকাল দেশ বিদেশে ভ্রমণের যেরূপ প্রথা বাড়িয়াছে, তাহার পক্ষে অনেকটা কাজে লাগে বটে। কিন্তু দিন দিন লোকে যেরূপ দুঃস্থ হইয়া পড়িতেছে ও রুচিবিকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কিছুদিন পরে লোকের গৃহে সোণা, রূপা, পিতল, কাঁসার দ্রব্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা।

পূর্ব্বে এদেশে বাজী প্রস্তুতকারী ও চিত্রকর পটুয়া জাতি ছিল, এখন তাহাদের শিল্পও বিদেশীর অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। কালেভদ্রে যদিও দুচারটা বাজীর বায়না জুটে তাহাও দেশীয়ের ভাগ্যে জুটেনা। কৃষ্ণনগর, কালীঘাট প্রভৃতির প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরা বিলাতী অইলপেণ্টীং ও কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের ছেলেপিলে গুলিকে অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে ঐরূপ কোন প্রকার টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষা দিয়া উহাদের পৈতৃক ব্যবসাগুলির উন্নতি করত দেশী শিল্পগুলি বজায় রাখা উচিত কিনা? কিন্তু এসব কথা ভাবে কে, আর ভাবিবার সময়ই বা কাহার আছে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় অনেক স্থলেই আলোচ্য বিষয় ছাড়াইয়া অন্য কথার অবতারণায় প্রবন্ধটি ভরিয়া ফেলিয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আলোচ্য বিষয়ের গণ্ডীর মধ্যে থাকিবার জন্য অধিক মনোযোগ দিবেন। ইতি— কৃঃ সঃ।

বেকার সমস্যা ও তাহার প্রতিকারোপায়।

(শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইউরোপের বেকার-সমস্যা এবং এদেশের—আমাদের মধ্যে বেকার-সমস্যার প্রকৃতি বিভিন্ন। সেদেশে অনেক লোক বাস্তবিক কর্ম্মহীন, আর এদেশে অনেক লোক—বিশেষতঃ যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের অনেকেই বাস্তবিক কর্ম্মত্যাগী, সুতরাং নিষ্কর্ম্মা। আমি বুঝিতে পারিনা কেন চাষ-আবাদ এবং শিল্পকর্ম্মগুলিতে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ঘৃণা আসিবে! যাঁহারা কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন, কিম্বা জেটী বা রেলের মালসরকারের কাজ করেন, তাঁহাদের কি অগ্ন্যুত্তাপে ময়লার সঙ্গে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে কাজ করিতে হয় না?

এই ঘৃণাটি ত্যাগ করিতে হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াছি বলিয়া যে কাজ অশিক্ষিতেরা করে তাহার আবশ্যকতা ভুলিয়া তাহা কেন ঘৃণা করিব? বরং সেই কাজে উদ্যমের সহিত নামিয়া উহাতে উৎকর্ষ দেখাইয়া আমাদের লব্ধ শিক্ষার সফলতা প্রদর্শন করিব। বুঝাইব, লেখাপড়া শিখিয়া কাজ করিলে ঠকিতে বা ঠকাইতে হয় না; শিক্ষিত লোকে প্রত্যেক কাজই আরও নিপুণভাবে করিতে পারে; এবং শিক্ষার ফলে কর্ম্মেরও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

আজ যদি বিদ্যালয় হইতে সদ্যনিষ্ক্রান্ত যুবকগণ কেরাণী হইবার চেষ্টা না করিয়া দলে দলে কথিত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল গ্রহণ করিতে চলিয়া যান, অল্পদিনের মধ্যেই এ সমস্যার মিমাংসা হইয়া যাইবে। আমি জানি কোন কোন শিক্ষিত যুবক ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিয়াছেন, কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়া দেখিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্র নির্ব্বাচন না করাতে তাঁহারা সফল হইতে পারিতেছেন না. এবং তাঁহাদের অসাফল্য অন্য সকলকে নিরুদ্যম করিতেছে। তাঁহারা ব্যবসায়নীতিটি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

কেহ বলিতে পারেন কি, আমাদের জীবন ধারণের জন্য কাঁচের চুড়ির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? কিন্তু জাপান ও ইউরোপে কাঁচের চুড়ি গড়িয়া এখানে আনিয়া এদেশের প্রত্যেক ঘরে উহার প্রচলন কেমন করিয়া হইল? প্রচারের দ্বারা অভাববোধ জাগানই ব্যবসায়নীতির একটি প্রধান অঙ্গ। মনে করুন, আপনি কলার বাগিচা করিয়াছেন; বাজারে ফলের কাটতি কম হওয়াতে আপনার লোকসান হইতে থাকিল।

আপনি অতিরিক্ত উৎপন্ন কলায় ময়দা প্রস্তুত করিলেন, বাজারে আনিলেন, কাট্‌তি হইল না; কেন? কারণ কাট্‌তির জন্য আপনি আদৌ চেষ্টা করেন নাই। এই কাট্‌তির জন্য যে চেষ্টা, উহা প্রচারের দ্বারাতেই হইবে, লোককে বুঝাইতে হইবে তাহাদের আবশ্যকতার দিক্ দিয়া ওই ময়দার অভাব তাহাদের আছে। ওই ময়দার ব্যবহার এবং উহার বিশেষ বিশেষ গুণগুলি প্রচার দ্বারা লোককে অন্য খাদ্যের তুলনায় উহার উৎকৃষ্টতা এবং সুলভতা বুঝাইতে হইবে, অভাব বোধটি জাগাইতে হইবে, তবেইত উহার কাট্‌তি হইবে। রবিনসনের বার্লির কেমন করিয়া এত কাট্‌তি হইয়াছে একবার ভাবুন দেখি! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে চায়ের যতটা প্রয়োজন ছিল, এখন তাহার অপেক্ষা কত গুন বাড়িয়াছে, এবং কেন বাড়িয়াছে, একবার স্থির চিত্তে চিন্তা করুন দেখি! উহাতে এই অনতিপ্রয়োজনীয় চাযটির কত সহায়তা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুধ ও চিনির কত অধিক ব্যবহার ঘটাইয়া এক সঙ্গে কতগুলি ব্যবসায়ের প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে, এবং কেমন করিয়া করিয়াছে, চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রচারের দ্বারা অভাববোধ জাগানই প্রত্যেক ব্যবসায়ের একটি প্রধান অঙ্গ।

যেদেশে কাঁচামাল প্রস্তুত করিতে সমগ্র অধিবাসীসংখ্যার ৮০ ভাগ লোক ব্যাপৃত, উহাদের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য প্রচার কার্য্যে সেই দেশের কতলোক প্রতিপালিত হইতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! এগুলি অবশ্য বহির্বানিজ্য সম্বন্ধের কথা।

পল্লীঅঞ্চলে হাঁড়ি-কলসীপ্রভৃতি মৃৎপাত্র গড়া হয়, এবং সেখানে উহার মূল্যও খুব কম। অনেক হয়ত জানেন না যে, কলিকাতা এবং ইহার উপকণ্ঠে ঐ মৃৎপাত্রগুলি কত উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, এবং যাহারা মফঃসল হইতে ঐগুলি আনিয়া এই সকল অঞ্চলে বিক্রয় করে, তাহারা কত অধিক মুনফা পাইয়া থাকে। অবশ্য এই সকল কর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, এবং প্রত্যেক বাজারে নূতন ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগীগণের প্রদত্ত অশেষ প্রকার বাধা অতিক্রম করিতে হয়। এ ছাড়া যতপ্রকার মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, আবশ্যকতা এবং ব্যবহারের দিক দিয়া উহার অনেক নূতন প্রকার উৎপাদন এবং বিক্রয় হইতে পারে। আপনারা জানেন কি, বিদেশীয় ব্যবসায়ী 'বরণ কোম্পানী' এই দেশেরই মাটিতে টালি ও নল প্রভৃতি গড়িয়া কেমন বিস্তৃতভাবে কারবার করিতেছে? আপনারা হয়ত ঘর ছাইবার জন্য অনেকে ঐ টালি কিনিয়া থাকেন এবং ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশের লোকের চেষ্টায় উহা হয় না কেন, বলিতে পারেন কি? কতলোকে ত চিনামাটির নানাপ্রকার পাত্র ও পুতুলাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, এদেশের মাটিতেও উহারা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও ব্যবহারের একান্ত অযোগ্য হয়না, বরং মূল্য হিসাবে তাহা যথেষ্ট

সুলভ হইবে। যদি সুলভতার দিক্ দিয়া পিতল কাঁসার পাত্রাদির স্থলে এনামেল, এলুমিনম্ এবং চিনামাটির পাত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে, তবে আরও সুলভ বলিয়া কেন এদেশের মাটির পাত্র ব্যবহৃত হইবে না? প্রয়োজনের আধিক্য প্রচারের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

চীনা সূত্রধর বা ছুতার মিস্ত্রি কি, শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেয়েও সুন্দর কাঠের কাজ করিতে পারে? তবে বাঙ্গালীর ছেলেরা 'ওভারসিয়ার' এবং 'ইন্‌জিনিয়র' হইতেছেন কি জন্য? কেন দেশীয় মুচির অন্ন জুটে না, অথচ চীনা মুচির দোকানে কলিকাতা ভরিয়া যাইতেছে? কলিকাতায় কত হিন্দুস্থানী এবং উড়িয়া মুটে মাল বহিয়া প্রত্যহ ২।৩ টাকা উপার্জ্জন করে, এবং কত শিক্ষিত বাঙ্গালী মাসিক ১৫।২০ টাকা মাহিয়ানার কেরানীগিরীর জন্য ছুটিয়া বেড়ান, কেন? মাল বহা কি খুব ঘৃণ্য কাজ? আবাদ অঞ্চলে চাষের কাজের জন্য প্রতিবৎসর কত উড়িয়া শ্রমিক নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহারা কি বাঙ্গালী শ্রমিকের চেয়ে ভাল কাজ করে? কেমন করিয়া করে? এই সকল বিষয়ই আমাদের বর্ত্তমানে বিশেষ করিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শ্রমবিমুখতাই আমাদের বর্ত্তমান সকল দুর্দ্দশার কারণ।

যদি যুবকগণ,—যাঁহারা সবেমাত্র বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন,—এখনও কেরানীগিরির পেষণে স্বাস্থ্যসুখ হইতে এবং কালোচিত শক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হন নাই,—তাঁহারা মিলিত হইয়া, একদল প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক ঘরে চরকায় কাটা সুতা সংগ্রহ এবং ক্রয় করিয়া আনেন, অন্যদল তাঁত চালাইয়া তাহাতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে থাকেন, এবং অপর একটিদল ঐ উৎপন্ন বস্ত্রাদির প্রচার এবং বিক্রয় করিতে থাকেন, তবে তাঁহারাও কর্ম্ম পান এবং দেশের একটী অভাবও পূর্ণ হয়। কথিত প্রচার এবং বিক্রয় কার্য্য প্রথমোক্ত সুত্রসংগ্রাহক দলের দ্বারাও পরিচালিত হইতে পারে; বরং ইহাতে উৎপন্নবস্ত্রাদির মূল্যকে বর্দ্ধিত না হইবার পক্ষে সহায়তা করিবে, এবং ব্যবসায়ের জন্য ইহাও প্রয়োজনীয়। এই প্রকার কার্য্য আরম্ভ করিলে, যে সকল গৃহে চর্‌কা চলেন না, সুত্র বিক্রয়ের সুবিধা পাইলে, ঐ সকল গৃহেও চর্‌কার প্রচলন হইবে; এবং তদ্দ্বারা অনেক গৃহীর অবসর সময় গুলির সুতকাটা কাজে ব্যবহার হইয়া গৃহস্থের আয় বাড়াইবে। এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি দেশের যুবকগণের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও অন্য কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই প্রকার কার্য্যে খদ্দরের যথেষ্ট প্রচার হইবে, এবং শিক্ষিত যুবকগণ নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জণের জন্য এই কাজে নামিলে—আমাদের মনে হয়—কাজটি সুশৃঙ্খলে এবং সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে।

সকল প্রকার ব্যবসায়ই বাঙ্গালীদের হাত থেকে মাড়োয়ারী ভাটিয়াদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইহা ফিরাইয়া লইতে হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলেরা প্রত্যেক সহরে নগরে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া আপনাদের ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা

করুন। ব্যবসায়ের মূলে কিন্তু সততা চাই; ঐটির অভাবে আমাদের অনেক কর্ম্মক্ষেত্র বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐটির দিকে খুব্ লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

ঘৃণা ত্যাগ করিতে হইবে, লজ্জা ত্যাগ করিতে হইবে, বাঁচিবার জন্য এই গুলির সঙ্গে আলস্যও ত্যাগ করিতে হইবে; পরিত্যক্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি এক এক করিয়া নিজেদের হাতে আনিতে হইবে, তবে ত দেশের অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে।

(ক্রমশঃ)

গোপালন ও দুগ্ধব্যবসায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:*:—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুগ্ধের মধ্যস্থিত শর্করাংশ বায়ুর উত্তাপে অথবা বীজাণুর ক্রিয়ার দ্বারা মাতিয়া উঠিয়া ল্যাক্‌টিক্ এসিড্ বা অম্ল উৎপন্ন করে। এই ল্যাক্‌টিক্ এসিডের আধিক্য হইলে দুধে তাপ সহে না, আগুনের উপর বসাইবামাত্র কেশীন্ জমিয়া দুধ বিকৃত হইয়া পড়ে বা ছিঁড়িয়া যায়। কেমন করিয়া ঐ রূপান্তরিত হওয়া বা বিকৃতি বন্ধ করা যায় তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জ্ঞান লাভের জন্য ডাঃ ফ্লিশ্‌ম্যানের পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইউরোপে Passeurization প্রক্রিয়ায় দুগ্ধকে অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বায়ু হইতে যে সকল বীজাণু দুগ্ধ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাতে বিষবৎ 'টোমেন' উৎপন্ন করে, তাহারা মানব দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া উৎকট রোগেরও সৃষ্টি করে। দুগ্ধের এই উৎসেক ক্রিয়াকে বন্ধ করিলেই উহা অধিকক্ষণ অবিকৃত বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিবে, ইহারই নাম 'প্যাষ্টিউরিজেশান'। প্রথমে অত্যধিক উত্তাপে জ্বাল দিয়া সহসা ঠাণ্ডা করাতে যাবতীয় বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। তবে ইহাতে দুগ্ধের গুণের কিছু ব্যত্যয় হয় বলিয়া অনেকে এ প্রথা ভাল মনে করেন না। তাঁহাদের মতে দোহনের পরবর্ত্তী স্বাভাবিক উষ্ণতা হইতে Cooler দ্বারা ঠাণ্ডা করিয়া বরফে আবৃত করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠান ভাল।

৫১ হইতে ৫৭ ডিগ্রির মধ্যবর্ত্তী উত্তাপে থাকা কালে দুগ্ধ মন্থন করিলে বা Skim করিলে যথেষ্ট পরিমাণে ভাল মাখন পাওয়া যায়। যাঁহারা মাখনের কারবার করিবেন

তাঁহাদের এই সময়েই উহা উঠান দরকার। গরু অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধে অধিক পরিমাণে মাখন থাকে। পৃথিবীতে যত প্রকার দুগ্ধ এ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতীয়—বিশেষতঃ সিন্ধুপ্রদেশস্থ—মহিষের দুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাখন পাওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতাও দুগ্ধকে অবিকৃত রাখিবার একটি উপায়। দোহনের পূর্ব্বে গরুর বাঁট বা পালাম ধৌত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরে গো-দোহন করা উচিৎ। তারপর দোহন পাত্র রীতিমত পরিস্কার করিয়া লইয়া তবে তাহাতে দোহন করা উচিৎ, নতুবা উহার মধ্যস্থ দুগ্ধ কলুষিত হইয়া বিবিধ রোগের কারণ হইতে পারে। এসকল কথা প্রত্যেক গৃহস্থেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। অনেক সময় দুগ্ধের দোষেই আমরা বহুবিধ রোগের অধীন হইয়া পড়ি। আজকাল যে শিশু মৃত্যুর এত প্রাবল্য, তাহার মূলে যে এই পরিচ্ছন্নতার অভাব নাই, একথা কে বলিতে পারে? এদেশে অধিকাংস্থলেই মাটীর দোহনপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাত্র মাটীর হইলেই যে তাহা খারাপ হইবে এমন কথা নহে, তবে উহাকে প্রত্যেকবার দোহনের পূর্ব্বে অগ্নির উত্তাপে পোড়াইয়া এবং ধুইয়া মুছিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিৎ; কিন্তু এদিকে গোয়ালাদের বা গৃহস্থের বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। পাশ্চাত্য দেশে এনামেলের বা কাচের রীতিমত পরিস্কৃত পাত্র এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ামের পাত্রও এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাটীর পাত্র ব্যবহার করিতে হইলে তাহা প্রত্যহ অগ্নির তাপে তপ্ত করিয়া বীজাণুশূন্য করিয়া লওয়া দরকার। পোর্সিলেনের বা চীনামাটীর পাত্রও মন্দ নহে, উহাও প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর ধৌত এবং পরিস্কৃত করা আবশ্যক।*

মোটের উপর জল, ঝড়, বৃষ্টি, বীজাণু, ধুলা ও অন্যান্য ময়লা, উষ্ণতা প্রভৃতি দুগ্ধকে সহজেই বিকৃত করিয়া থাকে। সুতরাং সাবধানতার সহিত এইগুলির প্রভাব হইতে সতত সদ্য দোহিত নির্ম্মল দুগ্ধকে রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। তারপর গোদুগ্ধ এবং মহিষদুগ্ধ বা অন্যদুগ্ধ একত্রে মিশান বড়ই অনিষ্ঠকর। এমন কি বিভিন্ন গাভীর দুগ্ধও একত্রে মিশ্রিত হওয়া উচিৎ নয়। প্রত্যেকটির দুগ্ধ পৃথক পৃথক পাত্রে বা বোতলে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। তবে জ্বাল দিবার সময় সমস্ত গোদুগ্ধ একত্রে জ্বাল দিলে আর অনিষ্টের ভয় থাকে না।

---

*আমরা পাঠকবর্গকে ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যার কৃষকে প্রকাশিত 'দুগ্ধ ও বীজাণু' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিও পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কৃঃ সং।

(গ)দুগ্ধ হইতে কি কি উপায়ে কত প্রকার জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে।

দুগ্ধ হইতে জমানদুধ (condensed milk) মাখন, ক্ষীর, সর, দধি, ঘৃত, ঘোল, ছানা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধকে জমাইয়া কঠিনও করা যায়, এবং সেই কঠিন পদার্থ হইতে চিরুণী বোতাম প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতে পারে। দুগ্ধের শর্করাংশ বাহির করিয়া sugar of milk প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ভেষজবহ রূপে ব্যবহৃত হয়।

জমান দুধ।—বীটশর্করা বা চিনি মিশাইয়া এবং দুগ্ধের জলীয়াংশ অগ্নিতাপে শুকাইয়া লইয়াই জমান দুধ বা 'কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক্‌' প্রস্তুত হইয়া থাকে। শেল্‌ডনের 'Dairy Farming' নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সদ্য দোহিত দুগ্ধকে ৬০ ডিগ্রি ফারেনহিটে নামাইয়া পরে ফুটন্ত জলের ভিতর রাখিয়া ১৬০ হইতে ১৮২ ডিগ্রি তাপে না পৌঁছান পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিবে। তদনন্তর উপরে পাখা চলে এমন একটী ঘরে একটি পাত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং ঐ চালিত পাখা দ্বারা উহার জলীয়াংশ বাষ্পাকারে উঠিয়া ঘরের বাহিরে চালাইয়া দিবে। এই ভাবে দুগ্ধস্থিত জলীয়াংশের শতকরা ৭৫ ভাগ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। কেহ কেহ বীটচিনির সঙ্গে carbonate of soda ও মিশাইয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ডিম্বের মধ্যস্থিত এল্‌বুমেনও ইহাতে মিশান হয়। জমাইবার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। পরিশেষে টিনের বাক্সে বদ্ধ করিয়া (air tight pack) বাজারে চালান দেওয়া হয়।

মাখন।—কাঁচা দুধ হইতে মাখন উঠান যায় এবং দধি হইতেও মাখন উঠান যায়। দুগ্ধ দোহনের পর গাঁজলা মরিলে অর্থাৎ দুধ ঠাণ্ডা হইলে ননী বা মাখন আপনা হইতেই উহার উপরে ভাসিয়া উঠে। এই সময়ে (৪৫ ডিগ্রি হইতে ৬০ ডিগ্রির মধ্যস্থিত উত্তাপে) Churn এ ফেলিয়া মন্থন করিলে বা Skim করিলেই মাখন পাওয়া যাইবে। মোটের উপর দুগ্ধ বা দধির ঠাণ্ডা অবস্থাতেই মাখন তোলা কর্ত্তব্য, নতুবা উহা গলিয়া যায়, তোলা যায় না।

মাখনের জন্য ভারতীয় মহিষ দুগ্ধই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে উৎপন্ন মাখনকে 'ভয়েসা' বা 'ভঁইসা' মাখন বলে। গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন মাখনের নাম 'গাওয়া' মাখন। ৩০ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট গোদুগ্ধ হইতে ১ পাউণ্ড মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু ১০·৪ পাউণ্ড ভারতীয় মহিষের দুগ্ধ হইতেই ১ পাউণ্ড মাখন উঠিতে পারে।

এদেশে গোদুগ্ধেরই দধি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতেও 'গাওয়া' মাখন প্রস্তুত হয়। দধি হইতে মাখন উঠাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম 'ঘোল,' ইহাও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধকে ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ বা অম্লযোগে বিকৃত করিয়া

জমাইয়া 'দধি' প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া উহার কেশীন জমাইয়া 'ছানা' প্রস্তুত হয়, ইহার অবশিষ্ট জলীয়াংশের নাম ছানার জল বা whey 'হোয়ে'; ইহাও লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য মধ্যে গণ্য এবং রোগীর পথ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ছানার ব্যবহার বাঙলাদেশেই দেখা যায়। এদেশে ছানা হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানায় প্রোটিডের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে বলিয়া উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে গণ্য। ছানা হইতে মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করা ব্যতীত, উহাকে ভাজিয়া তদ্দ্বারা বহুবিধ রুচিকর ব্যঞ্জনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ হিসাবে ছানাকে তরকারীও বলা চলে।

কাঁচা দুধ হইতে মাখন তুলিয়া লইলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহার পুষ্টিকারিতা গুণের কিছু ব্যত্যয় হয় বলিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ হইতে উহা নিকৃষ্ট, প্রায় 'ঘোলে'রই মত। ইহাকে দুগ্ধ না বলিয়া 'কাঁচা ঘোল' বলাই ভাল।

মাখন জ্বাল দিয়াই ঘৃত প্রস্তুত করা হয়, ইহা মাখনেরই পরিপক্কাবস্থা, এবং কথঞ্চিৎ গুরুপাক। ঘৃতও আমাদের খাদ্য মধ্যে গণ্য। ইহা দুগ্ধের মধ্যস্থিত তৈলাংশ, সাধারণ তৈল হইতে অধিক পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু ও রুচিকর গন্ধযুক্ত।

ক্ষীর একপ্রকার জমান দুগ্ধ মাত্র। দুগ্ধকে অবিকৃত অবস্থাতেই জ্বাল দিয়া জলীয়াংশ পৃথক করিয়া ঘন করিলেই ক্ষীর প্রস্তুত হয়। Condensed milk এবং আমাদের ক্ষীর প্রায় একই পদার্থ। এদেশে ক্ষীরেরও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত এবং ব্যবহার হইয়া থাকে। ক্ষীর বিশুদ্ধ দুগ্ধাপেক্ষা অধিকতর গুরুপাক।

(ক্রমশঃ)

মাটির কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সকলেই বোধ করি দেখিয়াছেন যে পতিত অকর্ষিত জমীর মাটী খুব শক্ত হইয়া থাকে। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষ এবং গরু ও মহিষাদি জন্তুগণ উহার উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়া উহাকে অনেকটা চাপিয়া দেয়, মধ্যবর্ত্তী বায়ুপথগুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, নীচের রস উপরে টানিয়া তোলা সম্ভব হয় না, এবং ফলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ মাটীর উপর বায়ুর একটা চাপ নিয়তই বর্ত্তমান, এবং ইহা নিতান্ত কমও নহে। মাটীর উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে

১৫ পাউণ্ড বা প্রায় /৭৷৷০ সের বায়ুর ভার সর্ব্বদাই আছে। মাটী কর্ষিত বা চষা থাকিলে ভিতরে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে বলিয়া ঐ চাপ কম হয়।

মাটী চষা থাকিলে আর একটী উপকার পাওয়া যায়। উল্লিখিত ১৫ পাউণ্ড বায়ুর মধ্যে প্রায় ১২ পাউণ্ড ভাগ নাইট্রোজেন, ইহা কর্ষিত ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বাড়াইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষেত্র কখনই অকর্ষিত বা আচোট ফেলিয়া রাখিতে নাই। এরূপ ফেলিয়া রাখিলে মাটী ফাটিতে থাকে, তাহাতে ওই সকল ফাটল দিয়া নিম্নস্তরের রস উপরে উঠিয়া যায়, এবং ক্ষেত্রের বহু নিম্নস্তর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া পড়ে। কৃষির উন্নতির জন্য মাটীর—ক্ষেত্রের—ভিতরে বায়ু ও রস থাকা একান্ত প্রয়োজন। অকর্ষিত বা আচোট ক্ষেত্রের মধ্যে এই দুইটির কোনটিরই সংস্থান সম্ভব হয় না। ওই প্রকার শুষ্ক জমীকে 'মরা জমী' বলে।

বৃষ্টির অভাবে আমাদের দেশের কৃষি যে একেবারে নিষ্ফল হয়, ইহার কারণ আমরা ভূগর্ভের মধ্যস্থ রস একেবারেই আমাদের কাজে লাগাই না, অল্পমাত্র মাটী চষিয়া বৃষ্টি হইতে প্রাপ্ত রসের দিকে চাহিয়া থাকি। মাটী গভীর করিয়া চাষ দিলে আমাদের এ অভাবটি অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করিলে আমাদিগকে অজন্মার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। পরন্তু গভীর চাষ দেওয়া ক্ষেত্র অতি বৃষ্টিতেও জল অধিক পরিমাণে শোষণ করিয়া লইয়া অজন্মা ঘটিতে দেয় না। প্রত্যেক কৃষিনিরত ব্যক্তির এই তথ্য গুলি জানিয়া রাখা উচিৎ।

বৃষ্টির জলে মাটীর উপরিভাগ জমাট বাঁধিয়া বা কঠিন হইয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, মাটীর সুচারুরূপে পাইট করিয়া, বীজ বপন করিয়া, গাছগুলি ভাল জন্মিবার পর বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্রের উপরের স্তর জমাট বাঁধিয়া গেল; এবং তন্নিবন্ধন গাছগুলি নিস্তেজ হইতে হইতে ক্রমশঃ শুকাইয়া গেল। ইহার কারণ বৃষ্টি জনিত উপরের স্তরের কঠিনতা ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্রের ভিতরে বায়ু ও আলোকের প্রবেশের পথ করিয়া না দেওয়া। এই জন্য ফসলের ক্ষেত্রের উপরিভাগ চিরকাল আল্‌গা রাখা চাই, মাটী সুচূর্ণ রাখা একান্ত আবশ্যক।

ভূমি কর্ষণের বা চাষের সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই বলিলাম। সকলেই মনে রাখিবেন এইটিই কৃষির প্রধান অবলম্বন। সারের অভাবেও ফসল জন্মান যায়, বৃষ্টির বা সেচের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও ফসল ফলান চলে, কিন্তু মাটী না চষিয়া বীজ বপন করিলে আদৌ ফসল ফলিবেনা। বরং চাষের গভীরতা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের নিম্নতর স্তর আলোড়িত করিয়া অন্তরস্থ রস উত্তোলন করিয়া জলের অভাব কতকটা পূর্ণ হইতে পারে; এবং কথিত স্তর আলোড়িত হইয়া বায়ু ও রৌদ্র যোগে উর্ব্বরতা বাড়াইয়া সারের অভাবও কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। তবে ইহাও স্থির, যে গভীর চাষের উপর

জল এবং সারের সহায়তা পাইলে, ফসলের ফলন আশাতীত প্রচুর হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই ভূমি কর্ষণের কথাটি প্রথমেই বলিলাম।

'সারে'র কথাও মাটীর কথারই অন্তর্গত। অতঃপর আমি সংক্ষেপে 'সার' সম্বন্ধীয় কথার আলোচনায় মনোনিবেশ করিব। আমি জানিনা, আমার এতদিনের কথাগুলি কাহারও কোনও উপকারে আসিয়াছে কি না?

—"চাষা"

(ক্রমশঃ)

পান চাষ।

—০—

আজ যে দ্রব্যটির চাষের কথা লিখিতে বসিতেছি, ইহা আমাদের দেশে খুব সুপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত। পান ব্যবহার করেন না এমন সভ্য ভারতবাসী খুব কমই দেখিয়াছি। হিন্দুর ত দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে এবং বহু পর্ব্বে ধর্ম্ম কার্য্যেও পানের ব্যবহার আছে। মুসলমানেরা পান ও আতর দিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। আহারের পর তাম্বুল চর্ব্বন বা পান চিবাইয়া মুখ শোধন সকল হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য ভারতবাসীও করিয়া থাকেন। এ ছাড়া দেশীয় চিকিৎসায় ঔষধের অনুপান রূপে এবং টোটকায়ও পানের রসের ব্যবহার হইয়া থাকে।

পানের চাষ করিতে কিন্তু তাম্বুলী এবং বারোজীবি শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোকের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। আজকাল দুই চারিজন মুসলমান, যাঁহারা পূর্ব্বে বারোজীবিগণের ক্ষেত্রে বা বরোজে কাজ করিয়া এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিযুক্ত হইয়াছেন। সাধারণতঃ এ সম্বন্ধে সাধারণের অভিজ্ঞতা খুব কম; এবং তাম্বুলী ও বারোজীবিগণ তাঁহাদের এই চাষ সম্বন্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা সহজে কাহাকেও জানাইতে ইচ্ছা করেন না, পাছে এই ব্যবসায়টিতে অন্য শ্রেণীর লোক প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহাদের বৃত্তিতে ভাগ বসায়। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা পানের ব্যবহার এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দিন দিন যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই চাষটির বিস্তৃতি আরও অধিক হওয়া উচিৎ। বিশেষতঃ যে যে জেলায় ইহার চাষ নাই, এমন সকল স্থানে সম্ভব হইলে, ইহার চাষের প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি তাম্বুলী

এবং বারোজীবিগণের দ্বারা এই বিস্তৃতি সাধন সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই অন্য শ্রেণীর কর্ম্মহীনগণকে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে, নতুবা আশানুরূপ বিস্তৃতি সাধন হইবে কিরূপে?

চাষের বিবরণ পাঠ করিয়া সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ হয় না; হাতে কাজ করিয়া তদ্‌সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এজন্য কেহ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করিয়া সাফল্য এবং অসাফল্যের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হ'ন, কেহ বা তাম্বুলী ও বারোজীবিগণের অধীনে উহাদের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া প্রথম হইতেই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন। বিভিন্ন স্থানে বা প্রদেশে চাষের চেষ্টা করিতে হইতে হইলে, সকলকেই প্রথমে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে; সকলেই জানেন প্রথম চেষ্টার নাম 'পরীক্ষা' তদ্বারা উহার চাষের প্রচলনের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হইবে। পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাই কালে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভে সাহায্য করিবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি পানের চাষ খুব আয়কর কৃষি। এই একটি মাত্র কৃষি হইতেই তাম্বুলী এবং বারোজীবিগণ যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে যদিও উহাদিগের মধ্যে হইতে কিছু কিছু অভাবাভিযোগের কথা শুনা যায়, তাহার কারণ উহাঁদের চাষটির বহু বিস্তৃতি না হওয়া।

পানের নানা জাতি আছে, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আকৃতি ও আস্বাদগত যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্ন বঙ্গে এবং কলিকাতার বাজারে আমরা মিঠাপান, ছাঁচিপান, দেশী পান, রংপুরী পান, যশুরে পান, এবং বারুইপুরে পান,—এই ছয় জাতীয় পান দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে সকল গুলিই বরোজে বা বরুইতে চাষ হয়। এগুলি ছাড়া আর এক জাতীয় পান আমরা দেখিয়াছি, উহা বাটীর পাঁচিল বা কোন বড় গাছ আশ্রয় করিয়া থাকে; ইহাদের সাধারণ নাম 'গাছ পান'। এই জাতীয় গাছ খুব সুখী নহে, প্রবল বায়ু এবং রৌদ্রে ইহাদের কোন অনিষ্ট হয় না, তাই ইহাদের জন্য বরুই বা বরোজের প্রয়োজন নাই।

মিঠা পান। ইহা ক্ষেত্রজ, রং একটু ফর্সা বা শ্বেতাভাযুক্ত, সুস্বাদু এবং লালাবর্দ্ধক। ইহার একটি সুগন্ধ আছে, পাতা একটু পুরু, এবং চর্ব্বনে মুখ বেশ সরস হইয়া থাকে।

ছাঁচি পান। ইহাও ক্ষেত্রজ, আকারে ও বর্ণে অন্যান্য জাতীয় পানেরই মত, এবং সুস্বাদু ও রসবর্দ্ধক। ইহার পত্রের নিম্ন পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণরেখা বা শিরা দেখা যায়, এবং ঐ গুলিই ইহার বিশেষত্ব।

দেশী পান। উল্লিখিত দুই জাতি ব্যতীত বাজারে যত প্রকারের পান দেখা যায়, সকলেই দেশী পান। কেবল কয়েক প্রকার সামান্য বিশেষত্ব লইয়া ইহার মধ্য হইতে রংপুরী, যশুরে এবং বারুইপুরে পান বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং উহাদিগকে

সেই বিশিষ্টতার জন্য পৃথক জাতীয় বলা হয়। ইহারা সকলেই ক্ষেত্রজ পান। সাধারণ দেশী পান হইতে রংপুরী পানের পার্থক্য এই যে, ইহা ক্ষুদ্রাকার এবং পুরু পাতা, সহজে খিলি করা যায় না। যশুরে পান খুব বৃহদাকার, পাতলা পাতা এবং বর্ণ কৃষ্ণাভাযুক্ত। বারুইপুরে পানের বিশিষ্টতা আকারে বা বর্ণে ধরা যায় না, পাতাগুলি অল্প পুরু অথচ কোমল, বেশ খিলি করা যায়, এবং চর্ব্বনের পর আদৌ 'ছিবড়া' থাকে না। অন্য দেশী পানে শিরাবাহুল্য থাকায় চর্ব্বনের পর 'ছিবড়া' থাকে। ওষ্ঠরাগ বর্দ্ধন ও মুখ সরস করাই দেশী পানের বিশিষ্টতা। উল্লিখিত সকল জাতীয় পানই (গাছ পান ব্যতীত) ক্ষেত্রজ অর্থাৎ বরোজে বা বরুইতে চাষ করা হয়, ইহারা অধিক বায়ু বা রৌদ্র সহিতে পারে না, বড়ই সুখী গাছ (লতা বিশেষ)।

গাছ পান। গাছ পানের পাতাও পুরু, মচমচে এবং ভঙ্গপ্রবন বলিয়া ভাল খিলি হয় না। ইহাও বেশ উপাদেয়। ইহাদের চাষে বরোজ বা বরুইএর প্রয়োজন হয় না। ইহার বল্লরী আম কাঁটাল প্রভৃতি বড় গাছ বা ইষ্টক প্রাচীর পার্শ্বে রোপন করিতে হয়। বৃক্ষ বা প্রাচীরের মূল হইতে ২।২॥ হাত দূরে একহাত গভীর খাত করিয়া পৌষ অথবা মাঘ মাসে ছাই এবং গোবর সার দিয়া উহা পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং পরে বর্ষার সময়ে চারা সংগ্রহ করিয়া ওই খাতে রোপন করিবে। যদি বৃষ্টি বন্ধ থাকে, তবে কয়েক দিন চারার মূলে জল সিঞ্চন করিয়া উহাকে 'লাগিয়া যাইবার' পক্ষে সহায়তা করিবে। ইহার ডগা বসাইয়া গাছ হয়, এবং পুরাতন মূল হইতে স্বভাবজ উৎপন্ন চারাও পাওয়া যায়; বলা বাহুল্য চারা বসানই ভাল।

চারা বা ডগা বসাইয়া জল দিয়া মূলের মৃত্তিকারন্ধ্র অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে যেন মূলের মৃত্তিকা শুষ্ক না হয়। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই নূতন শিকড় বাহির হইয়া গাছ লাগিয়া যাইবে এবং গাছেও নূতন পাতা বাহির হইয়া গাছ লতাইতে থাকিবে। তখন বংশশাখা বা অন্য পালা লাগাইয়া পানের গাছকে উহার আশ্রয় বৃক্ষ বা প্রাচীর অবলম্বন করিতে সাহায্য করিবে। গাছপানের প্রত্যেক গ্রন্থি মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় বাহির হইয়া থাকে, উহার দ্বারা উহারা আশ্রয় বৃক্ষ বা প্রাচীর অবলম্বন করিতে পারিলে, তখন আপনা আপনি উহা শিখর দেশে ধাবিত হয় এবং তথায় বিস্তৃত হইতে থাকে। এই কালেই এবং শিখর দেশেই ইহারা বহু পত্রযুক্ত হইয়া থাকে।

গাছপানের গাছ অনেকদিন বাঁচে এবং যত পুরাতন হয়, তদ্বির করিয়া রাখিতে পারিলে, তত বেশী পান দিয়া থাকে। তদ্বিরের মধ্যে লতার মূলে আগাছা জন্মিতে না দেওয়া, মাঝে মাঝে মাটী ও সার দেওয়া, এবং প্রয়োজন মত জল দিয়া মূলের মাটী সরস রাখাই প্রধান। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি ২।১টী করিয়া এই পানের গাছ করেন, তবে

তাঁহাদের পানের অভাব দূর হইতে পারে। গাছপান আশ্রয় বৃক্ষের কোন ক্ষতি করে না। পাতা তুলিবার সময় সমস্ত পাতা ভাঙ্গা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে গাছের ক্ষতি হইয়া থাকে। ডগার পাতা না ভাঙ্গিয়া নিম্নদেশের সুপুষ্ট পাতাই ভাঙ্গা উচিৎ।

(ক্রমশঃ) —শ্রী'তাম্বুলী'।

ভ্রম সংশোধন।

—*—

ভ্রমক্রমে মাঘ সংখ্যায় "তুলার চাষ,—কার্পাস" প্রবন্ধের ২৯৩ পৃষ্ঠায় 'কানপুর ক্ষেত্রে উৎপাদিত মার্কিন দেশীয় বীজের কার্পাস গাছ'এর ছবির পরিবর্ত্তে ঐস্থানে 'পশ্চিম দেশায় বীজের গাছে'র ছবি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ ভ্রমটি সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি—কৃঃ সঃ।

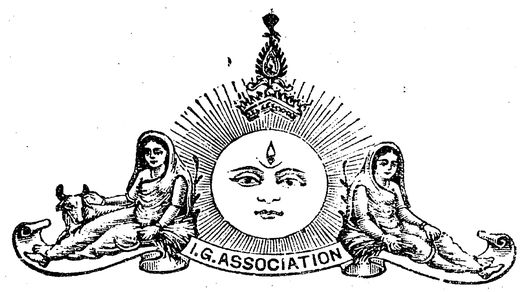

কৃষক—চৈত্র, ১৩৩০ সাল।

বর্ষ শেষে।

—:•:—

দেখিতে দেখিতে একটি একটি করিয়া কৃষকের জীবনের চব্বিশটি বৎসর গত হইতে চলিল। মানুষের জীবনে ইহাকে 'বয়স বাড়া' বলে, অর্থাৎ ইহা তাহার সীমাবদ্ধ সমগ্র জীবনের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের বিস্তৃতি। কিন্তু বয়সটা কি শুধুই মৃত্যুর দিকে আগাইয়া দেয়? না, বয়সটা তাহার জীবনের সাধনার দ্বারা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মাপকাটি? যে যত বেশী দিন বাঁচে, সে তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের সম্বন্ধে তত বেশী অভিজ্ঞ। তাই লোকে কথায় বলে,—"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং,—'পাকা মাথার কথাই সার'—'ages must be respected." সুতরাং বর্ত্তমান সাময়িকপত্র মহলে 'কৃষক' প্রবীণত্বের দাবী রাখে, 'কৃষকে'র বয়স অনেকের চেয়ে বেশী। তা ছাড়া, কৃষি সম্বন্ধে 'কৃষক'ই একমাত্র প্রধান পত্র। 'কৃষক' বসিয়া বসিয়া তাহারই জীবিতকালের মধ্যে কত সহযোগী পত্রের উত্থান-পতন, জন্মমৃত্যু দেখিল; কতলোকের কত কথা শুনিল। কিন্তু দেশের মধ্যে তাহার কাজ ফুরায় নাই, অসমাপ্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার অবসর লওয়াও ঘটে নাই। ভগবান দেশেরই জন্য তাহাকে সৃজন করিয়াছেন, 'কৃষক' তাই নীরবে এতকাল দেশের সেবা করিয়া চলিতেছে।

বাদপ্রতিবাদবিহীন 'কৃষকে'র এই নীরব জীবনযাত্রায় তাহাকে অনেক সহযোগীর, যাহাদের বয়স আজিও কৌমারের সীমার বাহিরে যায় নাই, তাহাদের নিকট অনেক অনালোচ্য কথা শুনিতে হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পরশ্রীকাতরতা। 'কৃষকে'র শ্রী যদি কাহারও অসহ্য হয়, তবে কেমন করিয়া তিনি দেশসেবা করিবেন, বুঝিতে পারিনা। 'কৃষকে'র লেখকগণের মতামত বহু কৃষি সম্বন্ধীয় গ্রন্থলেখক তাঁহাদের পুস্তকে সাদরে গ্রহণ এবং উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইয়াছে।

শুধু কৃষিই কোন দেশের উন্নতি সম্যকরূপে সাধন করিতে পারেনা। শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যতীত কৃষির আশানুরূপ উন্নতি সম্ভব হয়না, তাই আপনাদের 'কৃষক' কৃষি ও শিল্পবিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়েরও আলোচনা করিয়া থাকে। কৃষির সীমা শুধু কাঁচামাল উৎপাদন করা পর্য্যন্ত। কিন্তু মানুষ তাহার প্রয়োজনীয়তার দিক্ দিয়া এমন অনেক বস্তু চায়, যাহা কৃষির সীমার বাহিরের জিনিস। ঐগুলি পাইতে হইলে মানুষকে শিল্পেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আবার কৃষি ও শিল্পের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধই বাণিজ্য বা বিনিময়। সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের, শিল্পের উন্নতির জন্য কৃষি ও বাণিজ্যের, এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কৃষি ও শিল্পের সহযোগিতা চাই; আর সমগ্র সমাজের—জাতির—বা দেশের উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যের—তিনটিরই পূর্ণ সহযোগিতা চাই। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে কৃষিরও আশানুরূপ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। পাশ্চাত্য সভ্যজগতের কৃষকেরাই ব্যবসায়ী বা business men, এবং শিল্পিরাও তাহাই। এই অতি প্রয়োজনীয় এবং পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ তিনটি বিষয়ের একত্র আলোচনা এদেশে একা 'কৃষক'ই করিয়া থাকেন, এবং সেইদিক্ দিয়া ইহার অনুরূপ পত্রিকা এদেশে আর নাই। কোন কোন পত্র ইহাকে 'ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েব মুখপত্র' বলিয়া নিন্দা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলি 'ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুখপত্র' হওয়াটিই বরং 'কৃষকে'র পক্ষে গৌরবসূচক; অন্যের সে সৌভাগ্য লাভ ঘটে নাই বলিয়া 'ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুখপত্র' হওয়াটি 'কৃষকে'র পক্ষে গৌরবহানীকর বিবেচিত হইতে পারে না।

আলোচ্য বর্ষে 'কৃষক' শতাধিক নূতন বিষয়ের নূতন তথ্য দিয়া দেশের কৃষিশিল্প-বাণিজ্যনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন; এবং তাহারই ফলে ইহার গ্রাহকসংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে। নূতন গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা প্রায়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আলোচিত বহু বিষয়ের পুনরালোচনার জন্য অনুরোধপত্র পাইতেছি। তাঁহাদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন—তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইবে না. ক্রমশঃ আমরা সাধ্যমত তাঁহাদের সকল অনুরোধ রক্ষার ব্যবস্থা করিব।

আলোচ্য বর্ষটি 'কৃষকে'র জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে উহার উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের অনেক স্রোত বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয়—ঐসকল পরিবর্ত্তনে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অসুবিধা ঘটিলেও আমাদের অনেক কার্য্যে উন্নতিই সাধিত হইয়াছে। আমরা আশাকরি 'কৃষকে'র বর্ত্তমান সুশৃঙ্খলা আমরা ভবিষ্যতেও রক্ষা করিতে পারিব।

পল্লীসংস্কার।

পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন আজকাল অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়াছে, ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কার সাধন করিতে হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার কোন গুলি বর্জ্জনীয় এবং কোন গুলি রক্ষণীয় তাহা স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে পল্লীগুলির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সর্ব্ব প্রথমেই চেষ্টা করিতে হইবে, সেকথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু কেমন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে সে উপায় সম্বন্ধে বড় কাহাকেও চিন্তা বা কাজ করিতে দেখিনা।

'ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি' বলেন মশক নিবারণে পল্লীগুলির নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার অধিক সম্ভাবনা। তাঁহাদের মতে যেস্থলে শতকরা ৩০ জনের জ্বর হয়, শুধু মশা তাড়াইবার উপায় অবলম্বনে তথাকার শতকরা ২৮ জনের স্বাস্থ্য ভাল হইয়া উঠিবে, ইহা 'কুইনাইন' ব্যবহারের চেয়েও ফলদায়ক, কেননা 'কুইনাইন' ব্যবহারে উহার মধ্যে মাত্র ১০ জনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। তাঁহারা মশা তাড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দিয়া থাকেন।

(ক) গ্রামের মধ্যবর্ত্তী জলনিকাশের পথ বা নালাগুলি পরিষ্কার এবং কার্য্যকরী করিয়া রাখা।

(খ) ছোট ছোট খানা ডোবা, যাহা গ্রীষ্মকালে জলশূন্য হইয়া থাকে, অথচ বর্ষাকালে জল আবদ্ধ করিয়া রাখে, ওইগুলি বুজাইয়া ফেলা।

(গ) গ্রামের মধ্যবর্ত্তী বড় বড় পুকুরে কই, মৌরলা, পুঁটি, চুয়া প্রভৃতি মশক-কীড়াভুক্ মাছের চাষ করা, এবং পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ হইতে উহাদিগকে পরিস্কার রাখা।

(ঘ) ছোট ছোট বনজঙ্গল, যাহাতে আজকাল গ্রামগুলির মধ্যবর্ত্তী পরিত্যক্ত ভিটা বাস্তুগুলি ভরিয়া উঠিতেছে, তাহা কাটিয়া পরিস্কার করা।

(ঙ) পরিত্যক্ত ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়িতে, বড়বড় গাছের কোটরে, এবং আনারস প্রভৃতি কয়েক জাতীয় গাছের মাথায় যাহাতে বর্ষার জল জমিয়া না থাকে তাহার চেষ্টা করা।

(চ) কুয়াতে ঢাকা রাখার ব্যবস্থা করা এবং যতদিন না খানাডোবাগুলি বুজান হয় ততদিন উহাদের মধ্যে সঞ্চিত আবদ্ধ জলে মাঝে মাঝে কেরোসিন দেওয়া।

(ছ) বড় বড় পুষ্করিণীগুলির মধ্যে মধ্যে পঙ্কোদ্ধার করিয়া পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা।

আমরাও উল্লিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করিতে প্রত্যেক পল্লীবাসীকে উপদেশ দিই। ইহা দ্বারা খানা ডোবা ভরাট করিয়া গ্রামের মধ্যেই কৃষিযোগ্য জমী বাড়ান চলিবে, মাছের চাষ বাড়াইয়া বর্ত্তমান মৎস্যাভাব অনেকটা বিদূরিত হইবে এবং তদ্বারা অনেকের একটা নূতন আয়ের পথ খোলা হইবে, আর ছোট ছোট বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়াও কৃষিযোগ্য জমির বৃদ্ধি এবং কাঠের অভাবও অনেকটা দূর হইবে। গাছের কোটরে বা আনারসগাছের মাথায় জল জমিয়া থাকা নিবারণের দ্বারা গাছগুলির অবস্থাও ভাল হইবে। সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সকলেরই চেষ্টা থাকা উচিৎ।

কিন্তু কথা হইতেছে, এইগুলি করিতে যে সকল বাধা বা অন্তরায় আছে, তাহা নিবারণের উপায় কি? আজকাল পল্লীগুলিতে ত দরিদ্র কৃষক এবং শিল্পিরাই থাকে। যাঁহারা পল্লীর শক্তি সেই জমিদার এবং ধনীগণ ত পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরবাসই শ্রেয় করিয়া লইয়াছেন; অথচ তাঁহাদেরই পরিত্যক্ত বাস্তু এবং ভিটার জঙ্গল দরিদ্র পল্লীবাসীগণের পরিষ্কার করিয়া লইয়া ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। উল্লিখিত সমিতি তজ্জন্য কি সাহায্য করিতে পারেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলা দরকার।

'স্বাস্থ্য সমিতি' গঠন খুব প্রয়োজনীয়, এবং আমরাও পল্লীবাসীগণকে উহা করিতে উপদেশ দিই। ঐপ্রকার সমিতি গঠন করিয়া 'কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি'তে সংবাদ দিলে তাঁহারা প্রত্যেক 'পল্লী সমিতি'কে সাধ্যমত সাহায্য ও উপদেশ দানে উহাদের উন্নতির সহায়ক হইবেন। কলিকাতা, ১০১নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্যালয়।

আপনারা হয়ত জানেন না যে এই বঙ্গদেশে এক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যার হার এবং প্রত্যেক রোগে মৃত্যুর হার হিসাব করিলে দেখা যায় প্রত্যহ—

প্রতি	১½	মিনিট	অন্তর	একজন করিয়া	অধিবাসী	ম্যালেরিয়ায়	মরিতেছে।
”	৩	”	”	”	”	নিউমোনিয়ায়	”
”	৪	”	”	”	”	ওলাউঠায়	”
”	৪	”	”	”	”	আমাশয়ে	”
”	৫	”	”	”	”	ক্ষয়রোগে	”
”	৮	”	”	”	”	সুতিকায়	”
”	১৫	”	”	”	”	ধনুষ্টঙ্কারে	”
”	৩০	”	”	”	”	কালাজ্বরে	”

এবং প্রত্যহ একজন করিয়া টাইফয়েড্ জ্বরে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে।

দেশের এ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; সুতরাং স্বাস্থ্য সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অধিক করিয়া বলিবার দরকার হয় না।

খাদ্যাভাব।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে সকল দিক দিয়াই মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আবশ্যকমত খাদ্যের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে। খাদ্যশস্য যাহা জন্মে তাহার পরিমাণ সকলের প্রয়োজনের অনুরূপ নহে। ইহার উপর বিদেশে রপ্তানীও আছে। বাণিজ্যের হিসাবে আমরা আমাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের কিয়দংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য, নতুবা কিসের বিনিময়ে আমরা অন্য দেশ হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অন্য বস্তু আহরণ করিব? আমাদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসইত আর এদেশে উৎপন্ন হয় না। আমাদের প্রধান খাদ্য যে চাউল তাহার পরিমাণ আবশ্যকতার দিয়া হিসাব করিলে খুব কম করিয়া ধরিয়াও সমগ্র ভারতের জন্য ৭৯০ লক্ষ টন প্রয়োজন, কিন্তু উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ মাত্র ৬৪০ লক্ষ টন, অর্থাৎ প্রত্যেক লোকেরই প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশের অভাব।

এই বাংলাদেশেই পূর্ব্বে কত গাভী ছিল, প্রত্যেক গৃহস্থেরই দশ বিশটি করিয়া গাভী থাকিত; তাহার পরিবর্ত্তে এখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই গো-পূজক হিন্দুর দেশে—ভারতবর্ষে পালিত গরুর সংখ্যা নিম্নের তালিকায় দেখুন।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে	প্রতি	একশতজনে	২৫৯টি	গরু	আছে।
নিউজিলণ্ডে	”	”	১৫০	”	”
কেপকলোনীতে	”	”	১২০	”	”
কানাডায়	”	”	৮০	”	”
ইউনাইটেডষ্টেট্‌সে	”	”	৭৯	”	”
ডেনমার্কে	”	”	৫০	”	”
ভারতবর্ষে	”	”	৫০	”	”

মনে রাখিবেন, ভারতবর্ষের মত আর কোন দেশেই এত দুর্ব্বল নিকৃষ্ট জাতীয় অল্প দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বেশী নহে, এবং এখনও ভারতের উৎকৃষ্ট জাতীয় গোধন রৌপ্য-ধনের বিনিময়ে সকল দেশেই চলিয়া যাইতেছে। অন্য খাদ্যের অভাব হইলে প্রচুর দুগ্ধ

ও ঘৃতের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইবার আশাও নাই। হা চির দরিদ্র চাকরীজীবি দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! রাজনৈতিক অধিকার লাভে আপনারা এত উন্মত্ত, কিন্তু বলুন দেখি, আর কিছু দিন পরে এ জাতির অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? কে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবে? ভবিষ্যৎ বংশধরগণ? আপনি জানেন কি, এদেশের শিশু-মৃত্যুর হার গড়ে প্রত্যহ আট শত ষোলটি করিয়া! আর এদেশের লোকের আয়ু গড়ে পুরুষের ২২ বৎসর, এবং স্ত্রীলোকের ২৩ বৎসর; পৃথিবীর কোনও দেশের লোকের আয়ু গড়ে ৪৪ বৎসরের কম নহে।

আহার-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রয়োজন।

আজকাল সেইজন্য অনেকেই বলেন, আমাদের আহারের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও প্রয়োজনমত উন্নতি সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে ভাত খাই, ফেনের সঙ্গে উহার পুষ্টিকর অংশের অনেকটা ফেলিয়া দিয়া খাইয়া থাকি। যদি রন্ধন প্রক্রিয়াটি একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া, ভাতের ফেন ফেলিবার দরকার হইবে না, এমন করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে অন্ন গ্রহণ করিয়াও আমাদের খাদ্যাভাব আমরা অনেকটা দূর করিতে পারিব। জাপানের লোকেরা আমাদেরই মত অন্নভোজী, কিন্তু তাহারা এমন ভাবে ভাত রাঁধে, যে তাহাতে ফেন থাকেনা, সুতরাং ফেলিতেও হয় না। তাহারা অন্নভোজী হইয়াও কত সুস্থ ও কত সবল, আর আমরা ফেন ফেলিয়া ভাত খাইয়া কত রুগ্ন ও কত দুর্ব্বল! মিতব্যয়িতার দিক্ দিয়া দেখিলেও আমাদের অন্নপাক ক্রিয়ার কিছু পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ওই প্রকারে, ফেন ফেলিবার প্রয়োজন না হয়, এমন ভাবে রন্ধন করিতে পারিলে, সেই সারবান অন্ন অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিয়াও সকলেরই ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং শরীর পোষণ হইবে, অথচ প্রয়োজনীয় চাউলের পরিমাণ কম হইয়া আসিবে। ভবিষ্যতে আমাদের এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় করিবার ইচ্ছা রহিল।

'অশ্বগন্ধা চাষ' সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

পাঠকবর্গের অনেকেই গত ফাল্গুন সংখ্যায় আলোচিত 'অশ্বগন্ধাচাষ' সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অনুসন্ধানসূচক প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা ভবিষ্যতে উহার কৃষি বিষয়ক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। কিন্তু উহার বানিজ্য বিষয়ক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলি, এখনও দেশে উহার আবশ্যকমত প্রচার হয় নাই। তদনুরূপ প্রচারের দ্বারা উহার ব্যবসায়টি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য 'ভারতীয় কৃষি সমিতি'তে পত্র লিখিয়া সকল তথ্য অবগত হউন। শুনিতেছি শীঘ্রই 'ভারতীয় কৃষি সমিতি' এসম্বন্ধে একখানী পুস্তক প্রকাশ করিবেন, তজ্জন্য চাষের এবং ব্যবহারের পরীক্ষা চলিতেছে।

বাগানের মাসিককার্য্য।

(বৈশাখ মাস)

সব্জীবাগান।—মাথমসীম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারির বীজ বসাইবার এখনও সময় হয় নাই। টেপারির বীজ জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালাবিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, ও চিচিঙ্গার বীজ বৈথাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধইঞ্চা, অরহর, পাট প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময়ে রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতির বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে। কিঞ্চিৎ অধিক বারিপাত হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, এবং তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজইক্ষুর বা আখের টাক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেত্রে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক বোধ হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময় বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা বাঁশ, ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

আদা, হলুদ, আটিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে এসবগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে!

ফুলবাগান—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস, দোপাটী, গ্লোবআমরা-

স্থাস্, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছে আবশ্যকমত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে। যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।